১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩৪৮

পরিচয়

মোহানা

মাসীমার মৃত্যুর পর খগেনবাবু ও রমলার একত্র বসবাসে বাধা রইল না। মুকুন্দ আর চাকরী করবে না বলে দেশে গেল। গিন্নীর কৃপায় সে কিছু ধান জমি করেছে, তাইতে একটা পেট ভরবে যা করে হোক। সুজনেরও কোনো খবর নেই। বিজন ছাত্র-সমাজের একজন কর্ম্মিষ্ঠ বামমার্গী সভ্য হয়েছে। গুজোব এই যে ইতিমধ্যে সরকারের দৃষ্টি তার ওপর পড়েছে। বিজনের পিতার একজন বাল্যবন্ধু, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বিজনকে চায়ে ডেকে উপদেশ দিলেন পড়াশুনোয় মন দিতে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর অত্যধিক স্নেহময় উদ্বেগও যখন তাঁর তের বৎসরের কন্যার রূপের ক্ষতিপূরণে অসমর্থ হল তখন বিজন গুরুজনদের মুখের ওপর যৌবনের দায়িত্ব শুনিয়ে সোজা খেলার মাঠে চলে যায়। পরের দিনই তার রমাদিকে সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে যে-কোনো দিন সে দেশত্যাগী হয়ে হয় বিদেশে, না হয় অন্য প্রদেশে চলে যাবে। বিদেশের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, এবং প্রবাসের মধ্যে বম্বে কিংবা কানপুর তার গন্তব্য নির্ব্বাচিত হয়ে গিয়েছে—কিন্তু, কাশী কিছুতে নয়।

কাশীধাম পুরাতনের প্রতীক। কাশীর জীবনযাত্রায় মাসীমার জীবন মাখান; ভাঙ্গা বাড়ির বড় কর্ত্তার আলবোলার ধোঁয়ার মতন সর্ব্বত্র তার পরিব্যাপ্তি; পরতে পরতে পাকে পাকে ডাকে ডাকে গতায়ু সংস্কারের ছোঁয়াচ, আর কণ্ঠশ্বাস। সমগ্র সহরটা গঙ্গাবাসীর ঘর, তার হাল-ফ্যাশানের বাংলোগুলোয় এক বছরেই ফাট আর নোনা ধরে, বৃদ্ধা পিতামহী

বহুদিন যাবৎ শুষছেন, প্রথম প্রথম নাতি নাতনী নাতবৌরা সেবা করতে আসত, এখন তারা নিজের ধান্দায় ব্যস্ত, ছেলেরা চাকরী করে ঔষধালয়ে, আর ঝিউড়িরা রামনগরের বেগুণ কেনে, বউএরা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার রান্না-ঘরে তাই পুড়িয়ে সোয়ামীদের ভাতে ভাত দেয়। মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ, আর বিধবার প্রসব-বেদনার চীৎকার। কাশী যে-বস্তু যখের ধনের মতন রক্ষা করে সেটা এক প্রকাণ্ড ছোবড়া। জড়বাদের লীলাক্ষেত্র কাশীধামে যখন সাধু-সজ্জনের নতুন আশ্রম স্থাপিত হয় তখন তন্ত্রের আবশ্যিকতা বুঝতে দেরী থাকে না। এখানকার জীবনে যতটুকু স্বাধীনতার সুযোগ মেলে সেটুকু শব-সাধনার। অথচ, কাশী আসা চাই, থাকা চাই, সেখানে কেন্দ্র স্থাপনা না হলে কোনো অনুষ্ঠানই সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না। কিন্তু সত্য কথা এই, কাশীধামে সব কিছু রটে, কোনো কিছুই ঘটে না।

অবশ্য, মধ্যে মধ্যে সন্দেহ জাগে ঘটনার দরকারই বা কি? বিজ্ঞান, দর্শন, অধ্যাত্ম-চর্চ্চা এই ত' হল, অন্ধকার ঘরে অন্ধজনের কালো বিড়াল খোঁজার মতনই তার সার্থকতা। চিত্তশুদ্ধি চিররুগ্নের ভাববিলাস, অবসর-বিনোদন, কৃতি ও ইচ্ছাপূরণ। হিমালয় ভ্রমণ নিজের ছায়া থেকে পলায়ন। তাতে দুঃখ নেই, কর্ম্মফল কাটাতে হবে, আদিম অভিশাপের স্খালন চাই, নচেৎ দেহ ও মন প্রেতলোকেও কলহের জের টানবে। কিংবা, হয়ত মানুষের জীবনে উত্থান-পতনের কক্ষ সুনির্দ্দিষ্ট, তার থেকে বিচ্যুতি নেই, ঘটলে প্রলয় বাধে, কে আর প্রলয় চায়! তবে, কোনটা ওঠা, আর কোনটা নামা? যারা সব কাজের পিছনে ও সামনে উদ্দেশ্য রয়েছে মানে তাদের খানিকটা সুবিধা; কিন্তু যাদের পক্ষে উদ্দেশ্য-প্রেরণা কাব্য-সংস্কার মাত্র, তারা এই চিরন্তন দোলায় দুলতে পারে না; হয় জীব-ধর্ম্ম, না হয় বুদ্ধি, এই ধরণের যুক্তি তাই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য।

প্রথম প্রথম খগেন বাবুর চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটে। এমন কয়েক দিন গেল যখন দেহসম্ভোগ থেকে বিরাম ছিল না। পরের কয়েক দিন সারাক্ষণ সাহিত্যপাঠ—বোকাচ্চিও, পেট্রোনিয়াস, বার্টন, কাসানোভা, বাৎস্যায়ন, কালিদাস। যখন বোদলেয়ার হাতে এল, তখন বুঝলেন, যে-সাধনার ফলে অমঙ্গল বিশ্বরূপ ধারণ করে সেটা চিত্তশুদ্ধিরই শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রক্রিয়া, পাপ ও পুণ্য-সম্ভোগ একই ক্ষুধা-

নিবৃত্তির উপায়। বোদলেয়ার তাই বিরেচকের কাজ করল। ফলে খগেনবাবু স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন, দেহ ও মনের পার্থক্য ঘুচে যুগ্ম-অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করলেন। এই লঘু অবসরে শারদীয় মুক্তি বসন্তের প্রসারণে পরিণত হল।

নৌকাবিলাসে দুজনের সারা সন্ধ্যা কাটত। বিকেল থেকেই সাজ-সজ্জার আরম্ভ, এলো খোঁপায় কখনও রঙ্গন, কখনও বেলীর মালা, ছোট ব্লাউজ কাঁধের ওপর তোলা, আংরাখার ফিতে দেখা যায়, নানা রঙের সাড়ি এঁটে-পরা, আঁচল ছোট রাখার কৃপায় গড়ন পাতলা দেখায়। যতক্ষণ আলো থাকত, ততক্ষণ কাশীর লোকাকীর্ণ ঘাট পরিত্যাগ করে অন্য তীরে চলে যেতেন, সেখানে বালির ওপর বসতেন দুজনে। ওপারে এক একটি করে আলো জ্বলত, নহবতখানা থেকে সানাই-এ মূলতানী, পূরিয়া, পূরবীর আলাপ ভেসে আসত। সন্ধিরাগে মন উদাস করে দেয়, তার কোমল রেখাব আর তীব্র মধ্যমের সংযোগে কি এক জাদু আছে যার আহ্বানে অতি নিকটের সামগ্রী দূরে সরে যায়, এ-পারের ডাক ও-পারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। খগেনবাবু রমলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন, রমলা ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রাত আসে, বালুর চরের ওপর দিয়ে পাখী ওড়ার শব্দ আর পাওয়া যায় না। ইমন, কল্যাণ, ভূপালির গৎ সুরু হয়, লোকালয়ের আকর্ষণে তাঁরা নৌকায় চড়েন। এত শীঘ্র বাড়ি ফিরে লাভ নেই। ধীরে ধীরে নৌকা চলে। নৌকার খোলা পাটাতনে কার্পেট বিছানো। মাঝি ওপাশে গলুই-এ ব'সে হাল ধরে, নৌকার কুটুরীর জানলায় পর্দ্দা টাঙ্গানো, কারুর দৃষ্টি পড়ে না। রাত দশটায় দুজনে বাড়ি ফেরেন।

একদিন সন্ধ্যায়, তখনও অন্ধকার হয় নি, অন্য একটি নৌকা পাশ দিয়ে গেল। তার ওপর অক্ষয়বাবু রয়েছেন। খগেনবাবুকে অভিবাদন করে নিজের নৌকাটা পাশে ভেড়ালেন। অক্ষয়বাবু বল্লেন যে তিনি এখানকার বাঙালী যুবক সাঁতারুদলের সেক্রেটারী, কাল প্রতিযোগিতা হবে হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে, তাই আজ সন্ধ্যায় তদারক করছেন। রমলা আপনা থেকে ঘরের মধ্যে উঠে যাচ্ছিল। অক্ষয়বাবু হেসে বল্লেন, 'একটু আধটু ঠেকা দিতেও জানি। ভেতরে হারমনিয়ম আছে?' রমলা উত্তেজিত হয়ে মাঝিকে ঘাটে যেতে আদেশ করলে। পরের কয়েকটি সন্ধ্যা সিনেমায়

কাটল। যেদিন আবার নৌকায় বেরুলেন সেদিনও অক্ষয় ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ও মশাই, কাশীর এ-রীতি নয়, একলা মজা লুটতে বাবা বিশ্বনাথের বারণ আছে।' ফিরে এসে রমলা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে। কাশীর জীবন বিষিয়ে উঠল। খগেনবাবু রমলাকে আনন্দ দিতে সারাক্ষণ পাশে বসে রইলেন, আদর বাড়ল, সাড়ির পর সাড়ি দোকানীরা দেখাতে আনল, দ্বিগুণ উৎসাহে মালিরা ফুল যোগাতে আরম্ভ করলে, খান কয়েক বড় আর্শী কেনা হল। বিচিত্র পোষাকে, বিচিত্র ভঙ্গীতে রমলা দাঁড়াত আর্শীর সামনে, ঘরের কোনের আলো পড়ত তার মুখে, বুকে, হাতে, খগেনবাবু অন্ধকারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেন। দেখতে দেখতে কখনও তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হত সর্ব্ব দেহে, নিজে উঠে আলো নিভোতেন, রমলা মন্ত্রমুগ্ধের মতন চোখ বুজে খগেনবাবুর কাছে আসত। পরস্পরের অন্তর্ব্যাপ্তিতে শারীরিক সম্ভোগ অপাপবিদ্ধ, চিন্তাধারা অনুভূত, প্রবৃত্তিগুলি রঙ্গমঞ্চে নর্ত্তকীদের মতন সুসম্বদ্ধ হত। যে অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় পরিশীলনের অলিতে-গলিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সন্তুষ্টিসাধন এই দেহবাদের অন্তরে বিরাজ করে। বিরোধ-বিমুক্ত অবস্থায় খগেনবাবু যৌবন ফিরে পান, রমলার অকুণ্ঠ আত্মদানে জীবনের নতুন স্তর আবিষ্কৃত হয়।

এক ক্লান্ত প্রত্যুষে শয্যায় বাসি বেল ফুলের দুর্গন্ধ নাকে আসতে খগেন বাবু উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় গলা ধরে রমলা তাঁকে শুইয়ে দিলে। বুকের কাছে মুখ এনে বল্লে, এখনও সকাল হয় নি, অত ভোরে উঠতে তার মাথা ঘোরে, গা কেমন কেমন করে। গভীর আলিঙ্গনে রমলা খগেন বাবুর জড়তা কাটালে। 'জানলা দিয়ে আলো এসেছে, এবার ওঠ। আমি পারছি না, রোজই সকালে আমার গা গুলুচ্ছে।' 'বেশী রাত করে খেলে অসুখ হবে, বরাবর বলেছি, তুমি কিছুতে শুনবে না।' 'সেজন্য নয়, বোধ হয়···।' 'বোধ হয় কি?' 'যেন জানেন না, কচি খোকা!' অনেকক্ষণ খগেন বাবু রমলার দিকে চেয়ে রইলেন, একাগ্রদৃষ্টিতে কাতর হয়ে রমলা হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'রাগ হল?' 'রাগ কেন হবে?'

সারাদিন রমলা বিছানায় শুয়ে রইল। কোনো কথাবার্ত্তা হয় নি দুজনের মধ্যে। সন্ধ্যায় খগেন বাবু বল্লেন রমলার নৌকা চড়া আর হবে না, নৌকা

বড় দোলে। রমলা মেনে নিলে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খগেন বাবুকে রোজই বেরতে হবে আবদার করে বসল। দুদিন শুনলেন না, কিন্তু তৃতীয় দিনে বেরিয়ে পড়লেন। দশাশ্বমেধের ঘাটের জনতা পরিহার করে অহল্যাবাইএর প্রাসাদের নীচে বসে রইলেন। পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না পথের মধ্যে, ওপরের সামনেকার আলো জোর আগের কয়েক ধাপ দেখিয়ে দেয়, দুপাশের খানা খন্দর থেকে সাবধান করে, কিন্তু মোড়ের ওপাশে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। পথ যদি নাৎসী জার্ম্মানীর রাস্তার মতন সোজা ও বাঁধান হত, তবে গোল থাকত না। কিন্তু এ পথের সবটাই বাঁকা, প্রতি পদে দিক পরিবর্ত্তন, প্রতিক্ষেপে ভিন্ন স্তর। ইয়ুক্লীডে চলে না, রীমানের জ্যামিতি চাই, তার শাস্ত্র অজ্ঞাত, জ্ঞাত হলেও যেকালে অপ্রযোজ্য, তখন অবান্তর। কিন্তু একটা জিনিষ ভারী মজার—মনে কোনো আলোড়ন হল না শুনে, না এল আনন্দ, না এল দুঃখ। যোগসাধনার ফলে? এর মধ্যে একটা কোথায় প্রতিহিংসা রয়েছে। সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দেশ ভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চ্চা, মাসীমার মৃত্যুকে তিনি মুক্তির এক একটি স্তর ভেবেছেন; পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে অন্তস্থ সারবস্তুর সাক্ষাৎ পাবেন প্রত্যাশা করেছেন, কিন্তু আজ মনে হয় স্তর সেটা কেবল সাপ-মই খেলার ধাপ, পেঁয়াজের কূটে সেই খোসা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্যাফনুটীয়াসের পতন, না সেণ্ট আণ্টনী ও বুদ্ধের জয়, কোনটা সত্য? যীশু, বুদ্ধ নিজেরা হয়ত সফল হলেন, মোক্ষ পেলেন, কিন্তু আজ একজন খৃষ্টান, একজন বৌদ্ধের কি দশা? তাঁদের নির্দ্দিষ্ট, তাঁদের সৃষ্ট সভ্যতা আজ চুরমার। তাঁদের ধর্ম্ম নিশ্চয় জীবনের প্রতিকূল ছিল, নচেৎ জীবপ্রগতি তাঁদের অবহেলা করতে কিছুতেই পারত না। একজন বল্লেন শ্রমণ হও সকলে, আরেকজন আদেশ দিলেন সাধারণকে তাঁর অনুগামী হতে। অথচ সর্ব্বসাধারণের জীবনযাত্রায় যে-সব প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় তাদের মধ্যে রয়েছে প্রবণতার পরিমাণ, লঘু-গুরুর তারতম্য; তাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনই তাকে ওলট পালট করাও চলে না। অবশ্য প্রবৃত্তির মধ্যে পরিণতিও আছে, কোনটাই একান্ত ও বিশুদ্ধ নয়। তবু ক্রমকে অতিক্রম করলে জৈব-প্রকৃতি নাক দিয়ে জরিমানা আদায় করে। সেটা দেবার সময় মূলধনে টান পড়ে। লোকের ধারণা, ধর্ম্মে সর্ব্বজীবের আশাভরসা ভয়ভাবনার

সন্তুষ্টি থাকে। কিন্তু সেগুলো ভাব মাত্র, প্রবৃত্তি নয়। অর্থাৎ, সব ধর্ম্মের সঙ্গে জনগণের জীবনের কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নেই বলেই, সভ্যতার এই দশা, তাই মানুষের কাটা পথ রমলার খোঁপার কাঁটার মত অত বাঁকা। প্রবৃত্তি কাজে পরিণত হবেই, সভ্যতা সর্ব্বসাধারণের কাজ, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার ফল, ব্যক্তিগত জীবনের সুফলতা-নিষ্ফলতা তাই সার্ব্বজনীন জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা। সজ্ঞান প্রয়াসে সভ্যতাসৃষ্টিই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম—এ ছাড়া অন্য ধর্ম্ম অস্বাভাবিক। চিন্তার এই বিস্তৃতিতে খগেন বাবুর সাধনার দাম্ভিক নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হয়, সমগ্র পথ ও প্রতিবেশ আলোকিত হয়ে ওঠে।

ফেরবার পথে এক ডাক্তারখানায় ঢুকে খগেন বাবু লেডি ডাক্তারের সন্ধান নিলেন, প্রয়োজন হলে, পরে, যাকে পাওয়া যাবে। রমলা বিছানায় শুয়েছিল। খগেন বাবু বল্লেন, 'একবার ডাক্তার দেখালে হত না?' চমকে উঠল রমলা, 'কেন? সে আমি পারব না, মরে যাব।' 'আমি তোমাকে কি বোঝাব? তুমি সবই জান। ডাক্তার পরীক্ষা করুক, যদি সম্ভব হয়, তবে আপত্তিটা কি?' রমলা চোখ বুজে শুয়ে রইল।

ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে খগেন বাবু পাশ ফিরলেন। রমলা কি একাগ্রমনে এতদিন ধরে মাতৃত্বেরই কামনা করেছিল? খগেন বাবু কি তারই উপলক্ষ্য মাত্র? তাই যদি হয় তবে সে চরম মুহূর্ত্তে নির্জীব হল কেন? বিজয়ের গরিমাতে ফেটে পড়াই ত' সঙ্গত ছিল! কিন্তু নুয়ে গেল, ভেঙ্গে পড়ল। দৈহিক অবসাদ? সেটা স্বাভাবিক, ডাক্তারে তাই বলবে। কিন্তু ব্যাপারটা অতখানি জৈব নয়। যৌবনের উন্মাদনা ঘুচে যে অভিজ্ঞ-শান্তি চিত্ত অধিকার করে, তার অন্তরে থাকে অপার করুণা, যার আশীর্ব্বাদে চিত্ত শুদ্ধ হয়, সর্ব্বাঙ্গে বিষাদ ছায়। ঘুমের ঘোরে রমলা চোখের উপর হাত রাখল, ঘর ত অন্ধকার, কোথা থেকে আলো এল? ডান কুনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঠে শ্বাসপ্রশ্বাস শুনলেন, অনেক পরে পরে নিঃশ্বাস পড়ে, ক্রমে গতি নিয়মিত হল, খানিক পরে আবার মন্দাগতি, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, বন্ধ হল, আর একটু বন্ধ থাকলে সর্ব্বনাশ হত। বুকটা ধড়াস করে···রমলার বুকে হাত রাখেন, চেতনার চিহ্ন নেই, কোন আদিম অভ্যাসে রমলা অন্য হাতটি খগেন বাবুর হাতের ওপর রাখে···ছন্দে ফিরে এল আবার, চেতনার বহু নীচে যেখানে

ঘন গাঢ় কালো স্রোত বয় প্রাগৈতিহাসিক জীবন স্পন্দিত হয়, সেখানকার লয়ে। এরই সন্ধানে সকলেই ঘুরে মরে, জেনে, না জেনে। আবার কেন চেতনার অভ্যুদয়, আবার কেন অঙ্কুরোদ্ভব ?

খগেন বাবু উঠে টেবিল থেকে টর্চ্চ আনলেন। রমলার এক হাত চোখের ওপর, অন্য হাত তলপেটে। ওপরের হাতে আলো ফেল্লেন, রমলা নড়ল না। অন্য হাতের ওপর আলো ফেল্লেন, উত্তাপেরও অনুভব নেই। বুকের ওপর সাড়ির আঁচলটা পড়ে রয়েছে, নীচে হালকা বাঁধা জামা, অল্প চেষ্টায় সেটা খুলে গেল, সরিয়ে দিলেন আবরণ, আলো ফেল্লেন বুকের ওপর। নীল আভা, না কালীর প্রলেপ ? আলো প'ড়ে কালো বরফ গলে যাবে, নীল মেঘের টুকরো থেকে দুধ বৃষ্টি হবে, পরে নদীর সৃষ্টি, যেটা পার হওয়া দুসাধ্য। রমলা নির্ল্লজ্জের মতন পড়ে রইল। লজ্জাটা প্রাথমিক নয়, নন্দাদেবী বদরীনাথের পাশে বুক খুলে চিরটা কাল দাঁড়িয়ে রইল, পাশে নন্দকোট পঞ্চকোট প্রভৃতি পুরুষ প্রহরী—কিন্তু বুক ঢাকল না। লজ্জা নেই প্রকৃতির অন্তরে। সে কেবল কাজ করে, খগেন বাবু আলো নিভিয়ে টর্চ্চটা টেবিলে রাখলেন।

পনের দিন প্রায় রমলা বিছানা ছেড়ে উঠল না। ঝি চাকর বেয়ারা বাবুর্চ্চি রোজ সকালে আদেশ নিয়ে যায়। পেয়ালা পিরীচ ভাঙ্গতে সুরু হল, মাছ মাংসের দর বাড়ল, ফল দুষ্প্রাপ্য, খাওয়া দাওয়ার সময় গেল বিগড়ে, ন্যাপকীন ধোপার বাড়ি থেকে আসেনি, সাড়ির জরী ছিঁড়েছে, রঙ জ্বলেছে, সার্টের বোতাম নেই। রমলা উঠে বসল কাজ করতে। খগেন বাবু একটু বিরক্ত হলেন, এতদিন যে সংসার চলেছে তখন রমলা ছিল কোথায় ?

বিকেলে একদিন রমলা খগেন বাবুকে জানালে যে সুজন তাকে চিঠি লিখেছে। ঔৎসুক্য প্রকাশের অভাবে রমলা চিঠিঠা খগেন বাবুর হাতে তুলে দিলে। 'দেখই না, আমি ওকে বুঝি না।' খগেন বাবু চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ফেরৎ দিলেন, রমলা না নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে ইঙ্গিত করলে। 'এতে না বোঝবার কি আছে ? বেশ স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করেছে।'

'কিন্তু আমার দোষ কি ? ওকে অল্প বয়স থেকে দেখে আসছি। আমার প্রতি ঐ ধারণা পোষণ করবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'ধারণা কৈ ? মনোভাব, সেটা স্বাভাবিক।'

'ঢের হয়েছে আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমার কাজই বুঝি ছোট ছেলেদের বিপদে ফেলা।'

'ঠাট্টা নয়, ছেলেটিও ছোট্ট নয়। ছেলেবেলা বাছুর কোলে করেছ বলেই কি বৃদ্ধ বয়সে ষাঁড় কোলে করতে পারবে ?'

রমলা বিরক্ত হল। 'উপদেশগুলো না দিলেও পারত।'

'উপদেশ কোথায় ?'

'ওগুলো কি ? ঐ যে লিখেছে,—যদি নতুন কর্ম্মপ্রবাহে জীবন চালাতে পার তবেই সার্থক হবে, অবশ্য সেখানে তোমার কাজ নেতিমূলক। এ-সবের মানে জানি।'

'আমিও জানি, মানে অভিমান। বেচারী একলা, তাই তোমাকে চেয়েছে। এতদিন ভেবেছিল চাওয়াটা মানসিক। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে কেবল মানসিক নয়। তাই ভয় পেয়েছে, তারই বিকৃত রূপ ঐ অভিমান। তার প্রতি তোমার দায়িত্ব থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।'

'আমার দায়িত্ব! কোনো দিন তাকে আমল দিই নি, নিজে যদি ছেলে-মানুষী করে আমার তাতে আসে যায় না। এখানে আসতে চেয়েছে, আমি লিখে দিচ্ছি আসতে হবে না।'

'তা ত লেখে নি! যদি প্রয়োজন হয় তবে সে চলে আসবে, এইটুকু জানিয়েছে।'

'তবে ত' সব বুঝেছ! ওর মানে আমি তাকে আসতে লিখি। কোনো প্রয়োজন নেই।'

'থাকতে পারে, ডাক্তারে যদি রাজি হয়।'

নীচু গলায় রমলা প্রশ্ন করলে 'কাশী ছাড়তে বলছে কেন? তুমি তাকে জানিয়েছ ?'

'জানাই নি। নেহাৎ ভুল নয়। নতুন জীবন নতুন প্রতিবেশের অপেক্ষা রাখে। ঠিক লিখেছে। প্রেতাত্মারাই ছাতাপড়া দেওয়ালের কিম্ভূতকিমাকার নক্সায় আত্মগোপন করে, ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে, বেলগাছে আশ্রয় নেয়, স্থানীয় আবহাওয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে থম থমে ক'রে তোলে। অদৃশ্য

তাদের শিরা উপশিরা, কিন্তু তবু শক্ত। এত জোর কি হবে যে ছিঁড়তে পারব ?' রমলা শঙ্কান্বিত চোখে চেয়ে থাকে। খানিক পরে উঠে বসে বলে, 'সুজন আমাকে চেনে না। ওর ধারণা আমি তোমাকে নরকে নামাব। বেশ, তুমি ডাক্তার আন। আমি মা হতে চাই না, তোমাকে আমি বাঁধব না।'

লেডী ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মতে যদিও সন্তান-সম্ভাবনার চিহ্ন কিছু আছে, তবু আরও কিছুদিন অপেক্ষা না করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তবে কোনো আন্তরিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক দিন পরে লেডী ডাক্তার আবার এলেন। পরীক্ষার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন, 'না, একটি সন্তান হয়েছিল অনেক দিন আগে, মধ্যে কিছু হয় নি শুনলাম, তাই ঐ রকম হয়েছে। একটা প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্ দিচ্ছি...পরে নিয়মিত ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।'

রমলা মুড়ি দিয়ে আরো তিন চার দিন শুয়ে রইল। খগেন বাবু ঘরে এলেও মুখ খুলত না। বেয়ারাকে বলে দিলে সাহেবের অন্য ঘরে বিছানা করতে। ক্রমে বন্দোবস্তটি পাকা হল। একদিন সন্ধ্যায় আবার দুজনে নদীতে গেলেন। সেদিনও অক্ষয় এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফেরবার পথে রমলা খগেন বাবুকে বল্লে, 'চল, কাশী ছেড়ে চলে যাই। লক্ষ্ণৌ বেশ ভাল জায়গা শুনেছি। তোমার মেশবার উপযুক্ত লোক রয়েছে অনেক সেখানে।'

'তোমারও আছে, মেয়েদের ক্লাব খুব আধুনিক শুনেছি।'

রমলা বাড়ি এসে বল্লে, 'তালুকদারী জায়গা তোমার ভাল লাগবে না। চল কানপুর। নতুন সহর গড়ে উঠছে।'

*　　*　　*　　*

রমলা চাইলে ছোট লাইনে আসতে, কারণ দেখালে যে সে ইতিপূর্ব্বে ছোট গাড়িতে চড়েনি। খগেনবাবু কিন্তু বড় লাইন ও বড় গাড়ির পক্ষপাতী, কারণ, যদিও তাতে ভিড় বেশী, অতএব ষ্টেশনে ও গাড়িতে যাত্রীদের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্ভব, তবুও যেকালে স্মার্ত্ত পণ্ডিতের উৎপাত আজ লুপ্ত, দ্রুতগতিই সভ্যতার প্রতীক, সহজিয়ার মন্ত্র হল লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়, এবং যেকালে বড় গাড়ির বড় কামরায় মন সঙ্কুচিত হয় না, বিদেশ ভ্রমণের মোহ জাগে, তখন তাতে চড়তে আপত্তি থাকতেই পারে না,

বরঞ্চ উৎফুল্ল হওয়াই কর্ত্তব্য। রমলা এই যুক্তি মেনে নিলে, এবং পুরুষের গাড়িতেই উঠল।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়। হাতে সময় রয়েছে অনেক। ওয়েটিং রুমে মালপত্র রেখে খগেনবাবু খানকয়েক খবরের কাগজ কিনলেন। 'কাণপুরে ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা, মজুরদের অত্যধিক আব্দার···লক্ষ্ণৌএ দিন দুপুরে ডাকাতি···স্যাংঘাইএ গোলাবর্ষণ···মুসোলিনির বক্তৃতা···সুভাষ বসুর জ্বর···স্পেনে ১০৮টি গির্জ্জা ধ্বংস···চার বছরের মেয়ের অতীত জীবনের কাহিনী'···প্রকাণ্ড অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠা ভরা, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, ফেটে গিয়ে কানের পর্দ্দা ছিঁড়ে দেয়···ওয়াল্ট্ ডিজ্নের ছবির মতন অক্ষরগুলো নেচে বেড়ায়, তবে বর্ণহীন, শব্দহীন, তাদের না আছে তালমান, না আছে মানুষ-ঘেঁষা প্রতিকৃতি। কাগজের গায়ে গোবরের গোলা ছুঁড়েছে, সব কাঁচা, পাঁচ আঙ্গুলের দাগও ধরে নি। রমলা লেডীজ ম্যাগাজিনের ছবি দেখছিল। খগেনবাবু পাশে এসে চুপি চুপি বল্লেন, 'কিশোরীর নতুন জুতো ও ঘাঘরা চাই, নচেৎ ছোকরা প্রেমিক নাচতে ডাকবে না···মুখের ও গায়ের গন্ধে অমন সুন্দরীরও বিয়ে হল না, হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ, রমলা···সমুদ্রের ধারে পোষাক-প্রদর্শনী, চমৎকার দেখতে মেয়েগুলো, কিন্তু অমন বোকা হাসি কেন? অন্তঃসারশূন্য, তাই দেহের উগ্র বিজ্ঞপ্তি। দোষ দিচ্ছি না, চাই বৈ কি··· মনের ক্ষতিপূরণ আছে, তবে সেটা কি কেবল দেহেরই মারফৎ? অন্যায় নয় অবশ্য···কি বল?' সাড়ির আঁচল পিছনে টেনে রমলা ম্যাগাজিনটা ষ্টলে রেখে দিলে।

ষ্টেশনের বাহিরে একটাও টঙ্গা নেই, ট্যাক্সী নেই। একজন কুলী খবর দিলে যে টঙ্গা ও এক্কাওয়ালারা ধর্ম্মঘট করেছে, সর্দ্দার দিনে প্রত্যেকের কাছে আট আনা চেয়েছিল, কেউ রাজি হয় নি। পরে আয়-ব্যয়ের পার্থক্য রেখে টঙ্গা পিছু আট আনা ও এক্কা পিছু চার আনায় লোকটা রফা করতে যায়। দু-চারটে টঙ্গাওয়ালা রাজি ছিল, কিন্তু তারা ঠ্যাঙানি খেয়ে ধাতস্থ হয়েছে। এখনও মিটমাট হয় নি, এখনই সামনের বাগানে মিটিং হবে। ট্যাক্সী লক্ষ্ণৌএ অচল, কেবল ঘোড়দৌড়ের সময় ছাড়া, তখন দেশ বিদেশের বাবুরা এসে এক সপ্তাহের ফুরণ করে নেয়—আর রাজা বাবুদের বাড়ির গাড়ি আছে। কুলী

ফীটনে যাওয়া পছন্দ করলে না, বড় আস্তে যায়, কানপুরের ট্রেণ ছাড়বার আগে সহর দেখিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে না।

বাধ্য হয়ে খগেনবাবু ও রমলা ষ্টেশনের বাইরে এসে সামনের বাগানে বসলেন। মরশুমী ফুলের বাহার খুলেছে, লাল হলুদ গোলাপী 'ক্যানা,' সবুজ ঘাস, ফিরিঙ্গী ছেলে মেয়ের লাল মুখ, রঙীন জামা—যেন সেতারের জোড়ের আলাপ। আয়ার দল প্র্যাম ছেড়ে বয়ের দলের সঙ্গে গল্প করে। একটি ছোট মেয়ে সবুজ রেলিংএ ধাক্কা খেয়ে ঠোঁট কাটল। রমলা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিলে—রক্ত পড়ছে, রুমাল রক্তে লাল হল, আয়া ভয়ে চেঁচাতে লাগল, 'লুসি ভারি পাজি মেয়ে, হারামজাদী সাহেবের কাছে বকুনি খাওয়াবে রোজ, মেম-সাহেব জরিমানা করবে, চাবুক নিয়ে তেড়ে আসবে।' রমলা আয়াকে খুকীকে নিয়ে বাড়ি যেতে বল্লে, গিয়ে যেন আইডিন লাগান হয়, ভয় নেই, মেম সাহেব বকবে না, হেঁাচট খেয়ে সব ছেলে মেয়েরাই ঠোঁট কাটে। 'না, মেম সাহেব, আপনি জানেন না। এ মাসে আমার তিন টাকা কেটেছে, বেয়ারার দু টাকা, এক বোতলের দাম ফিরে এল সাহেবের। 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'…একটি যুবক পার্কে ঢুকল, সামনে চলে লাল ঝাণ্ডা, কাস্তে আর হাতুড়ি আঁকা, পিছনে আসে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক। 'ভাইয়োঁ',…যুবক বেঞ্চের ওপর উঠে হাঁকে, 'ভাইয়োঁ-বহিনোঁ।' রমলাকে খগেনবাবু প্ল্যাটফর্ম্মে অপেক্ষা করতে বল্লেন।

কি ভাষায় যুবক কথা কইছে বোঝা যায় না, পান্তির মাঠে, স্বদেশী বক্তৃতার বাঙলায় তার অনুবাদ হয় না। এককাট্টা, মজদুর, কিষাণ, ক্রান্তি, সাহুকারী রাজ, কথাগুলি স্পষ্ট, বুলেটের মতন গোটা-গোটা। কিন্তু চার পাশে ধোঁয়া, জনতার মুখে কালি ও তেলের দাগ, দেশী গাদা বন্দুক—তাই আওয়াজ নিশ্চয়ই জোর। মধ্যে একটি রাইফেল ঐ ছেলেটি, খদ্দর সাফ্, চোখ তীক্ষ্ণ, চুল ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামান, স্বর পরিচ্ছন্ন। ক্রমে ভিড় জমল। সেই হ্যারিসন রোডের ও গোলদীঘির লোক সমাগম, আর এই জনতা, একেবারেই অন্য রকমের, ভিন্ন জাতের, পৃথক ধাতুর। সেটার অস্তিত্ব দুপাশের চাপে নিয়ন্ত্রিত, এটার আকর্ষণ ভবিষ্যতের আহ্বান, সেটা নালার মধ্যে কাদার স্রোত, এটা ঘূর্ণিপাক, স্রোতের বুকে আবর্ত্ত। কোলকাতা সহরের এলোমেলো চৈতী

হাওয়া গলির মধ্যে ঢুকে জঞ্জাল জড় করে, আর পূর্ব্ববঙ্গের বুনো ঝড় নিজের বেগে, আপন খেয়ালে নৌকা ডোবায়, ঘরের চাল ওড়ায়, প্রতীক্ষারতা নতুন বৌএর চোখে ব্যাকুল দূরদৃষ্টি আনে। কাজ দুটি আলাদা। কোলকাতার ভিড়ের শক্তি নেই, আনুগত্যই তার ধর্ম্ম ; এই জনতার গতি আছে, অতএব শক্তি থাকতে বাধ্য। কিন্তু মতি? মন নেই তার মতি, মাথা নেই ত মাথাব্যথা!

কিন্তু ঠিক সেই জন্যই মতিভ্রম হবার শঙ্কা। এই লিভিয়াথান নির্ব্বিবাদে, সানন্দে আত্মসমর্পণ করবে মহাপুরুষের শ্রীচরণে, তেমনই আড়ষ্টভাবে যেমন নৃত্যশীলা কচিখুকীরা দুটো লম্বা হাত বাঁকাতে বাঁকাতে, 'পিয়'র পায়ে মাথা নোয়ায়; একত্রে রসজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির অপমান ক'রে। ইটালী, জার্ম্মানী, প্রায় সর্ব্বত্র এই ঘটেছে, এখানেও দেরী নেই। ভিড়কে জনতায়, সমাবেশকে সমবায়ে, ক্রাউড্কে ম্যাস্-এ পরিণত করবার জন্য যে পারিপার্শ্বিকের, যে গণচেতনার প্রয়োজন সে কোথায়? তবে ভিড়ের টান আছে বলতে হবে, যার জোরে পিল্‌পিল্ ক'রে হাজার লোক বাগানে জমায়েত হল। আয়া বয় পালিয়ে গেল। 'জওহরলালকি জয়!' মহাত্মা গান্ধীর নাম নেয় না কেন এরা? অল্পক্ষণেই নেতৃবৃন্দ এলেন। বেঞ্চের ওপর তাঁদের স্থান করে দেওয়া হল। সকলেরই বয়স কম, নিশ্চয়ই বহুবার জেলে গেছেন প্রত্যেকে, মুখে কিন্তু সংগ্রামের ক্ষত নেই, অহিংসার প্রলেপে দাগ উঠে গেছে। খগেন বাবু আরো কাছে এলেন, কৈ কারুর চোখ আত্মপ্রসন্নতায় স্তিমিত নয়ত! নিশ্চয়ই উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার নয়, যাঁরা বাঙলা দেশের মঞ্চ অধিকার করতেন, যাঁদের জন্য সভাস্থ ভদ্রলোক উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতেন, যাঁদের মুখ দিয়ে ইংরেজী বুলি অনর্গল নিঃসৃত হত, মধ্যে মধ্যে বার্ক, ব্রাইটের বুখ্‌নী, পাতলা ঢাকাইএর ওপর জরীর বুটির মতন। বোধ হয়, বৃত্তিটাই এঁদের দেশসেবা আর শ্রীঘরবাস। মুখে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে, চালাকীর নেই। একটু অন্য ধরণের বুদ্ধি, যেন একটু শান্ত, স্থির, ধীর রকমের। মনে হয় হিসেবী নয়, অথচ বে-পরওয়া চাউনিও নয়। চিন্তার ভারে কপালে দাগ পড়েনি, যুক্তিতে সবল নাও হতে পারেন, কিন্তু মনোভাবে গলদ নেই। একটা প্রাথমিক নীতিজ্ঞান তর্কবিচারের দায়িত্ব থেকে এঁদের নিষ্কৃতি দিয়েছে। মহাত্মাজীর কৃপা? তাই যদি হয়, তবে তাঁর নাম নেওয়াই উচিত। তাঁর কল্যাণে মধ্যবিত্ত-

সম্প্রদায়ের মানসিক পরিবর্ত্তন না লক্ষ্য করে যাবার উপায় নাই। কিন্তু তার বেশী আর কি ঘটল ?

ইতিপূর্ব্বে একজন দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ বেঞ্চের ওপর উঠে পড়েছেন। জনতা নীরব হল, পার্শ্ববর্ত্তী নেতারা মুখ তুলে চাইলে। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বক্তৃতা সুরু করলেন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন, এই সহরে তিনি একপ্রকার আগন্তুক, কিন্তু এলাহাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে কুলীদের, এবং সহরে এক্কাওয়ালাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ থেকে অনেক ন্যায্য দাবী আদায় করেছেন। যে-পন্থা সেখানে অবলম্বিত হয়, এখানেও তাই হোক—অর্থাৎ, টঙ্গা ও এক্কাওয়ালাদের মধ্যেকার বিরোধ ঘুচে যাক। এই-ভাবে ঐক্যসাধনের পর যে শক্তি তারা পাবে তাকে অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু সেটা পরের কথা, আগে টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে বিবাদ মেটান কর্ত্তব্য। তার উপায় হল এই: সর্দ্দাররা চেয়েছে আট আনা ওদের কাছে, আর চার আনা তোমাদের কাছে। তোমরা সকলে মিলে সর্দ্দারদের বল যে চার আনার বেশী এক পয়সা তারা পাবে না, পাবার অধিকার নেই, দেওয়া অসম্ভব, জবরদস্তী করলে সত্যাগ্রহ করব। আরেকজন বক্তা উঠে সত্যাগ্রহের মহিমা কীর্ত্তন করলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি পাশের একটি স্বেচ্ছাসেবকের হাত থেকে নিয়ে ত্রিবর্ণের জাতীয় পতাকা খুল্লেন। তাঁর মতেও চার আনার অধিক দেওয়া অন্যায়, এমনকি তাঁর ধারণা যে চার আনাটাই বেশী, তবে টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে রফা করতেই হবে, নচেৎ শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য। একজন লোক বেঞ্চের ওপর এসে বক্তার পাশে দাঁড়াল। মাথায় দোপাল্লি টুপি, গায়ে আদ্ধির জামা, তার ওপর ওয়েষ্টকোট, পায়ে নাগরা, কিন্তু সব ছেঁড়া, নোংরা, রঙ্গমঞ্চের মোসাহেবের পোষাকে যেমন আতিশয্যটা দারিদ্র্যকেই বাড়ায়, তেমনই। এই বোধ হয় লক্ষ্ণৌএর সেই বিখ্যাত এক্কাওয়ালা, যে ভোর বেলা থেকে মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত কেবলই ঠুংরী গায়, যার মেজাজ নবাবী, যার রক্ত খানদানী, যার রসিকতা অতুলনীয়, যার ভাষা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা,...এ কি সেই ? নিশ্চয়ই, ঐ যে বাবরী চুল, কানে আতর, মুখে জরদা, সমগ্র অবয়বে বিশেষত্ব, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কমনীয়তা, চাউনিতে লজ্জা। একপ্রকারের আভিজাত্য রয়েছে বটে, কিন্তু, কোথায় যেন

পচ ধরেছে সন্দেহ আসে, ধুঁকছে কেন যক্ষ্মারোগী পুতুল বৌএর মতন। সভার কাছে লোকটি পরিচিত হল এক্কাওয়ালার মুখপাত্র ব'লে। লোকটি চারধার ঘুরে সেলাম করলে, পতাকাবাহী পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার প্ররোচনায় নীচু গলায় খানিকটা কি বল্লে, তার মধ্যে ফারসী বুলিই বেশী, তাই বোঝা গেল না। তবে তার ভদ্রতায় মনে হল যে সে আপত্তি করতে ওঠেনি। তার বক্তব্য শেষ হবার পূর্ব্বেই লালপতাকাধারী যুবকটি বাধা দিলে। তার প্রতি ভঙ্গীতে ফুটে উঠল অসমর্থন। লাল ঝাণ্ডা খাড়া ক'রে সে উচ্চকণ্ঠে বল্লে, 'ইয়ে নেহি হো শক্তা। এক্কাওয়ালাদের কাজ নয় টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে রফা করা…চার আনা যদি তারা রোজ দিতে পারবে তবে আর ভাবনা ছিল কি। কেউ দেবে না এক পয়সা। ধর্ম্মঘট চালাতে হয় আমরা চালাব। ষ্টেশনের সব কুলীরা কাজ বন্ধ করবে। যে-সর্দ্দার এদের শোষে, সে-সর্দ্দার ওদেরও শোষে। আর সবার পিছনে কাঁরা আছেন জানতে বাকি নেই।' বেঞ্চ থেকে একজন মুরুব্বী গোছের ভদ্রলোক বল্লেন, 'এই ধরণের দায়িত্বহীনতা অসহ্য। অহিংসানীতি মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না।' যুবক উত্তর দিলে, 'রফা আর রফা, কতদিন চলবে এই চালে। অন্ধ যারা তারা কেন আসে নেতৃত্ব করতে।' তর্ক বাধল, দুটো ঝাণ্ডা পাশাপাশি উড়ছে, অন্য একজন যুবক বেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠে হাঁকলে, 'লাল ঝাণ্ডা জিন্দা রহে।' রব উঠল, 'লাল ঝাণ্ডা, লাল ঝাণ্ডা…'

কখন ও কি ভাবে তিনি অতটা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছেন খগেন বাবু বুঝতে পারেন নি। এক ঝলক দুর্গন্ধ নাকে আসতে ফিরে দেখেন চারপাশে কাতারে কাতারে লোক, এক্কাওয়ালা, রেলের কুলী। সামনে ফিরে দেখলেন লাল ঝাণ্ডা পড়ে গেছে, একজন কুলী ছুটে এসে সেটা তুলে নিয়ে বেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠল। জাতীয় পতাকাধারী লোকটি খগেন বাবুর ওপর পড়ে গেলেন। চারপাশের লোক তখন উত্তেজিত হয়েছে। শোনা গেল পুলিশ আসছে। ভিড় পাতলা হতে সুরু হল, কিন্তু লোকেরা ছুটে পালাল না। শীতের নারকেল তেল রোদ্দুরের ঝাঁজে খানিকটা গলেছে, খানিকটা থোলো থোলো রয়ে গেল, জমাট ভাব রইল কেবল বেঞ্চের চার পাশে। তিন জন কনষ্টেবল ও একজন দারোগা সামনে এল। দারোগা ভদ্রভাবে অনুরোধ জানালে হল্লা যেন না হয়। লাল পতাকাধারী যুবক উত্তর দিলে, 'হল্লা নয়, মিটিং, যা করবার

অধিকার আছে, পার্ক সাধারণের জন্য, উয়ো জমানা চলে গেছে। হল্লা হবে না।. আপনারা আসুনগে।' জাতীয় পতাকাধারী ভদ্রলোকটিও সায় দিলেন। দারোগা আরো নরম সুরে বল্লে, 'মিটিং করুন আপনারা, কিন্তু হল্লা থেকেই হাম্‌লা হয়। আপনারা আইন না মানলে সরকারের মান থাকবে না, এরাও হাতের বাইরে যাবে যে!' একজন কনষ্টেবল্ সামনে এগিয়ে আসতে যুবক ধমকে উঠল, 'যাও, বাহার যাও, নিক্‌লো হিঁয়াসে।' পুলিশের দল পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, দারোগার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

খগেন বাবু প্লাটফর্ম্মে ফিরে এলেন। দূরের এক বেঞ্চে রমলা বসে আছে, গালে হাত, পায়ের ওপর পা। ফিতে বাঁধা কালো জুতোয় সরু লাল পাড়, পায়ের গাঁঠ চোখে পড়ে, একটা নীল শিরা ওপরে উঠেছে। না, না, দাঁড়কাকের পা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলেতী বারণের অর্থ ছিল। কবি বলেন, মেয়েদের অন্তরের সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হয় অঙ্গ ব'য়ে, আঙ্গুল দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে। আবার বৈজ্ঞানিকের মতে বাইরের সৌন্দর্য্য অন্তরকে আক্রমণ করে, কারণ, ভঙ্গীই ভাবের জন্মদাতা। এই ঠিক। অন্তরের আবার সৌন্দর্য্য কি? বসবার, দাঁড়াবার, নড়বার-চড়বার, সাজসজ্জার ঢঙেই মন মাতায়। ফটোগ্রাফারও তাই বলবে। সিনেমার খেঁদী পেঁচীরা অপরূপ হয়ে ওঠে এরই জন্য। সব সময় কি সত্য? কে জানে! সুজন নিশ্চই বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাত। চিরকাল সে ভেসে বেড়াল—ডাঙ্গা পেল না। মঙ্গলে বিশ্বাসীদের দশাই তাই। তারা মঙ্গল ও সুন্দরকে যুগ্মপ্রত্যয় ভাবে, তাই পড়ে বিপদে। ফলে সত্য হয় যা অ-মঙ্গল ও অ-সুন্দর নয়। অথচ সমগ্র বিশ্বে অ-মঙ্গল ও অ-সুন্দর পরিব্যাপ্ত। তাকে বাদ দিলে ফাটা বেলুনের মতন জীবনটা কুঁচকে যায়। তারপর, যত ফুঁ দেওয়া যাক না কেন বেলুন আর ফোলে না। প্রেম, আত্মিক সাধনা, সাহিত্য, এ-সবে তার পেট ভরে না। সুজন ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চর্চ্চায় নিজের পরিণতি কামনা করেছে, সুন্দরের আকর্ষণে নয়, তাই সে দুঃখী।

খগেন বাবু রমলার কাছে আসতে তার গালের হাড় চোখে পড়ল। হাত এত নরম, তুলতুলে, মুখ এত কঠিন কেন? এই ত' সেদিন পর্য্যন্ত কচি তালশাঁসের মতন ছিল। আঙ্গুলের মাথা চ্যাপ্টা, কলাপ্রিয় নয়। গলার

কণ্ঠা দেখা যায়, উঁচু হাড়ের মধ্যে গর্ত্ত,- আধ পেয়ালা জল ধরে। চমকে খগেনবাবু মুখ ফেরালেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং স্বপ্ন—এই দুয়ের অতীতে যার সন্ধান মেলে তার রূপ 'সর্-রিয়ালিষ্ট' ছবির মত অবাস্তব ও বীভৎস। কিন্তু হয়ত অতিক্রম করবার দরকার নেই। অদ্বৈতবাদের ঝোঁক কাটান শক্ত। তার চেয়ে—তোমার আমার মধ্যস্থিত বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুতকণার সৃষ্টি হল, তার ফুল্‌কি তোমার-আমার আঙুলে ধরল, জ্বলতে জ্বলতে ওপরে উঠল, শুখনো সল্‌তে হলে ছাই এক মুহূর্ত্তে; নচেৎ ধিকি ধিকি, জ্বালা থামাবার জন্য কবিতার মলম ক্ষণে ক্ষণে। চোখের জল ঢাললে জ্বালা কমে না, বাড়ে কেবল, ফোস্‌কা আর ঘা হয়। সেই ক্ষতের স্মৃতি অসহ্য, যেন ঘা দেখিয়ে ভিক্ষে চাওয়া। ভগবান রক্ষা করুন এই অভিমানের বিলাস থেকে সমগ্র স্ত্রী-জাতিকে।

রমলা এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে খগেন বাবু বল্লেন, 'ট্রেণ ছাড়বার দেরী নেই, চল গাড়ীতেই বসিগে।' রমলা উঠল।

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'কি ?'

'এ যেন সরাইখানা। এত বড় ষ্টেশন ভাল লাগে না। ছোট আশ্রমই ভাল। যত বড় জায়গা তত প্রকট হবে বিরোধটা। কৈ হোক দেখি ধর্ম্মঘট পাড়াগাঁয়ে, পুঁইমাচার তলায় ?'

'কেন, ষ্টেশনটা চমৎকার নয় ?'

"ষ্টেশন হবে পাথরের, তাকে জড়াবে আইভি, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে থামবে এঞ্জিন ও ট্রেণ, আধখানা চাঁদের মতন, তোমার পুরু গাল যেমন ছিল তার মতন, দূরে দেখা যাবে লোহার কাঠামোর ওপর ঝোলা সিগ্‌ন্যাল, প্লাটফর্ম্মে থাকবে ক্যানার ঝোপ, বাইরের প্রাঙ্গণে থাকবে টু-সীটার, ট্র্যাপ্। ভারতীয় দৃশ্য নয়, কিন্তু এ-পোড়া দেশে কোনটাই বা স্বদেশী! বিদেশী, তাও নয়। আদর্শ জীবন মানেই হল কল্পিত বিদেশী পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা। সত্য-কারের দৃশ্য নয়। পার্কে গোলমাল বাধল এইমাত্র,—সেটা স্বদেশী ? বিদেশী ? জগাখিচুড়ি। স্বদেশী ধারায় পঞ্চায়েৎ মিটিয়ে দিত, বিদেশী ঢঙে প্রস্তাব স্থাপন, গ্রহণ, অনুমোদন সব কিছুই হত। এটা অনুকরণ, খাঁটি মাত্র ঐ দোপাল্লিধারী

এক্কাওয়ালাটা, কোন্ নবাবের বংশধর, এখনও বোধহয় পেন্‌শন পায়। তা হোক্, তবু সে সত্যিকার মানুষ, জরাগ্রস্ত, মুমূর্ষু, তবু মানুষ। দেখছ না চারধারে, রেলকোম্পানীর চাহিদা পূরণ করতে কাশী, জগন্নাথক্ষেত্র, হরিদ্বার, ম্যয় কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্য্যন্ত প্রাণপণে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের নিসর্গপটও ইংরেজের খয়েরখাঁ। অথচ মনে আছে কাশীর গঙ্গায় মড়াভাসা, হাঁড়ি আর খড়ের জঞ্জাল, পুরীর মন্দির দ্বারে কুষ্ঠরোগী, আর হরিদ্বারে ভণ্ড সন্ন্যাসীর ভিড়। সে-সব কোথায় এই ছবিগুলোতে? দৃশ্য নেই এদেশে, নবদম্পতির ফোটো দেখলে অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসে। শুভক্ষণ, না অশুভক্ষণের যাত্রারম্ভ? স্বাভাবিকতা অসম্ভব এদেশে। সত্যাগ্রহ স্বদেশী, ধর্ম্মঘট স্বদেশী, কংগ্রেস-রাজত্ব স্বদেশী? মহাত্মাজীর আবিষ্কার বলেই কি ভারতীয়?'

রমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'মিটিং ক'রে কি চায়?'

'ওরা দস্তুরী দেবে না সর্দ্দারকে।'

'তুমি কি বল যে ওরা বিনা ওজরে দিক?'

'মোটেই না। কিন্তু না দেওয়ার ভঙ্গীটা নিজস্ব নয়।'

'দোষ কি তাতে?'

'না বেশী দোষ নয়, ময়ূরের পোষাক পরা দাঁড়কাকের চেয়ে। এও এক রকমের জবরদস্তী, স্বভাবের ওপর। অত্যাচারের বিপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হবার দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ে, কোন্ পৃষ্ঠায়, কোন্ পংক্তিতে? থাকে যদি সে পাদটীকায়, তাও আবার দেশপ্রেমিক ভাষ্যকারের কৃপায়। সহনশীলতাই এ দেশের ধর্ম্ম, রয়েছে আমাদের অস্থি মজ্জায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এদেশের মেয়েরা স্বপ্ন দেখে যে স্বামী ঠ্যাঙাচ্ছে, আর তারা মুখ বুজে সহ্য করছে, আর তারপর স্বামীর সোহাগ খাচ্ছে। লজ্জা নেই, তেজ নেই, তাই হল সতীত্ব। একটা কবিতা আছে যেখানে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি বলছেন যে শূদ্র শূদ্র হয়েই ধন্য, কারণ ব্রাহ্মণের সেবা করতে পারবে চিরটা কাল।'

'অনুকরণ করবে না বলেই কি সকলে আধ হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকবে। ষ্ট্রাইক না হয় বিদেশী, কিন্তু স্বদেশী থেকেই ত' পরাধীন? সকলের জীবনেই একটা না একটা পরিবর্ত্তন আসে, তুমি বদলাও নি?'

'নিশ্চয় বদলেছি। সেটা নীতির ক্ষেত্রে, একটি মানুষের ক্ষেত্রে, কিন্তু সমগ্র জাতের যে পরিবর্ত্তন আসবে তার উৎস হবে ইতিহাসের স্রোত।'

'সেটা বুঝি অন্তঃশীল? যদি পরিত্যাগের সাহস আমাদের সংস্কারে না থাকে, তবে তোমার মতে যারা শুষছে তারা ঠিকই করছে? আমি অবশ্য কিছু বুঝি না, তাই বোকার মতন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যাই বল না কেন, শোষণটাও খাঁটি দেশী। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতরাও, যারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার গুণ সর্ব্বক্ষণ গায় তারাও এই হিসাবে খাঁটি স্বদেশী।

'নিশ্চয়ই। যে-জাত স্বদেশী শোষণ প্রক্রিয়াকে প্রেম ভক্তি করুণা প্রভৃতি নাম দিয়ে নিজেকে চোখ ঠেরেছে, যার সমাজধর্ম্মের মূলকথা দায়িত্বজ্ঞান, যার দাসত্বে শিক্ষানবীশি হাজার বছরের ওপর, তার অধিকার-সচেতনতা নিতান্ত কৃত্রিম, তার আপত্তিটা উত্তেজনা মাত্র। তাকে আজ স্বভাব পরিত্যাগ করতে বল্লে সে চেঁচাবে, কেলেঙ্কারী বাধাবে, জয় রবে গগন ফাটাবে, তার পর, সেই ঘরে ঢুকে বিছানা নেবে, তামাক আর আফিম খাবে, কলেজে কাউনসিলে কারখানায় সুড় সুড় করে ঢুকে পুনর্মূষিক হবে। এর বেশী জোরাল প্রতিবাদ আমাদের কর্ম্মে ফুটে ওঠা শক্ত। কচি খোকার ককানি, স্নেহময়ী মাতা স্তন্য দান করিতে থাকুন, খোকার পেটে বিগৎখানেক পিলে গজাক....বালসুলভ চপলতা, খানিকপরে ঘুমে নেতিয়ে পড়বে অকাতরে, শুভ অবসরে স্ত্রী যাবেন স্বামীর অঙ্গে, মাষ্টার হবে রায় বাহাদুর, জেল ফেরৎ নেতা হবে গবর্ণমেণ্টের খেতাবধারী চর, আর ধর্ম্মঘটের পাণ্ডা হবে মিলের জমাদার। রমলা, রমলা, এ চলবে না।'

রমলা হোঁচট খেল, সাড়ির পাড় গেল ছিঁড়ে। 'ঘোড় তোলা জুতো পোরো না, স্যাণ্ডাল পোরো।'

"আমি খালি পায়ে হাঁটতে পারব না বলে দিলুম।"

লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর যেতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগে। ইণ্টার-ক্লাসের তক্তার ওপর নোঙরা গদি, গা ঘিন্ ঘিন্ করে, তাই সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়াই ঠিক হল। ঐ প্রকার সরল জীবন যাপনে বিশ্বাস আসে না, চিন্তা কলুষিত হয়। কেন হবে না সে অবস্থা যেখানে তৃতীয় শ্রেণীও পরিচ্ছন্ন হবে? কিন্তু ততদিন নোঙরামি ধাতে বসবে না। সেকেণ্ড ক্লাস খালি। খগেনবাবু গদি ঝেড়ে দিলেন, রমলা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

'কি ভাবছ ?'

'এমনই, দেখছি।'

'আজ রাত্রে কোথায় মাথা গুঁজব জানি না।'

'ওয়েটিং রুমে থাকতে দেয় টাইম-টেবিলে লেখা আছে।'

'সেই ভাল, তুমি ঘুমিও, আমি প্ল্যাটফর্ম্মে টহল দেব। রুমালটা ফেলে দাও—ওটা লাল, এইটে নাও।' দেবার সময় খগেনবাবু জোরে আঙ্গুলগুলো টিপে দিলেন। 'কৈ হাত সরালে না ?' হাত এলিয়ে পড়ল।

উনাও ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে। খগেন বাবু একজন খদ্দরধারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা কি। উত্তরে শুনলেন যে 'কিষাণ লোক' এক তালুকদারের বাড়ি 'ধাওয়া' করবে, পাছে গোলমাল বাধে তাই এই বন্দোবস্ত। 'ধাওয়া' মানে 'চড়াও', যাত্রা, শোভাযাত্রা নয়, প্রতিবাদ জানাবার জন্য সরব যাত্রা। মহাশয় ব্যক্তি 'আবোয়াব' সংগ্রহ করেছেন তিন হাজারের কাছাকাছি, সেটা জমা না দিয়ে করেছেন বাজেয়াপ্ত। আপত্তি জানাতে বলেছেন যে সেটা বাকী খাজনা। প্রজারা উত্তর দেয় যে খাজনা তারা নিয়মিত দিয়ে এসেছে তহবিলে। তালুকদার রসিদের প্রমাণ চান, প্রজারা রসিদ দেখাতে পারেনি, কারণ রসিদের প্রথা সে তালুকদারীতে নেই। উলটে ম্যানেজার বাবু খাতা দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে খাজনা নেওয়াই হয় নি, কারণ অজন্মা হয়েছিল, এবং রাজা সাহেব দয়া করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্য উশুল করেননি। কিষাণরা প্রথমটা অত বড় মিথ্যায় হতবুদ্ধি হয়ে যায়, কংগ্রেস অফিসে খবর দেয়, ফলে কংগ্রেস কর্ম্মীর নেতৃত্বে হাজার পাঁচেক কিষাণ ছুটছে ধন্না দিতে কাছারী বাড়িতে, পরে হেঁটে যাবে লক্ষ্ণৌয়ে, কাউনসিল হাউসের সামনে কিষাণদের গ্র্যাণ্ড র্যালি হবে, ভিন্ন জেলার লোকজনও আসবে। তারা চায় প্রতিকার।

'মারপিটের সম্ভাবনা আছে ?'

'তিলমাত্র নেই, তবে যদি ওপক্ষ না বাধায়।'

'আপনারা অহিংসপন্থী, কিন্তু একি আগুন নিয়ে খেলা নয় ?'

'মহাত্মাজীর নামেই জল। তিনি জ্বালাতেও জানেন, নেবাতেও জানেন।'

ট্রেণ ছাড়ল উনাও থেকে।

'স্বাখ, রমলা, পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হয়।'

'কাকে ?'

'এই নামের শক্তিকে।'

'তবু ভাল! কেন, কীর্ত্তন শোন নি ?' খগেন বাবু হেসে ফেল্লেন।

এই প্রদেশে একটা ওলটপালট চলেছে। যত বাধাই থাক দেশের লোক রাজত্ব হাতে নিলে স্বাধীন প্রয়াসের সুযোগ ঘটেই। তার ওপর যদি সেই সব লোক সর্ব্বত্যাগী হয় তখন তাদের আশ্রয়ে সুপ্তশক্তি জাগ্রত হবার সম্ভাবনা বেশী হবেই। বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেস গুরুভার গ্রহণ করল না, তাই বাঙ্গালী স্বাধীনতার আস্বাদ পায় নি, ফলে নীচ দলাদলি, গালিগালাজ, হিন্দু মুসলমানের অসম্ভব অসদ্ভাব। গোদের ওপর আবার বিষফোড়া! বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানের অহঙ্কারই বাঙ্গলার কাল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তার অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল, শিক্ষার মোহ আর ভদ্রোজনোচিত বৃত্তি তার অভিশাপ। বাঙ্গালী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে ফ্যাশিজমের বীজ রয়েছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ আজ প্রগতিশীল। লক্ষ্ণৌ, কানপুরের ধর্ম্মঘট, উনাওয়ের ধাওয়া, মীরাটের মেথর সমস্যা, গোরখপুর জেলার মহারাজগঞ্জের কৃষক আন্দোলন, যার তুলনা ফ্রান্সের ১৭৮৯ সালের কিছু পূর্ব্বের প্রাদেশিক আন্দোলনে পাওয়া যায়। এদেশ জাগছে, সত্যি জাগছে ; বাঙ্গলা সেই কবে একবার দাঁড়িয়ে উঠে পাশ মুড়েছিল, আবার ঘুমুচ্ছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, চেঁচাচ্ছে, জোর স্বপ্নাবিষ্টের মতন চোখ বুজে বেড়াচ্ছে শ্রেণীস্বার্থ-টি বেশ বজায় রেখে। বাঙ্গলা দেশে বাস দুঃসহ। যে-দেশে কেউ কখনও চোখ খুলে সত্যের দিকে তাকায় না, সেখানকার পরিশীলনের প্রত্যেক অঙ্গটি সামাজিক সত্য থেকে পালাবার জন্য সাধা। সাহিত্যিক, কলাবিদ, নেতা, সকলে পালাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। গুণ্ডার ভয়ে যারা দেশত্যাগী হয় তারাই একমাত্র কাপুরুষ নয়, কাজটা তাদের মাত্র স্থূল, ব্যস, এইটুকু। নিজেকে খগেন বাবুর নিতান্ত বাঙালী বলে মনে হয়।

আদৎ কথা, যেখানে হোক জীবনের পরশ লাগলেই হল। প্রাদেশিকতা তাদের, যাদের ঘর বাড়ি আছে, ছেলের চাকরী না হলে যাদের চলে না। সাবিত্রী যখন ছিল তখন বাঙালী, এখন বন্ধনহীন, মাসীমাও নেই যে পিছন

টান থাকবে, রমলা যেভাবে থাকে সেটা ভারতে সর্ব্বত্র চলে। বাস্তবিকই ত, বাঙলা দেশ জন্মস্থান বলেই কি ভারতীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে! বড়র জন্য ছোটকে ত্যাগ করা ন্যায়সঙ্গত। ঢেউগুলো আরো ছড়িয়ে যাক, ভারতের বাইরে, চীন পারস্যে, এশিয়া আফ্রিকায়, যেখানে স্ত্রী পুরুষ প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাঁচতে, আরো ভালভাবে বাঁচতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে, বাধাহীন, সংশয়হীন আত্মপ্রত্যয়ে।

একটু কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। একলা কি দোকলার কর্ম্ম নয় সন্দেহ হয়। নিজের মূলধন কতটাই বা। পায়ের তলার অনড় মাটি, দুপাশের চেনা গাছ পালা, ওপরে পুরানো আকাশ, কাছে, খুব কাছে না হলেও, কাছে পরিচিত মুখ—এ-সব চাই; নচেৎ, সাইবিরিয়া থেকে উড়ে এসে দুদিনের জন্য ঝিলে বসা, আবার ওড়া হাজার হাজার মাইল ধরে—এ-কেবল পাখার পরিশ্রম। পাখীদেরও ভূম্যধিকার জ্ঞান টনটনে, বাঁচবার তাগিদে। কিন্তু যাদের সে তাড়না নেই, যারা স্বার্থজ্ঞান চৈতন্যের দ্বারা অতিক্রম করতে সক্ষম তাদের পক্ষে প্রাদেশিকতা কূপমণ্ডূকতার অন্য রূপ। 'রমলা, আমরা এখানেই থাকব, কানপুরে। কাশীর পালা সাঙ্গ। এখানে জীবনের নতুন বীজ পড়েছে, তোমার-আমার এই হল প্রকৃত প্রতিবেশ।'

'আগে দ্যাখ, পছন্দ হয় কিনা তারপর যা হয় ঠিক করা যাবে। আমি ভেবেছিলাম, আর বাসা বেঁধে ফল নেই তোমার ধারণা।'

'ভুল বুঝেছিলে বলব না। এখন আমিই অন্য রকম হয়েছি।'

'তা একটু বদলেছ', বলে রমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কানপুরে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা। প্লাটফর্ম্মের আলো জ্বলল। ওপরকার পুল পার হয়ে পয়লা নম্বরের প্লাটফর্ম্মে আসতে হয়, সেটা জমজম করছে, নিশ্চয়ই ট্রেণটা হাওড়া এক্স্প্রেস। একটা বেঞ্চের পাশে মালপত্র রেখে খগেন বাবু ও রমলা হিন্দু রেস্তরাঁয় গেলেন। ঘর পরিষ্কার, টেবিল, পিরিচ-পেয়ালার ওপর স্বত্বাধিকারীর নামের আদ্যাক্ষর লেখা, কাঠের ছোট ছোট কুটরী পর্দ্দাঘেরা, দেয়ালে তাজমহল, কাশীর ঘাট, কুতবমিনারের তৈলচিত্র ঝোলান। খগেন বাবু 'দেশী' খানার অর্ডার দিয়ে একটি ছোট কুটরীতে বসলেন। 'বয়' খাবার আনল। রমলার মাথা ধরেছে তাই খেতে

পারলে না। আটার রুটিতে গন্ধ, ডালে পেঁয়াজ, চাটনী দিয়ে এক গ্রাস ভাত পেটে গেল। খগেন বাবু বল্লেন, 'বোকামী হয়েছে। তুমি বস, আমি আসছি।' বাইরে এসে ম্যানেজারের কাছে খবর পেলেন যে দেশী হোটেল যা আছে তাতে সুবিধা হবে না, 'রিস্তাদার' যখন সহরে কেউ নেই তখন রাতের জন্য ওয়েটিং রুমেই থাকা ভাল। ম্যানেজার নিজে খগেন বাবুকে ষ্টেশন-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে নিয়ে গেলেন। নাম লিখতে হল মিষ্টার ও মিসেস। রেস্তরাঁর 'বয়' বিছানাপত্র খুলে দিলে। 'আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার, দু-বোতল সোডা ও দুটো গ্লাস এখনই পাঠিয়ে দাও, সকালে দুটো ছোট হাজারি এন সাতটায়, দুধ যেন তাজা হয়, না পাও কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্‌কের টিন্‌ এনে এখানে খুলো।'

'রাত বেশী হয়নি, অবশ্য, তবু তুমি শুয়ে পড়, সারাদিন গাড়িতে এসে ক্লান্ত হয়েছ। আমি একটু প্লাটফর্ম্মে ঘুরে আসি, কোনো বই আনব?'

'না।' রমলা জুতো খুল্লে। খগেন বাবু পায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ছোট্ট পায়ের হাঁপ লাগে না? মাসীমা ছেলেবেলা গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে বলতেন —ওম্‌ করে শো। মুড়ি দিতাম, পরে হাঁপ লাগত, নাক বার করতুম, কান, গলা, হাত, বুক...”

“ওগো তোমার পায়ে পড়ছি মাসীমার কথা থামাও। তাঁর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়। সাবিত্রী...'

'তার নামটাও না হয় নাই তুললে।'

'বেশ বলব না, ক্ষমা কর, কিন্তু...'

'আচ্ছা তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি একটু আসছি।'

ষ্টেশনের ষ্টলে বই সাজান। বেশীর ভাগ কলোনিয়াল সংস্করণের, ভারতীয় মস্তিষ্কের উপযোগী খাদ্য। ট্রেণেই যা কিছু সময় মেলে গোলামী থেকে, তাই মূর্খরাও শিক্ষিত হতে চায়। অবচেতনার নিম্নতম স্তরে যেসব গুপ্ত ইচ্ছা লুকানো থাকে তাদের প্রশ্রয় দিতে পারলেই ব্যবসার মস্ত সুবিধা। প্রকাশকবৃন্দ মনের এই গূঢ়তত্ত্বটি ধরেছে, তাই তাদের তহবিল ভর্ত্তি। যত বাধা তত গুপ্তি, যত সভ্যতা তত বাধা। এমন সমাজ কল্পনার অতিরিক্ত নয় যেখানে বিবেকের সূক্ষ্ম অথচ নির্ম্মম অত্যাচারে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আত্ম-

গোপনে তৎপর হবে না, ফলে প্রকাশের তাগিদ কমবে, আশা-পূরণের সাহিত্যের চাহিদা দুর্ব্বল হবে। সেখানেই আসবে সৎসাহিত্যের সুযোগ। জুজুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত চিরকাল···ছেলে বয়সে পিতৃ পিতামহ, যুবা বয়সে পরীক্ষক, পরে কারখানার মালিক যার এক কলমের খোঁচায় চাকরী যায়, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নিশ্চিত কাঠামো ভূলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু পুরুষেরাই কি একলা ভয় দেখায়? রমার মতে মাসীমার দলও নির্দ্দোষ নন। যাকে 'মাদার ফিক্‌শেসন্' বলে তার মূলেও কি ঐ একই ভয় রয়েছে। শ্বাশুড়ি-বৌএর কলহের প্রাথমিক কারণ ঐ; বৌ চায় ছেলের ঘাড়ের ভূত ছাড়াতে, দোষের মধ্যে সে আরেকটু চায়, নিজে পেত্নী হয়ে বসতে। স্বাধীন করাটা যদি স্ত্রীর উদ্দেশ্য হত, তবে স্ত্রৈণ হওয়ার মতন সুকর্ম্ম আর থাকত না। কিন্তু সম্পত্তিবোধ দুর্নিবার। সাবিত্রীর নাম নিতে রমলার ওপর রাগ এল।

গোল্যাংক্‌সের বই রয়েছে বিস্তর। বামমার্গী সাহিত্যে ছেয়ে গেল দেশ। বাঙালী মেয়েদের দ্বিতীয় ভাগের পরই যেমন রবীন্দ্রনাথ, পুরুষদের তেমনই বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকের 'নোট'-এর পরই কোনো সাহেবের মার্ক্স ব্যাখ্যা। মার্ক্‌স্ নয়, মার্কস-ব্যাখ্যা, তাও পচা, সস্তা, ভুল, এক পেশে। হেগেল, আডাম স্মিথ না পড়ে 'ক্যাপিট্যাল' কপ্‌চান, মার্ক্স না ছুঁয়ে লেনিন, লেনিন না দেখে ষ্ট্যালিন, তাও না, দু আনার ঋজুপাঠ। কাঁচাপাকার অদ্ভুত সমাবেশ, বাঙালী মেয়েদের মতন, এধারে স্বার্থপরতায় ঝানু, ওধারে ভেদ্দাদের চেয়েও মস্তিষ্ক অপরিণত, কচি থেকেই পচা, ভাই ভিজে, শ্যাওলা ধরা, উর্ব্বর. স্বল্পজীবী; পানাপুকুরের মশকী কামড়েছে পায়ে, গা শির্ শির্ করে, এখনই কম্বল আর কুইনীন চাই। বই না কিনে খগেনবাবু ওপরে এলেন।

রমলা চেয়ারে বসে ছিল। 'শোওনি? মাথা ছেড়েছে?' রমা ঘাড় নাড়ল। 'বিছানা আমি পাতছি।' রমলার দৃষ্টিতে প্রতীক্ষার ব্যগ্রতা নেই, জীবনের চিহ্ন নেই। উঠে সে সাহায্য পর্য্যন্ত করলে না। খগেনবাবু পাশ ফিরে শুয়ে বল্লেন, 'যখন ইচ্ছে হবে আলো নিভিয়ে দিও।' ষ্টেশনের কোলাহল থামল। ভোর বেলাতেই রমলা স্নান সেরে চেয়ারে বসে আছে জানলার ধারে।

ক্রমশঃ

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার যুগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১০)

মৌর্য্যযুগের পর ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ভ হয়। এই সময় সুঙ্গ, কন্ব বংশ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করে; পরে দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র-সতবাহন বংশ প্রভুত্ব করে।

এই সময়ের অর্থনীতিক অবস্থা পূর্ব্বের অভিব্যক্তির পথেই চলিতেছিল। এইযুগে শিল্প (Arts) ও শ্রমশিল্প (crafts) ব্যবসায় প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায়ী সংঘে (Trade Guild) সংঘবদ্ধ হইতেছিল (১)। এই গিল্ডগুলিই রাজশক্তির প্রধান সহায়রূপে ছিল। রাজকীয় শাসন (Administration) বিভাগ পূর্ব্ব-প্রথার অনুবর্ত্তী ছিল বলিয়াই মনে হয়; রাজবংশের পরিবর্ত্তন হইলেও শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইত না। ইহাই ভারতের ইতিহাসে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। এইজন্য মনূক্ত আইন সমূহ এইযুগের বিধিব্যবস্থাকে প্রতিবিম্বিত করে বলিয়া মনে হয়। মনু বলিতেছেন, "পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী এবং যাহারা স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ, সৎকুলোদ্ভব এবং পরীক্ষিত —এরূপ সাত আটটি মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক (৭, ৫৪)। এতদ্বারা আমরা এই বুঝি যে, বৈদিক মতাবলম্বী (এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মত পোষণ করিত এবং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারণ করিত বলিয়া বৈদিক মতাবলম্বী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধযুগের সময় হইতে একদল বলিতে হইবে) উচ্চকুলের পুরুষানুক্রমিক রাজকর্ম্মচারীশ্রেণী উদ্ভব করিবার চেষ্টা হইতেছিল; ইহার অর্থ দ্বিজবংশীয় আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করিয়া একটা

১। S. K, Das—P. 173.

ব্রাহ্মণ্যবাদীয় অভিজাতদল গঠন করিবার চেষ্টা এই ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগে চলিতেছিল। ইহারা ব্রাহ্মণ্যবাদী বনিয়াদিস্বার্থের দল বলিয়া শূদ্র ও বৌদ্ধদের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে না—ইহাই গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এইসঙ্গে মনু ব্রাহ্মণমন্ত্রীর প্রাধান্য দিতেছেন (৭, ৫৮-৫৯)। মৌর্য্যযুগের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী নগদ মাহিয়ানা না পাইয়া জমি ও অন্যান্য প্রকারে তাহা গ্রহণ করিত ঃ—যথা, গ্রাম্যলোকেরা অন্ন পানীয় এবং ইন্ধনাদি যে-কোন বস্তু প্রতিদিন রাজাকে দান করিবে তৎসমুদয় গ্রামাধিপতির প্রাপ্য। কুল অর্থাৎ ষড়গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমি দশ গ্রামাধিপের বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্য, বিংশতি গ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ ভূমি, শতাধিপের একখানি গ্রাম এবং সহস্রাধিপের একটি নগর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (৭, ১১৮—১১৯)। পূর্ব্বে যেমন বেতনের পরিবর্ত্তে গ্রাম প্রদান (মুসলমানযুগের 'জায়গীর') করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এইযুগেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। বোধ হয় বেতনের পরিবর্ত্তে গ্রাম ও নগরাদি পাওয়ার পদ্ধতি হইতে ক্রমশঃ এ কটা ভূম্যাধিকারী শ্রেণী গড়িয়া ওঠে। আমরা যে-যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি সেই যুগ হইতেই ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্র সংগঠিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এইস্থলে একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন উঠে যে, জমির মালিকানা সম্বন্ধে কিরূপ আইন বিবর্ত্তিত হইয়াছিল? আমরা বৈদিকযুগের অর্থনীতিক অবস্থার অনুসন্ধান কালে দেখিয়াছি যে সেই সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। বেদে জনসমূহের মধ্যে কৌম প্রথা (tribal system) ছিল ; কিন্তু জমি কৌমগত না হইয়া ব্যক্তিগত ছিল—ইহাই আমরা বেদে পাই। বেদে জমি সম্বন্ধে tribal communism-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (২)। বেদে সম্পত্তি

২। লোকে এতদিন Morgan-এর মত, যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ব্বরযুগে tribal communism অবস্থার মধ্য দিয়া একটা জাতিকে বিবর্ত্তিত হইতে হইয়াছে—একথা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। Sir Henry Maine 'Ancient Law' নামক পুস্তকে Morgan-এর মত অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে বৈদিকভারতেও জমিতে tribal communism প্রথা ছিল। কিন্তু Baden Powell, 'Indian Village Community' নামক পুস্তকে মেইনের মতের ভুল প্রদর্শন করিয়াছেন। উপস্থিত সময়ে মর্গানের মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

বংশগত না হইয়া বংশের কর্ত্তার ছিল বলিয়াই অনুমিত হয় ; এইসঙ্গে জমি কৌমগত বা বংশগত হইবার কোন নিদর্শন বেদে নাই (৩)। এক্ষণে বেদের পরবর্ত্তী যুগের অবস্থা কি ছিল তাহা আমরা স্মৃতিতে দেখিতে পাই। মনু বলিতেছেন, 'যে-ব্যক্তি যে-ভূমিকে বনাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক কর্ষণাদি দ্বারা উদ্ধার করে, সে-ভূমি তাহারই হইয়া থাকে (৯,৪৪)।' এতদ্দ্বারা জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। পুনঃ বলা হইতেছে, 'পথ, গ্রামান্ত ও পয়িহার ব্যতিরেকে ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে তবে পশুপালকের বা পশুস্বামীর একপণ পাঁচগণ্ডা দণ্ড হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণের জন্য ক্ষেত্রস্বামীকে অর্থ দিতে হইবে (৮,২৪১)। আবার বলা হইয়াছে, ভয় প্রদর্শন করিয়া যদি কেহ পরের গৃহ, তড়াগ, আরাম বা ক্ষেত্র হরণ করে, তবে উহাকে পাঁচশত পণ দণ্ড করিবে ; যদি অজ্ঞানে হরণ করে, তবে দুইশত পণ দণ্ড হইবে' (৮,২৬৪)। এই সকল উক্তি দ্বারা আমরা মানবধর্ম্মশাস্ত্র রচনাকালে অর্থাৎ মৌর্য্যযুগের পরে ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার যুগেও জমিতে কর্ষণকারীর ব্যক্তিগত অধিকার থাকিতে দেখি।

জয়সওয়াল বলেন, এই যুগের অন্ধ্র-রাজাদের সমসাময়িক কালে উত্তর ভারতে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা বিরচিত হয় (৪)। কালে খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই শতক কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে ইহার তারিখ নির্দ্ধারণ করেন (৫) ; জলি মনুর পরে এবং অনেক বিষয়ে মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আধুনিক বলেন (৬)। জেকবি বলেন, যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য গ্রীক Astrology-র (জ্যোতিষশাস্ত্র) সহিত পরিচিত ছিল সেইজন্য ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রাক্কালে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায় (৭)। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য শতবাহন বংশের রাজত্বের সমসাময়িক ছিল। বৌদ্ধভিক্ষুর প্রতি বিদ্বেষই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন, "হরিদ্রা রং-এর কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিগণ অশুভ দর্শন (১,২৭৩)। ইনি দ্বিজজাতিদের শূদ্রা ধর্ম্মস্ত্রী গ্রহণে আপত্তি করিয়াছেন

৩। Prafulla Chandra Basu—Indo-Aryan Polity, P 26—27.

৪। Jayaswal—Age of Manu and Jagnavalkya.

৫। Kane—P 187.

৬। Jolly—P 19.

৭। Jacobi—ZDMG, 30,306.

(৫৬)। "শূদ্র কেবল নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ করিবে (৫৭) *। "প্রতি-লোম বিবাহের সন্তানেরা 'অসৎ' ও অনুলোম বিবাহের সন্তানেরা 'সৎ' বলিয়া পরিচিত হয়" (৯৫)। "শূদ্রগণ দ্বিজজাতিদের সেবা করিবে, তাহার অভাবে ব্যবসায় অথবা অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু সর্ব্বদাই দ্বিজদের মঙ্গল করিবে" (১২০)। পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "একটি পুত্র শূদ্রা দাসীজাত হইলেও তাহার পিতার ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির একাংশ পাইবে (১৩৬)। পিতার মৃত্যুর পর শূদ্রাজাত সন্তানকে তাহার অন্য ভ্রাতারা তাহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ দান কবিবে ; অন্য ভ্রাতা বা তাহাদের ভাগিনেয় না থাকিলে এই শূদ্রাজাত পুত্র সমস্ত সম্পত্তি পাইবে" (১৩৭)।

পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্রাজাত সন্তানকে সনাতন ব্যবস্থারই অধীন রাখিয়াছেন ; তবে পূর্ব্ববর্ত্তী আইন-ব্যবস্থাপকদের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, অন্য উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে শূদ্রাজাত পুত্র সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে ; আবার পুত্র অভাবে কন্যাকেও বিষয়াধিকারিণী করিয়াছেন। এইস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্ববর্ত্তী আইনকারকদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও উদার! কিন্তু শাস্তি সম্পর্কে তিনি পুরাতন স্মৃতিকারদের বৈষম্য বজায় রাখেন (২০৯—২৯১)।

ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার যুগে যে "যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা" বিরচিত হইয়াছিল তাহা আমরা তাহার ব্যবস্থিত আইন হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কিন্তু "মিতাক্ষরা" আইন যাহা কেবল বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত সমগ্র হিন্দুসমাজের আইনপুস্তক তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতার উপরই ভিত্তি-স্থাপিত। এই আইনে আমরা family communism স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই। এতদ্দ্বারা আমরা দেখি যে হিন্দুআইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন সমর্থিত হইয়াছে বংশগত সম্পত্তিতেও কিন্তু গোষ্ঠিগত সাম্যবাদ রক্ষা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনটি ব্রাহ্মণ রাজবংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা এবং ভারতবাসীর জীবনের সর্ব্ব বিষয়ে ব্রাহ্মণাধিপত্যের ছাপ দেওয়া হয়। এই যুগের পর ভারতে

---

* এইসব স্থলে 'Yajnavalkya Samhita,' Translated by M. N. Datta ; 1906 দ্রষ্টব্য।

আবার বৈদেশিক আক্রমণ হয়। মধ্য এশিয়া হইতে বর্ব্বর শকেরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে। শকেরা ইরাণী-ভাষী একটি যাযাবর ইরাণী জাতি। কিন্তু এই জাতির যে অংশ ভারত আক্রমণ করে তাহা ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করে। শকদের পরে 'কুষাণ' নামে আর একটি মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি শকদের স্থান অধিকার করে; কুষাণদের ভাষা ইণ্ডো-ইউরোপীয় (আর্য্যভাষা) ভাষার পশ্চিম ইউরোপীয় শাখার (centum branch) অন্তর্গত। এই কুষাণদের শাসকশ্রেণীকে "আর্ষি" (৮) বলা হইত। ইহাদের নেতা কনিষ্ক উত্তর ও পশ্চিম ভারত জয় করেন। গান্ধার, কাশ্মীর হইতে পূর্ব্বে মগধ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত কুষাণদের শাসন বিস্তৃত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, ইহার বাহিরে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এক সময়ে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল (৯)।

কুষাণ-অন্ধ্র যুগ

কুষাণ বা ইউচি জাতিটি ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বৌদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন, কণিষ্কের পৌত্র বাসুদেব বিষ্ণু উপাসক হন। ইহাদের রাজত্ব যদিচ সমগ্র ভারতে পরিব্যপ্ত হয় নাই, তত্রাচ এক সময়ে বেশীর ভাগ ভারতে বিস্তৃত ছিল। এই যুগটি ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ। এই সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক ওলটপালট সম্পাদিত হয়। এই সময়ে বিশেষভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা হয়; অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি এই সময়েই আবির্ভূত হন। এই সময়ে শৈবধর্ম্ম, মহাযান, মিহির (সূর্য্য) পূজা ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসক সম্প্রদায় উত্থিত হয় এবং ১৬২ খৃঃ কশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহা ব্যতীত, এই যুগের প্রারম্ভে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত

৮। এই বিষয়ে Sieg এবং Siegling নামক জার্ম্মাণ পণ্ডিতদ্বয়ের অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত পুস্তকে ইহাদিগকে "ঋষিক" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জয়চন্দ্র নারঙ্-এর 'ভারতীয় ইতিহাসকী রূপরেখা'—২য় ভাগ, দ্রষ্টব্য।

৯। Jayaswal—History of India : Journal of Behar and Orissa Research Society, 1933.

সমূহকে সমীকরণ জন্য পাঞ্জাবে কনিষ্ক একটি বৌদ্ধ Council আহ্বান করেন। এইযুগে কুষাণদের রাজত্ব মধ্যে বৌদ্ধ-প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম আন্দোলন নূতন তেজ প্রাপ্ত হয়। জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের নিকট কুষাণেরা ভারতীয় নাম ও সভ্যতা গ্রহণ করিলেও বিদেশী ছিল; কিন্তু আন্তর্জাতিক বৌদ্ধদের নিকট বৌদ্ধ কুষাণেরা পর ছিল না। ভারতীয় সমাজে কুষাণ রাজত্বের ছাপ কতটা অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা এখন কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতেছে (১০)। কুষাণেরা বিদেশী ও বৌদ্ধ বলিয়া চিরকাল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে; এমন কি গুজরাটের কুষাণ ক্ষত্রপেরা ভারতীয় নাম এবং ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পরবর্ত্তী যুগের গুপ্ত সম্রাটদিগকর্ত্তৃক সমূলে উৎপাটিত হয়। বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আমলা-তন্ত্রের লোকদের এইজন্য অবিশ্বাস করিয়া কুষাণেরা শূদ্রজাতিসমূহ হইতে নিজেদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিত। জয়সওয়াল বলেন, কুষাণ ক্ষত্রপ বাণস্পর কৈবর্ত্ত ও অস্পৃশ্য পঞ্চকদের দ্বারা একটা নূতন রাজকর্ম্মচারীশ্রেণী সৃষ্টি করেন (১১)। পূর্ব্বভারতে শকসেনা নামক কায়স্থজাতীয় একটি কৌম বাস করে। ইহারা নাকি শকরাজাদের সৈন্যদলে কার্য্য করিত, সেইজন্য ইহাদের এই নামকরণ হয়। এই শকসেনা কায়স্থদের যে শক বা কুষাণ রাজাদের সহিত কিছু সংযোগ ছিল তাহা তাহাদের নাম হইতেই প্রতীয়মান হয়। এতদ্বারা বোঝা যায় যে নিজেদের স্বপক্ষীয় একটা পুরুষানুক্রমিক আমলাতন্ত্র ও অভিজাত দল সৃষ্টি করিয়া কুষাণেরা ভারতে কায়েমী হইবার জন্য চেষ্টা করে। তৎপর লক্ষণীয় যে কুষাণদের সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটাই বৈদেশিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মমতাবলম্বী নয়। ইহার মধ্যে সূর্য্যোপাসনা বিদেশ হইতে আগত বলিয়া প্রবাদ আছে (১২)। কনিষ্কের

১০। নারং বলেন, শকদের পোষাক যাহা কণিষ্কের মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়, তাহাই নানা রূপে পরিবর্ত্তিত হিন্দুদের চোগা চাপকানে দাঁড়াইয়াছে।

১১। Jayaswal—Journal of Behar and Orissa Research Society, 1933; P 42.

১২। প্রবাদ আছে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বাহ্লিক দেশ হইতে সূর্য্যপূজা ভারতে আনয়ন করেন। কথিত আছে ফার্সি 'মেহর' শব্দই সংস্কৃত 'মিহির' রূপ ধারণ করিয়াছে। এই

সময়ে মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত হয় ; ইহা ভারতীয় প্রচলিত কুসংস্কার বিশ্বাস ও ঠাকুরপূজার সহিত একটা রফা করে। বিষ্ণুপূজা, শৈবসম্প্রদায় সমূহও এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে প্রাচীন ধর্ম্মমত ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিবর্ত্তিত বলিয়াই অনুমিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে মহেন-জো-দাড়ো ও হারাপ্পায় যেসব মূর্ত্তি ও ধর্ম্মপূজার চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ধ্যানযোগী শিবের ষাঁড় (Bos Indicus), যোনী ও লিঙ্গ মূর্ত্তি পাওয়া যায় ; কেবল বিষ্ণুধর্ম্মের কোন চিহ্ন ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না (১৩)। এতদ্বারা আমাদের এই অনুমান হয় যে ভারতের আর্য্যপূর্ব্ব প্রাচীন অধিবাসীরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা পতিত ও আর্য্যসমাজের অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইলে তাহারা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে ; এইজন্যই জয়সওয়াল বলেন যে, "বৌদ্ধ" ও "শূদ্র" একার্থবাচক হয়। এইযুগেই নাকি বৌদ্ধপণ্ডিত অশ্বঘোষ বলিয়াছিলেন যে "ব্রাহ্মণদের আর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার কোন হেতু নাই, কারণ এখন শূদ্র ব্রাহ্মণের সমান পণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে 'ব্রাহ্মণ ও 'শূদ্র' এক (অশ্বঘোষ—বজ্রচ্ছেদিকা)। এতদ্বারা তিনি এই বুঝিয়াছিলেন যে, যখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জ্ঞানে এক (সমকক্ষ) হইয়াছে, তখন তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই সকল প্রমাণ হইতে এরূপ অনুমিত হয় যে বৈদিকযুগের পর হইতে ভারতীয় তথাকথিত প্রাচীন অধিবাসীরা যাহারা আর্য্যসভ্যতা দ্বারা প্রথমে অভিভূত হইয়াছিল তাহারা সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করে এবং শেষে নিজেদের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। মহাপদ্ম নন্দ এই আগত শূদ্র-প্রভুত্বের অগ্রগামী দূত ছিল, মৌর্য্যবংশে তাহা পূর্ণভাবে প্রকট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণাধিপত্যের এই প্রভুত্ব বিনষ্ট হইলেও শেষে তাহা

'মিহির' বা সূর্য্য ঠাকুরের পোষাকও চেহারা মধ্য এশিয়ার লোকের ন্যায়। ইহাদের সঙ্গে যেসব ইরাণী পুরোহিত ভারতে আগমন করিয়াছিল তাহাদের মগ (ফার্সি Magi) ব্রাহ্মণ বা শকদ্বীপি (Scythian) ব্রাহ্মণ বলা হইত। এই শকদ্বীপি ব্রাহ্মণেরা আজ নৈষ্ঠিক বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তাহারা কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সমাজে 'ঠেকো' হইয়াছিল। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে বিষ্ণুপূজা খৃষ্টপূজা হইতে আগত। ইহা শকদের সময়ে বিদেশ হইতে আনীত হয়।

১৩। Marshall—Indus Valley Civilisation.

নানা প্রকারের অবৈদিক ও নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় দ্বারা সমাজে পুনঃ প্রকট হয়। যদি ব্রাহ্মণশ্রেণীকে "শুক্ল পিঙ্গল কপিশ কেশ" বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্মপদ্ধতির রক্ষক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে এই সকল নূতন ধর্ম্মপন্থাকে বৈদিক ব্রাহ্মণ-ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বলিত ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতি যদ্বারা তাহারা অভিব্যক্ত হইতে পারে তাহা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইসব ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ধর্ম্ম জনসাধারণকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে আহ্বান করিত; এবং আদিম অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গগত করিত। এইজন্যই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম প্রভৃতি বৈদিক প্রভাব হইতে মুক্ত ও সমাজপদ্ধতি বিষয়ে উদার!

হারাপ্পা ও মহেন-জো-দাড়োতে "সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতা" বিষয়ক নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেক ভাবুকের মনেই এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে যে বর্ত্তমানের তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম, অর্থাৎ হিন্দুদের লৌকিক ধর্ম্ম, আচার ও পদ্ধতি এই সভ্যতার নিকট কত পরিমাণে ঋণী? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নরতত্ত্ববিদগণ মহেন-জো-দাড়োতে যে-সব মূলজাতির (race) নিদর্শন পাইয়াছেন সেই সকল নিদর্শন বর্ত্তমান ভারতীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার হারাপ্পাতে ও মহেন-জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত জালায় সমাহিত মৃতদেহ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় (১৪)। অন্যদিকে জন্মান্তরবাদ, গো-জাতির প্রতি ভক্তি যাহা হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট খোঁটা তাহার নিদর্শন বেদে নাই। যেসব ধর্ম্মের নিদর্শন "সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতা" মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভিত্তির সঙ্গে মিলে! এইসব দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, সিন্ধু-সভ্যতা মধ্যে হয়ত বৈদিক আর্য্যদের অস্তিত্ব ছিল; অন্যপক্ষে বৈদিক সাহিত্যে শিশ্নোপাসক অহিংসাবাদী ও ভাগবৎদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে প্রাগৈতিহাসিক অনেক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান নামান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে!

এই প্রসঙ্গে আর একটি খট্‌কার কথা উঠে। বেদে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি। স্মৃতিসমূহেও ধন এবং জমি

১৪। Dr. B. N. Datta—"Vedic Funeral Customs and Indus Valley Civilization" in "Man in India," Vols. 16, 17. দ্রষ্টব্য।

বিষয়ক সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর কৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা নামক টীকায় পৈত্রিক সম্পত্তিতে গোষ্ঠিগত কমুনিসম্ পদ্ধতি (যে-ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ইহাই দাঁড়ায়) বর্ণিত হইয়াছে। আর এই আইন বাঙ্গলা দেশ ছাড়া বাকী হিন্দু ভারতে প্রচলিত আছে। আবার অনেকে মধ্যপ্রদেশের জমিরূপ সম্পত্তিতেও সংযুক্ত (Joint) অধিকার পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন (১৫)। ইহারা মনে করেন যে প্রথমে গ্রাম্য জমি কৌমের প্রত্যেক লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিলি হইত, তখন communal ownership ছিল না; পরে Joint-family inheritance (যৌথ গোষ্ঠীগত সম্পত্তি) যাহাতে কতকগুলি অভিজাত বা ক্ষমতাপন্ন গোষ্ঠী গ্রামের অন্যান্য লোকদের উপর ভূ-স্বামীরূপে প্রভুত্ব করে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে সেই জমির co-sharer (বখরাদার) রূপে বিদ্যমান থাকে—সেইরূপ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় (১৬)। এই পদ্ধতি হয় একটি জাতিদ্বারা সম্পূর্ণ বিজয় স্বরূপ বা সম্পূর্ণ নূতন বন্দোবস্তরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে (১৭)।

বৈদিক ব্যক্তিগত অধিকারের পর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে গোষ্ঠির যৌথ অধিকার family communism-এর চিহ্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। এই পদ্ধতি কি প্রকারে আসিল তাহা অবশ্য আজ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু! ইহা কি ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের পদ্ধতি হইতে গৃহীত হইয়াছে? আবার কাহারও কাহারও মতে পাঞ্জাবের তিন প্রকারের জমি-বিলি পদ্ধতি কমুনিসম্ হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তিরই পরিচয় প্রদান করে (১৮)। প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, আচার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে লৌকিক প্রথারূপে এই যৌথপদ্ধতি বর্ত্তমান হিন্দুজাতির মধ্যে আসা অসম্ভব নয়। এই পদ্ধতির সম্যকরূপে মূল অন্বেষণ করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার সময় হইতে ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন জাতিদের পুনরুত্থান হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

১৫। B. H. Baden-Powel—Village Communties in India, Pp. 138-139.

১৬। B. H, Baden-Powel—Village Communities in India.

১৭। H. S. Maine—'Ancient Law'—Introduction by Sir F. Pollock, Pp 315—317.

১৮। Jolly—Recht und Sitte.

ইতিহাসের প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে শ্রেণী-সংগ্রাম ধর্ম্ম-সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা ইহা দেখিয়াছি। ভারতের ইতিহাসেরও প্রাচীন ও মধ্যযুগে শ্রেণী-সংগ্রাম ধর্ম্ম-সংগ্রামের রূপ ধারণ করিয়াছে। এইজন্যই এই সকল অবৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণশ্রেণীর এত বিরোধ ছিল। সমাজের নিম্নস্তরের শ্রেণীসমূহ ও পতিতেরা এই নূতন ধর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া উপরের স্তরের শোষণ নীতির কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। তখন শ্রেণী-সংগ্রামের সামাজিক সাম্যই ছিল লক্ষ্য, এবং উহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্ম্মপদ্ধতিই ছিল তাহার যুদ্ধক্ষেত্র।

আমাদের অনুমান হয় যে ক্লাসিক্যাল যুগ বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগ হইতে ভারতীয় প্রাচীন জাতির লোকেরা নানা নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে আর্য্য-সভ্যতাযুক্ত হইয়া আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সংগঠন করিয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রচলিত তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিকধর্ম্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা দেখিতে পাই যে Taboo (ছুঁৎছাৎ), Totemism (জন্তু বা গাছপালাকে পিতৃপুরুষ বলিয়া পূজা করা), Pre-animalism (জন্তুপূজা করিবার পূর্ব্বাবস্থা), Magic and witch craft (তুকৃতাক্, ঝাড়ন-ফোড়ন ব্যবস্থা), animalism (জন্তুপূজা) (১৯) প্রভৃতি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং এই সকল পূজা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সিন্ধুনদ সভ্যতায় এই সকলের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই হেতুই স্বীকার করিতে হইবে যে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ সনাতনী ও সঙ্কীর্ণ; তজ্জন্য অভিজাতীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। আর জনসাধারণ তাহার বিপক্ষে নূতন উদার ধর্ম্মসমূহ উদ্ভব করিয়া নিজেদের প্রকট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইতিহাসে ইহা সর্ব্বব্যাপী শ্রেণীসংগ্রাম ছিল এবং ইহারই ফলে মিশ্রিত হিন্দুজাতির উদ্ভব হইয়াছে (২০)। ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। এইগুলির কোন কোন ব্যাপার যে আর্য্যভাষীদের মধ্যে ছিল না তাহা বলা যায় না। Totemism, ছুঁৎ-ছাৎ, Magic প্রভৃতি তাহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

২০। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর গ্রীক লেখক ম্যাগাস্থেনেস্ উত্তর ভারতের লোকদের দীর্ঘাকৃতি ও গৌরবর্ণ বিশিষ্ট সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ স্থানের সম্বন্ধে কি উক্ত বর্ণনা খাটে ?

সাফো

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৪

ইরেণের সান্নিধ্য ও এতো সুখের মাঝখানেও কিন্তু গোসঁ্যার ভাগ্যে স্বস্তি নেই।

ইতিমধ্যে একদিন সঙ্গীত-রচয়িতা ডি. পটারের সঙ্গে, একটা দোকানের সামনে, অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে তার দেখা হয়ে গেল।

তার কাছে ফানির খবর পেল সে।

ফানি এখন আর একটি লোকের প্রেমে পড়েছে। ফ্লামাঁ তার নাম। এমন কি, ফ্লামাঁর একটি ছোট ছেলেকে, একমাত্র সন্তানকে, সে নিজের ছেলের মতই মানুষ করছে নাকি!

শুনে অবধি তার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কেন? গোসঁ্যা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে: কেন আর? সে তো আর ফানিকে ভালোবাসে না। তবে—তবে কেন?

কেবল, সে এই নারীকে যে সব চিঠি লিখেছে তার জন্য—তার জন্যই কেবল! সেই সব চিঠি এখনও ফানির দখলে। ফানি নিশ্চয় এই সব চিঠি সেই অপর লোকটিকে পড়ে শোনাবে—যেমন একদিন তার আর সব পূর্ব্বপ্রণয়ীর চিঠি গোসঁ্যাকে সে পড়িয়ে শুনিয়েছিল।

এমন কি—এমন কি হয়ত, তার এই নতুন প্রণয়ীর খারাপ আওতায়, ফানি সেই সব চিঠির সাহায্যে গোসঁ্যার সদ্য-লব্ধ সুখের স্বর্গে কোন দিন হয়ত বজ্র হান্‌বে—তার অনাহত সুখে ও শান্তির সাম্রাজ্যে অশান্তি আর নিরানন্দ বয়ে আনবে।

না, সেই চিঠিগুলো যত শীঘ্র সম্ভব তার কাছ থেকে নিয়ে আসা দরকার।

এবং এজন্যে গোসঁ্যাকেই যেতে হবে ফানির কাছে। সে নিজে ছাড়া

এই গোপনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আর অপর কার হাতে দেয়া যেতে পারে ?

স্যাভিল-এর সেই পুরনো বাড়িতে ফানি এখনো আছে কিনা সে বিষয়ে গোসঁ্যার মনে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও, একদিন গোসঁ্যা সকাল দশটার ট্রেনে চেপে, তার নতুন সংকল্প নিয়ে রওনা হলো। সাভিল-এ পৌঁছতে তার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লাগবে—এই সুদীর্ঘ পথযাত্রার শেষে হয়ত, হয়ত সে গিয়ে দেখবে যে সে-বাড়ির জানালা-দরজা সব বন্ধ, আর ফানি, তার নতুন প্রেমাস্পদকে নিয়ে অন্য কোথাও উধাও হয়েছে !

ষ্টেশনের কাছেই বাড়িটা। লাইনের বাঁক ঘুরতেই, ট্রেন থেকে, পর্দ্দা-টাঙ্গানো জানালাগুলো গোসঁ্যার চোখে পড়ল। একটা জানালা থেকে কুয়াশা ভেদ ক'রে ক্ষীণ একটু আলোর রেখাও যেন দেখা যাচ্ছে।

গোসঁ্যা আপন মনে একটুখানি হাসল। সে আর সেই আগের মানুষটি নেই—এবং ফানির মধ্যেও নিশ্চয়ই সে সেই আগের মেয়েটিকে দেখতে পাবে না। অথচ, কত দিনেরই বা ব্যবধান ? মাত্র দু'মাসের ! কিন্তু কী বিপর্য্যয়—কী পরিবর্ত্তনই না এসে গেছে তাদের জীবনে !

ষ্টেশনে আর কেউ নামল না গাড়ি থেকে। ঠাণ্ডা কুয়াশার ভেতর দিয়ে, পিচ্ছিল ফুটপাথের একপাশ ধরে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে চল্‌ল। পথের দু'ধারের গাছগুলায় তখনো নতুন পাতা ধরেনি—তাদের ডালপালায় সেই বিচ্ছিন্ন দৈন্য, সেই সেদিনের মতো, দু'মাস আগে এই পথ ধরে যেদিন সে ফানির সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেছিল।

রাস্তাটার মোড় ঘুরতে, এতক্ষণ বাদে, একজন মানুষের চেহারা তার চোখে পড়ল। একটি ছোট ছেলের হাত ধরে বলিষ্ঠকায় এক যুবক ষ্টেশনের দিকে চলেছে, তার পেছনে একজন কুলী বাক্স পেঁট্‌রা বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যুবকের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য এবং বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

হঠাৎ গোসঁ্যার মনে যেন বিদ্যুতের ঝলক্ খেলে গেল। এই কি ফ্লামাঁ ?—ফ্লামাঁ আর তার ছেলে ?

আপাদমস্তক ঘৃণায় কেঁপে উঠল গোসঁ্যার। তার ইচ্ছা হ'ল তক্ষুনি সে পালিয়ে যায়—সেই মুহূর্ত্তেই সেখান থেকে দূরে—অনেক দূরে চলে যায়

আবার! কিন্তু, দু'একটা জিনিস জানবার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। লোকটি তো চলে গেল, এবং সেই ছেলেটিও,—তবে ফানি গেল না কেন? এবং সেই চিঠিগুলো, সেগুলো তার পাওয়া চাই-ই। তার ভাবী স্বাচ্ছন্দ্যের মৃত্যুবাণ হস্তগত না ক'রে, এদের হাতে রেখে দিয়ে কি ক'রে সে ফিরে যাবে?

ফানির শয়নকক্ষের বাহির থেকে বাড়ির ঝি জানালো :

'মাদাম, কর্ত্তা এসেছেন।'

'কে কর্ত্তা?' ভেতর থেকে বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি।' গোসাঁ্যা বল্‌ল।

অস্ফুট একটু আর্ত্তনাদ, এবং তারপরেই :

'দাঁড়াও, আমি উঠছি—এই গেলাম বলে।'

দুপুর গড়িয়ে গেছে এখনও বিছানায়? গোসাঁ্যা একটু বিস্মিতই হ'ল। তবু, ভেবে দেখলে বিস্ময়ের কিছুই নেই। শীতকালের সকালের ক্লান্তি—রাত্রি জাগরণের অবসন্নতা—অত্যন্ত স্বাভাবিক। গোসাঁ্যার কি তা একান্তই অজানা?

গোসাঁ্যার কিরকম অস্বস্তি বোধ হ'তে থাকে। মনের ভেতর কাঁটার মত কি যেন বেঁধে।

খাবার ঘরে বসে সে ফানির অপেক্ষা করে। ডাইনিং টেবিলে ভুক্তাবশিষ্ট প'ড়ে—এইমাত্র যাত্রা করার আগে কারা যেন ব্রেকফাস্‌ট্‌ ক'রে গেছে।

ফানি ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত ভাবে তার দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু গোসাঁ্যার তরফে অভ্যর্থনার অভাব দেখে মধ্য পথেই থেমে যায়, এক মুহূর্ত্ত সে একটু ইতস্ততঃ করে, কি করবে ভেবে পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে, কোমলকণ্ঠে সে বলে : 'সুপ্রভাত!'

জাঁকে দেখে ফানির মনে হয় সে যেন রোগা হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ফানিকে দেখে জাঁ অবাক হয়ে যায়—আবার যেন সে তার যৌবন ফিরে পেয়েছে, কেবল সামান্য একটু স্থূলতা সেই সঙ্গে—আবার যেন তার ভেতর থেকে সুষমার দীপ্তি বিকাশিত হচ্ছে। বহুদিন পূর্ব্বে যে ফানিকে সে সারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসত সেই ফানিই যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আবার!

'শীতকালের দিনে উঠতে একটু দেরিই হয়!' ব্যঙ্গ-স্বরে গোসাঁ্যা বলে।

ফানি মাথাধরার অজুহাত জানায়, তখনো সে ভালো বুঝতে পারে না,

সাধারণ ভদ্রতা অথবা অন্তরঙ্গতার—ঠিক কোন ধরণে গোসঁ্যার সঙ্গে সে ব্যবহার করবে। গোসঁ্যার নজর ডাইনিং টেবিলে পড়েছে, তার দৃষ্টিতে নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠছে, ফানি দেখতে পায়ঃ

'ছোট্ট একটি ছেলে! থাকত আমার কাছে। আজ সকালে বাড়ি গেল কিনা! যাবার আগে সেই খেয়ে গেছে—'

'কোথায় গেল সে?' গোসঁ্যা জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব নিস্পৃহ করবার সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু তার ভেতর থেকে কেমন যেন একটা ঝাঁঝ ফুটে বেরয়।

'তার বাবা এসে নিয়ে গেল তাকে।'

'তার বাবা! ও, বটে! তোমার কেউ নয় বোধ হয়?'

গোসঁ্যার অন্তরে রাগ জমতে থাকে, কিন্তু না, রাগলে তার চলবে না, কিসের জন্যেই বা রাগ, ফানি তার কে? তাছাড়া, তার চিঠি! চিঠিগুলো তার পাওয়া চাই-ই। রাগ দমন ক'রে সোজাসুজি সে চিঠির কথায় এসে পড়ে।

'ও, তোমার চিঠিগুলো!' ফানি বলেঃ 'এক্ষুনি আমি দিয়ে যাচ্ছি তোমায়। সেই বাক্সেই আছে।'

গোসঁ্যা ফানির অনুসরণ ক'রে শয়নকক্ষে যায়। অগোছালো, অবিন্যস্ত শয্যা। পাশাপাশি দুটো বালিশ—তাদের ওপরে তাড়াতাড়ি একটা কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়েছে।

ফানি সেই ছোট্ট বাক্স নিয়ে এসে টেবিলে রাখে—তার ভেতর থেকে চিঠিগুলো বার করে। বিছানায় ব'সে শেষবারের মতো তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে যায়।

তারপরে সেগুলো গোসঁ্যার হাতে তুলে দেয়ঃ

'এই! এর মধ্যেই সব রয়েছে।'

জঁ প্যাকেটটা নিয়ে অবহেলাভরে পকেটের মধ্যে রেখে দেয়। তার মন তখন অন্য চিন্তায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

'তাহ'লে—তাহ'লে কোথায় গেলো তারা? তোমার সেই পিতাপুত্র?'

'মরভ্যান-এ, নিজেদের বাড়িতে গেলো।'

'আর তুমি? তুমি কি এখানেই থাকবে ভেবেছ?'

ফানি গোসঁ্যার দৃষ্টি এড়িয়ে বাধবাধ গলায় বলেঃ 'এখানে? এখানে একলা থাকা—' বলতে বলতে সে থেমে যায়, তারপরে জড়িতস্বরে জানায়, সেখানে তার মন টিক্‌বে না, সেও কোথাও চেঞ্জে যাবে, মনে করেছে।

'মরভ্যান-এই নিশ্চয়? আবার পুনর্মিলন? বাঃ বাঃ বেশ!' গোসঁ্যার মনের উচ্ছ্বসিত ঈর্ষা তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ভেঙে পড়ে।

'তার চেয়ে সোজাসুজি একটু স্পষ্ট করেই বল না কেন যে তুমি একজন নতুন প্রেমিক পাক্‌ড়েছ! সারা জীবন যা ক'রে এসেছ তুমি! আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্য্যন্ত! বাজারের বেশ্যা আর এর চেয়ে কী ভালো হবে! যাও! তাই যাও! সেই তোমার পক্ষে ভালো! সাধারণ লম্পটের সঙ্গে গণিকার মতো কাল কাটাওগে! তোমাকে আমি নর্দ্দামার পাঁক থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা ক'রে দেখছি তাহ'লে ভালোই করেছি!'

ফানি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে, নীরবে; একটি কথারও জবাব দেয় না—কেবল তার অর্দ্ধনমিত চোখের কোণ থেকে জয়ের দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়ে। গোসঁ্যা যতই তাকে গালাগালির চাবুকে জর্জ্জরিত করে, ততই যেন তার গর্ব্ব উথলে ওঠে, এবং তার ঠোঁটের কোণের মৃদু কম্পন ক্রমশই আরো বেশি স্পষ্ট হয়।

গোসঁ্যা তারপর তার নিজের সৌভাগ্যের কথা বলে—তার নিজের আনন্দের কথা। কুমারী মেয়ের মধুময় হৃদয়—তার অনাঘ্রাত যৌবন—তার পবিত্র ভালোবাসা—সত্যিকারের খাঁটি ভালোবাসা—যা সে পেয়েছে। আঃ, সতী নারীর কোমল বুকে মাথা পেতে শুতে কী আরাম!—

বলতে বলতে গোসঁ্যা হঠাৎ থেমে যায়, তার গলার স্বরও নেমে আসেঃ

'এই মাত্র আমি তোমার ফ্লামঁাকে পথে দেখেছি। এই ঘরেই সে ছিল রাত্রে?'

'হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এল, তখন বাইরে বরফ পড়ছে। ঐ সোফায় তার জন্যে বিছানা করে দিলাম।'

'মিথ্যেবাদী! মিথ্যুক! মিথ্যেকথা বলছ তুমি। সে ঐ বিছানাতেই শুয়েছে। বিছানার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এবং তোমার দিকে তাকালেও।

'বেশ, তা কি হবে?' ফানি তার জ্বলজ্বলে চোখ গোসঁ্যার মুখের ওপর তুলে ধরে ঃ

'আমি কি জানতাম যে তুমি আবার আসবে? তাছাড়া, তোমাকে হারাবার পর—'

'কী খাশা! কী চমৎকার! তাই সারারাত তার আদরের মধ্যে তুমি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছ! ধিক্! বাজারের বেশ্যারও অধম! এই নাও—'

গোসঁ্যার হাত তার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পেয়েও, ফানি অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সম্পূর্ণভাবে তার আঘাত নিজের গালে পেতে নেয়।

তার আর্ত্তনাদের মধ্যে একসঙ্গে বেদনার, আনন্দের, জয়ের ধ্বনি ফুটে ওঠে, যুগপৎ। এবং তারপর মুহূর্ত্তেই সে গোসঁ্যার ওপর লাফিয়ে প'ড়ে উদ্দাম বাহুবেষ্টনে তাকে জড়িয়ে বলে ঃ

'আমার প্রিয়! আমার প্রিয়তম! এখনো—এখনো তুমি আমায় ভালোবাসো তাহ'লে!'

তারপর দুজনে সেই বিছানার ওপরে গড়াগড়ি খায়।

ক্রমশঃ

শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়

আলফঁস দোদের 'সাফো' হইতে অনূদিত

সৃষ্টির আত্মগ্লানি

আদিম অন্ধকারের পথহারা গহ্বরের ভিতর থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে অপরিসীম অনিদ্রা অস্বাস্থ্যে আবিল। তার অতলস্পর্শ পঙ্ক-শয্যা থেকে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিচ্ছে অতিকায় কুৎসিত অর্ধগঠিত জলহস্তীর দল। এই অসমাপ্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রী নেই, শৃঙ্খলা নেই। নিজের লেখনীর প্রতি নিত্য-অসন্তুষ্ট আর্টিষ্ট কেবলই কাটাকুটিতে ছড়াছড়ি ক'রছেন। অসংলগ্নতার অসম্পূর্ণতার কুরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে;—তাদের ডানা হয়েছে—পাখা হয়নি, তাদের দাঁত দেখা যাচ্ছে—চঞ্চু দেখা যায় না। শব্দ বের হচ্ছে—ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সুরের অভাবে। হয়নি-হচ্ছে না-র বেদনায় ক্লিষ্ট সমস্ত আকাশ। বর্বর বিধাতার অনুষ্ঠান—অর্থহীন অসংলগ্নতায় আকীর্ণ করছে আদিকালের অরণ্যচ্ছায়া। সুপরিণত হয়নি কিছুই। সুগঠিত সুন্দর হবার চেষ্টা জীবজন্তুর দেহে দেহে বার বার ব্যর্থ হয়ে নিজের প্রতি ধিক্কার ঘোষণা করছে। পিশাচ তারা—বুদ্ধিহীন কিম্ভুতকিমাকার। চারিদিকে পঙ্গুতা ব্যঙ্গ করছে আপন সৃষ্টিকর্তাকে। জল-স্থল অন্তরীক্ষের অন্তরে অন্তরে এমন অসহ্য বেদনার আর কিছু হোতে পারেন না যে, হোতে চাচ্ছে—হোতে পাচ্ছে না। এই অসম্পূর্ণতায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে সমস্ত সৃষ্টি। অন্ধ কবন্ধের দল বিচিত্র বিকৃতির বাহন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত ভঙ্গীতে, অসহ্য এই অকৃতার্থ সৃষ্টির আত্মগ্লানি। উদয়াচলের ঊর্ধ্বলোক হোতে আহ্বান আসছে—আলোক, আলোক। কদর্যের অপসারণ বিশ্বজগতের সুসামঞ্জস্য—সেই আলোক চিত্রকরের রথ, কত যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে বিশ্বশৃঙ্খলার সুসঙ্গতির পথে; অর্থহীন নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্নকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে। আলোক বিস্তীর্ণ করেছিল তার রাজত্ব—বুদ্ধি রূপ নিয়েছিল শান্ত সুন্দরের; কিন্তু অসমাপ্তির বিকৃতি লুকিয়ে ছিল কোথায়—সমস্ত শৃঙ্খলা ছিন্ন করে সেই কদর্য বেরিয়ে এসে আবার তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল। জানান দিলে যে বিশ্বসৃষ্টিতে এখনও সম্পূর্ণের আগমন হয়নি। এখনও

তাকে বাধা দেবার জন্য উঠে পড়ছে আদিম অরণ্যচ্ছায়ার পিশাচের দল। যতদিন না অন্তরের মধ্য থেকে দূরীকৃত হয় বর্বর ততদিন কিছুতেই শান্তির আশা নেই। এর থেকে দেখতে পাওয়া যায় পীড়িত জগৎ হাত বাড়াচ্ছে আলোকের উৎসের দিকে—নাগাল পেয়েও নাগাল পাচ্ছে না। বিধাতার নিষ্ফলতা দুঃখে আকীর্ণ করছে তাঁর আপন রচনাকে। দিচ্ছে তার উপরে কালী ঢেলে। সেই আদিম—সেই ভয়ঙ্কর—সেই আত্মহিংস্রক, সেই নরঘাতী, তার চিরকালের গহ্বরের থেকে হঠাৎ কখন আবার দেখা দেয়—বলে যে, বর্বর এখনও মরেনি, কদর্য এখনও তার রাজ্যের জন্য লড়াই করছে।

উদয়ন
২রা জুলাই, ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃত ‘যোগ’ কি ?

(১)

‘যোগ’-শব্দের অর্থ সংযোগ। কাহার সহিত কিসের সংযোগ ? পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।

জীবাত্মাকে যদি the individual self বলা যায়, তবে পরমাত্মা হন the Universal Self এবং উভয়ের যে সংযোগ, তাহার পাশ্চাত্য নাম ‘At-one-ment’—‘to be one with, to be united to the Divine Self.’

এই যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ—জলস্তম্ভে যেমন জলধির সহিত জলদের সংযোগ হয়—এ সংযোগ সেরূপ অস্থায়ী সংযোগ নয় ; কিন্তু নদী যেমন অগাধ সমুদ্রে আপনা হারাইয়া চিরদিনের জন্য একীভূত হইয়া যায়, এ সেইরূপ চিরন্তন সংযোগ—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—উপনিষদ্

এই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মিষ্টিক্ বলিয়াছেন—

—It is a sempiternal unification, like that of the dew-drop slipping into the shoreless sea and becoming *one* with it.

বৈদান্তিক ইহাকে ‘ব্রহ্মসাযুজ্য’ বলেন। তখন জীববিন্দু সেই রসামৃত সিন্ধুতে একাকার হইয়া যায়। এই একাকার অবস্থা মননের অতীত, বচনের অতীত। কিন্তু তথাপি মিষ্টিকেরা নানা ছন্দে তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি :—

Amalgamation with God, Immersion in the Absolute, Absorption in the Divine Dark, Self-loss in the nudity of Pure Being। ‘অনাদ-নাদ’ (Voice of the Silence) নামক তিব্বতীয় যোগ-দীপিকায় এই দশা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"Where is thy individuality, lanoo ? where the lanoo himself ? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the ever-present ray become the All and the Eternal Radiance."

জীবের বহুভাগ্যে যখন ঐরূপ অঘটন ঘটে (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ), তখন জীব ভূমানন্দের আস্বাদ পায়—উপনিষদ্ যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্থ' (Acme of Bliss) বলিয়াছেন। ঐ আনন্দ 'আনন্দং নন্দনাতীতম্'—সুখ-দুঃখের অতীত অনির্বচনীয় অবস্থা—'সুখ-দুখ-মন্থনধন' (রবীন্দ্রনাথ)—বুদ্ধদেবের ভাষায় উহা 'পামোজ্জ-বহুলম্'—সংপশ্যে বিপুলং সুখং (ধম্মপদ)—গীতার কথায়—'সুখং আত্যন্তিকং যত্র'—'স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে।'

পতঞ্জলি যোগসূত্রে ইহাকে 'স্ব-রূপে অবস্থানং' বলিয়াছেন—যখন সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধের ফলে পুরুষ (দ্রষ্টা, Monad) নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন। * এই স্বরূপে অবস্থানের কথা আমরা প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে শুনিতে পাই—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং
জ্যোতিঃ উপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।

—৮।৩।৪

'ঐ জীবাত্মা এই শরীর হইতে উৎথিত হইয়া পরম (ব্রহ্ম-) জ্যোতিতে উপসন্ন হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হন।'

এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে—কারণ, ব্রহ্মজ্যোতিতে আরোহণ করা ও স্বরূপে সুস্থিত হওয়া—একই কথা—'to mount to God is really to enter into one's self'—ইহাই মুক্তি। এ ভাবে মুক্তি কি ?

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ

—ভাগবত

---

* এ সম্পর্কে Arthur Wells একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—The Psyche (পতঞ্জলি যাহাকে চিত্ত বলিলেন, ঐ চিতি), in her delusion, prefers the earthly wedlock with the terrestrial self (ভূতাত্মা বা Physical Ego)—rather than her divine husband—the Celestial Self (প্রত্যাগাত্মা বা পুরুষ)

রাজকবি টেনিসন্ বোধহয় ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন--তাই তিনি লিখিয়াছেন—Dive into the temple-cave of thine own self অর্থাৎ, আপনার হৃদয়-গুহার অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হও। টেনিসন্ নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে যোগী ছিলেন—নহিলে তিনি এত সহজে সমাধি লাভ করিয়া পরমাত্মার সংস্পর্শ অনুভব করিতেন কিরূপে? তাঁহার নিজের বাণী শ্রবণ করুন—

"Till at once, out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this—not a confused state but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—when death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction but the only true life."

টেনিসন্ একান্তে বসিয়া নিজের নাম উচ্চারণ করিলে তাঁহার ঐ দশা ঘটিত। তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইয়া তিনি যেন অসীম সত্তায় নিমজ্জিত হইতেন। সে একটা অস্পষ্ট কুয়াসার অবস্থা নয়—বেশ বিস্পষ্ট, বেশ সুনিশ্চিত। ঐ ব্যক্তিত্বের বিলোপ অভাব নয়, নির্বাণ নয়—কিন্তু পূর্ণ সম্বিৎ—তখন মৃত্যুকে একটা হাস্যকর প্রলাপ মনে হইত।

সে যাহা হউক, আমরা পতঞ্জলিতে ফিরিয়া যাই। পতঞ্জলি সাংখ্যমতের অনুসরণ করিয়া পুরুষের পরিচয়ে বলিয়াছেন—পুরুষ 'দ্রষ্টা দৃশি-মাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ'। ইহা সাংখ্যেরই প্রতিধ্বনি। সাংখ্যেরা পুরুষকে 'শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ' বলেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ এক নন, অনেক—তস্মাৎ পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধম্। প্রত্যেক পুরুষ অনাদিকাল হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু-দ্বারা রচিত এক একটি লিঙ্গশরীরের সহিত সংযুক্ত। ঐ লিঙ্গশরীর প্রকৃতিরই ভগ্নাংশ। উহা মহৎ-অহঙ্কার-একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র—এই অষ্টাদশ অবয়ব দ্বারা গঠিত। উহাকে 'লিঙ্গ' বলে কেন? ইহার উত্তরে অধ্যাপক ডয়সন্ লিখিয়াছেন—

It is termed 'Lingam', because it is the 'mark' by which the different Purushas are distinguished, for, in themselves, these collectively are mere knowing subjects and nothing more, and would consequently be completely identical and indistinguishable, if they had not their proper 'lingas' differing from one another.

—Philosophy of the Upanisads p. 242

এই লিঙ্গকে পতঞ্জলি 'চিত্ত' বলিয়াছেন। ব্যুত্থানদশায় পুরুষ চিত্তবৃত্তির দ্বারা অনুরঞ্জিত হন—যোগের উদ্দেশ্য সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া পুরুষকে স্ব-রূপে স্থাপন করা। তখন অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং সুকৃত-দুষ্কৃতরূপ অশেষ কর্ম নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। ঐ অবস্থায় পুরুষ চিত্তবৃত্তি দ্বারা অপরামৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ বা 'কেবল' ভাবে অবস্থিত হন। সেইজন্য উহার নাম কৈবল্য—তৎ দৃশেঃ কৈবল্যম্ (যোগসূত্র, ২।২৫)।

পুরুষ ঐরূপে কৈবল্য লাভ করিলে প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের লিঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও নাশ হয়—অর্থাৎ, 'the specialised fragment of প্রকৃতি associated with that particular মুক্তপুরুষ is returned to and merges in the ocean of প্রকৃতি'।

সাংখ্যেরা যাহাকে পুরুষ বলেন, তিনিই বেদান্তের চিন্মাত্র। ঐ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অংশ—সেই চিৎ-সিন্ধুর বিন্দু—a unit of consciousness—যাহাকে গীতায় ভগবান্ 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যেন অগ্নি আর এই সকল চিন্মাত্র যেন তাহার বিস্ফুলিঙ্গ—যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি সহস্রশঃ।

এই চিন্মাত্রকে উপনিষদের কোথাও কোথাও 'প্রত্যগাত্মা' বলা হইয়াছে—কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ (কঠ, ৪।১)। ঐ প্রত্যগাত্মাই পাশ্চাত্য দর্শনের Monad।

অংশ ও অংশীর, সিন্ধু ও বিন্দুর কোন তাত্ত্বিক প্রভেদ থাকিতে পারে না—শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষায়—অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব। সেইজন্য উপনিষদের উপদেশ এই যে, পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মা অভিন্ন—'তত্ত্বমসি', 'সোঽহম্'।

ঐ প্রত্যগাত্মা বিদেহী, কূটস্থ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ, নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিরুপাধি—এক কথায় লোকোত্তর (transcendent)। লোকোত্তর ভাবে, 'as the transcendence, the Monad is ever in the bosom of the Father' অর্থাৎ, ঐ চিন্মাত্র সতত চিদাকাশে সুস্থিত।

ঐ ব্রহ্মবিন্দু চিৎকণ স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব ও ব্যাবহারিক ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ, transcendence ছাড়িয়া immanent হন। He

wills to enter the প্রপঞ্চ, the fivefold universe, and to become immanent. তখন তাঁহা হইতে একটি কিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া শরীর গ্রহণ করে—becomes entangled with the Psyche.

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এই কিরণই জীবাত্মা—পাশ্চাত্য দর্শনের Ego. এইরূপে অংশ জীব অংশী ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন এবং তাঁহার স-দেহত্ব হয়। সেইজন্য উপনিষদে স্থানে স্থানে তাঁহার নাম 'দেহী'।

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃনোতি—শ্বেত, ৫।১২

আমরা প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে প্রবেশের কথা বলিলাম। ঐ প্রপঞ্চের পঞ্চ ভূমি—উহাদিগের নাম 'লোক'। উপনিষদের ভাষায় ঐ পঞ্চলোকের নাম ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক, দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক। দেব-লোকের আবার দুইটি স্তর—অরূপ-স্তর ও রূপ-স্তর। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মখণ্ড প্রত্যগাত্মা স্বরূপতঃ অদ্বয় হইলেও তিনি যখন সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার অংশ, তখন তিনিও সচ্চিদানন্দ। সেইজন্য তাঁহাকে 'Triple Monad' বলা হয়, কারণ, তাঁহার মধ্যেও পরমাত্মায় সুব্যক্ত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তি (যাহাদিগের প্রকাশ প্রতাপ, প্রেম ও প্রজ্ঞায়) অব্যক্তভাবে বিদ্যমান। সেইজন্য মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি বলিতেন—'The unit becomes three'। কিরূপে? প্রত্যাগাত্মা হইতে বিচ্ছুরিত ঐ কিরণ প্রপঞ্চে অবতরণ-উপলক্ষে ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক ও অরূপ-দেবলোক হইতে তিনটি 'ভূতসূক্ষ্ম' সংগ্রহ করিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশ রচনা করেন। এই তিন কোশের সংযুক্ত নাম 'কারণ শরীর'—উহাদিগকে উচ্চ ত্রিতয়ী (Higher Triad) বলা যাইতে পারে। ঐ কারণ-শরীর লক্ষ্য করিয়া বৈদান্তিক বলেন—কারণ-শরীর-উপহিত প্রত্যগাত্মাই জীবাত্মা। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—

To achieve this aim (so that the Monad, who is sown in weakness, may be raised to power), this unit of consciousness (the Monad) sends down a ray which appropriating the

necessary material from the *Nirvanic,* the *Buddhic* and the *Arupa* level of the *Manasic* Plane, * to serve as its vehicles for functioning on those planes, shines out as a central focus of consciousness surrounded by a resplendent aura, which in the technical phraseology of the yoga is called the *Karana* Sarira, composed of the Vijnanamaya, the Anandamaya and the Hiranmaya Kosha. This central focus of consciousness is the *Jivatma.*

কিন্তু প্রপঞ্চে অবতরণ এখনও সাঙ্গ হয় নাই। অরূপ-দেবলোকে হইতে জীবাত্মাকে রূপ-দেবলোক এবং পিতৃলোক ও মনুষ্যলোকে অবতরণ করিতে হইবে। ঐরূপে অবতীর্ণ জীবাত্মার বৈদান্তিক নাম ভূতাত্মা—পাশ্চাত্য দর্শনের Personality। ঐ ভূতাত্মা জীবাত্মার ছায়া। জীবাত্মা যদি চিদাভাস হয়, তবে ঐ ভূতাত্মা চিৎ-ছায়া। ভূতাত্মা ঐ অবতরণ-উপলক্ষে রূপ-দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক হইতে আর তিনটি ভূতসূক্ষ্ম সংগ্রহ করিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশ রচনা করে। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র একরূপ লিখিয়াছি—

This Jivatma, in its turn, puts down a fragment of himself into incarnation in the lower planes—namely, the *Rupa* level of the Mental plane and the Astral plane and the Physical plane, ensheathing itself in bodies of mental, emotional and physical matter—the Annamaya, the Pranamaya and the Manomaya Kosha of the Vedantist. This fragment of the Ego—really its reflexion and therefore called *Chidavasha* in the Vedanta—is the Personality of the Theosophist—our illusory terrestrial self.

ভূতাত্মার ঐ যে উপাধি—যাহা মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশের সমবায়ে গঠিত—উহাই আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর; কিন্তু যেহেতু অন্নময় কোশ ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহরূপে (gross body and etheric double) দ্বিধা বিভক্ত, অতএব উহাদিগকে 'নিম্ন চতুষ্টয়ী' বলা যাইতে পারে। এই বিষয় লক্ষ্য

* যাহাদিগকে এখানে Nirvanic, Buddhic ও Manasic Planes বলা হইল, উহারা আমাদের পরিচিত উপনিষদ্-উক্ত ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক ও দেবলোক।

করিয়া মাদাম্ ব্লাভাট্‌স্‌কি বলিতেন—The Unit becomes Three and Three generate Four.। বলা বাহুল্য, এখানে Unit আমাদের ঐ প্রাগুক্ত প্রত্যগাত্মা ; Three (ত্রয়ী) ঐ হিরণ্ময়, আনন্দময় ও বিজ্ঞানময় কোশের উপাধিতে প্রকাশিত প্রপঞ্চ-প্রবিষ্ট জীবাত্মার সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তি ; এবং Four (চতুষ্টয়ী) আমাদের উল্লিখিত মনোময়, প্রাণময় ও দ্বেধাবিভাজ্য অন্নময় কোশ—যাহার বাহনে ভূতাত্মা প্রপঞ্চের নিম্নভূমিতে বিহরণ করে। এইরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ সর্বাঙ্গ হয়—যাহা লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বলেন—

শরীরম্ অভিসংপদ্যমানঃ পাপ্‌মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

কথাটা যে খুব পরিষ্কার হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার জন্য আমার অক্ষমতাই প্রধানতঃ দায়ী—তবে ব্যাখ্যানের সংক্ষিপ্ততারও যে কোন দায় নাই—তাহা নয়। যাহা হ'ক, যিনি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু, তিনি আমার 'বেদান্ত ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান' (ঐ গ্রন্থ এখন যন্ত্রস্থ) সুযোগ মত পাঠ করিতে পারেন।

এতক্ষণ আমরা প্রত্যগাত্মার প্রবৃত্তিমার্গে জীবাত্মা ও ভূতাত্মা-রূপে প্রপঞ্চে অবরোহণ বা Descent-এর কথা বলিলাম। কিন্তু অবরোহণই শেষ কথা নয়। অবরোহণের পর অধিরোহণ—Ascent। প্রবৃত্তির পর নিবৃত্তিমার্গ—ঐ মার্গই যোগের পথ। ঐ যোগের পথে জীব প্রপঞ্চ হইতে উত্থিত হইয়া অ-প্রপঞ্চে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রত্যগাত্মা-রূপে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। আগামী বারে সে কথা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বরভেদ

বৈঠকখানার এক পাশে কাঠের পার্টিশান দেওয়া ছোট খোপটিতে এ বাসার তরুণ উকিলের প্রৌঢ় মুহুরী উপেন সরকার সেরেস্তার কাজ করছিল। হঠাৎ সামনের রোয়াকে উচ্চকণ্ঠের আভাষ পেয়ে কলম রেখে সে সোজা হ'য়ে বসল।

'নেমে যা, নেমে যা বলছি। শালা বদমায়েস পাগল, নেমে যা এখান থেকে।'

কণ্ঠস্বর কর্ত্তার, অর্থাৎ উকিলবাবুর পিতার। উপেন সরকার পার্টিশানের ভেতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু গলির ঐ পাশ থেকে আসা গ্যাসের ঝাপসা আলোয় রোয়াকের আগন্তুকটি কে বা কি রকম দেখতে কিছুই বোঝা গেল না। কোনো ফুটপাথবাসী ভিখারী হয়ত হবে, এই মনে ক'রে সে ঘুরে ব'সে কলমটি আবার তুলে নিল। 'চুঃ' ক'রে একটা চুমকুড়ি কেটে কাজে মন দিল।

উপেন সরকার হাসে না। হাসি পেলে মুখটা ছুঁচালো ক'রে শুধু একটা চুমকুড়ি কাটে। খুব হাসি পেলে সেই সঙ্গে উরুদেশে একটা ছোট চড় মারে, এই পর্য্যন্ত।

এ বাসার চাকরটি বাঙালী। কৌতূহলও তার নিতান্তই বাঙালী সুলভ। ভেতর থেকে কর্ত্তার উচ্চকণ্ঠ তার কানে গিয়েছিল, কিন্তু তখন মশলা পিষছিল ব'লে উঠে আসবার সুযোগ পায় নি। মিনিট পনের পরে তাই সে সন্তর্পণে সরকারের খোপের ভেতরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কত্তা চেঁচাচ্ছিল্যান ক্যান সরকার মশায়, এ্যাঁ?'

লিখতে লিখতে সরকার জবাব দিল, 'কি জানি, কোনো ভিখিরী-টিখিরী এসেছিল বোধ হয়!'

'তাই না কি! কত্তা পাগল-পাগল বল্যা চেঁচাচ্ছিল্যান, তাই ভাবল্যাম বুঝি—।'

'চুঃ' ক'রে একটা চুমকুড়ি কেটে সরকার উঠে ব'সে বলল, 'পাগল না হাতি।

বেটা বুড়ো নিজে পাগল, তাই মুল্লুকশুদ্ধু লোককে নিজের মত মনে করে।···
যা, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।'

চাকরটি ফাজিল মেয়ের মত ফিক ক'রে একটুখানি হাসল। তারপর ঝুঁকে পড়ে চৌকির নিচ থেকে কল্‌কেটা তুলে নিয়ে খোপ থেকে বেরিয়ে গেল।

কর্ত্তার নাম ক্ষেত্রনাথ। যদিও তাঁকে সকলেই 'কর্ত্তা' ব'লেই ডাকে, তবু 'কর্ত্তা' তাঁর নাম নয়;—নাম হ'চ্ছে ক্ষেত্রনাথ, ক্ষেত্রনাথ দস্তিদার বি, এল। বছর পাঁচেক আগে পর্য্যন্তও তিনি নিয়মিত পুলিশ কোর্টে হাজ্‌রে দিতেন; এবং বলতে বাধা নেই, তাঁর ছেলে তারিণী দস্তিদার এম্, এ ; বি, এল যদিও এখন পিতার পসার হাতে রাখবার জন্যে প্রাণপাত চেষ্টা করছে, তবু বৃদ্ধ ক্ষেত্রনাথের সঞ্চিত অর্থেই এখনো সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান হ'য়ে থাকে।

ক্ষেত্রনাথ গত পাঁচ বছর হ'ল আর কোর্টে যান না। পাঁচ বছর আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। সেই থেকে কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন কোনো সময়ে, ক্ষেত্রনাথ জবাবে মুখখানা হাসি-হাসি অথচ করুণ ক'রে বলতেন, 'কার জন্যে আর লক্ষ্মীর সন্ধানে ফিরি বল! ঘরের লক্ষ্মীই চলে গেল আমার।'

জবাব শুনে যে সব বন্ধুর স্ত্রী ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গগতা হ'য়েছিলেন তাঁরা নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন, এবং যাঁদের স্ত্রী এখনো জীবিতা তাঁরা কম্পিত বুকে কোনো এক অছিলায় তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বাসায় চ'লে যেতেন। কিন্তু যাঁদের নিশ্বাস পড়ত কিম্বা যাঁদের বুক কাঁপত, কেউই তাঁদের ধরতে পারতেন না, ক্ষেত্রনাথের কোর্টে যাওয়া বন্ধ করবার কারণ পত্নীবিয়োগ নয়,—মারা যাবার প্রায় দশ বছর আগে থেকেই ক্ষেত্রনাথ পত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে প'ড়েছিলেন,—তাঁর কোর্টে না যাবার কারণ, তারিণীর ওকালতী পাশ করা। অনেক কয়টি সন্তান মারা যাবার পর তাঁর ঐ তারিণী। ছোট-বেলা থেকেই তাই তিনি তাকে একটু বেশী পরিমাণেই ভালবেসেছিলেন।

অথচ ক্ষেত্রনাথের ভোলা সম্ভব ছিল না, তিনি পিতা ; এবং পিতার পক্ষে ছেলেকে বেশী ভালবাসা যদিও অপরাধ নয় তবু তার প্রকাশ্য রূপটা যে বিশেষ ভাবে লজ্জাকর এটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতেন। ফলে সহজ প্রকাশের পথ হারিয়ে তাঁর ভালবাসা বাঁকাচোরা পথে কেবলই অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি করত।...পরীক্ষার আগে তারিণী যখন রাত জেগে পড়ত তখন একবারের বেশী তুইবার তাকে নিষেধ করতে তাঁর বাধত, কিন্তু নিজে তিনি কোনো একটা বই সামনে নিয়ে জেগে শুয়ে থাকতেন যতক্ষণ না তারিণীর ঘরে আলো নেভে ততক্ষণ পর্য্যন্ত। স্ত্রী ঘুমোতে বললে অন্যমনস্কতার ভান ক'রে বলতেন, ঘুম হয় না।...তারিণীর অসুখ করলে পাছে কেউ কিছু মনে ক'রে এই আশঙ্কায় তার ঘরে যাওয়াই বন্ধ ক'রে দিতেন, কোর্টেও যেতেন ঠিক নিয়মিতই, কিন্তু টিফিনের সময় জলস্পর্শ করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, শরীর খারাপ। এবং কোনো শুভানুধ্যায়ী যদি কখনো ছেলের অসুখের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন তখন এমন একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে তিনি সেখান থেকে স'রে যেতেন যাতে স্পষ্টই মনে করা যেতে পারত, তারিণীর অসুখের সম্বন্ধে পর্য্যন্ত তাঁর কোনো ব্যস্ততা নেই, সে তাঁর এত অপ্রিয় !

আর কেবল বাইরের লোকই বা কেন, নিজের স্ত্রী—তারিণীর স্নেহপরায়ণা মৃতবৎসা মা—পর্য্যন্ত তাঁকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন। তারিণীকে তার বাপ দেখতে পারে না, এই নিয়ে কত অশ্রুপাতই না তিনি করেছেন। তবু এমন একটা অসহ্য অপবাদেও ক্ষেত্রনাথের মুখ খুলত না, ব্যবহারের ভো পরিবর্ত্তন হতই না।

কিন্তু একজন লোক ছিল, যে ক্ষেত্রনাথকে খানিকটা বুঝতে পেরেছিল। সে আমাদের উপেন সরকার।

অন্য সকলে পত্নীবিয়োগের অজুহাতে সন্তুষ্ট হ'লেও উপেন বুঝতে পেরেছিল, ক্ষেত্রনাথের কোর্টে না যাবার কারণ স্ত্রীবিরহ নয়, পুত্রবাৎসল্য। ছেলে যে তাঁর আর দশটা জুনিয়ার উকিলের মত সীনিয়ারের পিছুপিছু কলুর বলদের মত পাক খেয়ে বেড়াবে এটা তিনি সহ্য করতে পারেন নি, তাই স্ত্রী মারা যাবার সুযোগ নিয়ে ক্ষেত্রনাথ নিজের পরিপূর্ণ পসারটি ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে স'রে দাঁড়াতে চান,—'কর্ত্তা'র এই

অদ্ভুত এবং হাস্যকর মনোভাবটিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি উপেন সরকার ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল।

সেই থেকে সে 'কত্তা'র কথা উঠলেই 'চুঃ' ক'রে চুমকুড়ি কেটে নিম্নকণ্ঠে বলত, 'বেটা বুড়ো-পাগ্‌লা!'

ক্ষেত্রনাথকে উপেনের অস্বাভাবিক মনে হ'ত, এবং সে ঠিক করেছিল, তিনি পাগল।

পরিচিত আর সকলেও অবশ্য ক্ষেত্রনাথকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলে জানত। কিন্তু সে তিনি পাগল ব'লে নয়, কৃপণ ব'লে। রাধার পদপল্লবে যত্‌খানি তেল ঢাললে তাঁর মন উঠত ব'লে শোনা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী বিনয় এবং বাক্যব্যয় ক'রেও একখণ্ড তাম্রমুদ্রা খসানো যেত না নাকি ক্ষেত্রনাথের কাছ থেকে। পাড়ার ছেলেরা হাঁড়ি ফাটবার ভয়ে তাঁর নাম পর্য্যন্ত করত না।···স্বামীসৌভাগ্যবতী বর্ষিয়সী মহিলারা ছদ্ম রোষের সঙ্গে ভুরু কুঁচকে বলতেন, 'বৌ ম'রে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।' পত্নী এবং অপত্য-সৌভাগ্যজর্জ্জর প্রৌঢ়রা নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিতেন, 'কী ক'রে যে লোকে পয়সা কামায় একবার চোখ মেলে দেখ!'

অভ্যাসমত সেদিন সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রনাথ পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন কেবল, সামনেই রোয়াকের ওপর একটা অর্দ্ধোলঙ্গ কুশ্রী মানুষকে ব'সে থাকতে দেখে তাঁর মেজাজ গরম হ'য়ে গেল। কলকাতায় ভিখারী সংখ্যা হু হু ক'রে বেড়ে চলছে এবিষয়ে তিনি অবশ্য অনেক আগেই স্থির-সিদ্ধান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাই ব'লে তারা যে রাতেও উপদ্রব সুরু ক'রেছে এটা তিনি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। পুরু কাচের চশমার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে, কী চাই?'

লোকটি কথার জবাব দিল না, স'রে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ভাল ক'রে বসল।

ক্ষেত্রনাথ গলির পিচের উপর লাঠি ঠোকা দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে রে, এ্যাঁ ? কথার জবাব দিসনে যে ? নাম কি তোর ?'

লোকটি এবারেও কোন উত্তর দিল না, ক্ষেত্রনাথের চোখের দিকে স্থির-ভাবে চেয়ে রইল।

একটু ভয় হ'ল ক্ষেত্রনাথের,—পাগল নাকি ? তবু সাহসে ভর ক'রে আবার হাঁকলেন তিনি, 'কথা বলিস নে যে ? বেটা বদমায়েস, ওঠ, ওঠ বলছি।'

কিন্তু ও পক্ষের কথা বলবার বা ওঠবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্ষেত্রনাথ নিজেই রোয়াকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাতের লাঠিটা আস্ফালন ক'রে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ লোকটি স'রে এসে তাঁর পায়ের কাছে টিপ ক'রে একটা প্রণাম করতে ছিটকে স'রে গিয়ে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'নেমে যা, নেমে যা বলছি। শালা বদমায়েস, পাগল। নেমে যা এখান থেকে। নইলে পুলিশে দেব তোকে।'—ব'লে দম নিয়ে আরো কী সব বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এতক্ষণ ধস্তাধস্তিতেও যার যাবার তো ভাল, নড়বার পর্য্যন্ত কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ পুলিশের কথা শুনেই বিদ্যুৎচালিতের মত তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে সে নিমেষের মধ্যে ছুটে গলির মোড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ক্ষেত্রনাথ উদ্যত লাঠিটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে সেই দিকে চেয়ে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, 'বেটা পাগল!'

লোকটা এক দৌড়ে গলি পার হ'য়ে সামনের পার্কটির বাইরে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। কালো রোগা শরীর, মাথায় এক বোঝা ধূলিমলিন রুক্ষ চুল চিবুকে কয়েকটা দাড়ি,—চেহারা দেখলে তাকে সত্যই পাগল ব'লে মনে হয়।

এবং সত্যসত্যই সে পাগল।

কী ক'রে, কবে যে সে পাগল হ'য়ে গেল সে কথা তার মনে নেই—

কোনো পাগলেরই হয়ত থাকে না—কিন্তু সে যে পাগল হ'য়ে গিয়েছে (এবং এক সময়ে ভাল ছিল), এ কথাটা তার সব সময়েই মনে থাকে।

মাঝে মাঝে আরও তার মনে পড়ে যে, পাগল হবার আগে এখানে সে ছিল না, কোথায় কোন্ গ্রামে যেন ছিল,—সেখানে তার বউ ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল, ক্ষেতখামার ছিল,—পাগল হবার পর সে-সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে স্থায়ী ভাবে রয়ে গিয়েছে। স্মৃতিরই সূত্র ধ'রে সে আরো আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে, কী ক'রে পাগল হ'য়ে গেল সে, কিন্তু স্থিরভাবে কিছুই ভেবে উঠতে পারে না,—দু'একটা এলোমেলো কথা মনে পড়বার পরই জন কয়েক লাল পাগড়ী বাঁধা লোকের চেহারা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে, আর অমনি দারুণ উত্তেজনায়, ভয়ে দম আট্‌কে আসবার উপক্রম হয় তার।

এমনি এক দিন রাত্রে শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গিয়েছিল, যদিও সে এখন পাগল তবু সেটা তার নাম নয়, তার নাম প্রাণবন্ধু। মনে পড়তেই কথাটা আর সে নিজের ভেতর চেপে রাখতে পারে নি, একই ফুটপাথের প্রতিবেশী ওপাশের অন্ধ ভিখারীর সঙ্গিনী কালীকে সে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলেছিল, 'জানিস রে, এই কালী, জানিস আমারো একটা নাম আছিল।'

সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই উৎপাতে কালীর মেজাজ ভাল থাকবার কথা নয়, তবু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল ক'রেই সে বলল, 'আছিলই তো। নাম আবার কার না থাকে। ঘুমাও এখন।'

'না, তাই কইলাম।'—সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ভিখারীও পাগলের মনে কষ্ট দিতে দুঃখ পায়। কালী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তা নামটো কি, কওছে শুনি?'

'পরাণবন্ধু।'

'চোমৎকার নাম তো তোমার পাগল, এ্যাঁ!....পরাণবন্ধু। চোমৎকার নাম।'—বলতে বলতে কালী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

'ক্যান্, খারাপ হইল কিসে?'—প্রাণবন্ধু চ'টে যায় যেন।

'খারাপ না তো কি। তুমি কি নাগর না কি যে তোমার নাম পরাণবন্ধু হবি?'—ব'লে কালী আরো হাসতে থাকে।

'ধ্যুৎ, ক্যাবল ফাজলামী।' ব'লে পাগল ফস ক'রে নিদ্রিত অন্ধটির মাথার নীচ থেকে ছালার পোঁটলাটি টান দিয়ে নিজের মাথার নীচে চালান দিয়ে পাশ ফিরে গুটি মেরে শুল।

অন্ধটি চীৎকার ক'রে ওঠে, 'দে, এই শালা পাগল, দে আমার বালিশ। এই শালা—!'....

পার্কটির পাশে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রাণবন্ধুর সেই দিনটির কথা মনে প'ড়ে যায়। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের গলিটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে যায় সেই দিকে যেখানে কালী তিনখানা ইঁটে উনুন তৈরী ক'রে মাটীর হাঁড়িতে ভাত রান্না করছিল।

ধোঁয়ায় অন্ধটির চোখ জ্বালা করতো বলে সে একটু দূরে পিঠের নীচে ছালা দিয়ে পার্কের রেলিঙে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। সন্তর্পণে তার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে প্রাণবন্ধু কালীর পাশে গিয়ে বসল।

কালী একবার শুধু তার দিকে চোখ ফিরিয়ে আপন মনে কাজ ক'রে যেতে লাগল।

প্রাণবন্ধুও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর খুক খুক ক'রে একটু কেসে নিয়ে বলল, 'জানিস কালী, একটা কথা শুন্যা আজ আমার বউয়ের কথা মনে পড়্যা গেল।'

'তোমার আবার বউও ছিল না কি?' কুড়িয়ে আনা কাঠের গুঁড়োগুলো ঝাঁট দিয়ে উনুনের ভেতর ঠেলে দিতে দিতে কালী বলল।

'ছিল না?'—প্রাণবন্ধু ভালমানুষের মত সুবিজ্ঞ আশ্চর্য্য হবার ভঙ্গীতে বলল, 'খুব সোন্দর বউ ছিল আমার। তোর থাইক্যাও সোন্দর। তবে একটা দোষ উয়ার ছিল খুবই, ফস কইর্যা চট্যা যাইত। তোর মতন অত ঠাণ্ডা ছিল না।'

কালী উত্তর দিল না। নীরবে ফুটন্ত ভাতের দিকে চেয়ে ব'সে রইল।

'যা কচ্ছিলাম শোন। মনে পড়্যা গেল আজ উয়াগরে কথা। একটা কথা শুন্যা মনে পড়্যা গেল।'

'কী কথা?'

'তা আমি কইবার পারব না কালী। সে কথা শুনলেই পাগল হয়্যা যাই

আমি। তবে, রোস উঠে আয়, দেখাইয়া দিচ্ছি তোক। মোড়ের উপর গেলেই দেখা যাবি।'

কথা আবার দেখা যায় না কি? যদিও জানে কালী, তবু মনে মনে বিস্মিত না হ'য়ে সে পারে না। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সে অন্ধ যাতে টের না পায় এই রকম ভাবে আস্তে আস্তে প্রাণবন্ধুর পিছু পিছু উঠে পড়ল।

'তুই সন অজন্মা গেল আবাদে, বুঝলি কালী। তুই সন বানে সব ভাসাইয়া নিয়্যা গেল। ছাওয়াল নিয়্যা বৌ নিয়্যা সে যে কী হালেই পড়লাম কওয়া যায় না। পরের সনে চৈতালী বুনলাম। তা ভগবানের কিরপায় হইলও ভালই। তিলে আর যবে পেরায় কুড়ি খানেক শস্যি পাইলাম। ভাবলাম, এইবার বোধহয় দুঃখু ঘুচল। বউয়েক একখানা কাপড় পরমন্ত দেব মনে কইরলাম। দুই সন তো ভাল কাপড় একখানও জোটে নাই উয়ার, মনে কইরলাম তাই কাপড়ও একখান উয়ারে দেব। তা, বুঝলি কালী, ভগমানের তা সইল না। জমিদারের গোমস্তা আইসা দোহাই দিয়্যা আমার চোখের উপর দিয়্যা গোলা থাইকা সব শস্যি গাড়ী বোঝাই দিয়্যা নিয়্যা গেল। এমন যে কষ্ট হইল, কালী, আর এমন রাগ—এই দেখ্ গায়ে কাঁটা দিয়্যা উঠিছে আমার,—ঠিক কইরলাম ইয়ার একটা হেস্তনেস্ত না কইরা ছাড়ব না।···উঃ, তুই বড় পিছায়্যা পড়তিছিস কালী, কাছে আয়।···হাঁ, তারপর এই না ঠিক কইরা গেলাম গেরামের আর সকলের কাছে। তাগরেও সকলের আমার মত দুদ্দশা। আমি যাইয়া তাগরে কইলাম, ভাইরে, ভগমান ত যখন চোখ বুজ্যা আছে তখন আমাগরেই ব্যবস্থা করা লাগবি; চল যাই জমিদারের গোলাবাড়ী থাইকা মোট শস্যি আবার আমরা লুট কইরা আনি। তা, তোক কব কি কালী, শালা ভেড়ার পাল সব, আমার কথায় তো কান কেউ দিলই না, পরদিন ভোরে বাইরে বারাইয়া দেখি, বাড়ীর চারদিকে সব সার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখ্যা, বুঝলি কালী—।'

কালী এতক্ষণে নীরবে প্রলাপ শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন কৌতূহল চাপা রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলল, 'কী দেখ্যা? কী দাঁড়াইয়া ছিল তাতো কও না তুমি?'

'তা আমি কইবার পারব না, কালী। সত্যি কচ্ছি পারব না। তুই বচ্ছর রাখিয়াছিল আমাক, আর বাড়ীত ফির্যা যাই নাই। না না, ভুল করলাম, বাড়ীত ফির্যা গিছিলাম, কিন্তক মাস খানেক বোধহয়—। নাঃ,আরো বেশী,··· কি জানি মনে নাই।'—ব'লে হঠাৎ মোড়ের মাথায় থম্‌কে দাঁড়াল প্রাণবন্ধু। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার মধ্যস্থলের একটা মূর্ত্তির দিকে চেয়ে, সেদিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে হাত বাড়িয়ে কালীর বাহুমূলে মুষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাকে একেবারে গায়ের কাছে টেনে নিল প্রাণবন্ধু। কালী অবাক ভাবে তার মুখের দিকে চাইল; সে অপর হাত সামনে প্রসারিত ক'রে ইঙ্গিতে সেই মূর্ত্তিটিকে নির্দ্দেশ ক'রে চাপা গলায় বলল,—'ঐ!'

'কী? কোনডা?'—বুঝতে না পেরে কালী জিজ্ঞাসা করল।

'ঐ যে!'

'পুলিশ?'

'ঈস্!' বলে প্রাণবন্ধু সহসা এক ধাক্কা দিয়ে কালীকে দূরে ঠেলে দিয়ে দিশেহারার মত পড়িমরি ক'রে উল্টো পথ ধ'রে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল।

অন্যমনস্ক মুহূর্ত্তে ধাক্কা খেয়ে কালীর বাঁ হাতের মুঠ থেকে অন্ধকে লুকিয়ে ভিক্ষে ক'রে জোটানো তিনটি পয়সা ও একটি আধলা ঠুন্‌ঠুন্ ক'রে গড়িয়ে ফুটপাথের ওপর পড়ল। তাড়াতাড়ি সেগুলো আগে কুড়িয়ে নিল কালী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণবন্ধুর গন্তব্যপথের দিকে চেয়ে এই প্রথম মনে মনে তাকে পাগল না ব'লে চেপে চেপে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মোড় থেকে অনেকটা দূরে চ'লে আসবার পর প্রাণবন্ধু থমকে দাঁড়াল। ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল তার। এদিকে ওদিকে চেয়ে আহার্য্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হল সে।

ওটা কী ঐ ফুটপাথে ?···ঐ তো তার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার!

'চুপ কর, চুপ কর, দেবনি' খাইবার। একটু চুপ কইরা থাক্!'—নিজের ক্ষুধার্ত্ত পাকস্থলীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল প্রাণবন্ধু। তারপর রাস্তা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেইখানে, যেখানে ষাঁড়ে উল্টেদেওয়া ডাষ্টবিনটি কাৎ হ'য়ে

প'ড়ে ছিল ফুটপাথের পাশে। একটা গন্ধ এসে লাগল তার নাকে—পাগলের স্নায়ু বেশ সক্রিয়ই থাকে,—কিন্তু সেটা দুর্গন্ধ তা বুঝতে পারল না সে; পচা, বিষাক্ত জঞ্জালগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে উজ্জ্বল হীরকের মত চক্‌চকে মহামূল্য ভাতের দানা আবিষ্কার করতে লাগল।

কিছুক্ষণ এইভাবে যাবার পর হঠাৎ যেন মনে হ'ল প্রাণবন্ধুর—সংসারে ক্ষুধার শেষ নেই। সঙ্গে সঙ্গেই মহা বিরক্ত হ'য়ে ধমকে উঠল, 'আর কত চাস? শালা, যতই দেই ততই তোর আহ্লাদ বাড়ে, না? শালা শত্তুর কোথাকার!' ব'লে সে সহসা খাওয়া থামিয়ে দৌড়ে আবার চলে গেল একদিকে।

এইরকম পাগলামী আর কতক্ষণ, কিম্বা কতদিন, অথবা কত বছর করত বলা যায় না, হঠাৎ কালীর কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় নিজের আস্তানায় ফেরবার ইচ্ছা হল প্রাণবন্ধুর।...

কালী ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাস্তায় লোকজনও কম চলছে। অনেক রাত হ'য়েছে নিশ্চয়ই! প্রাণবন্ধু গুণগুণ ক'রে গান ধরল, 'দুপুর রাতে আইস্লো ঘুমের ম—তন গো—ও—ও...।'

শুয়ে শুয়ে গান গাইতে গাইতে চোখে জল এসে গেল প্রাণবন্ধুর। হাসবার চেষ্টা ক'রে সে নোংরা খস্‌খসে হাত দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

কতদিন পর এই প্রথম তার চোখে জল এলো!

কতদিন পর? হঠাৎ গান থামিয়ে প্রাণবন্ধু ভাবতে লাগল,—কতদিন পর? কবে সে শেষবারের মত চোখের জল ফেলেছিল? কবে?

দুই বছরের নিদারুণ কারাভোগের পর যে দিন সে বাড়ীতে গিয়েছিল প্রথম, সেইদিন। কিন্তু কেন, সেদিন তার চোখে জল এসেছিল কেন? আনন্দে?—দুই বছরের কারাভোগ ও অদর্শনের পর স্ত্রীপুত্রের মাঝখানে দাঁড়াতে পেরেছিল এই উল্লাসের উত্তেজনায়? না। প্রাণবন্ধু অতখানি সৌভাগ্যবান নয়,—বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীপুত্রকে সে আর দেখতে পায় নি। ছেলেটা মারা গিয়েছিল কলেরায়, মেয়েটা মারা গিয়েছিল ম্যালেরিয়ায়; আর, বউটা? বউটা মারা গিয়েছিল কিসে?—শোকে? গলায় দড়ি দিয়ে? না গো না, মেয়েমানুষ অত সকালে মাথা হারায় না। গলায় দড়ি দিয়েও মরে নি, শোকেও মরে নি

সে,—কোনো রকমেই সে মরে নি ; মরেই নি ! না ম'রে বেশ পেটের ভাতের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। আর সেই খবরটা শুনেই চোখ দিয়ে তার সেই শেষবারের মত— !

হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে প্রাণবন্ধু ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল কালীকে, —'এই কালী শোন্, এই পাজি হারামজাদী কালী—।'

মোড় থেকে ফিরে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে তিনটে কুকুর আর অন্ধকে কাণা-মাছি খেলতে দেখে সেই যে কালী প্রাণবন্ধুর ওপর চ'টেছিল ঘুমের মধ্যেও তার তাপ কমে নি। এবং ভাতগুলো নষ্ট হওয়ায় নিজের কষ্টের সঞ্চয় সেই তিন পয়সা ও আধলার গোটা ছুটো পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনতে হ'য়েছিল, এটা আবার সেই রাগের মধ্যে বেদনার দাগ কেটে দিয়েছিল। সে ঝাঁকি দিয়ে প্রাণবন্ধুর হাত সরিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী ? কী কইবার চাও ?'

প্রাণবন্ধু একটু দমে গেল, তবু মনের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সে উত্তর দিল, 'বউ আমার বাইর হইয়া গিছে রে, বেশ্যা হইয়া গিছে।'

'তোমার মতন স্বোয়ামী যার, তার ঐ হওয়াই ঠিক।'

'আমি তো আগে এ্যামন ছিলাম না কালী, ও' বাইর হইয়া গেল জন্যিই আমার এ্যামন হইল।'

'হ'ছে তো হ'ছে। তাই কী, হবি কী ?'

'না, তাই কইলাম।'—প্রাণবন্ধু আবার ফিরে যেয়ে শোয়।

পাগলকে তাড়িয়ে ক্ষেত্রনাথ ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতর চ'লে এলেন। তারিণীর ঘরে আলো জ্বলছিল, সেদিকে চেয়ে পাছে তার সঙ্গে আবার চোখা-চোখি হ'য়ে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি।

লাঠিটি এক কোণে নামিয়ে রেখে পাঞ্জাবী খুলছেন তিনি, এই সময় তের বছর বয়স্ক নাতি নিধু এসে পেছন থেকে আব্দার ক'রে বলল, 'একটা পয়সা আজ চাই কিন্তু দাছ।'

'কী ?'—ক্ষেত্রনাথ পাঞ্জাবীটার ঝুল ধ'রে ছু'হাত ওপরে তুলেছেন কেবল, তাড়াতাড়ি চোখের ওপর থেকে পাঞ্জাবীর আবরণ সরিয়ে—অর্থাৎ সেটা খোলা

বন্ধ রেখে—তিনি চশমার ভেতর দিয়ে নিধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'কী চাই আজ ?'

'একটা পয়সা।'

'কেন ?'

পয়সা চাইলে দাদু যে তার সন্তুষ্ট হন না, এটা অবশ্য নিধু জানত। কিন্তু এরকম মারমুখো হ'য়ে উঠতে সে কখনো তাঁকে দেখে নি। ঢোক গিলে সে বলল, 'একটা ঘু—ঘুড়ি কিনব।'

'ঘুড়ি কেনবার জন্য পয়সার সৃষ্টি হয় নি। পাবে না'—বলে ক্ষেত্রনাথ টান দিয়ে এবার পাঞ্জাবীটা খুলে ফেললেন।—'বুঝলি, ঘুড়ি কেনবার জন্য লোকে পয়সা রোজগার করে না। পয়সা গাছের ফল নয়। যা, পড় গে।'

নিধু নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছিল, ক্ষেত্রনাথ আবার তাকে ডেকে ফেরালেন, 'শোন্, দাঁড়া। খবর্দ্দার আর কারো কাছে পয়সা চাবি নে। পয়সা ভিক্ষুকেরা চায়। তুই কি ভিখারী ?'

এত বকুনি খাবার পর অন্তত পয়সাটা আজ মিলবে এই রকম আশা করেছিল নিধু। কিন্তু হায়, কোথায় পয়সা! দাদুর বক্তৃতা তখনো চলতেই থাকে,—'তোকে না হয় একটা পয়সা দিলামই। কিন্তু ফলে দাঁড়াবে কি জানিস, আরও একটা পয়সা খরচ হবে। মানে, তোকে পয়সা দিলে একটা ভিখারীকেও আবার দিতে হবে। কেননা, তোর চেয়ে তার পয়সার দরকার অনেক বেশী। তুই যদি পয়সা পাস তবে তারও পাবার অধিকার আছে। বুঝলি, তোকে আমি পয়সাটা দিতে পারতাম, যদি সেই পাগলাটাকে তখন দিয়ে দিতাম একটা পয়সা, সেইজন্যে তোকে আমি কিছুইতেই—।'

'বাবা।'—সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্টাঙ্গ তারিণী চটি ফট্-ফট্ করতে করতে একটা জটিল মোকর্দ্দমার ফাইল বগলে ক'রে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'ও, সেই মোকর্দ্দমাটা? বস, বস, দেখছি।...আর, এই নে নিধে, বেশী নেই ভাই, নে'—ব'লে ফতুয়ার বুক পকেট থেকে একটা ন্যাকড়ার পুটলি বের ক'রে তিনি তার ভেতর থেকে একটি টাকা তার হাতে দিলেন,—'যা।...হ্যাঁ কি বলছিলে তুমি? সেই কেস্‌টা? হুঁ।'...তারিণীর চোখকে এড়িয়ে ক্ষেত্রনাথ মহা ব্যস্তভাবে কাগজ পত্র নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করলেন।

সে দিন রাত্রে ক্ষেত্রনাথের ঘুম এল না কিছুতেই। জেগে জেগে তিনি বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। জীবনে বোধহয় এই প্রথম তিনি একটা গোটা টাকা অযথা ব্যয় করলেন, নিধুকে ঘুড়ি কিনতে দিয়ে। কিন্তু কী করবেন ক্ষেত্রনাথ, না দিয়ে উপায় ছিল না, এমন ভাবে তারিণী ঘরে ঢুকে পড়ল —!

অবশ্য ক্ষেত্রনাথের ঘুম না হবার কারণ সবটাই ঐ টাকার শোক নয়। টাকার শোক তাঁর যথেষ্টই হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী হয়েছিল, টাকা না দেবার অশান্তি। নিধুকে একটা টাকা দিলে আর একটা টাকা ভিখিরী-দেরও প্রাপ্য হয় নিশ্চয়ই। সেই টাকাটা দিতে পারছেন না বলেই ঘুম হচ্ছিল না ক্ষেত্রনাথের।

অথচ এই বৃদ্ধবয়সে এই রকম ভাবে রাত জাগাও খুবই অনুচিত, প্রায় আত্মহত্যার সামিল।

আরো কিছুক্ষণ ছট্-ফট ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন ক্ষেত্রনাথ। কিন্তু যখন বুঝলেন ঘুম তাঁর এখন কিছুতেই আসবে না, তখন কী মনে ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। তারপর ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে, চশমা চোখে দিয়ে নগ্নপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ভেবেছিলেন যে কোনো একটা ভিখিরীকে ধ'রে একটি টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন তিনি, কিন্তু গলি বেয়ে পার্কের কোণটিতে এসে ক্ষেত্রনাথ সন্ধ্যায় তাড়িয়ে দেওয়া সেই পাগলটিকে দেখতে পেয়ে মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন।

কালীর ঝাঁঝালো উক্তি শোনবার পর অনেকক্ষণ জেগে থেকে সবে বোধ-হয় প্রাণবন্ধু একটু ঘুমোবার উপক্রম ক'রেছে, হঠাৎ গায়ে নাড়া পেয়ে চোখ মেলে চাইল সে।

'ভয় নেই রে, ভয় নেই। একটা জিনিষ দিতে এলাম তোকে। এই —এই নে।' ফতুয়ার পকেট থেকে একটি চক্চকে টাকা বের ক'রে ক্ষেত্রনাথ তার হাতে গুঁজে দিলেন।

প্রাণবন্ধু টাকাটি হাতে নিয়ে দাতার চোখের দিকে নীরবে চেয়ে রইল। দেখে মনে হল যেন কৃতজ্ঞতায় কথা বলতে পারছে না।

ক্ষেত্রনাথ ধীরে ধীরে উঠলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গলি দিয়ে বাসার পথ ধরলেন।

কিছুটা পথ মাত্র এসেছেন, হঠাৎ পাশে 'ঠুং' ক'রে একটা আওয়াজ হ'তে ক্ষেত্রনাথ চেয়ে দেখলেন, কী যেন একটা চক্‌চকে জিনিষ গড়িয়ে গিয়ে পড়ল। ঝুঁকে পড়ে সেটি তুলে নিয়ে চশমার সামনে ধ'রে দেখতে পেলেন তিনি, একটি টাকা; এইমাত্র যেটি পাগলকে দিয়ে এসেছেন তিনি সেইটিই।...পেছনে চেয়ে দেখলেন, গলির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাণবন্ধু, —পাগল। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তার আকৃতিকে যেন মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত মনে হ'ল ক্ষেত্রনাথের। ফেরবার জন্য পা বাড়িয়ে তিনি মনে মনে বললেন শুধু,—'বেটা পা—গল!'

সদর দরজা বন্ধ করবার সময় খুট্ ক'রে একটা আওয়াজ হল। ক্ষেত্রনাথ চকিতে চারদিক চেয়ে দ্রুতপদে ভেতরে গিয়ে নিজের ঘরের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ালেন্। উত্তেজনায় তাঁর বুক যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হচ্ছিল।...

বৈঠকখানার কাঠের পার্টিশানের আড়ালে ছোট খোপটিতে উপেন সরকার পাশ ফিরে ভাল ক'রে শু'ল। চাকরটি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ, মেঝে থেকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'কে সরকার বাবু, এ্যাঁ? কে?'

'বেটা বুড়োপাগলা, আর আবার কে!'—ব'লে উপেন অভ্যাস মত 'চুঃ' ক'রে একটা চুমকুড়ি কাটল।

মণীন্দ্র রায়

ওডিসিউস

অপরাহ্ণে পত্রগুচ্ছ মর্মরে কেবল।
অথবা আমার স্বপ্ন? শুনি কণ্ঠের কল্লোল
শিঞ্জির মূর্চ্ছনা, নৃত্যরতা বনদেবীদের।
অধোমুখ আকাশের
কবোষ্ণ কাঞ্চন-প্রভা নীলারুণ স্রোতে
সোনায় সোহাগা যেন। বাঁচি কোনমতে
এ হেন যাত্রায়। ক্ষুরধার বালি
দিয়েছে আশ্রয় তবু। বিপুল আস্ফালি
তরঙ্গ-নিচয় মোরে করেছে নিক্ষেপ
দূর হতে দূরে; বুঝি শেষ অবলেপ
আনগ্ন শরীরে দেখে লবনাক্ত বালুকা বেলায়।
আহা, সেই সমুদ্র-যাত্রায়
ধরেছি কেবল
সযত্নে গলুই; তরঙ্গের দল
সান্তর বিভঙ্গে অবিরাম করেছে গর্জন।
এসেছি যখন
সর্বনাশা মুখোমুখি পাহাড়ের কাছে,
থমকে আমার তরী—ভাবি বুঝি আর না সে বাঁচে।
হিমতু কঠিন!
অঙ্গে যেন হয় অঙ্গহীন।
শোনেনি এ আর্তের ক্রন্দন
আতপ্ত চুল্লীর পাশে পৃথ্বীর নন্দন।
চিত্তের গুমোটে শুনি কভু ঝাঁকে ঝাঁকে
সাগর-বলাকা খালি ডাকে।
তারি ডাক একমাত্র হাসিই আমার।

দেখি বসে পার হয়ে তরঙ্গ-প্রাকার
স্নানের আনন্দে তারা দলে দলে মেলে শতপাখা
সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে যায় পরস্পর বাঁধে যেথা শাখা
অপ্রমেয় বৃষ্টি ও তুষার।

অসহ্য ঠেকে না আর
দৈবের লিখন।
তাছাড়া এবারে বুঝি হয়েছে প্রাক্তন
সমুদ্রের ক্রোধ যত।
তবু কত
এসেছে সংশয়।
পরম বিস্ময়
এই কণ্ঠস্বর।
জানি না এ দৈব কিংবা নর।
পদধ্বনি করে হতবাক—
মনে হয় সাটিরের আশ্চর্য্য ডুলাক।
অদূরে নদীর তীরে
কৃশকায় বেণুবন ঘিরে
অপরাহ্ণে মুহুর্মুহু বংশী অনুনাদে
পলাতক বনদেবী বিড়ম্বিত প্যানের প্রমাদে।
—বৃক্ষের আড়ালে তবে নিজেরে লুকাই।
বনের লতাই
আনগ্ন শরীর ঢাকে।
লতাগুল্ম ফাঁকে
দেখেছি নিশ্চয়—
ফেনিল রূপশ্রী ঝরে সারা অঙ্গময়
কন্দুক-ক্রীড়ায়।

বৃত্তাকারে পদক্ষেপ পায়
নৃত্যের ভঙ্গিমা।
অরুণিমা
কুমারী-যূথের ভালে কপোলে অধীর।
এলায়িত কেশ কবরীর
হীরক ছটায়
গতীয় আবেগে কভু কাছে এসে দূরেতে পালায়।
সবুজ প্রান্তর দেখ অপরাহ্নে সোনায় উচ্ছল।
তরল বহ্নিরে ধরে কৃষ্ণচূড়া, কিংশুকের দল।
তাদেরি উত্তাপে যেন পর্বতের সানুদেশে ফাটে
আতাম্র ডালিম। রাগরক্ত ঠাটে
যেমন মৌমাছি আসে তৃষ্ণায় কাতর
কভু রক্তে সেইমত ঘটে রূপান্তর
ক্ষণিক আশ্লেষে—
স্বপ্ন, মতিভ্রম শেষে।

বারে বারে ঠেকে গিয়ে এসেছে নির্ভয়,
একনিষ্ঠ স্বধর্মে প্রত্যয়।
যাই নি তলিয়ে
এমন কি নরকেও গিয়ে।
শোণিত উৎসর্গে সেথা নিরুপাধি প্রেতচ্ছবি ঘিরে
খুঁজেছি কেবলি মোর পথ-সন্ধানীরে।
(এমনি গৃহের টান প্রবাসীর কাছে।)
জানি এ জঙ্গম স্থল মুহূর্তেই রঙ্গিলা কি ছাঁচে
তারপর সকলি মিলায়
নিরাকার অন্ধকারে আশ্রয় সহায়।
লুকাতে পারি না তাই আর,
আশা দুর্নিবার।

কুমারীর দলে ভিড়ি অধোমুখে বিষম লজ্জায়।
সভয় চীৎকারে তারা অমনি পালায়
নিষাদের শিলীমুখে মৃগেরা যেমন।
সহসা তখন
নিরাশ্রয় চোখে ভাসে করুণা অপার
শুভ্রবাহু নোসিকা আমার।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপনযুগ

সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে।

প্রস্তর-যুগ থেকে তার সুরু, তারপর লৌহ-যুগ পেরিয়ে অনেক টাল-বেটালের ভেতর দিয়ে এল যন্ত্র-যুগ। এখন পিষ্টনের গুঁতোর ঠেলায় আর হুইলের দাঁতের টানে প'ড়ে প'ড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে—তাই এখনও এটাকে বলি যন্ত্র-যুগ। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতে যন্ত্র-যুগ পেরিয়ে আমরা যে আর একটা যুগে এসে পড়েছি, সেটা জানা দরকার—এটা যন্ত্র-যুগ নয়, এটা হলো বিজ্ঞাপনী-যুগ। আধুনিক সভ্যতাটাকে বিজ্ঞাপন একেবারে উদরস্থ ক'রে ব'সে আছে। আমরা বলি বটে মেশিন মানুষকে চালাচ্ছে, কিন্তু সেটা ভুল, মেশিন ও মানুষ দুটোকেই আজ চালাচ্ছে বিজ্ঞাপন। শুধু চালাচ্ছে নয়, অমানুষিক অত্যাচার ক'রে চালাচ্ছে। অত্যাচারটা এমনিতে টের পাইনে শুধু ওটা চোখের উপর দিয়ে চলছে ব'লে। চোখ ছেড়ে কানের ঘাড়ে চাপলে বুঝা যেতো ব্যাপার-খানা কি!

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো। উত্তর কলকাতার একটা রেষ্টুরান্ট-এ ব'সে একদিন চা খাচ্ছিলাম। পেছনের টেবিলে যে চারিটি লোক ব'সে আছে প্রথমটা খেয়ালই করি নি, হঠাৎ টেবিল চাপড়ানোর শব্দ পেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি অদ্ভুত ভঙ্গীতে দুরন্তভাবে তারা হাত নাড়ানাড়ি করছে। হাত নাড়া থেকে আঁচ করা গেল 'ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব' স্কুলের ছাত্র। যতখানি উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছিল, মূক না হয়ে মুখর হলে রাস্তায় ভীড় জমে যাবার কথা। তেমনি ভাবুন একবার, রাস্তার দু' পাশের সাইনবোর্ডগুলো যদি টকিংবোর্ড হতো তবে ব্যাপারটা কি দাঁড়াতো! এ তুলনায় রেডিওকে বলা যেতে পারে বিরল এবং কোলাহলটা তার কোরাস, তবু বিভীষিকাটা আঁচ করবার এক টুকরো নমুনা হিসেবে নেহাৎ মন্দ নয়। মানুষ যদি লিখতে না পারতো তা হলে আর রক্ষে ছিল না। একবার ভাবুন তো, দু'পাশের টকিং-বোর্ডগুলো ছোট-বড় সাইনবোর্ডের মতো ছোট-বড় গলায় প্রাণপণে নিজেদের নাম ও জিনিষ হাঁকছে, বিড়ির বিজ্ঞাপন চলছে হারমনিয়ম বাজিয়ে গজল সুরে,

মনিহারী ঠুংরীতে, দামি দামি সব গম্ভীর জিনিষ ধ্রুপদে—তার সঙ্গে হ্যাণ্ডবিলের কিচিরমিচির। শুধুই কি তাই, কানের ব্যাপার হলে হট্টগোলে শোনা যাবার মতো আরও কত যে অভিনব আওয়াজ আর ঢং আবিষ্কার হতো তার অন্ত নেই। বিজ্ঞাপন-দাতারা চিত্রকর ছেড়ে গায়কদের নিয়ে পড়তেন—সাহিত্যিক-দের চাহিদাটা অবিশ্যি থাকতো এখনকার মতোই। ভালো ভালো বিজ্ঞাপনের অবলম্বন হতো উঁচু দরের বক্তা, অভিনেতা, গায়ক, এ-সব ধরণের লোক যাদের বহুলোকের কানের সামনে দাঁড়াতে হয়। জবাহরলাল হয়তো বক্তৃতা দেবার আগে বা পিছে ব'লে নিতেন, 'গডরেজকা সাবুন আওর আয়রণ সেফ বহুৎই আচ্ছা হ্যায়'—অনভ্যস্ত ব'লে কথাটা শুনতে ইয়ার্কির মতো শোনায়, কিন্তু পরিচয়, প্রবাসীর সুরু বা শেষের বক্তব্যগুলো বেশ সহজ ভাবেই তো মেনে নিই।

যাক, যা হয়নি আর হবেও না তা নিয়ে ভেবে মরতে আমি বলছি নে, আমি শুধু বলতে চাই যে অক্ষরের আবিষ্কার এ শারীরিক অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু মনের উপর অপরিসীম অত্যাচার করবার পথটা বিজ্ঞাপনের সামনে খুলে ধরেছে সে-ই। ইংরেজের ভারত জয়ের চাইতে বেশী কৌশলে ও বেশী নীরবে এই অক্ষরের মারফৎ বিজ্ঞাপন সহুরে সভ্যতাকে জয় ক'রে বসেছে। শাসন করার পলিসিতেও ইংরেজের সঙ্গে বেশ একটা মিল আছে। ইংরেজ যেমন বলে, তোমরা যে-যার ধর্ম্মকর্ম্ম করো, আমার কিছু আপত্তি নেই; আমি শুধু ব্যবসা করবো আর তোমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবো—তোমাদেরই ভালোর জন্যে। তেমনি মাসিকপত্রটি খুললেন, অমনি বিজ্ঞাপন বলে উঠলো, আপনি পড়বেন পড়ুন, পড়ুন, আমার বক্তব্য আমি পরে বলবো; আমাদের কাজ হলো ব্যবসা আর অবসর মতো খবরাখবর দিয়ে আপনাদের চোখ দুটো খুলে দেওয়া। শব্দের মতো অত্যাচারী হলে এত দিনে একটা বিপ্লব এসে যেতো, কিন্তু এই অমায়িক ভাবটির জোরে আমাদের মন ও মাথাটি দিব্য সে জুড়ে ব'সে আছে।

আপনি হয়তো মাথার একটা তেল কিনবেন মনে ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে-ছেন, পাশের দেয়ালের গা থেকে একরাশ চুলওলা এক সুন্দরী ব'লে উঠলো, আপনি বুঝি তেল কিনবেন? তেলের পয়সা জলে ফেলবেন না, আপনার

স্ত্রীকে আমাদের বিশুদ্ধ নারকেল—শেষ করতে না দিয়েই এগিয়ে গেলেন। কিছু দূর না যেতেই আবার শুনলেন, খারাপ তেল মেখে চুলগুলো আপনার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আপনার ক্যাষ্টর অয়েল মাখা দরকার। বাস-এ চেপে বসেছেন, পাশের লেডিজ সিটে হয়তো একটি সুন্দরী মহিলা, তারই সামনে এক কোণ থেকে একটা টিনের টুকরো অসভ্যের মতো জিজ্ঞেস করতে থাকবে, আপনার পাঁচড়া হয়েছে বুঝি? আর এক দিক থেকে হয়তো বলবে বাজে ঘি খেয়ে আপনার শরীর দিন-কে-দিন ভেঙ্গে পড়ছে, বা, সান লাইট সোপ ব্যবহারে আপনার পরিবারের লুপ্ত শান্তি ফিরে আসবে। চার দিক থেকে বিশ্বটা আপনার ভাবনা ভেবেই অস্থির। রোদে ঘুরে ঘরে ঢুকতেই টেবিলের উপরকার দৈনিক কাগজ থেকে দাঁত-বার করা লোকটা জিজ্ঞেস ক'রে বসবে, আপনি কি আজ দাঁত মেজেছেন? এ ছাড়া অসুখ বিসুখ নিয়ে গোপন কথা আর নিজের বৌদের সুখে রাখবার চেষ্টায় পরের বৌ-এর ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তাকুল বীমা কোম্পানীগুলোর অমূল্য উপদেশ তো আছেই। মোট কথা আপনার জীবনযাত্রার 'অধিকারী' বা পরিচালক হলো বিজ্ঞাপন; লক্ষ-কোটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তার হাত এড়িয়ে ভাববার বা করবার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার নিজের চিন্তা ব'লে কিছু সে থাকতে দেবে না, যেদিকে তাকাবেন সে-দিক থেকেই মনের মধ্যে একটা কিছু সে ছুঁড়ে দেবেই। আমাদের সহুরে মনগুলো তাই হয়ে পড়েছে আস্ত-ভাঙা টুকরো টাকরা সব বিজ্ঞাপনের গুদোম ঘর। বিজ্ঞাপনের ভাবনা ছেড়ে নিজের ভাবনা ভাববার একমাত্র পথ উর্দ্ধমুখী হওয়া—আকাশ চোখে না পড়ুক, বিজ্ঞাপন চোখে পড়বে না। বিশেষ ক'রে কলকাতায়, কাউকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলে আমি সন্তুষ্ট হই শুধু এই ভেবে যে লোকটা নিজের ভাবনা ভাবছে। কাৎ হলেন বা উঠে বসলেন তো আর রক্ষে নেই, অমনি ক্যালেণ্ডার বা এখান-ওখানকার কাগজপত্র থেকে ব'লে উঠবে—একটা কথা স্যার! এত যে স'য়ে গেছে তবু একটা ব্যাপার আমার সহ্য হয় না। ধরুন রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা,' যেটা আপনি হয়তো সব সময় নাড়াচাড়া করেন, তার মলাটের মলাট হিসেবে চেপে বসলো একখণ্ড পুরনো পত্রিকা, ঠিক তার উপরেই একটা বিজ্ঞাপন—কেমন ফাঁকিবাজ দেখুন, একদিনের টিকিট কেটে বিনি মাসুলে হাতের পর

হাত ঘুরে বেড়াবে, আর দিনের ভেতর একশোবার চোখের সামনে ব'সে ঐ অমায়িক সুরে বলবে, একটা কথা স্যার !

বিজ্ঞাপন যদিও বা পুরুষদের খানিকটা সমীহ ক'রে চলে, মেয়েদের ফাঁকা মনের ময়দানে রুচি-বুদ্ধির উপর তারা জটলা বেঁধে মহানন্দে নৃত্য ক'রে বেড়ায়। মাসিকপত্রখানা তুলতেই স্নো, শাড়ী বা সাবান হয়তো চোখ টিপলো, গতি মন্থর হলো, তার পরেই শুনলো, গল্প তো আছেই, কাজের কথা শুনুন, এই দেখুন খাসা নতুন ডিজাইনের ঝাপটা আর পেনডেন্ট—ধরুন না কর্ত্তাকে। (মেয়েরা অবিশ্যি একটা বিজ্ঞাপন সইতে পারেন না, সে হলো লোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন—যারা গয়না বাঁধা রেখে অল্প সুদে টাকা ধার দিতে চায়।)

বিজ্ঞাপনের উপর বিতৃষ্ণা দূরের কথা, ওগুলোকে যে লোকে বেশ যত্ন নিয়েই পড়ে সেটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ দেখলেই বুঝা যায়। মাসিক-পত্রে ওগুলোকে দেওয়া হয় এক সঙ্গে, সেগুলো পাঠক একেবারে চোখ বুজে উল্‌টে যাবে না জেনেই পয়সা খরচা ক'রে বিজ্ঞাপনমণ্ডলী সেখানে এসে জমায়েত হয়।

এ-যুগের রাজা যে বিজ্ঞাপন সে তার রাজোচিত হালচালেও ধরা পড়ে—আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হলো সে। (একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাজারাজড়ার চেয়ে একটা বড়ো গুণও তার আছে। রাজা-জমিদারের স্নেহের অত্যাচারে সাহিত্য মাঝে মাঝে ক্লিষ্ট হয়ে পড়তো ; তাদের ফরমায়েস মানতে গিয়ে সাহিত্যিককে অনেক মূর্খতার প্রশ্রয় দিতে হতো। বিজ্ঞাপন বুকে পিঠে জাপটে নিয়ে বেড়ায় কিন্তু ভেতরের ব্যাপারে হাত চালাতে আসে না)। বিজ্ঞাপনের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ না নিয়ে বাজারে নামলে সাময়িক পত্রিকার অকালমৃত্যু অনিবার্য্য। বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষমতা থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায়, কেড়ে নেবার ক্ষমতা থাকলে বহু লোককে ভয় দেখানো যায়। কাগজে যার বাঁধা বিজ্ঞাপন লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা। সব চেয়ে বড় কথা হলো বিজ্ঞাপন আজ সহুরে-সভ্যতার মনের মালিক। জান্‌তে বা অজান্‌তে তারই উপদেশে আমরা কিনিকাটি, খাইদাই, দেশ ভ্রমণে বা'র হই। তাই এটাকে যন্ত্র-যুগ না ব'লে বলা উচিত বিজ্ঞাপনী-যুগ। এ-যুগের প্রতীক

হচ্ছেন পঞ্জিকা—যাঁর হাড় ক'খানা বাদ দিয়ে বিপুল বপুর সবটাই বিজ্ঞাপন। পৃথিবীর সব বিজ্ঞাপন হঠাৎ যদি আজ থেমে যায় তবে আজকের সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের 'বাণী'র মতোই বিজ্ঞাপনহীন অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠবে—"হারিয়ে গেছি আমি।"

জ্যোতির্ম্ময় রায়

ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব

ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলার নেতৃত্বের স্থান নেই। একথা বল্‌লেও চল্‌ত যে, ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলার স্থান নেই। কিন্তু কথাটা সর্বসম্মত হ'ত না। কেননা, আজও যাঁরা নেতৃত্বের গৌরব করেন তাঁরা অহরহ এই নালিশই করেন যে, বাংলার নেতৃত্বকে বঞ্চিত ক'র্‌তে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চ'ল্‌ছে। আর যাঁরা তেহিনো দিবসাঃ গতাঃ ব'লে হাঁফিয়ে উঠ্‌ছেন, তাঁদেরও এবিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু সরাসরি যদি বলা যায় ভারতীয় রাজনীতিতেই বাংলার স্থান নেই, তবে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হ'বেন, সত্যমূর্ত্তির এই কঠোর কথনে মারমূর্ত্তি হ'য়ে উঠ্‌বেন। গোখ্‌লেজীর সেই বহুত কপ্‌চানো হোয়াট্‌ বেঙ্গল থিঙ্কস···ইত্যাদি মন্ত্র আউড়ে আমরা অতীতে চ'লে যাই। মনে পড়ে ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট হ'য়েছিলেন এই বাংলাদেশেরই ডব্‌লিউ সি বনার্জ্জি। সেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। সার হেনরী জন কটন লিখে-ছিলেন ঃ The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawar to Chittagong। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি সম্পর্কে তিনি আরও বলেছিলেন, At the present moment the name of Surendranath Banerjee excites as much enthusiasm among the rising generation of Multan as in Dacca। এধরণের বহু সার্টিফিকেট ছাড়াও আমরা মাউণ্ট এভারেষ্ট আবিষ্কর্ত্তা রাধানাথ সিকদার থেকে সুরু ক'রে, তরু-অরু দত্ত প্রভৃতির নামাবলী নিয়ে ভারতের একমাত্র লর্ড সিংহের নাম উপসংহার টানি। কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, এই দীর্ঘ ফিরিস্তি যে কোন দেশের গৌরব। হিংসুটে মেকলে তাই তৃপ্তির সঙ্গে বাঙ্গালীকে গালাগাল দিয়ে গেছেন। হিংসে হবে না? ওদেরকে যে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত ঢের বেশী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিভার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ওদেশের যত ওঁছা লোক এদেশে নীলকর চাকর সেজে অতিরিক্ত 'কর্ত্তামি' ক'রতে গেছে তারা এদের কাছে ঘা খেয়ে তবে না টিট হ'য়েছে? বিদ্যাসাগরের ঠন্‌ঠনে

চটি বেচে থাক্, বাঙ্গালীকে আজ যত অপদস্থ হ'তে হয় সেকালেও ততটা হয় নি। সবাই রুখে দাঁড়িয়েছে।

খৃষ্টান মিশনরীদের আক্রমণে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হ'ল। তারপর বাংলা সাহিত্যের যে নবরূপ দেখা দিল তাতে এল "বন্দে মাতরম্"-এর যাদুস্পর্শ। আজ এর যত ছাঁটাই চলুক এককালে এর অর্থটা ছিল আলাদা। অনৈতিহাসিকেরা একথা ভুলে যান।

ইতিহাসের কথা যখন উঠ্‌লই তখন "নেতৃত্ব-হারা" বাংলার পরিস্থিতিটা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখে যাই। তাতে অন্ততঃ স্বদেশী আন্দোলনের পারম্পর্য্যটা বোঝা যাবে।

'এই বাংলায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর'—মিথ্যে নয়। কেননা, বাংলাই ছিল ভারতীয় সামন্ত তন্ত্রের weak link বা দুর্ব্বল গ্রন্থি। এখানে স্বদেশী শেঠেরা খুঁজছিল তাদের মনের মত রাষ্ট্রশাসন, যে শাসনে তাদের বণিক লোলুপতা কোথাও ব্যাহত হবে না। অর্থাৎ তাদের স্বরাজ। যথেষ্ট সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধতা জ্ঞানসম্পন্ন না হ'তেই এসে পড়্‌ল বিজিত ইংরেজ বুর্জোয়াদের অপভ্রংশ,—এই দুইয়ে মিলিয়ে হ'ল এক জগা খিচুড়ী। তাই এখানে ভারতের দিবাকর ডুব্‌ল বটে কিন্তু এই খিচুড়ীর প্রসাদে পরিবর্ত্তনটা অবৈপ্লবিক থেকে গেল। বুর্জোয়া বিপ্লবের উপসংহার হ'ল না।

কার্ল মার্কস্ এসম্বন্ধে ব'লেছেন,

'Now, the British in East India accepted from their predecessors the department of finance and war, but they have neglected entirely that of Public Works. Hence the deterioration of an agriculture which is not capable of being conducted on the British principle of free competition, of Laissez-faire and Laissez-aller."

তিনি আরও ব'লেছেন,

"There cannot, however, remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindostan is of an essentially different and more intensive kind than all Hindostan had to suffer before......

"......England has broken down the whole frame work of

Indian society, without any symptoms of reconstruction yet appearing.

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেও এ কথা সত্য ছিল, আজও এ কথা সত্য আছে। আজও ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথ উদাত্তস্বরে এ অভিযোগ করেছেন ঃ

Assuming, however, that English language is the only channel left to us for "enlightenment" all that 'drinking deeply at its wells' has come to is that in 1931, even after a couple of centuries of British administration, only about one per cent of the population was found to be literate in English,—while in the U. S. S. R. in 1932, after only fifteen years of Soviet administration, 98 per cent of the children were educated.

And what have the British who have held tight the purse strings of our nation for more than two centuries and exploited its resources, done for our poor people ? I look around and see famished bodies crying for bread.

...While prentending to be trustees of our welfare they have betrayed the great trust and have sacrificed the happiness of millions in India to bloat the pockets of a few capitalists at home.

আগাগোড়া এমন পরিস্থিতির মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতবাসীর জন্ম হ'য়েছে এবং এ কথা আজ সুবিদিত যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা দেবার যে গর্ব ইংরেজেরা ক'রে থাকেন তাকে না দেবার নানা ছলা কলাও যথেষ্ট দেখা গিয়েছিল ; এজন্যই রবীন্দ্রনাথের কথা অস্বীকার করবার কারও পথ নেই যে ইংরেজীভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছি সত্য কিন্তু Those of our countrymen who have profited by it have done so despite the official British attempts to ill-educate us.

এ ব্যাপারেও বাংলার নেতৃত্ব রয়েছে এবং তার প্রধান ও প্রথম নেতা হ'চ্ছেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা অনিবার্য ও অপরিহার্য জেনে পাবার উৎকণ্ঠা জানিয়েছিলেন। বাংলা থেকেই ইংরেজ শাসনের সুরু। স্বদেশীদের সহযোগিতা ছাড়া অন্ততঃ খাজনা আদায়টাও হবে না।

তাই ইংরেজের অসির সঙ্গে বাঙালীর মসীও অবিভাজ্য হ'য়ে পড়ল। বাংলায় কেরাণীকুলের সৃষ্টি হ'ল। শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হ'ল। শিক্ষিত অশিক্ষিত-দের মধ্যে পদলোভ জন্মাল। এই পদলোভ ইংরেজ রাজত্ব কায়েম ক'র্‌ল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অসামঞ্জস্যের অঙ্কুর ক্রমশঃই পরিব্যাপ্ত হ'তে লাগল। ইতিমধ্যে বাঙালী নিজস্ব ভাষা পেয়ে গেছে; পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাদ পেয়েছে; কর্তৃত্বের আঁচ পেয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানার রেশ আর অব্যাহত চলা কঠিন হ'য়ে উঠল। ইংরেজেরা শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে পদে পদে বাধা পেতে লাগল। আই-সি-এস নিয়ে সুরেন ব্যানার্জির সঙ্গে যে কোঁদল পাকিয়ে উঠল সে আমাদের আধুনিক ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম উন্মেষ। কিন্তু তার আগে বাংলা একক লড়াই ক'রে যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল, তাই শেষ হ'য়েছে চিত্তরঞ্জনে এসে। এর নির্বাণ ইতিহাসটা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। পরে বলছি।

এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত আছে। আজকের বাংলা সাহিত্য জাতীয়তা-ভ্রষ্ট ও রাজনীতি-ভীরু কিন্তু সেকালের বাংলা জাতীয়তার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে আছে। তাই সেকালের বন্দে মাতরম্-ই অমর হ'য়ে রইল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর কবি নন; কিন্তু তাঁর দুঃসাহস ছিল, তিনি লিখেছিলেন:

হিপ হিপ হিপ হুরে
হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে
তা'দের বিচার
নেটিবের কাছে হবে
নেভার—নেভার !!

এতে পাই ইলবার্ট বিলের ইতিহাস। আর পাই মনমোহন বসুর সঙ্গীতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গুণগ্রাহিতার পরিচয়:

রিপণের গুণের কথা
রইল গাঁথা
জন্মের মত হৃদ্-মাঝারে।

কেননা লর্ড রিপণ ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সায় দিয়েছিলেন।

বাংলার একেবারে নিজস্ব আন্দোলন তিনটি। একটি ইলবার্ট বিল এবং এই আন্দোলনকে আমরা নবজাত পাতি বুর্জোয়াদের পদাধিকারের আন্দোলন বলতে পারি।

দ্বিতীয়টি নীল চাষ আন্দোলন। একে পাতি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে চাষী আন্দোলন বলতে পারি।

তৃতীয়টি বঙ্গভঙ্গ। একে (সবিনয়ে) বাঙালী হিন্দুর আন্দোলন বলতে পারি। এরও নেতৃত্ব ছিল পাতি বুর্জোয়াদের হাতে।

এতে শেখবার আছে এই যে ইলবার্ট বিল আন্দোলনে গণ-সহযোগ ছিল না; সফলকামও হওয়া যায় নি।

নীল চাষ আন্দোলনে গণ সহযোগ ছিল; সাফল্যলাভও হ'য়েছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক হ'লেও গণ-সহযোগ ছিল। সফলও হ'য়েছিল।

মাধ্যমিক বিল প্রতিরোধী ও হিন্দু মহাসভাইট্‌দের বোধ হয় এতে কিছু শেখ্‌বার আছে।

যাক্‌গে, নীল চাষ আন্দোলন খুবই তীব্র হ'য়েছিল। সাধারণ লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যক্তিদের সংযোগ বলতে এই আন্দোলনই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কিন্তু পরবর্ত্তী কৃষ্টি ও পদলোভের আন্দোলন এই উভয় শ্রেণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রেছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের আত্মসম্মানবোধ ক্রমশঃ তীব্রতর হ'য়ে ইলবার্ট বিলে রূপ পায় এবং তাতেই ঘা খায়; উত্তরকালে এরই গর্ভে জন্মাতে থাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংহতি—যা আজও প্রবাদ হ'য়ে আছে। Settled fact unsettle করা—পরাধীন জাতির পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ আন্দোলন হ'য়েও এই আন্দোলনের কর্ণধারেরা নিয়মতন্ত্রের দিকে ঝুঁকলেন।

ইল্‌বার্ট-বিলের উদ্দেশ্য ছিল আইনের দিক থেকে সাদা-কালার পার্থক্য দূর করা—কালা বিচারকও সাদা আসামীর বিচার ক'রতে পারবে। সাহেবরা এমনই ক্ষেপে গেল যে, লর্ড রিপণকে বিল প্রত্যাহারে করতে হ'ল। আজও এই পার্থক্য আছে—সাহেবরা যদ্দিন সাহেব তদ্দিন এ পার্থক্য থাকবেই কিন্তু

শিক্ষিতদের বেশ একচোট শিক্ষা হ'য়ে গেল—পরাধীনতার সংজ্ঞাটা স্পষ্ট হ'তে লাগল।

শেখ রে এখন ভারত সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতিকুল মান
রাজ-স্তুতিগান সবই বিফল

(হেমচন্দ্র)

কৃষ্টির দিক থেকে বহু পূর্বেই বিদ্রোহ জেগেছিল। রামমোহনের যুগ থেকে তা স্পষ্ট, বিদ্যাসাগরের যুগে তা স্পষ্টতর, বঙ্কিমের যুগে তা বাঙ্ময়। পলাশীর যুদ্ধের উপসংহার যেমন হ'য়েছে এক শতাব্দী পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের তথাকথিত "সিপাহী-বিদ্রোহে" (বস্তুতঃ, সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থান), তেমনি এ কৃষ্টির সংগ্রাম স্বামী বিবেকানন্দে এসে সুস্থির হ'য়েছে। পাশ্চাত্যকে আত্মসাৎ করা চল্‌বে কিন্তু চল্‌বে না পাশ্চাত্যের শাসন মাথার ওপর। সেবার ভেতর দিয়ে বজ্রের মত কঠোর ইস্পাতের মত অনমনীয় চরিত্র গঠনের সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। গীতা আর ফুটবলের উদ্দেশ্য যে এক, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এরা যে একই মার্গী এতদিনে তা উপলব্ধি হ'ল। বহুদিন প্রচেষ্টার পর বাংলায় চরিত্র সৃষ্টি হ'ল।

ইংরেজের দৃষ্টি ছিল ভারত; তাই বাংলার তৎকালীন চিন্তানায়কদের লক্ষ্যও ছিল ভারত এবং ভারত সংহতি, এ চিন্তা থেকেই বহু পরে ভারতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক পরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়।"

"মিলে সবে ভারত-সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"
(হেমচন্দ্র)

অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে
ডুবায়ে ভারত ভূমি যেওনা তপন
(নবীনচন্দ্র)

"বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, রুক্ষকেশা, রুক্ষাক্ষা।"
(অক্ষয়চন্দ্র সরকার)

এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে তৎকালীন চিন্তানায়কেরা চ'লেছিলেন বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ বাংলার গৌরব নিয়েও অনেক রচনা, সঙ্গীত, প্রচার ক'রেছিলেন। তা' না ক'রলে এ আত্মবিস্মৃত জাত জাগ্‌ত না নিজে, জাগাতে পারত না অপরকে। পরকে জাগানো জাতীয় আন্দোলনের 'ইকনমি'। তা' ছাড়া যে শাসনের উচ্ছেদে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব সে-শাসনের ভৌগোলিক সীমাকে অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। তখন যাও বা ছিল এখন সেণ্ট্রালাইজড্‌ শাসন, এখন এ কল্পনাও বাতুলের। যা হোক্‌, ভারতের জাগরণ বিরাট ভারতের দিকে লক্ষ্য রেখে পুষ্ট হ'চ্ছিল ব'লে পরবর্ত্তীকালে এর নেতৃত্ব ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অবিসম্বাদী ছিল। কিন্তু এ কথাটা ভুললে চলবে না যে বাংলার এ সব আন্দোলনের নেতৃত্ব ক'রেছে চাকুরিয়া বা চাকুরী প্রত্যাশীরা ; অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনও অপর প্রদেশের ঠিক ঐ শ্রেণীর ভদ্র ব্যক্তিরাই উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হ'য়েছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে। বহুদিন থেকেই, ইংরেজ শাসন সর্বত্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভূত হ'চ্ছিল। সেই থেকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাংলার যে আত্মসম্মানবোধ উত্তর কালে নেতৃত্ব ক'রেছিল তার সুরু হয় কৃষ্টির বিদ্রোহে ও পদাধিকার প্রত্যাশায়—এ কথা ব'লেছি। ভিক্ষায় যে কিছু হবে না এ অভিজ্ঞতা তদ্দিনে বাংলার হ'য়েছে। তারা জেনেছে ঃ

'দাও ! দাও !' ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু
(যদি) মান পেতে চাও প্রাণ পেতে দাও
প্রাণ আগে কর দান।
(রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের পরাধীনতার রূপটিও ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হ'তে লাগল ঃ

তাঁতি কামার সবার অন্ন মেলাভার, করে হাহাকার

আর—

ছুঁই সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশালাই কাটি—তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে—
কিছুতেই নয় লোক স্বাধীন।

এ থেকেই স্বদেশীর উদ্ভব ও বয়কট মন্ত্রের উদ্ভাবনা। বাংলার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই উদ্ভাবনা-শক্তিটিও মস্ত কারণ। ১৮৭৩ এ 'হিন্দু মেলা' হয় কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভারত সভাটি সব দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

(১) দেশে প্রবল জনমতের সৃষ্টি করা।

(২) একই রাজনৈতিক স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের ভিন্ন জাতিকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করা ;

(৩) হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা ;

(৪) রাজনৈতিক কার্যে জনগণকে আকৃষ্ট করা।

স্বদেশী বয়কট ও প্রচারের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নূতন কর্ম্মসূচী দিতে পারে নি।

বাংলা সাহিত্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রমেশ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইত্যাদি নানাপ্রকারে স্বদেশপ্রেম প্রচার ক'রছিলেন। কেউ বলছেন, আবার তোরা মানুষ হ ; কেউ বলছেন,

কতকাল পরে বল ভারতরে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে ?

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এক পরামর্শ সভা হয়। তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা যোগ দেন।

তারপর কংগ্রেসের সৃষ্টি।

সৃষ্টিকালে ভারতীয় বুর্জোয়ারা কায়মনোবাক্যে এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়নি। কংগ্রেসের নেতৃত্ব তখনও চাকুরীয়া ও চাকুরী প্রত্যাশীদের তাঁবে; কিন্তু বেকার চাকুরী প্রত্যাশীরা বুভুক্ষ জনগণের রোষ ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। বাংলার ঘরে ঘরে অন্নাভাব, অন্নের সম্ভাবনার অভাব। স্বল্পতুষ্ট গ্রাম ভেঙে চুরে গেছে; নিম্ন মধ্যবিত্তদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ক্রমশঃ জমি ও গ্রাম থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করতে লাগ্‌ল। জনসাধারণের সঙ্গে এরা সংযোগ হারাতে লাগ্‌ল বটে এবং ভদ্রস্থ ব্যক্তিরা সংহৃত হ'তে লাগ্‌লেন এও সত্যি কিন্তু বঙ্গভঙ্গ পর্য্যন্তও জনগণ ও ভদ্রব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের প্রতি মায়া কাটাতে পারে নি। কিন্তু ঠিক এ পথসন্ধিতেই বঙ্গভঙ্গের প্রসাদে গণসংযোগ থেকে দেশনেতৃত্ব বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে। দেশে নরম আর গরম দুই দলের সৃষ্টি হয়। হওয়া স্বাভাবিক। কথা আর কাজের মধ্যে তফাৎ হ'তে বাধ্য।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন জাগ্রত আত্মসম্মান ও বিদেশী শাসনের মধ্যে প্রথম ও বিরাট্ সংঘর্ষ; অথচ এ সংঘর্ষ একান্তরূপে বাংলার। বাংলার প্রতি গৃহে তখন রাখীবন্ধনের অচ্ছেদ্য নৈকট্য। তাই ভারতের ব্যাপক মূর্তি তখন ক্ষণিকের জন্য স্তিমিত।

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী!'

তখন বাংলা, বাংলা, কেবল বাংলা—

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।

এল বয়কট। শাসকশ্রেণী পাল্টা জবাব দিল—হিন্দু-মুসলমান ভেদ—হিন্দু হ'ল দুয়ো (কেন না এরাই ক'র্‌ল প্রতিরোধের নেতৃত্ব), মুসলমান হ'ল সুয়ো (কেন না এরাই ক'রল প্রতিরোধের প্রতিরোধ)। বাংলার শক্তি পরীক্ষা হ'তে লাগল। বাংলা জবাব দিল।

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে ?
(কাব্যবিশারদ)

অপর দিকে—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।

কিন্তু এই গরম আবহাওয়ায় সরকার যতটা না বিব্রত হ'লেন তার চাইতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই বেশী ভয় পেলেন।

সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে নরমপন্থী মডারেটরাই জয়ী হ'লেন। গরমপন্থীরা বাইরে ঘা খেয়ে অন্তর্দেশে তলিয়ে গেল। বাংলায় সন্ত্রাসবারের জন্ম হ'ল। এই সন্ত্রাসবাদে বাংলার জনগণ যোগ না দিয়েও সহজে গ্রহণ ক'র্‌ল ; ক'র্‌লেন না কেবল দেশের চিন্তানায়কেরা। তাঁরা প্রমাদ গণ্‌লেন। এর পর থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতারা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে একযোগে বাংলার এই গরমপন্থীদের বিষদৃষ্টিতে দেখে এসেছেন।

এর পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া গান্ধীজী, তাঁর অহিংসা।

কিন্তু গান্ধীজী একক নন। গান্ধীজী একটা শ্রেণীর মুখপাত্র। তাঁরা কারা, এবার সে ইতিহাসই পড়ব এবং তাতেই ধরা পড়বে বাংলার নেতৃত্বচ্যুতির কারণ।

যে প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনাবশে মডারেটদের জয় হয় এবং যে ভীতিবশে মডারেটরা সংহত হয়, তাই তাদের সরকার-ঘেঁসা ক'রে তোলে। অথচ দেশে অভিযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদেশী শাসনের মাহাত্ম্যই এই।

এল ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের ইউরোপের মহাযুদ্ধ।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। রৌলট আইন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, লোকক্ষয়,—জনগণ শুদ্ধ সকলেই তিক্ত ও অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল। মডারেটরা যে সহযোগের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিলেন তাতেই জন্মাল অসহযোগিতার প্রতিক্রিয়া—১৯২০ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন।

এইখান থেকেই ক্রমশঃ জাতীয় নেতৃত্ব পাতি বুর্জোয়াদের হাত থেকে বুর্জোয়াদের হাতে আসতে লাগল। তাই এই নরম-গরমের সমন্বয়; অসহ-যোগিতা ও অহিংসার সহবাস।

এর অর্থনৈতিক ইতিহাসটা বলছি।

ব্যবসায়ী ইংরেজ এল বিদেশী পণ্য নিয়ে। হয়তো ব্যবসাবুদ্ধিই থেকে যেত কিন্তু আরও অনেক বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা দেখা দিল, অভ্যুত্থানকামী স্বদেশী বুর্জোয়া এই সংঘর্ষে এল। তার পরের ইতিহাস সকলেই জানেন। কিন্তু ইংরেজ বৃটীশ পণ্যের ওপর যে শাসন রচনা ক'রল তাতে ভারতের স্বল্পতুষ্ট গ্রাম্যপ্রথা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল; এর শিল্প হ'ল লুপ্ত; রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পণ্য গ্রামাভ্যন্তরে পর্যন্ত অনায়াসে হানা দিতে লাগল।

সহসা স্বদেশী শিল্প গ'ড়ে উঠ্‌বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কাঁচা-মালের দেশে পরিণত করায় এদেশে যে শিল্প গ'ড়ে উঠ্‌ল তা প্রথমতঃ বৃটিশ পুঁজির আওতায় এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষিসংলগ্ন শিল্প। তাই এদেশে চা ও পরে পাটই হ'চ্ছে শিল্প কারখানার অগ্রদূত। স্বদেশী লোকেরা বিদেশী পণ্যের এজেন্ট রূপেই পুষ্ট হ'তে লাগ্‌ল।

দেশীয় লোকের আওতায় বস্ত্রশিল্প অবশ্য ক্রমশঃ দেখা দিল। আর দেখা দিল কয়লার খনি—রেলওয়ের আনুষঙ্গিকরূপে। এ কথা মার্কস্‌ অনেক আগেই ব'লেছিলেন।

You cannot maintain a net of railways over an immense country without introducing all those industrial processes necessary to meet the immediate current wants of Railway locomotion, and out of which there must grow the application of machinery to those branches of industry not immediately connec-

ted with railways. *The Railway system will therefore become, in India, truly the foreruner of modern industry.*

যাই-হোক্, দেশীয় ব্যবসায় এক রকম মরি-বাঁচি ক'রে চল্‌ছিল। এর মধ্যে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ লাগ্‌ল। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ছিল মোট আমদানীর শতকরা সাত ভাগ জার্ম্মানীর। যুদ্ধ লেগে গেলে, জার্ম্মানী তিরোহিত হ'ল বটে, বৃটিশ আমদানীও কম্‌ল, এই ফাঁকে জাপান আর আমেরিকা ঢুক্‌তে চেষ্টা কর্‌ল। ভারতের উৎপাদনও বাড়্‌ল। বিশেষ বস্ত্রশিল্পের খুবই উন্নতি হ'ল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মিলগুলি ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের মাত্র নয় ভাগ মেটাত; ১৯২১-এ তা হ'ল শতকরা ৪২ ভাগ;—আমদানী ৬৪ থেকে ২৬শে নাম্‌ল। লোহা আর ইস্পাত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছিল ১৯,০০০ টন, ১৯১৮-১৯-এ হ'ল ১২৩, ৮৯০ টন!

আমাদের প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে এ কথা ব'লে রাখা ভাল যে, এই শিল্পোন্নতি-তে বাংলার অংশ সামান্য। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল সর্বপ্রথম হ'লেও সে যুগে —ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। চা বাগান বাংলায় থাক্‌লেও, ওটা প্রধাণতঃ আসামের। পাট প্রধানতঃ বাংলার হ'লেও, পুঁজিবাদীরা সর্বাংশে বিদেশী। বাংলার নেতৃত্বের দিক থেকে এ কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার।

গত মহাসমরকে ধন্যবাদ, বণিকেরা শিল্পপতি হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে পরাধীন দেশের শিল্পোন্নতি বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যে শাসকশ্রেণীর কাছে বাঞ্ছনীয় নয় এটা প্রমাণিত হ'য়ে গেল।

চারদিকে অভাব অনটন, অসন্তোষ। তাকে দমন ক'ররার জন্য রাউলাট আইন পাশ হ'ল; জালিনওয়ালাবাগে সঙ্ঘবদ্ধ হত্যাকাণ্ড হ'ল। সমস্ত চাপ এসে পড়্‌ল কংগ্রেসের ওপর। নরমপন্থীরা এক দল পিছিয়ে পড়্‌ল, এক দল দূরদর্শী নরমপন্থী গরমদলে সায় দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ সংঘর্ষে রাজী হ'ল। এই দলই গান্ধীজী ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের দল। বাংলার আভ্যন্তরীণ ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এ কথার সাক্ষ্য দেবেন যে, বাঙ্গালী নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হিংসপন্থাকে চিত্তরঞ্জন কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাময়িক প্রতিশ্রুতিতে এক রকম রাতারাতি অহিংস ক'রে ফেল্‌লেন। চিত্তরঞ্জন বা গান্ধীজী এঁরা

আসলে নিয়মাতান্ত্রিক ; এজন্য এই নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনে আর কোনদিক থেকে বাধা না আসে চিত্তরঞ্জন তাই হিংসাপন্থীদের সঙ্গে প্যাক্ট ক'রেছিলেন। বাংলার গুপ্ত সমিতি এই প্রথম ওপরে ভেসে উঠ্‌ল। একথা ব'ললেও চলে যে, নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বের এখানেই অবসান হ'ল।

সমস্ত আইন মেনে তবে অসহযোগ ও আইন অমান্য। এই নেতৃত্বের রীতি ও নীতি যে জনগণের রীতি ও নীতি থেকে পৃথক্ তা চৌরাচৌরিতে প্রকট হ'ল। তারা হিংসা ক'রে ব'স্‌ল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভবিষ্যতে এদের নিয়েই কারবার চালাতে হবে ; কাজেই তারা এ প্রশ্রয় দিতে পারে না। গোড়া থেকেই তারা সাবধান। বৃটিশ শাসকশ্রেণীও প্রকারান্তরে গান্ধীজীর ঐ নীতি সমর্থন ক'রে এসেছেন।

এরপর থেকে নেতৃত্ব সম্পূর্ণ হাত বদ্‌লে একেবারে বোম্বাই, আহ্‌মেদাবাদ, যুক্তপ্রদেশে চ'লে গেছে। বাংলার পুঁজিপতিরা অবাঙ্গালি। শিল্পই জাতীয় অগ্রগতির পথ, শিল্পপতিরাই জাতীয় নেতৃত্ব রাখ্‌তে চান। শাসকশ্রেণীর যেমন যুক্তির দরকার হয় না, ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্র দেশাই-প্যাটেল-দের তেমনি যুক্তির প্রয়োজন করে না।

শিল্পের এই নেতৃত্ব হারিয়ে বাংলা রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারিয়েছে ; নিরাশ প্রতিক্রিয়ায় বাংলায় তাই ফ্যাসিবাদ উঁকি মার্‌তে চাইছে। এটা মোটেই সুলক্ষণ নয়।

পুলকেশ দে সরকার

পুস্তক পরিচয়

THE BACKGROUND OF ART—By Talbot Rice, (Nelson), 2/6

আমাদের যুবা বয়সে কলাবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার মধ্যে ছিল না। যখন আশুবাবু প্রাচীন ভারতের বিভাগ খুললেন তখন ভারতীয় চারুকলার দিকে ছেলেদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সুযোগ এল। কিন্তু নানা কারণের মধ্যে বিষয়টি প্রত্নতত্ত্বের তাঁবেদারী করার দরুণই প্রধানত তার প্রতি বাঙালী ছাত্রের চোখ খোলে নি। অন্যধারে অবশ্য বাঙলা দেশে হ্যাভেল, অবনীবাবু, গগনবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু এবং তাঁদের শিষ্য সন্ততির প্রাণপণ চেষ্টায় চিত্রকলার প্রতি একাধিক শিক্ষিত ব্যক্তির যৎসামান্য অনুরাগ আসে। 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিউ নব-উদ্যমের প্রচার কার্য্যে সহায়তা করে। 'রূপম' নামে একটি সত্যকারের উচ্চশ্রেণীর ত্রৈমাসিক বেরোয় এই সময়, কিন্তু সাধারণ রুচি ও জ্ঞানের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। কিছু পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন অবনীবাবুকে। এখন অধ্যাপক সুরহ্বার্দ্দি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা বিষয়টিকে শিক্ষার উপযোগী ক'রে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এখনও আর্টশিক্ষা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্তর্গত। আর্ট অধ্যয়নের জন্য ছাত্ররা দল বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ছুটছে না। আমাদের সমাজ শিক্ষাপদ্ধতিকে এমন কোনো বড় ধাক্কা দেয়নি যার কৃপায় ছাত্রদের মধ্যে চিত্র, স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্য্যের কদর বাড়তে পারে। আর্টের ডিগ্রীতে চাকরী জোটে না, আর্ট সমালোচনায় টাকা নেই, মাত্র মেয়ে মহলে একটু খাতির হয়; তাতে পেট ভরে না। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাইরে চিত্র সম্বন্ধে সামান্য আগ্রহ দেখা দিয়েছে মনে হয়। প্রতি বছরই অন্ততঃ তিন চারটে প্রদর্শনী হচ্ছে, খবরের কাগজে তার নোটিশও বেরুচ্ছে। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকার মারফৎ প্রবন্ধাদিও চোখে পড়ে। এই রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যেও রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে তিন চারটি

রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, সত্য কথা এই, একটি ছাড়া এমন কোনো রচনা ভাগ্যে জোটে নি যা থেকে প্রমাণ হয় যে এতদিনে শিক্ষিত জন সমাজের মধ্যে আর্ট শিক্ষা যথার্থ রীতিতে স্নুরু হল। যদি বলা যায় যে কোনো শিক্ষাই আমাদের হয়নি, তবে আমি মন্তব্যটি স্বীকার করেও বলবে যে সময় এসেছে এত দিনে। শিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁরা ইতিপূর্ব্বে চাকরী করছেন কিংবা যাঁদের ডিগ্রীর উপর অন্ন সমস্যার নিরাকরণ নির্ভর করছে না তাঁরা কি ভাবে অগ্রসর হবেন সেটাও বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ সমালোচনা করছি না। তবে পরোক্ষভাবে যদি এসে পড়ে তবে আমার সদুদ্দেশ্যই আমাকে যেন রক্ষা করে।

নিজের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ পেয়েছি যে একটা ছবি দেখলে, গান শুনলে, কবিতা পড়লে সে সম্বন্ধে ভাল কিংবা মন্দ একটা সাধারণ ধারণা সহজেই মনে ওঠে। এই অবস্থায় অনেকে ক্ষান্ত হন, হয় আলস্যের জন্য, না হয় অজ্ঞানতার জন্য। একাধিক লোক আছেন যাঁরা আলস্য ও অজ্ঞানতা ঢাকতে চান এই মতবাদের দ্বারা যে বাস্তবিক পক্ষে আর্টের বিচার ঐ ভাল লাগা ও না লাগাতেই শেষ হয়। মতটি আংশিক ভাবে সত্য, কারণ, আনন্দদানের যে ক্ষমতা ঐ বিশেষ ও স্বাধীন গান, কবিতা কিংবা চিত্রটির মধ্যে আছে সেইটাই তার সম্বন্ধে এক্ষেত্রে বিচারের প্রধান বিষয়। কিন্তু মতের অন্যাংশটুকু গ্রহণ করা বিপজ্জনক। শৈশবকালে ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত কোকিল কবিতা পড়া ও বুড়ো বয়সে পড়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য আছে, সেটা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন। এখন যদি মানি যে উপভোগের জন্য কোনো জ্ঞানেরই প্রয়োজন নেই, তবে মানসিক প্রগতিকে বাতিল করা হয়, মনকে স্থাণু বস্তু হিসেবে দেখতে হয়, তার সঙ্গে জৈব প্রবৃত্তির সমীকরণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত মনের অস্তিত্ব স্বীকারেরই প্রতিকূল। তা ছাড়া, অভিজ্ঞতায় এ কথাও বলে যে আনন্দের মাত্রার স্তর আছে। রাগের প্রকৃতি, ছবির গঠনচাতুর্য্য, কবিতার ছন্দ-কৌশল বুঝলে আনন্দের মাত্রা বাড়ে বই কমে না। আরো বলা চলে, এমন কোনো মানসিক প্রক্রিয়া জানা নেই যার ফলে চারুকলার উপভোগকে অন্য প্রবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়া থেকে ছাড়িয়ে এনে একটা বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে পরিণত করা যায়। যদি

তা সম্ভব হত, তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পাশে অন্য প্রকার রস-সম্ভোগের প্রয়োজনই উঠত না।

মোদ্দা কথা এই: ছবি ও দ্রষ্টা, গান ও শ্রোতা, কবিতা ও পাঠকের মানসিক সম্পর্কে অন্ততঃ পক্ষে দুটি স্তর আছে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গত বোধ, দ্বিতীয়তঃ উপলব্ধি। সর্ব্বশেষে অনুভব অবশ্য, কিন্তু সেটা সর্ব্বশেষে, এইটা ভুললে চলবে না। আর্টশিক্ষার প্রধান প্রতিজ্ঞা হল স্তরের স্বীকার। তার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত করা। যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে অনুভূতি সময়সাপেক্ষ।

কি ভাবে উন্নয়ন সম্ভব? টলবট রাইস তাঁর বহু বৎসরের শিক্ষকত্বের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ছোট বই লিখেছেন, যেটা আমি প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবককে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট শিক্ষার্থীদের পড়তে অনুরোধ করছি। উপক্রমণিকা হিসেবেই বইটার গুণ; নচেৎ প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে বলা বাহুল্য। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সত্যই ব্যাপক। সীদিয়ান থেকে আধুনিক কারুশিল্প, কোনো রূপের প্রতিই তাঁর তাচ্ছিল্য নেই। যেটা আমার সব চেয়ে মনে ধরেছে সেটা হল এই ভদ্রলোক আর্ট বস্তুটি এই জীবনেরই অঙ্গ ধরেছেন, এবং তার বিচারে আধ্যাত্মিকতার বুজরুকী চালান করেন নি। এটা যে কত মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গী তা বুঝবেন তাঁরা যাঁরা ভারতীয় কলার দার্শনিক ব্যাখ্যায় তিতিবিরক্ত। দেশাত্মবোধের অভিমান, পরাধীনতার অপমানের ক্ষতিপূরণ, অতীতের প্রতি মোহ—এদের ষড়যন্ত্রে ভারতীয় মন আজ নিষ্ক্রিয়। অবশ্য মার্ক্সিষ্ট ব্যাখ্যা বইখানিতে নেই। আছে মোটামুটি যাকে বলে সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, যেটা আধ্যাত্মিক ও আদর্শবাদী ছাড়া অন্য সর্ব্বপ্রকার জীবের প্রথম উপভোগের পক্ষে আপাতত যথেষ্ট।

লেখক বলছেন উপলব্ধির জন্য সভ্যজগতের আর্ট কলেজে দুটি ব্যবস্থা চোখে পড়ে। আর্টের ইতিহাস, ও জার্ম্মান পণ্ডিত যাকে Kunstforchung বলেন, যার বাঙ্গলা কিংবা ইংরেজী প্রতিশব্দ ঠিক নেই, আর্টের ব্যাখ্যা বল্লে খানিকটা চলে। আর্টের ইতিহাস বিস্তর লেখা হয়েছে, নানা ধরণে, অতএব সে সম্বন্ধে এইটুকু মনে রাখা যথেষ্ট যে বিখ্যাত আর্টিষ্টের জীবন কথা ইতিহাস নয়,

আর্টের ধারাবাহিকতাটা দেখান ছাড়া তার অন্য সার্থকতা নেই। পূর্ব্ব ও পরের পারম্পর্য্য দেখানোই আর্ট-ইতিহাসের কাজ। ব্যাখ্যার পদ্ধতি নিয়েই যত গোলমাল। পদ্ধতি যেকালে প্রধানত বিষয়টির প্রকৃতি-সাপেক্ষ, এবং আর্ট যেকালে আকাশ থেকে পড়ে না, পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয় তখন তার ব্যাখ্যার মূল কথা এই যে একটি মাত্র ধারার পৃথক্করণ অ-স্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। অনেক শুদ্ধ সমালোচকের ধারণা যে আঙ্গিক বিচারের দ্বারাই কোন বিশেষ চিত্র, কিংবা কবিতা কিংবা গানের ধারা সুপ্রকট হয়।

আমি এই মতে সায় দিই না। ধরা যাক গত ত্রিশ বৎসরের বাঙলা চিত্রের ধারাকে। সে সম্বন্ধে গোটা কয়েক মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। সেটা ভুঁইফোড় ঠেকেছিল সাধারণের কাছে। কিন্তু ক্রমে তার সুখ্যাতি করা ফ্যাশানে দাঁড়ায়। পরিচিত বিদেশী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি থেকে সেটা পৃথক ছিল, ক্রমে তার মধ্যে জাপানী ও বৌদ্ধযুগের অজন্তাদির প্রভাব চোখে পড়ে। বাঙলা দেশের বিশেষ মানসিক বৃত্তি পরে তার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় ও বাঙলা পরিশীলনের অঙ্গ হিসেবে ধারাটি বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করে। চিত্রধারার ও আঙ্গিকের মধ্যে বাঙলার জীবনযাত্রা ও ভৌগলিক উপচয়ের প্রমাণও পাওয়া যায়। শেষে বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর মধ্যে এই ধারার সৌজন্যে রুচি পরিবর্ত্তন ঘটে। গোটাকয়েক ছবি চিত্র হিসেবে উঁচু দরের হয়েছিল, এবং কলাবিদের প্রশংসা পায়। এই ধরণের আরো অনেক তথ্য নির্দ্দেশ করা সম্ভব। কোনটাই এর মধ্যে তত্ত্ব নয়, মতও নয়, নির্জলা ফ্যাক্ট।

এখন প্রত্যেক তথ্যটি যদি বিচার করি, কিংবা সবগুলিকে একত্র করে তাদের তাৎপর্য্য খুঁজি তবে পূর্ব্বলিখিত মতবাদের গলদ এবং আর্ট উপলব্ধির প্রকৃত উপায় বেরিয়ে আসে। কেন আমাদের চোখে ছবিগুলি ভুঁইফোড় ঠেকে? কারণ আমাদের শিক্ষার অভাব, আমাদের কুরুচি, আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি যাতে জীবনের সমগ্র শক্তি মাত্র বাঁচার কাজেই নিঃশেষিত হয়েছিল। অতএব বাঙলার চিত্রধারা বোঝবার জন্য আমাদের সমাজ ও শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞানেরও প্রয়োজন। কিন্তু পরে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বল্লেন যে এটা ভুঁইফোড় নয়, এর সঙ্গে চীনে জাপানী ছবি ও অজন্তার যোগ রয়েছে। কেন ও কোথায় রয়েছে দেখবার সময় বোঝা গেল যে বাঙলা দেশের কৃষ্টি ভারতীয় কৃষ্টিরই

অঙ্গ, এবং ভারতীয় কৃষ্টি এশিয়াটিক কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আরো একটু এগুলে দেখা গেল যে এই ধারার সঙ্গে অন্য দেশের সমসাময়িক যেমন প্রথম যুগের খৃষ্টানী ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর কলাপদ্ধতির সঙ্গে অনেক মিল আছে। অতএব ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বিচার না করলে গত ত্রিশ বছরের বাঙলাদেশের আন্দোলনের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাখা ও উপলব্ধি অসম্ভব। তেমনই কেন গোড়ায় যেটা ফ্যাশান ছিল সেটা পরে রুচির উন্নতি কি ভাবে ও কতটা করলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বোধহয় দেখতে পাব যে যদিও প্রকৃত আনন্দ উপভোগ ফ্যাশান-সাপেক্ষ নয়, তবু বাঁধা সমাজে ফ্যাশানটা হেয় নয়, তার পরিবর্ত্তন আছে, এবং সে পরিবর্ত্তন গোটাকয়েক সামাজিক নিয়ম মেনে চলে। আবার আমরা যখন ছবি দেখে বাঙালী হিসেবে গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম, বাঙলার জীবন যাপন, বাঙলার ঘর বাড়ি, পল্লীগ্রাম, মন্দির, এমন কি আমাদের দেশস্থ উপকরণের ব্যবহারের সুচারু বিকাশ হিসেবে তাকে দেখে আত্মপ্রসন্ন হয়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই আমাদের উপভোগে চিত্রধারা ভিন্ন বাঙালী জাতির মানসিক ধারা, তার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, তার বিশেষ রূপ, তার ভূগোল, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি এসে পড়েছিল। অতএব ইতিহাস ও সমাজ ছাড়াও জাতিবিচার ও ভূগোলবৃত্তান্ত চিত্রধারার উপলব্ধিতে সাহায্য করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, এই সব জ্ঞানের সাহায্যেই আঙ্গিক বিচার সম্ভব।

তা হলে দাঁড়াল এই ঃ আর্ট উপলব্ধির জন্য ইতিহাসের ক্রমবিকাশ, সমাজ-পরিণতি, জাতিগত বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ, ভৌগলিক প্রভাব ও তুলনামূলক বিচার নিতান্ত আবশ্যিক।

অবশ্য একটি কোন চিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগটাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তার স্থান কোথায়? সর্ব্বত্র নিশ্চয়, কিন্তু প্রধানতঃ, সর্ব্বপ্রথমে ও সর্ব্বশেষে। অর্থাৎ পাঠ সুরু হবে যাকে প্র্যাকটিক্যাল এসথেটিকস্ বলে তাই থেকে। একটা ছবি সামনে রেখে কেন ভাল লাগল, কেন ভাল লাগল না, ও কেন কোনো সাড়াই এল না এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রেরা প্রথমে দেবে, ও তারপর সেই সব প্রশ্নের বিচার চলবে। প্রবীণের মতামত না জানানই সমীচীন। রিচার্ডস্ কবিতা-অধ্যাপনায় এই আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন।

১২

কিন্তু ব্যাপারটি শ্রমসাপেক্ষ, তাই একটু অদল বদল করলে ভাল হয়। মোটা-মুটি যদি রেখা, রঙ, ছক, ওজন সমাবেশের অর্থ বোঝাবার পর ছাত্রেরা তাদের মূলনীতিগুলো বিখ্যাত ছবির বিশ্লেষণের ফলে হৃদয়ঙ্গম করে তবে কাজ অনেক দূর এগিয়ে যায়। রঙ, রেখা ও ম্যাস ব্যাপারগুলো কি, দাঁড়ি, বাঁকা রেখা, বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রত্যেকের ভাব উদ্রেকের শক্তি ভিন্ন, আগুন, জলস্রোত, গাছ, ফুল, দাঁড়াবার ভঙ্গী প্রভৃতির গতিরূপ পৃথক—মাত্র এতটুকু বোঝবার পর ছাত্রেরা ওপরের স্তরে উঠতে পারে দেখেছি। তারপর 'এপ্রিশিয়েশন'। এই দিকে একটা ভুল বিশ্বাস জেনে শুনে খাড়া করতে হয়—'যেন' সৌন্দর্য্য-জ্ঞান একটি বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি। অর্থাৎ এবার নেতিবিচারের পালা। সুন্দরী মেয়ে কিংবা মনোহর দৃশ্য ব'লেই চিত্রটি সুন্দর নয়, দামী ও বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কন ব'লেই শ্রদ্ধেয় নয়, গল্প কিংবা কোনপ্রকার আত্মগরিমার খোরাক যোগাচ্ছে ব'লেই সেটি চমৎকার নয়, সর্ব্বোপরি, পরিচিত কিংবা অবদমিত মনোবৃত্তির স্ফুরণ বলেই সেটি হৃদয়গ্রাহী নয়—এই ধরণের সাধনা চাই, নচেৎ উপলব্ধি জৈব বোধেই থেকে যায়। এক কথায় willing suspension of beliefs and disbeliefs এই সময় নিতান্ত প্রয়োজন।

এই রকম অবস্থায় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইতিহাস ও বিচার উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

তবু ব্যাপারটা শেষ হল না। ঐ 'যেন'টাকে কাটাবার ফন্দী শিক্ষা-পদ্ধতিতেই থাকা চাই, নচেৎ আর্ট ফর আর্টস্ সেক্-এর মতন ন্যাকামী ঢুকে পড়বে। এখনও পর্য্যন্ত যখন মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রবৃত্তির ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে এক মত নন, যখন 'শুদ্ধ' প্রবৃত্তির চর্চ্চায় মানুষ তার সাম্য হারাচ্ছে, তখন বিশুদ্ধ সঙ্গীত, চিত্র, ও কবিতা রসের উপভোগের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তায় সন্দিহান হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমাজ, ইতিহাস ভূগোল, জাতি সম্পর্কে জ্ঞান 'শুদ্ধি'র মোহ কাটাতে অনেকটা পারে নিশ্চয়, যদি না তারা বিচারের সমগ্র ক্ষেত্রটাকে নিজেরা জুড়ে বসে। শিক্ষকের ওপর ওজন বিভাগ ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, কারণ তাঁরা নিজেরাই অনেকে সুশিক্ষিত নন। সেই জন্য শিক্ষাপদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন আর্টের পারিপার্শ্বিক বিচারের সুযোগ থাকা চাই, তেমনই তৃতীয় অধ্যায়ে এক একটি চিত্রে কি ভাবে সমগ্র

চিত্রধারা ব্যক্ত হয়েছে, দেশের ও জাতির চাহিদা ও মনোবৃত্তির প্রকাশ হয়েছে তারই পুনরায় বিচার থাকবে। বলা বাহুল্য এই বিচারের স্তর ও গুরুত্ব সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হতে বাধ্য। তবেই আর্ট শিক্ষা আর্টের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারবে। এইটাই হল শিক্ষার প্রকৃত ফন্দি। আর্টের ইতিহাসে নব্য সৃষ্টির ইঙ্গিত থাকে না, কোন কিছুর ইতিহাসেই থাকে না। ইঙ্গিত ফোটে সেই শুভ মুহূর্ত্তে যখন ইতিহাসের শায়িত দণ্ড চৈতন্যের ঊর্দ্ধলম্বকে অতিক্রম করে। পিকাসোর মতন অত বড় আর্টিষ্টের উক্তি 'the artists' business is to produce the work, and the observers' is either to be bowled over or not bowled over by it'—অতি-সারল্য-দোষে দুষ্ট। তাঁর নিজের কর্ম্মধারাতেই তার অপ্রমাণ, জীবনের সমগ্রতার কাছে সেটি অগ্রাহ্য।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শুভশ্রী—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'শুভশ্রী' তেরোটি ছোট গল্পের সংগ্রহ। এ বইয়ের কোনো রচনাকেই ছোট গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা যায় ব'লে আমার মনে হয় না। প্রতিটি রচনার আয়তন ও আঙ্গিক যদিও অতি-ছোট গল্পের বা রেখাচিত্রের, বলবার ধরণ হলো ছোট হালকা প্রবন্ধের ; এবং মূল বক্তব্য গল্পের বক্তব্য বিষয়ের মতো প্রচ্ছন্ন নয়, প্রবন্ধের বক্তব্যের মতোই প্রারম্ভ থেকে স্পষ্ট। গল্পের মূল বিষয়বস্তু বা বক্তব্য ধীরে ধীরে পাঠকের অজ্ঞাতে গড়ে ওঠে ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে, কিন্তু উক্ত বইয়ের প্রতিটি ঘটনা গড়ে উঠেছে বক্তব্যের নির্দ্দেশে, এবং সে-গঠনের ক্রমপরিণতি আগ্রহকে আমন্ত্রণ করে না মোটেই। এ আয়তনের ছোট গল্প

সার্থক হয় তখনই পাঠক যখন সুরু থেকেই এগিয়ে যাবার জন্যে একটা তাগিদ বোধ করে, এবং একটু যেতে না যেতেই আচম্‌কা একটা সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপ্ত ইঙ্গিতে এসে তাকে থেমে পড়তে হয়। থমকে থেমে পড়তে হয় ব'লে পাঠকের কৌতূহল সেখানে ব্যর্থ হয় না; এই আকস্মিকতার মধ্যেও পূর্ণতার পরিচয় থাকে। ছোট গল্পে, বিশেষ ক'রে এ আয়তনের অতি-ছোট গল্পে, লেখক পাঠকের অনেকখানি কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রে অনেক কিছু ব'লে যান সামান্য বলার ভেতর দিয়ে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে হয় লেখক অনেক কথা বলেছেন সামান্য একটা কথা প্রমাণ করবার জন্যে যা তিনি গল্পের সুরুতে বা খানিকটা এগিয়েই প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। বইয়ের প্রথম গল্প 'দার্জ্জিলিং এফেক্ট'-এর সুরুর সাত-আট পাতায় দার্জ্জিলিং-পরিচয়ের পর্ব্বটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় গল্পের বক্তব্যে এসে পৌঁছান মাত্র। আবার পেণ্টুলন কেনার কথা থেকে হোটেলের লোকদের 'দার্জ্জিলিং এফেক্ট' বলার পর বাকিটা হ'য়ে পড়ে বাহুল্য—তার মধ্যে ঘটনা বা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য কোনো কিছুই নেই যার জোরে ওখানে তা গল্পের অঙ্গ বৃদ্ধি করার দাবি করতে পারে। 'চ্বী' বা 'হাইজিন' ধরণের গল্প দু'পাতা এগুবার পরই গল্প হিসেবে ঢিলে হয়ে পড়ে। একমাত্র 'পদ্মা' গল্পটিকে ভালো 'রেখাচিত্র' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলায় এ ধরণের সার্থক 'রেখাচিত্র' রচনা করেছেন একমাত্র 'বনফুল'; অবশ্য সেগুলো 'রেখাচিত্র', ছোট গল্প নয়। 'বনফুলের' সে-রচনায় বক্তব্য বা মরালও থাকে, এবং সেটা ব্যাপ্ত বা প্রচ্ছন্নও নয়, তবু তিনি গল্পকে ছাপিয়ে যেতে কখনও দেন না—কারণ পাঠকের কৌতূহল শেষ অবধি ধ'রে রাখবার কৌশল তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে।

গল্পগুলো গল্প হিসেবে সার্থক না হলেও রচনা হিসেবে ব্যর্থ নয়। এদের রেখাচিত্র বা নক্সা নাম দিয়ে আসরে নামালে লেখক তাঁর রচনার উপর কিছুটা সুবিচার করতেন। প্রতিটি রচনায় সুন্দর একটি ব্যাপ্ত ব্যঙ্গের সুর আছে যেটুকু বেশ উপভোগ্য। তা ছাড়া লেখকের শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীটুকুও খুবই প্রশংসার যোগ্য। লেখার ধরণ থেকে মনে হয়, এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ জাতীয় বক্তব্য লেখক যদি হালকা প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতেন তো রচনা তাঁর পুরোপুরিই সার্থক হত—যে ধরণের লেখা বাঙ্গলার উন্নত সাহিত্যে

আজও বিরল। এ গল্পগুলো এ-বইয়ে বিজ্ঞাপিত 'লেখা'র সরস প্রবন্ধ কয়টি পড়বার জন্যে আমাকে বিশেষভাবে আগ্রহী ও উৎসাহী ক'রে তুলেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—রবীন্দ্র-সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত অমল হোম-সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিকী 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে, কিন্তু সাহিত্যিক পত্রিকা হিসাবে নয়। 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট্'-এর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অতি কম, যদিও এর সম্পাদক সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নন। কিন্তু এই পত্রিকাটির 'বিশেষ পরিশিষ্ট' রূপে কিছুদিন পূর্বে যে রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যে-কোনো সাহিত্যিক বা অ-সাহিত্যিক পত্রিকার পক্ষে তা' গৌরবের বিষয়। এত তথ্য ও এত চিত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রকাশিত কোন পত্রিকা দূরের কথা কোনো বইতেও ইতিপূর্বে আমাদের চোখে পড়েনি। এই একটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আশি বছরের জীবনের সকল বৈচিত্র্য, সকল ধারা যে-ভাবে আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা সিনেমা চিত্রের মতন চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হচ্ছে সম্পাদক-সঙ্কলিত রবীন্দ্র-জীবনের দীর্ঘ ঘটনাপঞ্জী। মূল্যবান প্রবন্ধও অনেকগুলি আছে। চিত্র অসংখ্য, বেশির ভাগই ফোটোগ্রাফ। শুধু এই ফোটোগ্রাফগুলির মধ্য দিয়ে বাল্য হতে বার্ধক্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে শ্রীযুক্ত অমল হোম শুধু দক্ষ সম্পাদক নন, অতি নিপুণ প্রযোজক।

বৈশাখী—বার্ষিকী, প্রথম সংখ্যা, ১৩৪৮। সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ। দাম এক টাকা।

'বার্ষিকী' কে পত্রিকার পর্যায়ে ফেলা উচিত না বইয়ের তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। 'বৈশাখী'-র মতন বার্ষিকীকে যদি কেউ বই ব'লে গণ্য করেন খুব

অসঙ্গত হবে না। কিন্তু দুই কারণে পত্রিকা-প্রসঙ্গে এই জাতীয় বার্ষিকীর আলোচনা স্থান পেতে পারে। প্রথমত, প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা ছাড়া এমন কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা এতে আছে যেগুলিকে বিশেষভাবে সাময়িক বলা যেতে পারে—যথা, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সাম্প্রতিক চিত্রকলা, সংবাদ-পত্র ও পত্রিকা। অবশ্য এই বিষয়গুলি নিয়ে এমন আলোচনা করা যেতে পারে স্থায়ী সাহিত্যে যা স্থান পেতে পারে। কিন্তু 'বৈশাখী'-তে তা হয়নি। না হওয়াটা অবশ্য দোষের কথা নয়। বরঞ্চ, 'বৈশাখী'-র বিশেষত্বই এই যে সাময়িক সাহিত্যিক আবহাওয়ার প্রকৃষ্ট বাহক ব'লে গণ্য হবার দাবী 'বৈশাখী' অর্জন করেছে। এই জন্যে ঐ আলোচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য 'বৈশাখী'র সব রচনাগুলি সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। এমন একাধিক গল্প বা কবিতা এতে আছে যা অনেক বছর পরেও সাহিত্য ব'লে গণ্য হবে।

আরো এক কারণে এই জাতীয় রচনা-সংহার পত্রিকার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। তা এর পাঁচমিশালী উপাদান। অবশ্য বহু সঙ্কলন-গ্রন্থ এই রকম পাঁচমিশালী। যদি বিশেষ কোনো সময়ের ছাপ এই জাতীয় সঙ্কলন-গ্রন্থে পরিস্ফুট হয় তাহলে সেগুলি নামে না হলেও প্রকৃতিতে পত্রিকার পর্যায়ভুক্ত বলতে হবে।

যাই হোক এই জাতীয় পাঁচমিশালী রচনার সমাবেশের জন্যেই 'বৈশাখী' এত উপভোগ্য হয়েছে। আশা করি পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও সাময়িক সাহিত্যের ও শিল্পের এই রকম উপভোগ্য পরিচয় আমরা পাব।

হালখাতা—ছোটদের বার্ষিকী। যুগ্ম-সম্পাদক: শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র। প্রথম বর্ষ, ১৩৪৮। দাম—এক টাকা। "আলো সাহিত্য সঙ্ঘ," ৪১-ডি, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

'হালখাতা'ও বার্ষিকী—কিন্তু ছোটদের, অর্থাৎ শিশুদের নয়, কিশোরদের। সর্বপ্রথম আছে "বিশ্বকবির আশীর্বাণী":

আমি অতি পুরাতন, এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই আছে কোনো গুণ
ভিতরে নবীন থাকে অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপা গাছে নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে অমৃতের ভাষা ॥

বাংলাদেশের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গল্প প্রবন্ধ নাটিকা ও কবিতাতে 'হালখাতা' সমৃদ্ধ। যথা, পরিমল গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মেঘেন্দ্র লাল রায়, 'সম্বুদ্ধ,' মাণিক বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি (গল্প); সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি, কাজি আপসার উদ্দিন আহমদ, সজনীকান্ত দাস, গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার (প্রবন্ধ); যতীন্দ্রমোহন বাগচী, হুমায়ুন কবির, সুনির্ম্মল বসু (কবিতা); 'বনফুল,' প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (নাটিকা)। আরো অনেক লেখকের রচনা আছে। প্রায় সবগুলি রচনাই কিশোরদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। দুঃখের বিষয় সব থেকে খারাপ হয়েছে কবিতাগুলি—এগুলি বাদ দিলে বইটির কিছুমাত্র হানি হত না। ছাপা ও বাঁধাই, বিশেষভাবে প্রচ্ছদপট অতিশয় মনোরম।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
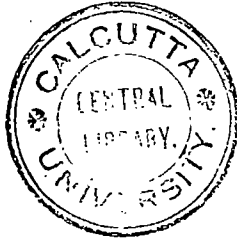
১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৪৮

পরিচয়

প্রকৃত 'যোগ' কি ?

(২)

গত বারের 'পরিচয়ে' 'প্রকৃত যোগ কি ?' এই প্রসঙ্গের আলোচনায় আমাদিগকে অগ্নিরূপী পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ প্রত্যগাত্মার কথা বলিতে হইয়াছিল—যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি সহস্রশঃ। ব্রহ্মখণ্ড ঐ প্রত্যগাত্মা স্বভাবতঃ লোকোত্তর (transcendent)—অ-প্রপঞ্চের অধিবাসী, বিদেহী। তথাপি তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রপঞ্চের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সদেহী হন—মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—এবং জীবাত্মা ও ভূতাত্মারূপে পঞ্চভূমিক প্রপঞ্চে বিহরণ জন্য অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় এবং বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশ-ষট্‌ক-রূপ উপাধি গ্রহণ করেন। এইরূপে প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে অবতরণ সর্বাঙ্গ হয় এবং তিনি শরীরের সহিত 'সারূপ্য' করিয়া—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

কিন্তু অবরোহণ বা Descentই শেষ কথা নয়। অবরোহণের পর অধিরোহণ বা Ascent, প্রবৃত্তির পর নিবৃত্তিমার্গ। ঐ মার্গে যাত্রা করিয়া প্রত্যগাত্মা আবার স্বধাম অপ্রপঞ্চে সুস্থিত হন। পূর্ব প্রবন্ধে অবরোহণের কথা বলিয়াছি—এইবার অধিরোহণের কথা বলি। অবরোহণকে ইংরাজিতে Involution এবং অধিরোহণকে Evolution বলা যাইতে পারে। ইহা ঠিক

যেন উল্টা রথ বা পুনর্যাত্রা। কিরূপে ঐ পুনর্যাত্রা নিষ্পন্ন হয়? এ সম্পর্কে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি বলিয়াছেন :—

The Four have to become the Three and the Three to expand into the Absolute One.

অর্থাৎ, ঐ চতুষ্টয়ীকে ত্রয়ী হইতে হইবে এবং ঐ ত্রয়ীকে শুদ্ধাদ্বৈতে একীভূত হইতে হইবে। এ প্রসঙ্গে মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি আরও বলিয়াছেন :—

'Merge Personality in the Ego and the Ego in the Monad and thereby become one with the Universal All.

অর্থাৎ, ভূতাত্মাকে জীবাত্মাতে লয় কর এবং জীবাত্মাকে প্রত্যগাত্মায় বিলয় কর এবং ঐরূপে বিশ্বাত্মার সহিত 'অনন্য' হও। ইহাই যোগের চরম ও পরম। যখন জীব এরূপ যোগসিদ্ধ হন, তখনই তাঁহার নিয়তির প্রপূর্তি। অনাদি অতীতে যে ব্রহ্ম হইতে জীব বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, এতদিনে আজ সেই ব্রহ্মের সহিত তাহার সাযুজ্য ঘটিল। সে এখন বলুক—ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম—যিশুখৃষ্ট পরমপিতার সহিত ঐক্যানুভূতিতে যেমন বলিয়াছিলেন —'Consummation est, it is finished' অথবা নির্বাণ লাভ করিয়া বুদ্ধদেব যেমন বলিয়াছিলেন—বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং'।

ঐ যোগের প্রণালী কি? কি প্রকার সাধনে ঐ সিদ্ধি সমীপস্থ হইবে? সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐ প্রণালী উপাধির বিশোধন (Refinement of the Vehicles) এবং সংবিতের সংপ্রসারণ (Expansion of the Consciousness)। এক কথায় the unmaking and remaking of himself. অর্থাৎ, যিনি যোগী হইতে চান, সাধারণ মানুষের মত তাঁহাকে সংসার স্রোতে অলস ভাবে ভাসিয়া চলিলে চলিবে না—তাঁহাকে আত্মস্থ হইয়া, সন্নদ্ধ হইয়া, যোগমার্গে প্রবেশ করিতে হইবে এবং যোগসাধনে নিবিড় মনোনিবেশ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ঐ সাধন সুদীর্ঘকাল সাপেক্ষ। ঐ পথে সাধককে সতর্কতার সহিত শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ করিতে হয় এবং বৎসরের পর বৎসর ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়—requiring years of strenous self-discipline, ত্বরা ও ব্যাজ উভয়ই বর্জন করিতে হয়—যাহাকে 'without haste but without rest' বলা হয়।

যাহাকে আমরা উপাধির বিশোধন বলিলাম—এদেশে তাহার সাধারণ নাম—'চিত্তশুদ্ধি'। এই চিত্তশুদ্ধি সম্পর্কে উপনিষদ্, গীতা, ধম্মপদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেকানেক অমূল্য উপদেশ আছে। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক—কারণ, চিত্তশুদ্ধি যে ধর্মজীবনের অবশ্যম্ভাবী অবলম্বন এ বিষয়ে মতান্তর নাই। তথাপি নিম্নে ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম—

The yogi has to cease from wrong-doing, give up self indulgence, become passion-proof, crushing and annihilating all desires in the retort of an unflinching will, cultivate charity and tolerance and love for all, perform *karma* impersonally in His name and for His sake—in a word renounce the self, unconditionally and absolutely, in thought as in action.

অর্থাৎ, যোগীকে দুষ্কৃত হইতে বিরত হইতে হইবে—রিক্ত ও অকিঞ্চন হইতে হইবে—করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা অভ্যাস করিতে হইবে,—তিতিক্ষায় সিদ্ধ হইতে হইবে,—সংযমের অগ্নিতে কামনা-বাসনা ছারখার করিয়া 'অকাম নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকাম' হইতে হইবে,—সর্বভূতের হিত-রত হইতে হইবে,—আত্মপর ভেদ ভুলিয়া সকলকে ভালবাসিতে হইবে—উদাসীন ভাবে ব্রহ্মার্পণ করিয়া কর্ম করিতে হইবে,—কায়েন মনসা বাচা নিরহংকার ও নিরভিমান হইয়া সর্বতোভাবে অহংকে বলি দিতে হইবে।* পতঞ্জলি দুইটি শব্দ দ্বারা এ সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়াছেন—যম ও নিয়ম। পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের

---

* এ সম্পর্কে মিসেস্ বেসেন্ট কয়েকটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন—আমরা এই পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Purity, selflessness, devotion, utter self-surrender, utmost abnegation must be found in the yogi ere he touches the ark of occultism, for without these any success is a defeat." So he has, she says, to give and not to take, help and not to hold, and pour out without looking for return and to go forward, donning, as she puts it, the armour of purity and the helmet of unselfishness. In a word, he has to transcend the personality, nay eliminate it altogether, so that the very idea of the separated life is entirely obliterated and he becomes pure—physically, emotionally and intellectually, and the master of his thoughts and passions.

উপদেশ দিয়াছেন এই যম ও নিয়ম তাহার প্রথম দুই অঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম। আর শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—ইহাদের নাম নিয়ম।

এই যমনিয়মের ভিত্তির উপরই যোগীকে সম্বিতের সম্প্রসারণ গড়িয়া তুলিতে হয়। পতঞ্জলি তজ্জন্য প্রথমতঃ আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের উপদেশ করিয়াছেন। আসন কি? স্থির-সুখম্ আসনম্ (Posture)—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ (গীতা)।

ইহার পর প্রাণায়াম—প্রাণের আয়াম (control)। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংযমন দ্বারা এই প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—যোগসূত্র, ২।৪৯

এ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ এই ঃ—

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ—৫।২৭

'যোগী প্রাণ ও অপানকে নাসিকার অভ্যন্তরে সমীকৃত করিবেন।'

ঐ সঙ্গে প্রত্যাহার—উহাই বহিরঙ্গ যোগের শেষ অঙ্গ। প্রত্যাহার কি? ইন্দ্রিয় সকল নিরুদ্ধ করিয়া আবৃত্তচক্ষুঃ হওয়া—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্ চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ
—গীতা ৫।২৭

'যোগী বাহ্য-বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্বক ভ্রু-যুগলের মধ্যে চক্ষুঃ সংস্থাপিত করিবেন।'

এই প্রত্যাহার এবং কঠোর নিয়ম, সংযম ও আত্ম সংযমনের ফলে সাধকের ভূতাত্মা বশীভূত হইলে তাঁহার শরীর-ত্রয় শুদ্ধ পূত হইয়া যেন ভগবানের অঙ্গুলি সঞ্চালনের উপযোগী বীণাতন্ত্রীতে পরিণত হয়—'The yogi's bodies become perfect instruments for the Divine Player within to play upon'.

ইহার পর পতঞ্জলি অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলিয়াছেন। ধারণা কি ?

দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা—যোগসূত্র, ৩।১

'একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনের নাম ধারণা'। ইহার ইংরাজী নাম Concentration। 'True concentration is self-forgetting attentiveness.'। ঐ ধারণা এমন তীব্র ও একাগ্র হওয়া উচিত যেন ধারণার বিষয় ভিন্ন অন্য আর সমস্তই যোগীর চিত্ত হইতে নিরাকৃত হয়।

ধারণার পর ধ্যান। ধ্যান কি ?

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—৩।২ সূত্র

চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান।

যে কিছুই ধ্যানের বিষয় হইতে পারে—যথাভিমত-ধ্যানাদ্ বা—

"A picture, a statue, a tree, a distant hillside, a growing plant, running water, little living things." We need not, with Kant, go to the starry heavens. 'A little thing—the quantity of a hazel nut will do for us, as it did for Lady Julian long ago."

এইরূপে যোগীর চিত্তকেন্দ্রের মেরুর পরিবর্তন ঘটে—The yogi alters his mental equilibrium—এবং তাঁহার ভূতাত্মা—যাহা সাধারণ জীবে সর্বদা প্রবুদ্ধ—তাহা নিষুপ্ত হয় এবং তাঁহার অন্তরাত্মা জাগরিত হইয়া উঠেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী—গীতা

এবং যোগী বুদ্ধির ভূমি ছাড়াইয়া বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং বিশ্লেষণের ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সংশ্লেষণে সুস্থিত হন—rises from analysis to synthesis.

ধ্যানের পরই সমাধি। যখন ধ্যান পরিপক্ক হইয়া ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার মত ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি (Contemplation)। *

---

* এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ পাশ্চাত্যের উক্তি এই :—

The aspirant has to pass progressively from concentrated thought (Dharana) to meditation (Dhyana) and from meditation to profound contemplation (Samadhi) in which everything within him stands still.

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ—যোগসূত্র, ৩।৩

এইরূপে চিত্ত স্থিতি লাভ করিলে যোগী তাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, সুসূক্ষ্ম যে যে আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তদনুসারে তাঁহার চিত্ত আকারিত হয়। এই অবস্থার নাম 'সমাপত্তি'। ইহা চতুর্বিধ—সবিতর্ক, নির্বিতর্ক সবিচার ও নির্বিচার। ইহারা সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নামান্তর।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ—১।৪৬ সূত্র

তাহার ফলে যোগীর 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ঐ প্রজ্ঞার উদয়ে সমস্ত চিত্ত-মল বিধৌত হওয়ায় সম্বিতের এতই সংপ্রসারণ হয় যে, অজ্ঞেয় অল্পই অবশিষ্ট থাকে—যেন 'আকাশে খদ্যোত'।

জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ম্ অল্পম্ (সম্পদ্যতে)
—যোগসূত্র, ৪।৩১

ঐ অবস্থায় যোগীর সত্যের সাক্ষাৎকার হয় এবং তিনি সম্বিতের উচ্চতম স্তরে আরূঢ় হইয়া বিশ্ব সম্বিতের সংস্পর্শ লাভ করেন।

ঐ প্রজ্ঞা-জাত সংস্কার চিত্তের অন্যান্য সংস্কারকে বাধিত করে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য সংস্কার-প্রতিবন্ধী—১।৫০

যোগী যখন এই সংস্কারকেও নিরোধ করেন, তখন তাঁহার নির্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে super-সমাধি বলা যাইতে পারে—ইহাই যোগের চরম অবস্থা।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ
—যোগসূত্র, ১।৫১

ঐ নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান একাকার হইয়া পুরুষ স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্—যোগসূত্র, ১।৩

এই কৈবল্যের অবস্থায়—যখন প্রগাঢ় সমাধি নিবিড়তম হয়, তখন এই 'দেবালয়' দেহে (দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ) স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ পুরুষের জ্যোতিঃ

বিশ্বব্যাপী হইয়া পরম জ্যোতির সহিত একীভূত হয় এবং সেই অন্তরতম নিস্তব্ধতায় অনাদনাদের গম্ভীর ঝঙ্কার শ্রুত হয়।

When the সমাধি deepens into what Patanjali calls 'অসংপ্রজ্ঞাত' —the soul is left in darkness and alone and the inward Man is at last revealed in spiritual spendour in his temple of flesh—for, in that silence the voice of the Divine is heard and in the darknees the Light Eternal shines.*

এ সম্পর্কে ট্রান্‌স্‌ভাল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হর্ণ্‌লি সাহেব (Prof. R. F. A. Hœrnlie) কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

When the thinker has withdrawn into his innermost self behold! all barriers melt away and the self mingles with the boundless All, with which from the first it was one.

এই যে সম্বিতের সীমাহীন সম্প্রসারণ—ইহার কথা আমরা উপনিষদের ঋষিদিগের মুখে বহুপূর্বে শুনিয়াছিলাম—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

"মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করেন, 'আমিই এই বিশ্ব'। ইহাই তাঁহার পরম অবস্থা।"

ইহাই বুদ্ধদেবের নির্বাণ। ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া স্যার এডুইন্ আর্ণল্ড্ তাঁহার Light of Asia কাব্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

He goes unto Nirvana. He is one with life.
Yet lives not. He is blest, ceasing to be.
* * * Seeking nothing he gains all,
Foregoing self, the Universe grows 'I'.

যখন The Universe grow's 'I', তখনই সম্বিতের সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়।

---

* In that *lux eterna*, all barriers melt away and the self mingles with the boundless All.

In that exalted ecstasy, the yogi gets unknown revelations of glory, wisdom and bliss.

এই লোকোত্তর অবস্থায় যোগী খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে এককে দর্শন করেন। তখন তাঁহার দৃষ্টিতে—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্রেত হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥

এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গীতা ভগবানের মুখে বলিয়াছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও আমাদিগকে অভয় দিয়াছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা, ৬।২৯

অর্থাৎ, যিনি যোগযুক্তাত্মা তিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন করেন—তিনি সর্বত্র 'সমদর্শন' হন।

ইহাই প্রকৃত যোগ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মোহানা

(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তখনও সকাল হয় নি, নানা স্বরের ভোঁ-তে খগেন বাবুর ঘুম ভাঙ্গল। থামতেই চায় না, সরু মোটা ঘন পাৎলা গম্ভীর হালকা, কেউ ডাকছে উঠে পড়্, কেউ বলছে ছুটে আয়, ঐ দ্যাখ্ মজুরণী বাজরার রুটি পাকিয়ে তাতে নুন মাখাচ্ছে, খোকার বুড়ো আঙ্গুলের নখে খয়েরী আফিমের পালিশ ঘষলে, বাচ্ছা চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়বে, চেঁচিয়ে মার রোজগারের ক্ষতি করবে না, বে-মওকা দুধ খেতে চাইবে না। একটা আওয়াজ ষ্টীমারের মতন একটানা, তৈলধারাবৎ, ভবিষ্যধর্ম্মের অনাহত ধ্বনি। খগেনবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন।

ছোকরা চা আনল। টঙ্গা পাওয়া শক্ত, তবে হুকুম পেলে সারাদিনের জন্য, সস্তায়, টাকা পনের ও পেট্রলের দাম দিলে, একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত তখনই সে করতে পারে। রমলা কি বলতে যাচ্ছিল, খগেনবাবু বাধা দিলেন। চা পানের পর খগেন বাবু হোটেলের সন্ধানে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন।

কানপুরের ষ্টেশন বড়, কিন্তু সামনেকার রাস্তা অপ্রশস্ত, অযোগ্য। সহরের মুখ নেই, থাকতে পারে না। রাস্তা পাকা, কিন্তু কয়লার গুঁড়ায় কালো, আকাশ ধোঁয়ায় ভরা, বারো বামণের তের চুলোর ধোঁয়া শাদা থামের মতন ওপরে ওঠে, ওপর থেকে কলের চিমনীর ওলট-খাওয়া ধোঁয়া কয়লার ভারে নীচে নামতে চায়—দুটোর রফায় সূর্য্যের আলো হ্রাস পায়। এক ফোঁটা হাওয়া নেই, রুদ্ধশ্বাস সহর, দুর্ভেদ্য নিম্নগামী আপ্‌লুর্টন স্তর তাকে চেপে মারছে। রেল-লাইন পার হয়ে সহরের প্রশস্ত রাস্তা, তার একধারে বড় বড় দোকান, অন্য ধারে নীচু ঘরের সারি, টিনের চাল দেওয়া, খাপরার। ছোট বড়র ঘেঁষাঘেষি বসবাস। একটু এগিয়ে পুরানো ধরণের বাড়ির নীচের তলায় দোকান ঘর। মধ্যে মধ্যে বসতবাটিও রয়েছে সন্দেহ হয়। হঠাৎ-বড়-মানুষের

বাড়ির কুটনো-কোটা, ভাঁড়ার-বার-করা গিন্নী কর্তার মান রক্ষার জন্য কস্তা-পেড়ে সাড়ির আঁচলে ভারি চাবির গোছা বেঁধে, গালে পান দোক্তা ঠেসে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে রূপোর পানদান নিয়ে, ক্ষয়িষ্ণু চুলে পাতা কেটে বিশ ভরীর চুড়ি আর বেনারসী প'রে সান্ধ্য পার্টিতে বেরুবেন, এই সব বাড়ি থেকে, খাতির পেতে।

একটা লেভেল ক্রসিংএর ফাটক বন্ধ সকালবেলাতেই। কলের সাইডিংএর মালগাড়ি এগুচ্ছে পেছুচ্ছে পনের মিনিট ধরে, সহরের যাতায়াত থামিয়ে। ফাটক খুলে গেল, ওপারে মস্ত মিল্, ফাটকে কনষ্টেবলের গাঁদি। আরো আগে বড় রাস্তার বাঁ পাশে বাজার, ছেঁড়া টায়ারের, কাটা কাপড়ের, পুরানো জামার, সাইকেল-মেরামতের। রাস্তার ওপর দো-দো পয়সার খেলনা পাতা। কোথাও হোটেল নেই।

সহরে এক চঞ্চলতার চিকিমিকি। রাস্তার পাশে খোলা যায়গায়, চৌরাহায়, বিশ পঁচিশ জন লোকের জটলা। আরো এগিয়ে বাঁ দিকে বড় মাঠে লোকে লোকারণ্য, ডিমের পোচ্‌এর মতন মাঝখানে ফোলা, কিনারায় ভিড় গড়িয়ে পড়ছে। ফোলা জায়গার মাথায় খদ্দরের টুপী। রোদ্দুরের তেজ বেড়ে চল্ল, শীঘ্রই হোটেল, না হয় বাড়ীর সন্ধান চাই। খগেন বাবু একজন ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, 'একটা ভাল হোটেল কোথায় পাওয়া যায় যেখানে ভদ্র পরিবার সপ্তাহ খানেকের জন্য থাকতে পারে?' 'পাওয়া যায়, তবে দেশী লোকের জন্য নয়। একবার তিলক হোটেল দেখুন।' একটি দেশী ও গোটাদুই বিদেশী হোটেলের ঠিকানা পাওয়া গেল। ফেরবার পথে বড় মিলটার সামনে একটা সভা চলছে, পাশে পুলিশ প্রহরী। কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে, খগেন বাবু চলে যাচ্ছেন এমন সময় বক্তা মুখ ফেরাল পরিচিত ভঙ্গীতে। বিজন দেখতে পায়নি।

এখানে বিজন এল কি করে! রোদ্দুরে মাথা ধরবে ছোকরার, একি খদ্দরের টুপির সাধ্যি। টেনিস ছেড়ে দেশপ্রেমের খেলা ধরেছে, তা ভাল, তা ভাল, রমাকে কি একটা লিখেছিল, রমার সঙ্গী হল, একেবারে একলা থাকে, নিজেকে আরো সরিয়ে রাখলে শেষে পাগল হবে, বেচারী নিজের প্রতিবেশ চায়, যে-আশা করেছিল তা পেল না, ভালবাসুক না বিজনকে, বোনের মতন,

মা'র মতন। পরে সুজন এসে জুটবে, জমবে ভাল রমাদির দুজনকে নিয়ে, পরিচয়ের পরিধি বেড়ে যাবে, জমবে ভাল, অনেক নিয়ে, তা ভাল তা ভাল।

হাত বাড়িয়ে বিজন কাকে ডাকলে। ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে এল, পিপের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলে। বক্তৃতা, আর বক্তৃতা, মধ্যে মধ্যে ইন্‌কিলাব্, আরো কত নিরর্থক চীৎকার।

বিশালকায় নদীর দুর্নিবার বহতা বাঁকের মুখে ঘাটে আটকেছে। পুরানো ঘাট, এককালে সওদাগর মশাই ময়ূরপংখীতে পণ্যদ্রব্য ঠেসে লক্ষ্মীর সন্ধানে বেরতেন, মাথায় থাকত আদিম দেবদেবীর অভিশাপ। এখন ঘাটের ধাপ ভাঙ্গা, বহতা দূরে সরেছে, সামনে পড়েছে কাশে ভরা প্রকাণ্ড চড়া। হয়ত কোনো কালে একটা অশথ গাছ ভাসতে ভাসতে ডোবা চড়ায় ঠেকেছিল, তাকে ঘিরে খড় কুটো জমল, সেটার আশ্রয়ে তৈরী হল চড়া। স্রোত রইল না, বজরা চলল না, আলস ভরে ভাসে কেবল জেলে ডিঙ্গী, গ্রীষ্মকালের ভোরবেলা পল্লীবধূ বালি ভেঙ্গে জল আনতে যায়, তাও শুখল বুঝি এ ক'বছর। এই হল দেশী বক্তৃতার স্বরূপ, দেশী সাহিত্যের প্রকৃতি, বালিভরা খাত আর কথার চড়া। অবশ্য, আত্মপ্রকাশের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা কর্ম্মপ্রবাহ থেকে বিরতি থাকে। চিন্তা ও কাজ সপিণ্ড হতে পারে কিন্তু যমজ নয়। এককাল ছিল যখন রক্তস্রোত থামাতে বাক্যের প্রয়োজন হত। পরে বাক্যের ছড়াছড়ি, পুঁথির পাহাড়, আদর্শের বড়াই, আর্টের জন্য আর্ট, চিন্তার জন্য চিন্তা, কথার জন্য কথা। প্রতিক্রিয়ায় নেচে উঠেছে রক্ত। ভারতবর্ষের রক্ত ঠাণ্ডা, কারণ নাকি তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির তুষার গলা অহিংস ধারা মিশেছে। 'হয়ত বা এদেশে এখন স্রোতই নেই, চরের বালি চিকচিক করতেই জানে, জোর তার বুকে কাশ ফুল দোলে। লোকে বলে বাঙ্গালী বেশী কথা কয়, কিন্তু এদেশে কথার রাজত্ব সুরু হয়েছে, আর রক্ষে নেই, এইবার সাহিত্যের পালা, মাসিক পত্র, সাহিত্য সভা, কে সাহিত্য সম্রাট, কে সাম্রাজ্ঞী, খেয়োখেয়ি দলাদলি তাই নিয়ে। ভগবান রক্ষা করুন এই অ-বাঙ্গালী ভারতীয় জাতিসমূহকে, যেন তারা সাহিত্যের খপ্পরে পড়ে আত্মপ্রসাদে উচ্ছন্ন না যায়।

'এই যে আপনি! কোথেকে? রমাদি?'

'ঘুরতে ঘুরতে কানপুরে হাজির।'

'রমাদি ?'

'ষ্টেশনে।'

'ষ্টেশনে কেন ? কবে এলেন ? আজই ?'

'এসে পড়লাম।'

'বাসা কোথায় ?

'তাই খুঁজছি। একটু সাহায্য করুন না ?'

'আপনি টাপনি ছেড়ে দিন। তাই ত', আজ আমরা বড় ব্যস্ত। তা হোক্, চলুন, ইনি সফীক্। কমরেড, একবার আমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে।'

'যাও। ওখানকার ব্যাপারটা দেখে এস।'

পথে বিজন খগেন বাবুকে সহরের চঞ্চলতার কারণ বুঝিয়ে দিলে। কানপুরে মজুরের দল এককাট্টা, সেইজন্য তারা মালিকদের চক্ষুশূল। তাদের সভার নাম 'মজ্‌দুর সভা'। আগে যে সভা নিরীহ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ছিল, এখন তার সংখ্যা বেরেছে, ফলে, সক্রিয় হয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি এই যে মজদুর সভার ক্রিয়াকলাপ আজ মজদুরদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে আবদ্ধ নয়, ক্রমেই পলিটিক্যাল, অর্থাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠছে। এই শিশুকে আঁতুড় ঘরেই মারতে না পারলে সমূহ বিপদ, অতএব মজদুর সভার কর্ম্মীদের জব্দ করা চাই। উপায় হল বিনা অজুহাতে তাদের চাকরী খাওয়া। মজদুর সভা আজ সচেতন মজুরদের অগ্রদূত, তাই সে আজ বাঁচবার জন্য লড়তে প্রস্তুত। পরের কৃপায় বাঁচা নয়, আপন শক্তিতে বাঁচা। একজনকে তাড়ালে সমগ্র মজদুর সভা তার হয়ে লড়বে। খগেন বাবু বল্লেন, 'এখন সরকার দেশের, অতএব কাজটা শক্ত হবে না।'

'এক হিসেবে শক্ত, অন্য হিসেবে সোজা। কংগ্রেস সরকার কানপুরের গোলমাল থামাবার জন্য একাধিক কমিটি বসিয়েছিলেন। শেষ কমিটি একটা প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেছে। প্রথমে মালিকরা তার সামনে সাক্ষ্য দিতে নারাজ হয়, পরে বাধ্য হয়ে রাজি হল বটে, কিন্তু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলো তারা মানল না। শেষে অবশ্য বোঝাপড়া হয়েছে, কিন্তু সেটা নিতান্ত মৌখিক।

ভেতরে ভেতরে তারা উঠে পড়ে লেগেছে যাতে সব পণ্ড হয়। গুপ্ত উদ্দেশ্য অবশ্য স্বদেশী সরকারকে বিপদে ফেলা। বিপদ এই, আমাদের সরকারও শান্তিতে রাজ্য চালাতে চান, সেটা কত অসম্ভব তাঁদের ধারণা নেই। সহানুভূতি থাকলে কি হয়। থুতুতে ছাতু ভেজে না।'

'আপাতত ব্যাপারটা কি?'

'মজতুর সভার একজন কর্ম্মীকে মালিক বরখাস্ত করেছে, ছুতো সে নাকি কাজে বড় ঢিলে। অথচ সে একজন সত্যকারের হুসিয়ার লোক। কখনও কেউ তার কাজে গাফিলতী দেখাতে পারে নি। কিন্তু তার দোষ যে সে মজতুর সভার বড় পাণ্ডা। সভার তরফ থেকে আপত্তি জানান হয়েছিল, ফল হয় নি। যদি মাত্র একটা দৃষ্টান্ত হত, তবে বোঝা যেত, কিন্তু এ রকম প্রায়ই ঘটছে। আমরা ষ্ট্রাইকের জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় মালিক জন-কয়েক নিজেরাই লক্-আউট করেছে। এটা অসহ্য!'

'ব্যাপারটি ষ্ট্রাইক না লক্-আউট?'

'ছুইই, যে ভাবে দেখেন। আদৎ কথা, বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করা চাই। ধর্ম্মঘট জোরে চালাতে হবে।'

বিজনকে নিয়ে খগেনবাবু ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে এলেন। আরসীতে ছায়া পড়তে রমলার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'একেই বলে দৈব। হঠাৎ দেখা। বিদেশে ওরই আশ্রয়ে থাকতে হবে।'

'ভালই করেছ।' ঠোঁট চেপে রমলা মুখ ফেরালে।

'এখন না হয় আমাদের আড্ডায় ওঠ, তার পর, বাড়িতে যেও। আজ আমরা একটু ব্যস্ত। তবে কষ্ট হবে বলে দিচ্ছি।'

খগেনবাবু বল্লেন, 'এমন কষ্ট আর কি হবে। তা ছাড়া, তুমি যখন নিয়ে যাচ্ছ, তখন ওঁর ভাল লাগবেই।'

'তা ঠিক নয়। আমি যা পারি আপনারা তা পারবেন না।'

'রমাদির সঙ্গে গল্পও হবে।'

'গল্প? গল্প আর করি না। বেশ তাই চল, দেখি কি হয়।'

বিজন একটা ট্যাক্সীতে মালপত্র ভরে নিজে সামনে বসল।

বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে, পচা নর্দ্দামা হুপাশে, অনেকটা

দশ পনের বছরের আগেকার বাঙলা নব্য সাহিত্যের বস্তীর অনুকরণে। তবে এমন দুর্গন্ধ কোলকাতার মধ্যে নেই, মেলে সহরের আশে পাশে, খিদিরপুর আর টিটাগড়ে যার পাশ দিয়ে দিয়ে ট্রেণে যেতে ডেলী প্যাসেঞ্জারদের নাকে রুমাল গুঁজতে হয়। কানপুরে সে গন্ধ ম্যালের এ-পিঠে ও-পিঠে সুলভ। ট্যাক্সী যেখানে থামল সেখানটা একটু খোলা, তারপর আর রাস্তা নেই। সামনে একটা খাপরার বাড়ি, চূণকাম করা দেওয়াল, দরজা জানলায় চিক্ টাঙ্গান। দুটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালপত্র নামালে। বিজন পরিচয় দিলে, 'খগেনবাবু ও ভাবীজী, কমরেড কিষণচাঁদ, মহবুব।' ঘরে প্রবেশ করবার সময় বিজন রমলাকে নীচু গলায় বল্লে, 'এখানে বাথ রুম্ টুম্ নেই, উঠোনের কোণে কলঘর, ব্যস্। খিদে পেলে খেয়ে নিও। ষ্টেশনে খেয়ে নিলে পারতে। খেয়েছ—তবু, দুপুরে যা পার তাই খেও। নতুন কিছু শিখেছ? মোমফালীর স্যাণ্ডউইচের জন্য জিব এখনও সক্ সক্ করে। আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি।'

ঘর ছোট নয়, কিন্তু বসবার জায়গা আলাদা নেই। গোটা চারেক দড়ির খাটিয়া পাতা, কোলকাতায় যাতে মড়া বওয়া হয়, তার ওপর নোঙরা বিছানা, যা নিমতলায় পড়ে থাকে, মাটিতে জুতো-চাপা ঘসা-মাথা সিগারেটের টুকরো, যা কুড়িয়ে ভিখিরীরা টানে। কাঠের টেবিলে চা-বাটির গোল গোল দাগে ভরা ছাপা খদ্দর, যুবক-সমাজের নামাবলী, উপছে পড়ছে হলদে আর লাল মলাটের বই, পত্রিকা, প্যামফ্লেট, কাটা খবরের কাগজ। একটা দেওয়ালে জহরলাল, গান্ধীজীর ফোটো, অন্য দেওয়ালে একজন যুবকের, চোখে যার পাগল চাউনি। সবার ওপর ষ্ট্যালিনের ছবি, মাথায় কসাক্ টুপী। এক কোণে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা, তার ওপর লাল ঝাণ্ডা। পতাকা মোটা খদ্দরের, রঙ ম্যাড় ম্যাড় করছে। রমলা চোখ ফিরিয়ে নিলে দেখে খগেনবাবু হাসলেন। 'কেন, পছন্দ হল না?'

'কাঁরা এই সব রঙ বেছেছিলেন?'

'নেতৃবৃন্দ।'

'জওহরলাল আপত্তি করেন নি?'

'সরোজিনী নাইডুর নাম করলে না?'

'জহরলালের রুচিতে বাধল না। এই সমাবেশ কোনো সৌন্দর্য্যপ্রিয় ব্যক্তি সহ্য করতে পারেন না।' বিজন বল্লে, 'খগেন বাবু ঠিক ধরেছেন। জহরলালকে মেয়েরা দেবতা ভাবে।' রমলা উত্তর দিলে, 'তা নয়। তাঁর নিজের মতামত আছে।' 'সে কথা আর তুলো না, রমাদি। নিজে স্বীকার করেছেন যে মহাত্মাজী যা করেন তাইতে তিনি শেষকালে সায় দেন। ওইটাই ত' আমাদের চরম ক্ষোভ। আজ যদি তিনি তাঁর কবল থেকে মুক্ত হতেন তবে আর ভাবনা ছিল কি! আমার বিশ্বাস পতাকা মহাত্মাজীর আবিষ্কার না হলেও তাঁর মনোমত।'

'যাঁরই মনোমত হোক না কেন বিজন, তোমার রমাদির পছন্দ নয়; ওঁর বক্তব্য এই বোধ হয়ঃ ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামরা, চেঁচালেই উঁচু থাকে না। ঝাণ্ডা কেবল পাঁচ হাত পাকা বাঁশ নয়, সেটা আমাদের মেরুদণ্ড, যেটা শিরকে উঁচু রাখবে। ঝাণ্ডার মাথার কাপড় হবে রেশমী, তবেই পৎপৎ করবে, কাঁপবে, সকলকে কাঁপাবে। বাস্তবিকই তাই; সমবেত উন্মাদনার জন্য সৌন্দর্য্য কি অবান্তর? কেবল নভেলিয়ানার জন্যই কি তার আবির্ভাব? সৌন্দর্য্যবোধ কি কখনও কাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সমগ্র মানবিক সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত হবে না? ব্যক্তিগত সম্বন্ধেই কি সেটা চিরকাল আবদ্ধ থাকবে? সমাজের আদান প্রদানে কি সেটা নিষ্প্রয়োজন?' বিজন বল্লে, 'যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের পক্ষে সৌন্দর্য্যবিলাস বেশী দূর সম্ভব নয়।'

'মানি না। দু বেলা খেতে পায় না যারা দু মুঠো তাদের হাতের আল্পনা, কাঁথা দেখেছ? তা ছাড়া, যাঁরা পতাকার কল্পনা করেছেন তাঁরা বুভুক্ষু নন্।'

'কিন্তু আপনাদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়, নয় ত এত খিদের উল্লেখ হচ্ছে কেন? রমাদি, রান্নাঘরটা দেখে নাও। আমাদেরও খাবার দিতে হবে। তাড়াতাড়ি নেই, আজ আবার বেশী কাজ, কখন ফিরব তার পাত্তা নেই। অপেক্ষা করতে হবে না, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না এখানে। আচ্ছা আমরা এখন আসি। তোমাদের জন্য বাড়ি দেখতে হবে। দুপুরে যা করে হোক বিশ্রাম নিও।' বিজন ও দুজন কমরেড চলে গেল।

'এরা কারা?'

'ভগবান জানেন। তুমি বোসো, আমি দেখছি।'

রমা উঠানে এল। কোণে টিনের ঘরে একজন ছোকরা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছে। উঁচু উনুনে ডেক্‌চি বসান, পাশে এলিউমিনিয়মের থালায় ঠাসা আটা, তার ওপর অগুণ্‌তি মাছি। রমা ঘরে ঢুকতে ছেকরা উঠে সেলাম করল, খোঁড়া, মুখে বসন্তের দাগ। মাছি তাড়িয়ে আটা ঢেকে রমা ডেক্‌চির ঢাকনা খুল্লে। মাংস চড়েছে, জল কম, খানিকটা ঢালতেই ছোকরা পেঁয়াজ ছেড়ে দিলে। 'কি করলি!' ছোকরা হেসে বল্লে, 'বাঙ্গালীবাবু কাঁচা পেঁয়াজ পছন্দ করেন না, আমি কি করব!' 'ঘি দিয়েছিস?' 'গোড়াতেই।' 'মাথা কিনেছ আমার! চাল আছে? যে বাবু এসেছেন, তিনি তোদের খোট্টাই রুটি খান না। চাল নেই ত' বাজার থেকে রুটি মাখন আনতে পারিস?' 'কেঁউ নেহি?' 'কেঁউ কেঁউ করিসনি, যা নিয়ে আয়।' 'আভি?' 'আভি নয়ত কি কাল!' 'আভি যেতে পারব না, বহুৎ লোক আসবে, রোটি বানাতে হবে।' 'কজন আসবে?' 'তার ঠিকানা নেই।' 'কখন খান বাবুরা?' 'তার কি টাইম আছে। তবে ছুটোর আগে নয়।' 'আচ্ছা চল্‌ আমার সঙ্গে, লিখে দিচ্ছি কি আনতে হবে। তোর রাঁধতে হবে না। এখানে বড় গ্রোসারী আছে, যেখানে সাহেবেরা খাবার কেনে?' ছোকরা বুঝতে পারল না। 'সাহেবদের বেণের দোকান, যেখানে মাখন-টাখন মেলে?' 'এ-পাড়ায় নেই, একটু দূরে আছে।' 'কতক্ষণে আনতে পারবি?' 'যাব আর আসব। আর যদি না মেলে তবে কি আনব?' 'তবে তোদের ভাল দেশী খাবারের দোকান কত দূর?' 'বেশী দূর নয়। সব্‌সে আচ্ছা মিঠাইলালের দোকান। বাবুরা খুব ভালবাসে ওর খাবার। সে বার হরতালে মজুরদের একবেলা রোজ পনের দিন ধরে খাইয়েছিল, বড় ভাল আদমী, ওস্তাদের দোস্ত্‌।' 'আগে বড় বেনের দোকানে যা, না পারিস, ভাল দেশী খাবার আনবি। ডবল রুটি আর মাখন আনতে ভুলিস নি।' রমলা ঘরে এসে কাগজে ফর্দ্দ করে ছোকরার হাতে দশ টাকার নোট দিলে। 'শীগ্‌গির এলে বখশিস পাবি।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলেটি চলে গেল।

'আমার অন্যায় হয়েছে ষ্টেশন থেকে এ-বেলার ঝঞ্ঝাট শেষ না করে আসা। স্নানের বন্দোবস্ত নেই বোধ হয়? খোলা জায়গাতেই আমার চলবে। বাক্সেই সব আছে?' খগেন বাবু বাক্স খুলতে যাবার আগেই রমলা

স্যুটকেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ বার করে দিলে। ছোট-খাট ব্যাপারেই পার্থক্য ধরা পড়ে। সাবিত্রী স্যুটকেশের সামনে থাবড়ী খেয়ে বসত, চাবি লাগাতে পারত না, লাগালে খোলা যেত না, স্বদেশী কলের বিপক্ষে মন্তব্য জানাত, মুখ বাঁকাত ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়, একবাব চাবির গায়ে নম্বর সেঁটে রেখেছিল। একবার নয়, বহুবার খগেন বাবু তাকে মানা করেছিলেন তাঁর স্যুটকেশে চাবি দিতে। সাবিত্রী শোনেনি কখনও। হাতে তোয়ালে নিয়ে খগেন বাবু নাইতে যাচ্ছেন রমলা বল্লে, 'সাবানটা ওখানে ফেলে এস না।'

রমলা ঘরে অপেক্ষা করছিল, ছোকরা এখনও ফিরল না। এখানে হোটেলে থাকাও চলবে না। তার চেয়ে ছোট বাড়ী নেওয়া হোক, বিজন থাকবে, সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত খেয়ে দেয়ে যা-ইচ্ছা তাই করুক, কে মানা করছে ওকে। নোংরামি সহ্য করা ওর রক্তে নেই। এই জঘন্য জায়গায় থাকে কি করে! সঙ্গীরাও যেন কেমনধারা, একজনেরও সঙ্গে মেশা চলে না। ভদ্রতার একটা স্তর আছে যার নীচে নামতে কষ্ট হয়। গরীবদের অবস্থা বোঝা যায়, কিন্তু এরা যেন কী! খগেন বাবু স্নান সেরে খাটের ওপর বসে বই ওলটাচ্ছিলেন, রমলা তাঁকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল, খগেন বাবু দেখতে পেলেন না।

ছোকরা খাবারের চুবড়ী নিয়ে এসেছে। 'মেমসাব, বেনের দেদকানে আপনার ফরমায়েসী খাবার পাওয়া যায় না, তাই, মিঠাইলালের হালুয়া আর কচুরী এনেছি।' রমলা কোনো কথা কইল না দেখে ছোকরা চুবড়ী নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। বিজনের সঙ্গে জনকয়েক লোক ঘরে হুড়মুড় করে এল। তারা নিজেরাই টেবিলগুলো ধরাধরি করে সাজিয়ে বসবার জন্য পাশে দুটো খাটিয়া টেনে নিলে। রমলা বাক্স থেকে একটা টেবিলক্লথ বার করছে দেখে বিজন হাসল। টেবিলে এলুমিনিয়ম ও কাচের ফাটা প্লেট, তার ওপর দেশী খাবার, হালুয়া, ডবল রুটি, বিজনের সামনে শুখনো পাতা, যাতে খাবার এসেছিল। 'খগেন বাবু, এঁকে ত দেখলেন, কমরেড সফীক্, এঁদের নাম কি মনে থাকবে? আসফাক, নাখভী, মহীন্দর, সব কমরেড। আর ওঁর কথা ত' বলেইছি, ইনটেলেক্চুয়াল, ইনি ভাবীজী'...

সফীক্ বিজনকে প্রশ্ন করল ষ্টেশনের হালচাল সম্বন্ধে। 'হরতাল সম্পূর্ণ।

কিন্তু সেটা অন্য কারণে মনে হল। লক্ষ্ণৌএর জের বলতে পার। খগেন বাবু এখনই লক্ষ্ণৌ থেকে আসছেন, তাঁর কাছে লক্ষ্ণৌএর খবর পাবে।' খগেন বাবু বল্লেন, 'লক্ষ্ণৌএর হরতালও সম্পূর্ণ বটে, তবে মিটমাটের চেষ্টা হচ্ছে, একটা মিটিংএ ছিলাম।' সফীক্ উদ্‌গ্রীব হয়ে সভার বিবরণ শুনতে চাইলে। শোনবার পর, ইডিয়টিক্ বলে সামনেকার প্লেটটা সরিয়ে দিলে। বিজন বলল, 'আপোষে ঝগড়া করে লাভ কি, ওস্তাদ?'

সফীক্ একটু উষ্মাভরে উত্তর দিলে—'টঙ্গাওয়ালার চার আনা আর এক্কাওয়ালার চার আনা একেবারে ঐশ্বরিক সুবিচার। এরকম প্রস্তাব যে কেউ সজ্ঞানে উপস্থিত করতে পারে আমি ভাবতেই পারি না।

খগেন বাবু—'আমারও একটু আশ্চর্য্য লেগেছিল। কিন্তু কানপুরে গড়াল কি করে?'

স—'আপনা থেকে, কারুর চেষ্টা করতে হয় নি।'

খ—'কোনো বক্তৃতারও প্রয়োজন হয় নি?'

স—'যৎসামান্য, কাঠ শুখনো হলে, আর হাওয়া অনুকূল থাকলে, বেশী দেরী হয় না। আপনারা কতদিন কানপুর থাকবেন?'

খ—'ঠিক নেই। তবে আপাততঃ মাস কয়েক ত' বটেই। একটা হোটেল...'

রমলা দেবী—'বাড়ীই ভাল।'

স—'বিজন, তুমি আজই বিকেলে খোঁজ।'

বি—'সে হয় না, ওস্তাদ, কাল দেখা যাবে, আজ হাতে অনেক কাজ।'

স—'এঁদের কষ্ট হবে, বিশেষতঃ ভাবীজীর।'

বি—'তুমিই না হয় একবার ফোন কর না, তোমার এক কথায় হয়ে যাবে।'

স—'দেখি।'

খ—'অত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই, অবশ্য আপনাদের অসুবিধা হবে।'

বি—'আমাদের! হয়ত আমরা রাতে ফিরতেই পারব না। ওস্তাদ, আজকের রুটিন কি?'

স—'আগে রিপোর্ট আসুক।'

মহবুব—'আজকের কাগজ দেখেছ ওস্তাদ? এক দল বলছে লক্‌আউট, অন্য দল বলছে ষ্ট্রাইক। আমার মনে হয় মজদুর সভার তরফ থেকে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করা ভাল।'

স—'মজদুর সভা যা উচিত ভাববে তাই করবে।'

মহবুব—'তাই বলে চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু করা চাই। ওস্তাদ, আমি না হয় একবার উধামজীর কাছে যাই।'

স—'তিনি কি বলবেন জানা নেই?'

বি—'তাঁর মতে এটা ষ্ট্রাইক নিশ্চয়, তবে লক্‌-আউট হিসেবে প্রচার হলে সহানুভূতিটা সহজ হবে।'

স—'তবে!'

বি—'দোষটা কি তাতে!'

খ—'ব্যাপারটা কি প্রকৃতপক্ষে?'

স—'প্রকৃতপক্ষে' দুইই। এমন কোনো লক-আউট হয় না যার উল্টো দিকে ষ্ট্রাইক নেই। সত্তা নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল, ব্যাপারটা এই, অমরা জানি, অর্থাৎ আমাদের সকলের মনে এই ধারণা দৃঢ় করতে হবে যে আমরা স্বেচ্ছায় হরতাল করেছি।'

খ—'পার্থক্যটুকু সূক্ষ্ম।'

স—'সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত দরকারী। উধামজী চান সহানুভূতি, কিন্তু তার চেয়ে প্রয়োজন মজুরদের সচেতনতা। আকাশ পাতাল তফাৎ।'

খ—'মানি।'

বিজন উৎফুল্ল হয়ে রমলার মুখের দিকে চাইলে। রমলা বল্লে, 'উনি ভাবছেন অন্য কথা।'

স—কি?

র—ভেতরকার শক্তি।

স—'তার অর্থ যদি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব হয় তবে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।'

বি—'ওস্তাদ ভাবছে গণ-চেতনা।'

খ—'তারও সাধনা আছে।'

স—'সেটা নাভিপদ্মে দৃষ্টি নিক্ষেপ নয়।'

খ—কি সেটা ?

স—'কানপুরে থাকলেই দেখবেন।'

খ—'সুযোগ পাব ?'

সফীক রমলার দিকে একবার চেয়ে বল্লে, 'সুযোগ! খুঁজে নিতে হবে। পারবেন কি ?' রমলার মুখ লাল হয়ে উঠছে দেখে বিজন বল্লে, 'সাধনা হল কাজ। চিন্তা কর্ম্মপদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।'

খ—'এম্‌পিরিসিজম ? তার মূল্য আমার কাছে বেশী নয়। তাতে নতুন কিছু গড়া যায় না, যা হয়েছে সেইটাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ করবার সুবিধা হয় মাত্র।'

স—'নাম সেঁটে দেবার দরকার আছে কি ?'

খ—'আছে বৈ কি! স্পেয়ার পার্ট কেনবার সুবিধা হয়।'

স—'কাঁচা মালের লেন-দেনে হয় না।'

পর্দ্দার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। মহীন্‌দর, গিয়ে একটা লেফাফা এনে সফীক্‌কে দিলে। পড়বার পর সফীক্‌ বাইরে গেল, পরে মহবুব, মহীন্‌দর। বিজনও উঠছে দেখে রমলা বল্লে, 'এই রোদ্দুরে! আজকে তাহলে বাড়ী খোঁজা হবে না ?'

'ওস্তাদ নিজে যখন ভার নিয়েছে তখন পাওয়া যাবেই। তুমি কিছু খেলে না দেখলাম। বিকেলে একটা হোটেলে যেও, খগেন বাবুকেও খাইও, এখানে বন্দোবস্ত নেই। অবশ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, তোমাদের থাকের পক্ষে নয়। ওস্তাদকে কেমন লাগল ? আশ্চর্য্য মানুষ! বুদ্ধিটা ঝকঝকে।'

র—'তোমার নতুন হিরোকে আমার ভাল লাগতেই হবে।'

বি—'খগেন বাবুর কেমন মনে হল! সুজনদার চেয়েও পড়েছে, অবশ্য দরকারী বই, মাথার মধ্যে খিচুড়ী পাকায় নি। কাজ করে কিনা, তাই।'

বিজন রমলার হাত থেকে সোলার টুপী না নিয়ে খদ্দরের টুপী পরেই চলে গেল। ছোকরা রেজগী ফেরৎ দেবার সময় একটা আধুলী বখশিস পেলে। এঁটো বাসন ছত্রাকার। ছোকরা পরিষ্কার করবার পর রমলা একটা আলু ও এক শ্লাইস রুটি কাটলে নিজের জন্য।

'নতুন জীবন কেমন লাগছে ?'

'ভাল। তোমার ?'

'এরই মধ্যে ভাল লাগছে ! মেয়েদেরও হার মানালে, ক্ষমতা বটে।'

'যদি ছাড়তেই হয়, তবে নতুনকে প্রাণমন দিয়ে গ্রহণ করাই উচিত নয় কি !' মন্তব্য করেই খগেন বাবুর মনে সন্দেহ জাগে। হঠাৎ কেন মুখের আগল খুলে যায়, কণ্ঠস্বরে উগ্রতা আসে কে জানে ! তর্কের খাতিরে ? তাই যদি হয় তবে বুঝতে হবে—কি বুঝতে হবে ? ভয় হয়, মনেও আনতে আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে কেন ? পৃথক ঘরের ব্যবস্থার জন্য ? রমলা যেন কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। যে স্বেচ্ছায় দূরে সরে যায় সে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকে ! ডাকে না, কিছুতেই ডাকে না। একবার স্বামীর কাছে অত্যাচার, আবার যাকে বরণ করলে তার কাছেও আশাভঙ্গ। ভেবেছিল মা হবে, সংসার পাতবে, প্রকৃতি দেবী কি এক কলকাটি টিপে দিলেন, সর্ব্বত্র হতাশ হল—তাই, অভিমানে সে সরে গেল। সফীক তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, সুযোগ পাওয়া শক্ত, রমলা আঘাত পেলে, আরো কত পাবে···খগেন বাবুর মন স্নেহে আর্দ্র হয়ে আসে।

রমলা নিশ্চয়ই বলতে পারত নতুনকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুক তারা যাদের ভাঁড়ার খালি। অবশ্য রমলার ভাঁড়ার ঘরে রঙ্গীন সুতোর সিকে ঝোলে না, তাতে রঙবেরঙের আলপনা আঁকা হাঁড়ি থাকে না, যেমন ছিল মাসীমার, তবু রমলা নিঃস্ব নয়। সে এল চলে, সংস্কার ভেঙ্গে লোকে ভাবতে পারে, কিন্তু অন্য সংস্কারের ঠেস না থাকলে সে কি পারত ! নিজের সুখের তাগিদে ? নিশ্চয়ই নয়, তার প্রমাণ সে দু'হাত ভরে দিয়েছে। এই সংস্কারের প্রকৃতি এতই অ-পূর্ব্ব যে হিন্দু ভারতবাসীর পক্ষে তাকে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু রমলার আচরণে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা নেই। নিঃস্বরাই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে।

বিজনের কমরেডরা কি চায় জানতে ইচ্ছে হয়। এদের কাছে পুরাতন নেই, তার জের নেই, তাই প্রত্যেক আগন্তুক আসে বরের বেশে। কিন্তু গৌরীর আত্মদান ইতিহাসে অচল। আঁচড় না-কাটা কাঁচা রেকর্ড বর্ব্বররাও জড় করে না, সভ্য মানুষ ত' দূরের কথা। যার অতীত আছে সে ত্যাগ

করুক দেখি কেমন পারে! সংস্কার-মুক্তি অন্য কাজ। রমলা সফীককে বল্লে যে সচেতনতা আত্মিক সাধনার ফল। হয়ত লয়ালটি, মাত্র প্রতিবাদও হতে পারে, যার ভাষা খগেন বাবুর সঙ্গে বসবাসের সুযোগে অর্জ্জিত। সফীক ধর্ম্মতত্ত্ব ভেবে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু সাপের বিষ নেই নেই করলেই কি উড়ে যায়। গণ-চেতনা কি ব্যক্তিগত চেতনার অতিরিক্ত! যদি না হয়, তবে মানুষের মেরুদণ্ডরূপ সংস্কারকে বাদ দেওয়া যায় না। যদি হয়, তবুও অসম্ভব, বরঞ্চ বেশী, কারণ গণ-সংস্কার সৃষ্টি হতে, বৃদ্ধি পেতে বেশী দিন লেগেছে, তার ব্যাপ্তি আরো গভীর ও প্রশস্ত, তাই তাকে ছাড়াও কষ্ট।

রমলার চাই ভাল সাবান, দামী গন্ধ মাত্রা, নানা রকমের সাড়ি, লেসের সেমিজ, রেশমী সায়া, নরম বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড়। খদ্দর তাকে মানায় না কিন্তু তাতে আসে যায় না। যে সাধু সর্ব্বত্যাগী হয়েছে একবার, সে তখনই রেশমী আলখাল্লা, রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ, দামী খাবারের ওপর অধিকার অর্জ্জন করেছে। রমলা চলে এসেছে—এইটাই তার ব্যবহারের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যতক্ষণ তার আচরণ এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকছে, ততক্ষণ ছোটখাট সংস্কারগুলো তাকে বাঁধতে পারছে না।

বিজন রমলাকে বেশ গ্রহণ করে নিল। কখনও বিজনের কাছে সামাজিক প্রথার অর্থ ছিল না। তাই তার পক্ষে সহজ হল। বিজন প্রত্যাশা করছে যে সেই পুরাতন রমলাকেই সে কবে পাবে, রমলাও ভাবছে যে বিজন যা ছিল তাই আছে। দুজনের পরিবর্ত্তন যদি একই দিকের হয় তবে পরস্পরের চেষ্টায় সম্বন্ধ সমৃদ্ধতর হবে, নচেৎ পুরাতন সম্বন্ধের জোরে বিজন রমলার কক্ষে গ্রহের মতন ঘুরবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাগপাশ থেকে উদ্ধার নেই। এইটেই সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্কার।

কিন্তু কম্‌রেড্‌রা নিশ্চয়ই অন্য কিছু সম্পর্কের সন্ধান পেয়েছে, নচেৎ, কেমন করে তারা আত্মীয়স্বজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কাটিয়ে ওঠে? নতুন সমাজ তৈরী হবার পর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ফুটে উঠবে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে পরিহার করা চাই। এটা মহাপুরুষরা বুঝেছিলেন। সম্পর্কের এক নক্সা খুলে আরেক নক্সা বানাচ্ছে মেয়ে জাতটা। চরখা আর তাঁতের সামনে বসে কি তারা আগন্তুকের অপেক্ষা করে, না সেই প্রবাসী প্রিয়ের? নক্সার সামনে ও

পিছনে যে আরেক বড় হুক রয়েছে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা অচেতন, নিরাগ্রহ। যে সে বিষয়ে স্মরণ করাবে সে মেয়ে জাতের চিরশত্রু হয়ে রইল। সফীকের সঙ্গে রমলার ভাব হতে পারে না।

খগেন বাবুর ঘুম আসছিল দেখে রমলা বল্লে, 'একটু বিশ্রাম করে নাও। বিছানা পেতে দেব? সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজী হোটেলেই চল।'

'সেটা ভাল দেখায় না। ওরা নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করবে।'

'আমি এখানে এত লোকের মাঝে থাকতে পারব না বলে দিলাম। তোমার ভাল লাগে তুমি থেকো। তুমি বোঝ না কেন যে আমরা এখানে রবাহূত? ওদের কাজে আমরা বাধা দিচ্ছি।'

'তোমাকে ষ্টেশনে রেখে আসাই ভাল ছিল। তুমিই বা এলে কেন?'

'বিজন এমন নোঙরার মধ্যে থাকবে ভাবতেই পারিনি।' রমলা খাটিয়া থেকে নোঙরা বিছানা টেনে মাটিতে নামাচ্ছে দেখে খগেন বাবু বল্লেন যে তিনি ঘুমুবেন না, বই পড়বেন। রমলা দুটো চেয়ার টেনে একটির ওপর পা রেখে অন্যটিতে বসল।

বিজন যখন খবর দিলে যে আপাততঃ একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। মাত্র দুটি সুটকেস ও বিছানা নিয়ে বিজন রমলা ও খগেন বাবুকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিলে। রাত ৮ টার সময় দু'জন 'বয়' টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার আনলে, ওস্তাদের আজ্ঞা-মত। 'বিজন, খেয়ে যাও।' 'না, খগেন বাবু, মাপ করবেন। আজ কাল আমরা খুব ব্যস্ত থাকব। রমাদি, হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না এ ক'দিন। ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিও। তারপর, একটা হেস্ত-নেস্ত হলে তোমার বাড়িতে আড্ডা জমাব আমরা।' খগেন বাবু উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আসবে। তোমার ওস্তাদকেও এনো অতি অবশ্য।' বিজন চলে গেল।

'একবার তুমি নিজেও বলতে পারতে!'

'কি?'

'জানি না।'

'মক্ষিরাণী হবার লোভ আমার নেই।'　　　　　　　　ক্রমশঃ

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতার প্রকার

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কবিতার ভাবপ্রধান আর মননপ্রধান নামক দুটি মূল বিভাগের অধীনে কল্পনার প্রকৃতিভেদ অনুমান ক'রে আরো তিনটি বিভাগ বা প্রকারের ধারণা করেছি—উচ্ছ্বাসপ্রধান, খেয়ালপ্রধান আর বাস্তবতাপ্রধান নাম দিয়ে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই তিনটি প্রকার আলোচ্য। প্রথমে উচ্ছ্বাস-প্রধান রূপের কথা।

'উচ্ছ্বাস' কথাটি এখানে কি অর্থে ব্যবহার করছি সেটা পরিস্ফুট করা দরকার। ভাবাবেগের একটা লঘুতর বাইরেকার প্রকারের দিক থাকতে পারে, যেমন করুণ রসের মূলে যে শোকভাব, তার অশ্রু-তরঙ্গিত উদ্বেলতা হ'ল একটা উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। ভাব হ'ল একটা গূঢ় আবেগ যেটা একটা শক্তিও বটে। সে চিন্তার ধারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে; কর্ম্মের প্রেরণা যোগাতে পারে। প্রেমিকের মধ্যে প্রেম যখন ভাবরূপ নেয় তখন সে হ'তে পারে কবি কিম্বা কর্ম্মী—চণ্ডীদাস কিম্বা মার্ক এণ্টনী; কিম্বা কবি আর কর্ম্মী দুই—যেমন দান্তে। উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত্তে প্রেমিক বাহ্যতঃ বিভোর—বিলাস শয্যায় অলস এণ্টনী। উচ্ছ্বাস গভীর অন্তর্নিহিত ভাবের উপরকার অংশ। ভাব দেয় হৃদয়কে মুক্তি। অনুভূতির সংকীর্ণতর গণ্ডী পার ক'রে সে চেতনাকে দূরে নিয়ে যায় যেখানে আমি আমার ক্ষুদ্রতর মোহ, স্থূলতর সম্পর্ক আর খুঁটিনাটির আবেষ্টন থেকে অনেকটা শিথিল হয়ে এক অবাধ বিস্তীর্ণ আদর্শের পরিসরে বিচরণ করি। উচ্ছ্বাস সীমাবদ্ধ পরিধি থেকে মুক্তি পাবার আগেকার অবস্থায় যে স্ফূর্ত্তি তাই।

"পূরবী"র "কিশোর প্রেম" শীর্ষক কবিতাটির প্রথম দুটি কলিকে একটি সম্পূর্ণ কবিতাভাবে বিবেচনা করা যাক :—

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এলো কোন জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ?
সে যে অনেক দিনের কথা ॥

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জ্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এলো আমার অধর পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখীর মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জ্জন অঙ্গন।

এই কবিতার মূল সুরটি ধরতে বিলম্ব হয় না। প্রেমিক প্রেমিকার পার্থিব মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে কৈশোরের সহজ সরল ভঙ্গীতে। প্রেমাবস্থার একটা অসহায় ভাব যেন কবিতাটিতে আন্দোলিত হয়। বিষাদের অশ্রু-উচ্ছ্বাস যেন স্ফুরিত হয়। ১৩৩২ সালের বার্ষিক বসুমতীর ১৬০ পৃষ্ঠায় যখন কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন নীচে লেখা কলিটিও ছিল :—

তার পরে সেই তীরে ব'সে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার পানে যাবার লাগি
আঁধার রাতে ছিলাম জাগি
কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা।
মিছে কত কাঁদন কাঁদা।

এই হ'ল অবিমিশ্র উচ্ছ্বাসের রস। অবশ্য কোন সত্যকার ক্রন্দন-অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নয়; কল্পনায় উচ্ছ্বাস-রসরূপের নির্ম্মাণ।

উচ্ছ্বাসের অবস্থা উত্তীর্ণ হ'লে পর আসে অন্তঃশীল ভাবাবেগের অবস্থা। তখন কাব্যের রূপান্তর হয় হয়ত এই রকম :—

সে যে বহুদিন হ'ল। সেদিনের চুম্বনের পরে
কত নব বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোত কাকলী
তারি পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এলো গেলো চলি।
কত দিন ফিরে ফিরে তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জা ভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের পরে
চঞ্চল আলোক ছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে

বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপন লিখন,
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতি মুহূর্ত্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকা চোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
[পূরবী—"কৃতজ্ঞ"]

এখানে ভাবের উচ্ছ্বাস কবিকে বিপর্য্যস্ত করে' তোলে না—এ কবিতা সংযমের কবিতা—emotions recollected in tranquillity। পূর্ব্বে যেখানে ছিল প্রেমের প্রতিদিনের মায়ামোহ-মাখা নানা মিষ্টতর বিকাশের কথা, সেখানে পাওয়া গেল এক প্রশান্ততর নৈর্ব্যক্তিক ধরণের আবেগ। যা ছিল উচ্ছ্বসিত, মুখরিত, উদ্বেল, তা এখানে হয়েছে মন্থর, অন্তর্মুখী। শরীরী চাঞ্চল্যের অন্তরালে পরিচয় পাই গূঢ় গম্ভীর প্রাণের!

উচ্ছ্বাস থেকে এলুম শুদ্ধ ভাবের রাজ্যে আর তা থেকে যখন জ্ঞানের রাজ্যে যাই তখন যেন "মিষ্টতা" আরো কমে আসে; প্রেমিক হয়ে ওঠে কবি। প্রেমের কলকূজন সঙ্গীতের মন্দ্রধ্বনিতে ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দ্যুলোকে ভূলোকে :—

তুমি সে আকাশ-ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বাহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে সেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু' বাহু বাড়ালে॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে;

মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে ;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে।
[পূরবী—"আহ্বান"।]

যে নারীর জন্যে কাঁদন কাঁদা হয়েছিল তার স্থান এখন কত উঁচুতে।

কিন্তু আমাদের তুলনা থেকে এ রকম বুঝলে ভুল হবে যে উচ্ছ্বাসের কবিতা অপাঠ্য। তাহ'লে লঘু সুরের সঙ্গীতও অশ্রাব্য। ঐ "আহ্বান" কবিতাটিরই এই কলিটিকে উচ্চাঙ্গের উচ্ছ্বাস-ব্যঞ্জনা বলতে বাধে না।—

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে' জাগি
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ সুধারস॥
নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান ?
মনে জানি এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে ?
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে' রয়েছ রমণী
নীরব নিশীথে ?

এ উচ্ছ্বাসে বিকার আসে না। উচ্ছ্বাস, ভাব, মানসিকতা, সকলের এক অপরূপ সমীকরণ হয় দক্ষ শিল্পীর হাতে।

কল্পনার দিক থেকে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের কবিতার নামকরণ করেছি খেয়াল-রচনা। এ হ'ল ভাবের বহুরূপী মূর্ত্তি ; কল্পনার খেলার অবসর। বহুরূপী বেশের মধ্যে থেকে ভাবরূপকে চিনে নিতে হয়। বৈষ্ণব কবিতায় এই খেয়াল-রচনার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। দুটি একটি পরীক্ষা করলেই এ রচনার প্রকৃতি বুঝতে পারা যাবে।

জ্ঞানদাসের একটি পদের আরম্ভ ঃ—

"আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।"

এ উক্তির সত্যতা যুক্তির ওপর নির্ভর করে না। বক্তার ইচ্ছায় এ ভাবকে সত্য হ'তে হয়েছে। রাধার মন কামনা করে যে শ্যামের চিত্তকে রাধার মোহ এমনই আচ্ছন্ন ক'রে থাকুক যে তাঁর দৈহিক লক্ষণগুলিও রাধাকান্ত অনুকরণ করুন। ফলতঃ শ্যামের পীতবাস পরিধানের রাধা এই ব্যাখ্যা করেন যে তাঁরই দেহবর্ণের অনুকরণে ঐ বর্ণের বসন কৃষ্ণ ব্যবহার করেন। অতএব ইচ্ছা বা কল্পনাই এখানে ভাবের ভিত্তি। সেই জন্যেই এ রচনাকে বলি খেয়াল-খুসীর রচনা ; প্রধানতঃ অলঙ্কার নিয়ে খেলা ; অলঙ্করণ-বৃত্তির মধ্যে দিয়ে চিত্তের বিনোদন।

তেমনি অন্যত্র প্রেমাভিষিক্তা রাধা তাঁর কাঞ্চন দেহবর্ণের কারণ স্বরূপ কৃষ্ণকে বলেন ঃ—

বঁধু তুমি সে পরশ মণি
তুমি সে পরশমণি
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোণার বরণখানি।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে বস্তুরূপের খেয়ালী ব্যাখ্যা পাই, অর্থাৎ প্রথমটিতে কৃষ্ণের পীতবাসের আর দ্বিতীয়টিতে রাধার দেহবর্ণের। নীচের পদটিতে দেখা যায় গুণের খেয়ালিয়া বর্ণনা ঃ—

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।

এ হ'ল খেয়ালের আশ্রয়ে কানুর পীরিতির গুণ-বর্ণনা। অবিমিশ্র খেয়ালের নিদর্শন এই পদটিতে পাবো :—

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলই
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।
* * *
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাব বিলোল
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল।
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই।
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে পীতবাস আর দেহের বর্ণ চোখে দেখাতে কল্পনা তার কারণ সৃষ্টি করেছিল; তৃতীয় উদাহরণে কৃষ্ণপ্রেমের গুণ উপলব্ধি করাতে রাধার চিত্ত মন বাস্তব রাজ্যে তার তুলনা খুঁজে পেয়েছিল। এখানে কৃষ্ণের সঞ্চরণ উপলক্ষে বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সত্যই কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, কিন্তু রাধার অন্তর্জ্জগতে যে অসাধারণ অভিনবত্ব আসে তাই বহির্জ্জগতের দৃশ্যকেও অলৌকিক ছদ্মবেশ পরায়।

খেয়ালের কবিতায় একটা কৃত্রিমতার সুর বাজবার আশঙ্কা বড় বেশী, যদি না ভাবের আবেগ এতটা প্রবল আর সঞ্চারী হয় যে রূপবর্ণনার শত অলৌকিকতা আর অভিনবত্ব স্বত্ত্বেও রসিকের অন্তরে একটা বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়।

আধুনিক বাঙলা কবিদের মধ্যে সত্যেন দত্তের রচনাবলী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খেয়াল রচনার আকর :—

তুমি আমি—আমরা দোঁহে—যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে, ছিলাম যখন পাপড়ী-ঘেরা সিংহাসনে;

আমার ছিল সোণার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্যকেশর আমি তোমার ছিলাম পাশে।
[কুহু ও কেকা—"তুমি ও আমি।"

এর একটা কথাও আলাদা আলাদা ক'রে বিশ্বাস করি না ; কিন্তু সমগ্র-ভাবে দেখলে ফুল-জীবনের কল্পিত পরিবেশ নিজেকে ঘিরে এতটা সত্য হয়ে ওঠে যে কবিতা প'ড়ে মন আরাম পায়।

কল্পনার ক্রিয়াপদ্ধতির তৃতীয় বিভাগ বাস্তবতাপ্রধান কবিতা। এখানে ভাবরসের উদ্বোধন যে অভিজ্ঞতারাজি থেকে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়। অর্থাৎ কবি কেবল অবতারণা করেন একটা দৃশ্যচিত্রের। তার কোন রসভাষ্য করেন না। এ ধরণের একটি কবিতা এই :—

চলি পথে ; রাত্রিশেষে গ্রামান্তের আঁকা বাঁকা পথ
নিশির শিশিরে স্নাত পড়ে' আছে স্বপন আলসে,
হোথা বাবলার সারি স্পন্দহীন চিত্রার্পিতবৎ—
তাহারি শাখার ফাঁকে নিশান্তের ক্ষীণ শশী হাসে,
ফুলগাছে ঝরে পাতা—দহিয়াল ঝাপটিছে পাখা,
তাহারি আড়ালে হোথা পুষ্পশেষ শেফালী দাঁড়ায়ে
শিশির ঝরায়ে কাঁদে, ঘনশ্যাম পল্লবিত শাখা
রিক্ত কৃষ্ণচূড়া পানে বকুল সে রয়েছে বাড়ায়ে।
কুহেলি ছাড়িয়া পথ বেণুবনে করে যাই যাই ;
আকাশ প্রদীপ নিভে গেছে ওই গোপ গৃহাঙ্গনে ;
এখনো ঘুমায়ে বধূ, আঙিনায় বাঁধা বুধি গাই
ব্যাকুল উৎসুক আঁখি দ্বার পানে চাহে ক্ষণে ক্ষণে।
[৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—"হেমন্তের রাত্রিশেষে"।

এখানে কবি যা দেখেছেন মোটের ওপর তার তালিকাই দিয়ে গেছেন। তাঁর মনে সে দর্শন কি ভাব-পরিণতি গ্রহণ করেছে তা বলেন নি। অবশ্য স্থানে স্থানে কথঞ্চিতভাবে, যেমন "স্বপন আলসে," "শিশির ঝরায়ে কাঁদে," প্রভৃতি উক্তিতে নিজের মনের ভাব বাইরের বস্তুর ওপর আরোপ করেছেন। এ ছাড়া চোখে দেখা রূপেরই অবতারণা করেছেন। পাঠক প্রশ্ন করবেন

এখানে তাহ'লে কথার অর্থ আবেগ গ্রহণ করলে কোথায়? এর উত্তর এই যে হেমন্তের রাত্রিশেষের দৃশ্যে যদি হৃদয় স্পর্শ করবার মত কোন সৌন্দর্য্য বা আকর্ষণ থাকে তাহ'লে সেটা কবির চিত্তকে যেমন ভাবে মুগ্ধ করেছে কবি ধ'রে নেন যে আমাদেরও তেমনি ভাবেই করবে। বলতে গেলে, এ কবিতার রস-গ্রহণ করতে হ'লে পাঠককে তাঁর নিজস্ব কবিভাবেরই সাহায্য নিতে হবে কেননা বাইরের কবি তো উপলক্ষগুলিকেই সামনে ধ'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, কোন টীকা বা মন্তব্য করলেন না। সে চাক ভেঙ্গে মধু পাঠককেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, ভোরবেলাকার পল্লীদৃশ্যের কতকটা অভিজ্ঞতা, এই সকল বোধ আর জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। এইভাবে সঞ্চারিত না হ'তে পারলে এ কবিতা প্রাণস্পর্শী হ'তে পারবে না, কেননা এতে বাইরেকার বিজ্ঞাপন কিছু নেই; সাজ নেই, অলঙ্কার নেই; মুক্ত আবেগের প্লাবনী বেগ নেই, তর্ক বিচারের স্তম্ভিত প্রতিধ্বনি নেই; আছে শুধু শান্ত বর্ণনা। বাস্তব কবিতার আকর্ষণের উৎস কোথায় তার কতকটা উত্তর যেন রবীন্দ্রনাথের একটি বাস্তব কবিতাতেই পাই :—

চেয়ে আছি দু চোখ দিয়ে সব কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
বালক যেমন নগ্ন আবরণ
তেমনি আমার মন।
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে,
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে;
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন
আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আনমনা।
[পরিশেষ—"বালক"।

বাস্তবতা-প্রধান কবিতায় এই জানার মাঝে চিরকালের না জানার শঙ্খধ্বনিই যেন সকল পাঠককে আনমনা করে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয়া

উমাদেবীর "বাতায়ন" কবিতার-পুস্তকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করতে হয়ঃ—

"ভাবুকতার কবিতা অনেক সময়ে রঙ্গীন মেঘের মতো ; তার মধ্যে যদি বা স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়, সে সুনির্দ্দিষ্ট নয় ; বাষ্প রেখায় রূপ যদি বা আঁকা পড়ে, মনে হ'তে থাকে এর ধ্রুবত্ব নেই ; কিন্তু যে জিনিসকে তুমি হৃদয় দিয়ে দেখেছ, এই ছোট ছোট কবিতায় তাকেই সহজ ক'রে দেখিয়েছ ; এই মনে ক'রে তৃপ্তি হয় যে এগুলি প্রত্যক্ষ বিষয়। হৃদয়ের উড়ো হাওয়ায় যে সকল বেদনার খেয়াল ভেসে বেড়ায় তাকে পাঠকের মনে অনুভাবিত করা, সে আর এক জিনিষ। সেখানে প্রায় দেখা যায় ঠিক সুরটি লাগে না ; অত্যুক্তি এসে পড়ে ; সর্ব্বদা কাব্যে ব্যবহৃত বাক্য ও বাক্যরীতি জমাট বেঁধে ভাবের আন্তরিক লঘুতা ঢাকা দেয় ; একরকম প্রথাসম্মত চলনসই জিনিষ দাঁড়িয়ে যায়, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই 'ছায়াছবি'র বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয় ; তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছ।"

বাস্তব কবিতায় এইটিই লক্ষিতব্য—যে সরল নৈপুণ্যে কবির দৃষ্টির ঔৎসুক্য প্রকাশ পেলে কি না। তা যদি হয়ে থাকে তো সে আবেগ পাঠককেও সংক্রমিত করবে। বাস্তবতামূলক কবিতার একটি সুন্দর নিদর্শন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কুহু ও কেকা"র ঃ—

বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম ;
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায় পাতায় ;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায়।
সশব্দে বাঁশের নামে শির,—
শব্দ করি ওঠে পুনরায় ;
শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
পথ ছাড়ি ছুটিয়া পালায়।
স্তব্ধ হয়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে,

বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।
পাতা উড়ে ঠেকে গিয়ে আলে
কাক বসে দড়িতে কুয়ার ;
তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে
ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার।
["গ্রীষ্ম চিত্র"।

"পাতা উড়ে ঠেকে গিয়ে আলে," "কাক বসে দড়িতে কুয়ার," এ সব অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র কলমের আঁচড়ে যদি পাঠকের উপলব্ধিতে গ্রীষ্মের দুপুরে পল্লীর একটি অখণ্ড রূপ জেগে ওঠে—গ্রীষ্মের একটা অতিকায় অনাড়ম্বর রূপ ধারণা—মহালে মহালে যে হানা দিয়ে বেড়ায়—যদি চেতনায় আকার লাভ করে তাহ'লেই এ কবিতার উদ্দেশ্য সফল হ'ল।

শ্রীনবেন্দু বসু

সাফো

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মেল গাড়ি চলে যাবার আওয়াজে, সন্ধ্যার মুখে, গোস্ত্যাঁর ঘুম ভেঙে যায়। চোখের পাতা খুলে প্রথম কয়েক মিনিট সে বুঝতেই পারলে না যে সে কোথায়। প্রকাণ্ড একটা বিছানার মধ্যে সে একাকী। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত অবশ—যেন অনেক পথ সে হেঁটেছে—গা-হাত-পায়ে কোন সাড় নেই। সারা বিকেল ধরে তুষারপাত হয়েছিল, চারিধারে মরুভূমির মতো বিপুল নৈঃশব্দের মধ্যে, সেই তুষার-গলার শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায়। দেয়াল বেয়ে জানালার শার্সীতে, শার্সী বেয়ে মেঝেয়, তুষার-বিন্দুরা গলে গলে টপটপ ক'রে পড়ছে, গোস্ত্যাঁ বিছানাতে শুয়েই কান পেতে শুনতে পায়।

সে এখানে কেন? কি করছে সে এখানে? আস্তে আস্তে সে ভাবতে চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে সম্মুখের দেয়ালে-বিলম্বিত ফানির প্রকাণ্ড পোট্রেটটা আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে। এবং ধীরে ধীরে তার মনে পড়ে, আবার, আবার সে অধঃপতনের পথে নেমে এসেছে।

কিন্তু বিন্দুমাত্র সে বিস্মিত হয় না। আজ যে মুহূর্ত্তে এই ঘরে সে এসে ঢুকেছে, এই বিছানার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এসে, সেই মুহূর্ত্তে, তক্ষুনিই, সে অনুভব করেছে আর তার আশা নেই—পুনরায় সে ধৃত হয়েছে, তার পুনরুদ্ধৃত হবার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিছানার শাদা চাদর তাকে টানতে সুরু করেছে, চারিধার থেকে কী যেন ঘূর্ণির মতো পাক দিয়ে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই বিছানার মধ্যে—সেই নরকের গর্ভে—এবং সে নিজের মনেই বলে উঠেছে :

'যদি আবার আমি এর জালে পড়ি, তাহ'লে উদ্ধারের আর কোনো উপায় থাকবে না—চিরদিন—চিরদিনের জন্যেই আমি আটকে যাব।'

এবং সে আটকে পড়েছে। কাপুরুষতার আত্মগ্লানির অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে এই সান্ত্বনা শুধু সে বোধ করছিল যে, না, আর সে কোনো

দিন এই পাঁকের—এই অধোগতির কবল থেকে উঠতে পারবে না। উঠতে চায়ও না সে। রণক্লান্ত আহত সৈনিক যেমন তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহকে কোন রকমে টেনে নিয়ে, মৃত্যুর অপেক্ষায় পথের জঞ্জালের ওপরেই নিজেকে বিছিয়ে দেয়—নরম এবং চরম একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিতে চায়—গোস্যাঁও নিজের মনে সেই রকম একটা অনুভূতি বোধ করছিল।

এর পর তার যা করবার তা খুব ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু খুবই সহজ। ইরেণের কাছে ফিরে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে তাকে সব জানানো। তাকে বলা যে সে তার যোগ্য নয়, উপযুক্ত নয়, তার বিগত জীবনের মারাত্মক মোহ থেকে এখনো সে বিমুক্ত হতে পারে নি—হ'তে পারবেও না—এবং সে কিছুতেই, আর যাই হোক, মিথ্যার ছদ্মবেশ পরে, একজন সরলা কিশোরীর সর্ব্বনাশ করতে পারবে না।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে থাকে—আশ্চর্য্য এই রমণী! এই ফানি লগ্রাঁ! পরমাশ্চর্য্য! সে ভাবতে থাকে, সেই প্রথম দিনের কথা, যখন এই নারী এসে প্রথম তার বাহু স্পর্শ করল—তারপর থেকে দিনের পর দিন, তাদের দু'জনের সম্মিলিত জীবন—যে-জীবনে ভালবাসার স্থান যৎসামান্যই ছিল, কেবল স্ফূর্ত্তি আর দেহসুখলালসাই উপজীব্য ছিল একমাত্র—অবশেষে যখন সে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনে মনে ভেবেছে, সে মুক্ত, সে স্বাধীন, আর তার ভয় নেই, মোহ নেই, দুর্ব্বলতা নেই—যখন সে ভেবেছে, এবার তার সুখের পথ, স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত—ইরেণের হাত ধরে এইবার সে স্বর্গের দিকে পা-বাড়াবে—তখনই এই নারী আবার তার জীবনে আবির্ভূত হয়ে, অতীত দিবসের যাদুবলে আবার তাকে তার ভৃত্য ক'রে ফেল্ল—তার অতীতের অন্ধ মোহ টেনে নিয়ে এসে তার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল—সেই অতীত, যার সমস্ত কলুষ এবং গ্লানি, পাপ এবং ব্যভিচার তার অস্থিমজ্জাকে পর্য্যন্ত জর্জ্জর ক'রে তুলেছে—যাকে সে ভুলতে চেয়েছিল, এবং ভুলতে পেরেছে ব'লে গর্ব্বিতও হয়েছিল হয়তো।

দরজা খুলে গেল। ফানি পা টিপে টিপে ঢুকল ঘরের মধ্যে, গোস্যাঁর

যাতে ঘুম না ভেঙে যায়, আধবোজা চোখের ভেতর দিয়ে গোস্তাঁ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ফানিকে—আবার যেন এই নারী নতুন ক'রে যৌবন লাভ করেছে, আবার সে শক্ত এবং সমর্থ—আবার যেন তার সমস্ত সুষমা আর সৌন্দর্য্য ফিরে এসেছে।

তুষারপাতে ফানির সর্ব্বাঙ্গ ভেজা—আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে ফানি নিজের গা-হাত-পা গরম করছিল, এবং মাঝে মাঝে, গোস্তাঁর দিকে ফিরে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। সেইরকম মুচকি হাসি—আজ সকালে দু'জনের কলহের মধ্যে যে-হাসি সে বার বার হেসেছে। বিজয়িনীর হাসি।

ফানি টেবিল থেকে একটা সিগ্রেট্ তুলে নিয়ে ধরিয়ে আবার বেরিয়ে যাবে, গোস্তাঁ তাকে থামাল।

'তুমি তাহ'লে ঘুমন্ত নও?'

'না'।

'বসো এখানে। অনেক কথা আছে।'

ফানি বিছানার পাশে বসল, গোস্তাঁর গলার গাম্ভীর্য্যে একটু বিস্মিতই হ'ল সে।

'ফানি, আমরা দু'জনেই চলে যাব—' বল্ল গোস্তাঁ।

ফানি ভাবল, তাকে পরীক্ষা করবার জন্য গোস্তাঁ ঠাট্টা করছে। কিন্তু তারপরই গোস্তাঁ বিস্তৃত বিবরণের তালিকা এঁকে জুকে তার কাছে বিশদ করতে লাগল। এরিকায় একটা চাকৃরি খালি আছে, কন্‌সালেটের চাকৃরি—এই কাজটার জন্যে সে আবেদন করবে। সপ্তাহ দুয়ের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে—ট্রাঙ্ক বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার পক্ষে দু'সপ্তাহই যথেষ্ট।

'আর তোমার বিয়ে?'

'বিয়ে? বিয়ে আর হয় না। যা আমি করেছি আর তাকে ফেরানো চলে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি। ইরেণের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকেছে; তোমাকে ছেড়ে আর আমি থাকতে পারব না।'

'দুষ্টু ছেলে!'—এই শুধু বল্ল ফানি। গলায় কেমন যেন একটা শান্ত বিষাদ—একটু তিরস্কারও যেন!

তারপর সিগ্রেটে কয়টা টান দিয়ে ফানি জিজ্ঞাসা করল ঃ

'অনেক দূর দেশ কি—যার তুমি নাম করলে ?'

'এরিকা ? ওঃ, অনেক দূর। পেরুতে।' তারপরে, গলার স্বর নামিয়ে গোস্যাঁ বল্ল, 'ফ্লামঁা সেখানে তোমার সঙ্গে গিয়ে মিশতে পারবে না।'

ফানি চুপ ক'রে বসে থাক্‌ল—চিন্তায় এবং রহস্যে সমাচ্ছন্ন হয়ে, সিগ্রেটের-ধোঁয়ার মধ্যে। ফানির হাত গোস্যাঁর মুঠোর মধ্যে, তার নগ্ন বাহুতে গোস্যাঁ মৃদু আঘাত করছে—চারিদিক বেয়ে তুষার গলার শব্দ বয়ে চলেছে—জানালা থেকে শার্সীতে—শার্সী থেকে মেঝেয়—টুপ্‌ টাপ টুপ্‌ টাপ—নরম শব্দের স্রোত—গোস্যাঁর দু'চোখ বুজে আসে এবং আবার সে আস্তে আস্তে পাঁকের মধ্যে ডুবে যায়।

১৫

গোস্যাঁ গত দু'দিন ধরে মার্সাই-এ অপেক্ষা করে আছে—ফানি এখানে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবে।

তার মন অতি চঞ্চল, ভাবনায় কম্পান্বিত—অত্যন্ত সুদূর বিদেশে যে-সব যাত্রী পাড়ি দেয়, তাদের মতই নিরুদ্দিষ্ট তার মন। তার অজ্ঞাত আসন্ন ভবিষ্যতের ভারে সে মুহ্যমান।

ফানি এখানে এসে মিলিত হবে তার সঙ্গে। সমস্তই তৈরি, বার্থ্‌ নেয়া হয়ে গেছে—দুটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন—এরিকার ভাইস্‌ কন্‌সাল এবং তাঁর শ্যালিকা সহযাত্রিণীর জন্যে।

ফানির আসার প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন মনে নিজের হোটেলের শয়নকক্ষে সে পায়চারি করছে। বাইরে বেরুবার তার সাহস নেই, এই কারণে, হোটেলের ভেতরেই, এধারে-ওধারে পায়চারি ক'রে সময় কাটাতে হচ্ছে তাকে। মার্সাই-এর পথঘাট তার কাছে ভয়াবহ—সৈন্যদল কিম্বা জেলখানা থেকে পলাতক সৈনিক অথবা কয়েদীর মতই সর্ব্বসাধারণে বাহির হবার তার সাহস হয় না কি জানি যদি কোন চেনা লোকের চোখে পড়ে যায়। কেবলি তার মনে হতে থাকে, হয়ত রাস্তার এই বাঁকটায় আড়াল থেকে এক্ষুনিই বুড়ো বেঁাশেরো

বেরিয়ে আসবে—এবং তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধ'রে বন্দী ক'রে নিয়ে চলে যাবে।

নিজের ছোট্ট ঘরখানিতেই সে আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। হোটেলের সাধারণ ভোজন কক্ষেও সে যায় না, তার খাবার পর্য্যন্ত ঘরে এনে দেওয়া হয়। যে সময়টা সে পায়চারি করে না, বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে, স্থির দৃষ্টিতে, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখনো চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। রবিবারের আগে ফানির আসার সম্ভাবনা নেই। এখনো চব্বিশ ঘণ্টা!

ইরেণের স্মৃতি মাঝে মাঝে তাকে উন্মনা ক'রে দেয়। সুন্দরী ইরেণ! জীবন এবং জগতের যাবতীয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞা সরলা কিশোরী! কিন্তু সে কতদূরে এখন—কত সুদূরে! যে-স্বর্গ সে হারিয়েছে, ছেড়ে এসেছে—কত মধুর কত সুন্দর কত বিচিত্র সেই স্বর্গ! যে-সব স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেল, হায়, তার দুঃখ-বেদনা কী চিরন্তন!

যাক, যা যাবার চলে গেছে—!

ঘর থেকে বেরুতেই, গোসঁ্যা, হোটেলের ওয়েটারকে দেখতে পায়।

'কন্‌সালের নামে একটা চিঠি। সকালেই এসেছিল, কিন্তু কন্‌সাল তখন ঘুমোচ্ছিলেন।' ওয়েটার জানায়।

গোসঁ্যা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কে তাকে চিঠি লিখবে? কেউ ত' তার এখানকার ঠিকানা জানে না—কেবল এক ফানি ছাড়া।

খামখানা হাতে নিয়ে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে, আতঙ্কে ও ভয়ে, তার বুক বসে যায়; সে বুঝতে পারে।

'না, না! আমি যাব না। যেতে পারব না আমি। এতবড় বোকামি করবার বাসনা আমার নেই। এই ভাবে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস একমাত্র যৌবনেরই রয়েছে, এবং লক্ষ্মী ছেলেটি, তুমি বুঝে দেখ, সেই যৌবন আমার আর নেই। যৌবনের দুরন্তপনা আমাকে সাজে না। যৌবনের দুঃসাহসিকতায় এ হেন অভিযান সম্ভব, আর সম্ভব অন্ধ প্রেমের আবেগ—কিন্তু প্রেমের আবেগ আমাদের দু'জনের কারোই নেই এখন। পাঁচ বছর আগে হ'লে, যখন আমাদের সুখের দিন ছিল, তখন তোমার একটা সামান্য ইঙ্গিতে, পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত

তোমাকে আমি অনুসরণ করতে পারতাম,—একথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে আমার সারা দেহ মন দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, প্রাণভরে তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আমার যা কিছু দেবার ছিল সবই তোমাকে দিয়েছি, এবং যখন, বাধ্য হয়ে, আমার নিজেকে তোমার বাহুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে হয়েছে, তখন—তখনো তোমার জন্য যে-যাতনা যে-কষ্ট যে-বেদনা আমি পেয়েছি, এর আগে আর কোন পুরুষের জন্যই তা আমি ভোগ করি নি। কিন্তু এই দুঃখ—এই দুর্ব্বিবহ দুঃখ আমাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে—আমাকে জরাজীর্ণ ক'রে রেখে গেছে—এ রকম দারুণ দুঃখ আর দারুণ ভালোবাসার ফলে তাই হয়, তুমি কি তা জানো? তুমি এতো সুন্দর, আর এতো তরুণ, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার ভয় হয়েছে যে তোমাকে হারাব। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তের এই প্রাণঘাতী আশঙ্কার প্রজ্জ্বলন্ত প্রদীপ অনুক্ষণ অন্তরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখা—এখন—এখন আমার পক্ষে অসহ্য। আর আমি তা পারি না—সে জ্বালা সইবার আর আমার শক্তি নেই। তোমার জন্য অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি—তুমি আমাকে দিয়েছ—অত্যন্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং উগ্র সেই হলাহল—তাই পান করেই আমি আজ দেহ-মনে জরাজীর্ণ—আর কিছুই আমার অবশিষ্ট নেই।

এরকম অবস্থায়, বহুদিনের সমুদ্রযাত্রা, আর, নতুন দেশে গিয়ে আবার নতুন ক'রে জীবন গড়ে তোলা—একথা ভাবতেই আমার ভয় হচ্ছে। তুমি তো জানো, গৃহস্থালীর জন্যে পরিশ্রম করা—আমি পারি না—আর ভেবে দেখ —বল্‌তে কি St. Germains-এর ওধারে কখনও আমি পা বাড়াই নি। দূর প্রবাসের কথা ভাবতেই আমার বুক কাঁপে। তাছাড়া, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মেয়েরা অল্পদিনেই বুড়িয়ে যায়, এবং তুমি তিরিশ পেরুতে না পেরুতে, আমি জটেবুড়ির বার্দ্ধক্য দশায় গিয়ে পৌঁছব। তখন তুমি, তোমার সর্ব্বনাশের জন্য আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপাবে—আর হতভাগিনী ফানিকেই আবার নতুন ক'রে তার সমস্ত দুঃখ পোহাতে হবে।

শোনো, প্রাচ্যে কোথায় এক দেশ আছে, সেখানে, একটা বইয়ে পড়েছিলাম, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী নারীকে জীবন্ত একটা বিড়ালের সঙ্গে, একটা চামড়ার থলেয় সেলাই ক'রে সমুদ্রতীরের বালির ওপরে, উত্তপ্ত

সূর্য্যতেজের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেয়েটি চীৎকার করে এবং বেড়ালটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে—দু'জনের ঝটাপটি আর আর্ত্তনাদ—এবং বিড়ালের সেই মরণ কামড়—তার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যতেজ, চামড়া ক্রমশই কুঁচকে আসে—যতক্ষণ না শেষ কাতরধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যায়—থলেটা শেষ বারের মতো কেঁপে পড়ে থাকে। ভেবে দেখো, আমাদের দু'জনের দশাও ঠিক এই রকমই হবে—'

গোসাঁ্যা মুহূর্ত্তের জন্য থামে,—বিধ্বস্ত এবং বিহ্বল হয়ে থেমে যায়। চোখ তুলে তাকায়, যতদূর দৃষ্টি যায়, ধূসর সমুদ্র ধূ ধূ করতে থাকে—চক্‌চক্ করে তার চোখের ওপর। তার ব্যর্থ, চূর্ণ বিচূর্ণ জীবনের একান্ত শূন্যতা তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। শোকাবহ, ধূসর ঊষর জীবন—কোন দিকেই কোন সান্ত্বনা সে দেখতে পায় না। যেমন বীজ সে বপন করেছিল তাই আজ কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ হয়ে ফলেছে—ভবিষ্যতের জন্যে আর কোন ভরসাই তার নেই। কেবল এই নারী—এই ছলনাময়ীর জন্যে—তার সমস্ত আশার সমাধি আজ। এবং সেই নারীও আজ তার হাত ফস্‌কে চলে যাচ্ছে!

'তোমাকে আগেই আমার এ-কথা জানানো উচিত ছিল, কিন্তু আমার সাহস হয় নি। তুমি এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলে এবং স্থিরসঙ্কল্প করেছিলে—তোমার উৎসাহ আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার ওপরে, আমার নারীর অহঙ্কার—তোমাকে আবার আমি জয় করতে পেরেছি, হারাবার পরে ফের জয় করে এনেছি তার গর্ব্ব বোধ—আমাকে বাধা দিয়েছে। তবুও, আমার অন্তরের গভীরতায় আমি অনুভব করেছি—কী যেন নেই, কিছু যেন নেই! এতদিনের ছাড়াছাড়ির পর কিসের যেন অভাব!—ভাঙা কাচ কি আর জোড়া লাগে? ভেব না যে, হতভাগা ফ্লামাঁর জন্যেই তোমাকে আমি ছাড়ছি। মোটেই তা নয়। তার জন্যে, অথবা তোমার জন্যে, অথবা আর যে কোন পুরুষের জন্যেই—আমার সমস্ত নিঃশেষিত—আমার ভালোবাসা মরে গেছে।

কারুকেই আর আমি ভালোবাসতে পারব না—কোনদিনই না। কিন্তু সেই ছোট ছেলেটি, যে আমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না, সেই ফিরে এসে আমাকে তার বাবার কাছে নিয়ে চল্ল। শিশুর এই টান—এই এখন আমার কাছে সজীব—একমাত্র সত্য। এ-টান আমি ছাড়তে পারলুম না।

আমি তোমাকে বলেছি তো, আমার জীবনের ওপর দিয়ে ভালোবাসার ঝড় বয়ে গেছে—খুব বেশি আমি ভালোবেসেছি—এখন আমি বিধ্বস্ত। ভবিষ্যতে আমি এমন একজনকে চাই যে উল্‌টে আমাকে ভালোবাসবে, আমি না ভালোবাসলেও, আমাকে পূজা করবে যে। যে তার সমস্ত স্নেহ, শ্রদ্ধা আর সান্ত্বনা আমার পায়ে ঢেলে দেবে—আমার কপালে রেখা পড়েছে কিনা, বা আমার চুলে পাক্ ধরল কিনা, যে লক্ষ্য করবে না—এবং ফ্লামাঁ হচ্ছে সেই ধরণের মানুষ যাকে আমার এখন দরকার।

এমন কি, সে আমাকে বিয়ে করতেও পারে। আমি যদি সম্মত হই, তাহ'লে যেন তাকে কৃপা করাই হবে।

এখন, এই দুটি ছবিই তুমি মিলিয়ে দেখ।

তারপর—শেষ কথা—আর বোকামি করো না। যাতে তুমি আমাকে আর খুঁজে না পাও আমি সেরকম ব্যবস্থা করে'ই যাচ্ছি। ষ্টেশনের কাছাকাছি যে-কাফেয় বসে তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি, সেখান থেকে, গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে, আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটি দেখা যাচ্ছে—যেখানে একদিন কী সুখেই না আমরা কাটিয়েছিলাম—আর তার পরে কী দুঃখেই না দিনের-পর-দিন আমার কেটেছিল—সুখদুঃখের স্মৃতি জড়ানো সেই বাড়িটি আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি তার বন্ধ জানালায় বিজ্ঞাপন টাঙানো—'নতুন ভাড়াটে চাই।'

তুমি মুক্ত—তুমি স্বাধীন। আর এ জীবনে তোমার পথে আসব না।

বিদায়, একটি চুমু—একটি মাত্রই—আমার শেষ চুম্বন—তোমাকে—আমার প্রিয়তম।—

সমাপ্ত

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

আলফঁস দোদের 'সাফো' হইতে অনূদিত

হরেকৃষ্ণের যুক্তি

(মাথা বুলোতে বুলোতে)

"হে ইচ্ছা, হে ইচ্ছা—
মাথা ঠুক্‌ল দেয়ালে,
জোরে মলম লাগানো আর তোমার ক্ষেদ ঃ
কেন দেয়াল, কেন ইঁটের নিষেধ,
কালসিটে পাথরের শক্ত খেয়ালে ?
অথচ অন্য সময়ে চাও বাড়িটা মজবুৎ ।
শোনো, তোমার অবস্থাটা অদ্ভুৎ ।
হে ইচ্ছা ।

"হঠাৎ মধ্য হতে থাম্‌বে কেন ফলা ?
ফল্‌বে নিয়ম ফল,
শিকলের জোড়ে-জোড়ে কল
পারম্পর্য্যের অমোঘ ছলাকলা ।
ভাব্‌লে দেখ্‌বে এর মধ্যেই আশা
কেননা কারণ বুঝ্‌লে শেষ করব সর্ব্বনাশা
যাকে বলি হঠাৎ,
(অকারণে বলা বিনামেঘে বজ্রপাত) ।

"ধরো যদি তোমার খুসিতে নিয়মের লক্ষ্মী বা নিয়মের যম
ভাঙ্‌ত নিয়ম,
ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ত মোড়ক কুইনিন্‌ নীল শূন্য থেকে
প্রাণবাঁচানোর কান্নায় যখন মরচ বিধিকে ডেকে ;
যদিও ভাবচ হোতো ভালো,
আগাগোড়া সব কণা সত্যকেই তবে বদলাতে হোতো—কে প্যাক করালো

কাগজ কোথায় হাওয়ার শূন্যে, তিতো কৈ উর্দ্ধমূল অবাক্ শাখ গাছে,
ইত্যাদি। ভূতুড়ে ব্যাপার চাও দৈবের কাছে ?
তেমনতর আবদার-বিতস্তত পৃথিবীতে সত্তা
—তার চেয়ে ভালো আত্মহত্যা।

"নিয়মভাঙা কান্নার দাবী কে শোনে
কত যুগে মা কাঁদল, মৃত্যুর ক্ষণে
যন্ত্রণার চরম ক্ষণে একমাত্র শিশুর—শিশু কি বাঁচল ?
বাঁচেনি।
বাঁচে যখন প্রাণ এবং বুদ্ধি এক উৎসাহে কাজে নাচ্‌ল
—কেবলমাত্র ধ্যানেই নাচেনি—
এবং উত্তর এল যখন আমার হাত, আমার মন, আমার ভুবন
বিস্মিতের মর্ম্মে বাঁচার ওষুধ করেচে উদ্‌ঘাটন।

"প্রশ্ন করচ : কিন্তু বেশি কেন পারি না ?
উত্তর : আজও কাঁদি, কিন্তু বোমা ছুঁড়ি, অতএবই মরি
এবং মারি (অন্যের প্রাণের ধার ধারি না,
অথচ অন্যে বোমা ছুঁড়লে রাগ করি।)
অতিমানসে ব'সে খুনোখুনির টাকা না দিয়ে ছাড়ি না।
হে ইচ্ছা, হে ইচ্ছা

"নিয়ম অতিক্রম ?
যম এবং ইত্যাদিকে দেখানো মানুষ কি কম ?
—তা যদি হয় তো হবে।
কিন্তু চোখ বোজবার দলীয় উৎসবে
চোখ, মন, কাজ, ইচ্ছা, ভালো মন্দ লুপ্ত যদি করো, তবে,
অসুখও নেই সারাও নেই সেখানে, অর্থাৎ
বিশ্বকর্ম্মে একটা কথা বলেও প্রমাণ কোরো না মূর্খতা, তফাৎ

থেকো। দুটোকে অন্যথা মিশিয়ে, চৈতন্যের কাজ এবং তদাতীত—
সেটা যাই হোক্—
খেচরান্ন বানানোটাই ধূম্রলোক।
বুদ্ধির গাধাটাকে যদি নিয়ে যাও ঘাটের দিকে
—পাকা সড়ক দিয়ে চালাবার পথ আগে শিখে—
তার পরে যেটা জল
স্বচ্ছ, হিমগলা, চিরনির্ঝরিত নির্ম্মল,
যা পাবে তার হিসাব নেই ঃ
যেখানে স্নান এবং পান।
খোঁজো মর্ত্যে নদীর সন্ধান
যাকে বল্‌চি গাধা তার পিঠে চ'ড়েই।
হে ইচ্ছা, হে ইচ্ছা ॥

অমিয় চক্রবর্ত্তী

শূন্য ঘর

অনিশ্চিত এ সংসার ঃ নিষ্ফল নিশানা।
ভারি রণতরী ভিড়ে ঘাটে ও বন্দরে।
শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত পথ কি অজানা ?
নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থার মহড়া নগরে।

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল যেমনি,
বাপুজিরো মৌনব্রত আরম্ভ আবার।
সম্বল বল্কলমাত্র, কোন্ ধনে ধনী
হ'য়ে তবে নির্ব্বিকল্প এই ব্যবহার ?

বিষণ্ণ হৃদয় যেন ছিন্নমূল শাখা
বাতাসের দোলা লেগে কদাচিৎ নড়ে।
নির্ম্মম সূর্য্যের তাপ কঠিন পাথরে।
এখন সম্ভব নয় হাতে হাত রাখা।

চিত্রাঙ্গদা প্রতীক্ষা-কাতর—
বেকার অর্জ্জুন আজ বহুকাল ছেড়ে দিয়ে ঘর
বেরিয়েছে মরু-পর্য্যটনে,
কবে যে ফিরিবে ফের মেয়েটিরো পড়ে না স্মরণে।

চৌদিকে ছড়ানো আছে বিস্তর জঞ্জাল
পরিত্যক্ত জীবনের, পুতিগন্ধময়।
ডুবেছে অনেক তরী, ভেঙে গেছে হাল—
যা সহাও তাই যেন এ শরীরে সয়।

চূর্ণ ও বিচূর্ণ হ'লো খ্যাতি কীর্ত্তিভার।
সীমাবদ্ধ সত্যাগ্রহে হবে দেশোদ্ধার ?
এহেন বুর্জোয়ারীতি ঠেকিছে মামুলি।
কী আজ রয়েছে মনে সোজা খোলাখুলি

বলা ভালো, ধৈর্য্য ধরে আছে জনগণ।
মন্ত্রর সাধন কিংবা শরীর পতন।
জীবন শাখায় আসে শিলযুক্ত ঝড়।
কেন তবু ভীরু গতি, তৃষিত অধর ?

বসন্তশেষের দিন শবাহত কাটে।
নিথর চন্দ্রিমা জ্বলে পূর্ণ পূর্ণিমায়।
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কাচের কবাটে।
ম্যামথের স্মৃতি ফোটে পাথুরে ছায়ায়॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

হাওয়া

দু নম্বর বাসে গিয়ে শ্যামবাজারের সেই চায়ের দোকানে
দেখা কোরো।······শুন্‌লাম ঃ দু নম্বর বাস। দু নম্বর ?
কত ?

কিন্তু কী হবে দেখা করে ?

তোমাকে জ্বলন্ত দিনে মনে পড়ে।
শূন্য দিন।···কারা কথা কইলো, কারা ?
ঝিলমে শিকারা ?
শ্যামবাজার, চায়ের দোকান, বাস,
কত নম্বর ?

আহা
কী সুন্দর হাওয়া।
এলো কোথা থেকে ?
কোন্ নীল আকাশ, নীল অরণ্য, কোন্ নীল সমুদ্রের
নোনা জল মেখে !

এখানে
চায়ের দোকানে
সে বাতাস হঠাৎ ছড়ালো
মুহূর্ত্তের সমারোহ।

আমি কি ভুল্‌তে পেরেছি ? যখন
শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে চলি
তখনো কি মনে মনে বলি ? (তোমার নাম ?)
···আমি এগিয়ে এসেছি
ছিঁড়ে এসেছি।
কিন্তু অদ্ভুত তোমার নাম,
মন্ত্রের মত।

ঈশ্বর যেমন ধূলো থেকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন
(ঈশ্বর ?)
তারপর যেমন
অনেক নীল রাত
আর ফ্যাক্টরির আগুন
আর অজন্মা
আর দুর্ভিক্ষের পর
বজ্রের আগুনে আমরা ছাই হয়ে যাবো,
সেই রকম আমাকে তুমি ছাই কোরো।
তুমি কি আমাকে সৃষ্টি করেছিলে ?

আমাদের প্রাত্যহিক নবজন্মে
নবমৃত্যুতে
গম্ভীর পাহাড়ের ছায়া
আর বছরের শেষ ঝরাপাতা।
কত ঝরাপাতায় আমাদের ব্যবধান দীর্ঘ হয়েছে।

বছরের শেষ সূর্য্য পশ্চিমে রক্তপতাকা তুলে ধরেছে।
ল্যাণ্ড্ স্পেকুলেশান, চায়ের দোকান, দু নম্বর বাস্,
তোমার আমার পৃথিবী
আজ আশ্চর্য্য হাওয়ায় একাকার শুষ্ক পাতার মত।
মনে নেই আমায় তুমি ভালবেসেছিলে কিনা
সামনে নতুন বছর, নীল আকাশ
আর হাওয়া ;
আহা
কী সুন্দর হাওয়া।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

গুপ্ত-যুগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১১)

কুষাণযুগের পর ভারতের বিশিষ্ট ঘটনা হইতেছে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যুগ। অনেকের মতে (১) ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ এইযুগে প্রথম বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়েই পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের শেষ সংকলন হয়। এই সময় ভারতে আবার জাতীয়তাবাদী যুগ আরম্ভ হয়, নিখিল ভারত আবার একজাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। এইবার একজাতীয়তা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা সমুদ্রগুপ্ত একজন সামান্য রাজপুত্র, ইনি লিচ্ছবীদের দৌহিত্র এবং তাঁহার জাতি অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি নিজেকে "লিচ্ছবী তনয়াসুত" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। জয়সওয়ালের প্রথম আবিষ্কার অনুযায়ী "গুপ্তেরা" কারস্কারজাতীয়। তাঁহার দ্বিতীয় আবিষ্কার হইতেছে যে ইহারা জাঠ জাতীয় ছিলেন। গুপ্তদের কারস্কারজাতীয় উৎপত্তি বিষয়ে অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সন্দিহান। তিনি বলেন যে এই বিষয়ে প্রমাণের অভাব; কারণ, কৌমুদি মহোৎসবে (Aiyangar Com. Vol. P 361) উল্লিখিত চন্দ্রসেনকে ১ম চন্দ্রগুপ্তের সহিত এক বলিয়া সনাক্ত করা (identify) বিচারসহ নহে। (Vide Prof Dr. H. C. Rai Choudhuri, Political History of Ancient India; foot-note to P 442, 1938)।

'আর্য্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' পুস্তক আবিষ্কারের পর দ্বিতীয়বার তিনি গুপ্তদের "জাঠ"জাতীয় বলিয়া স্থির করেন এবং উভয় মতকে মিলাইবার জন্য তিনি

১। Vincent Smith—Early History of India.

বলেন যে প্রাচীন কারস্কারেরা বর্ত্তমানের 'কাক্কর জাঠ'-এ পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সংস্কৃত পুস্তকের দক্ষিণ-ভারতীয় পুঁথিতে উক্ত আছে—"মথুরায়াং জাত বংশ্যাচ্যঃ বণিক" (৩৫১); পুনঃ তিব্বতীয় পুঁথিতে বর্ণিত আছে—"মথুরাজাতো বৈশ্যাখ্যাঃ পূর্ব্বো"। তিনি বলিতেছেন (আর্য্যমঞ্জুশ্রীর ইংরেজী অনুবাদ—An Imperial History of India, P53) "He is said to have been a Mathura Jata (Sanskrit, Jata-Vamsa). Jata-Vamsa, that is, Jata Dynasty stands for Jarta, that is Jata. That the Guptas were Jats, we already have good reasons to hold (Journal of Behar-Orissa Research Society, Vol. XIV, P 118). কোন্ ভাষাতত্ত্ব বা স্ফোটতত্ত্ব অনুসারে সংস্কৃত 'জাত' আধুনিক পাঞ্জাবী বা হিন্দী 'জাট' বা 'জাঠ'-এ পরিণত হইতে পারে তাহা বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিবেন। কিন্তু জাঠেরা আজ পর্য্যন্ত শূদ্র বলিয়াই গণ্য হয়। লেখক শুনিয়াছেন যে রাজপুতনার কোন কোন স্থানে তাহারা ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করেন। আর্য্যমঞ্জুশ্রী বলিতেছে যে গুপ্তদের পূর্ব্বজেরা মথুরার ধনী বৈশ্য বা ব্যবসায়ী ছিল। এইজন্যই কি এইবংশে বৈশ্যবর্ণবাচক "গুপ্ত" পদবী গৃহীত হয়? ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথের তাহাই অনুমান। যাহা হউক, তাহাদের হীন উৎপত্তি ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাহারা বাঙ্গলার পালদের ন্যায় নিজেদের জাতির পরিচয় দেয় নাই।

আজকাল পুনঃজাগরণের যুগে হিন্দু ইতিহাস লেখকেরা পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজাদের "জাতে তুলিবার" চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্যই চন্দ্রগুপ্ত হইতেছেন মৌর্য্য-ক্ষত্রিয়, সমুদ্রগুপ্ত হইতেছেন "জাঠ" (এই জাতিও আজ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছে), শিবাজী 'ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন মহাপদ্মনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুগের "মাধোজী সিন্ধিয়া," রণজিৎসিংহ পর্য্যন্ত অনেক বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রাজা নীচ শূদ্রবংশীয় ছিলেন এবং অনেকে "জারজ"ও ছিলেন, একথা কি অস্বীকার করা যায়? কিন্তু মুলা পঞ্চাননের—"ভূমীপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলিয়া বলায় যত্র তত্র;" পুনঃ "রাজায় রাজায় বিবাহ, সবাই ক্ষত্রিয়। পিতৃমাতৃ একপক্ষ, রাজন্য গোত্রীয়"—এই কথাই হইতেছে ভারতীয় রাজাদের সমাজতত্ত্বের চাবিকাঠি!

স্মৃতিতে এই জাতিকে একটি ব্রাহ্মণবর্জ্জিত অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতির মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে এবং মহাভারতে (কর্ণপর্ব্ব) ইহাদের ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত ও ব্রাত্য বলা হইয়াছে। ইহারা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ছিল ; ইহাদের শাসনকালেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতঃ "ভূ-দেবতারূপে" নিজেদের জাহির করিতে পারে।

গুপ্তযুগে (৩২০-৫০০ খৃঃ) গিল্ডগুলি খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও বিষ্ণু-স্মৃতিসমূহ প্রমাণ করে যে গিল্ডগুলি কেবল রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অংশ হয় নাই, রাষ্ট্র তাহাদের নির্দ্দেশ মানিত (২)। এই গিল্ড-গুলির নিজের নিজের সভ্যদের উপর আইন জারী করিবার ক্ষমতা ছিল, যে-সব ব্যাপার দ্বারা নিজেদের ব্যবসায় আটক পড়িত সেই সকল স্থানে ইহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। শুক্রের নিম্নলিখিত বচন দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে গিল্ডরূপ প্রতিষ্ঠানটি দেশের সাধারণ আদালতেরও কার্য্য করিত ; "কুল, শ্রেণী এবং গণ-সমূহ (সাধারণতন্ত্রীয় সমাজ) স্বায়ত্ত-শাসনের ধাপে ধাপে উচ্চ প্রতিষ্ঠান। যখন এবং যে-স্থলে ইহারা অকৃতকার্য্য হইবে, তখন রাজা ও তাহার কর্ম্মচারীগণ হস্তক্ষেপ করিবে" (৩) (৪, ৫, ৫৯—৬০)। এতদ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে গিল্ডগুলির "স্বায়ত্ত্ব-শাসন" ছিল, এবং এই বিষয়ে তাহারা ইউরোপীয় গিল্ডগুলি হইতে অধিক অধিকার ভোগ করিত। এই সময়ে ব্যবসায় ও শ্রমশিল্প বিশিষ্টভাবে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল।

এই যুগের স্মৃতিকারদের মধ্যে নারদ ও বৃহস্পতি ছিলেন প্রধান। নারদ 'নিয়োগ-প্রথা' সমর্থন করিয়াছেন (৮০-৮৮) ; স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহেরও আদেশ দিয়াছেন (৯৭)। ইনি পনর প্রকার গোলামের (২৬—২৮) তালিকা দিয়াছেন (মনু সাত প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন)। নারদ রাজপদকে দেবত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন ; এবং দুর্ব্বল ও অযোগ্য রাজাকেও মান্য করিতে এবং তাহার আদেশ পালন করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন (২০—২২)। নারদে "দিনার" মুদ্রার (৩ক) কথা উল্লেখ থাকায় জয়সওয়াল এই পুস্তক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখিত বলিয়া মনে করেন। নারদের রাজার দেবতা

২। S. K. Das—P 248.
৩। S. K. Das—P 251—252.
৩ক। রোমান Dinarius মুদ্রা এক সময়ে ভারতে প্রচলিত ছিল।

হইতে জন্ম ও এত খোসামুদী করার জন্য ইনি অনুমান করেন যে একটা নূতন রাজবংশের শাসনের ওকালতী করিয়াছেন এবং নারদ গুপ্ত সম্রাটদের শাসন সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি হয় নারদের সমসাময়িক না হয় কিঞ্চিৎ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে নারদ অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যদিকে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণে ব্রাহ্মণদের অবধ্য ও শারিরীক শাস্তিভোগের অতীত বলিয়াছেন।

গুপ্তযুগে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রীয় যুগ পূর্ণরূপ ধারণ করে বলিয়া অনুমান হয়। এই সময়ে পুরোহিতশ্রেণী ভগবানের প্রতিনিধি, তজ্জন্য উহার সাত খুন মাপ—এই মত জাহির করা হয়। আবার রাজাও ভগবানের প্রতিনিধি বা দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রচারিত হয়। এই সময়ে ব্যবসায় ও শিল্পকে গিল্ডের অধীন করিয়া সেই গিল্ডের কর্ম্ম মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করা হয়। শূদ্রের প্রতি শাসন ও বিচার ব্যবস্থা অতি কঠোর হয়। বিষ্ণুসংহিতাতে নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট অপরাধ করিলে মনুর ব্যবস্থিত আইনের ন্যায় নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান করা হইয়াছেঃ "নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীর লোকের আসনে বসিলে তাহার নিতম্বে আগুনের ছাপ দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে" (৫,২০); সে যদি থুথু ফেলে তাহার ঠোঁট কাটিয়া দিবে (৫,২১); কোন জাতিচ্যুত ব্যক্তি সাক্ষীরূপে গৃহীত হইবে না (৭,২); নিম্নশ্রেণীর পুরুষ দ্বারা উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে, দ্বিজেরা তাহাকে ঘৃণা করে···সকলে নিজের সমাজের মধ্যে সামাজিকতা করিবে (৯,৩,১৫); দ্বিজেরা যদি আহাম্মকী করে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক বিবাহ করে তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদের পুত্রদেরও বংশকে শূদ্রের স্তরে নামাইয়া দেয় (২৬,৬)। এই সময়কার স্মৃতিসমূহ পাঠ করিলে আমরা অন্যান্য দেশের সামন্ততান্ত্রিক যুগের মনোবৃত্তি এই দেশেও প্রকাশিত হইতে দেখি। সমাজে শ্রেণীসমূহ যত কুর্ম্মাবস্থা ধারণ করিতে থাকে, উপরের স্তরের লোকেরা তত নিম্নস্তরের লোকদের সহিত পৃথক হইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে।

ধর্ম্মোপাসনার জন্য রক্তের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন (৩খ)—এই অজুহাত

৩খ। রোমান Patrician-গণ এইপ্রকার অজুহাত তুলিয়া ধর্ম্মোপাসনা সম্বন্ধে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিত।

ভুলিয়া নিম্নশ্রেণীর সহিত বিবাহ ও আহারাদি বন্ধ করা হয়; প্রকৃতপক্ষে ইহা কিন্তু নিম্নশ্রেণী হইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আলাদা হইবার ফন্দি মাত্র। এই যুগে রাজা ও পুরোহিত উভয়েই ভগবানের সনন্দ প্রাপ্ত লোক হয়। এই সময়েই গণ-সাধারণকে শোষণ ও লুণ্ঠনের জন্য ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র এক হয়। ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রিয়ার সময় হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রে এই লক্ষণ আমরা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্র তপস্বী শম্বুকের হত্যা এই লক্ষণের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। এইযুগেই অজ্ঞ লোকদের মোহমুক্ত করিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির শেষ সঙ্কলন করিয়া তাহাতে 'ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত' গাহিবার ন্যায় ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের কথা প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে (৩গ) (বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ কাহিনীটি ইহার একটি নমুনা)। এইযুগে ব্যবসায় ও শিল্পসমূহ যেমন সংঘবদ্ধ হয়, গোলামীত্ব ও অর্দ্ধ-গোলামীত্ব তেমন অনেক স্থলে বাড়ে। ভারতে এই সময়ে গোলামদের প্রকারভেদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে—এই তথ্য আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। সামন্ততান্ত্রিকযুগের অপর একটি লক্ষণ হইতেছে রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যাপারে স্তর-বিভাগ (hierarchy) সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রের শীর্ষোপরি রাজা থাকে, তন্নিম্নে সামন্ত রাজগণ, তন্নিম্নে ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী সর্ব্বনিম্নে থাকে কৃষক।

মৌর্য্যযুগের পর হইতেই যে সামন্তযুগ অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। গুপ্তযুগের সময় তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই যুগে সার্ব্বভৌম রাজার অধীন সামন্ত রাজার কথা শুনা যায়, ভূম্যধিকারী উদ্ভূত হয় ইত্যাদি। এই সময়ে একটা পুরুষানুক্রমিক আমলাতন্ত্রও বিবর্ত্তিত হয়—ইহাও ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। একটা জাতির অর্থনীতিক বিবর্ত্তন তাহার সমাজে প্রকাশ পায় এবং তাহার ভাবরাজ্যেও (ideologies) তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীস একটা একজাতীয়তাপূর্ণ রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই, সহর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের 'হেলেন'ত্ব জ্ঞাপনের জন্য Amphictyonic League স্থাপন করিয়া তথায়

৩গ। পরশুরাম ভৃগুবংশীয় এবং "মানবধর্ম্মশাস্ত্র" প্রণেতাও ভৃগুবংশীয়; সেইজন্যই কি পুরাণে বিষ্ণুকে ভৃগুকে দিয়া লাথি খাওয়াইয়া ব্রাহ্মণশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পরস্পারের সহিত নির্ব্বিবাদে মিশিত। এইজন্য তাহাদের ধর্ম্মেও একত্ব স্থাপিত হয় নাই। দেবতারা একটা আল্‌গা সংঘ (Loose federation) দ্বারা সংযুক্ত ছিল। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রেও এই প্রকারে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। বৈদিকযুগে প্রত্যেক কৌমের একটি করিয়া পৃষ্ঠপোষক দেবতা থাকিত, এবং প্রত্যেক কৌমের নিজের কৌমগত দেবতা অপর কৌমের দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বড়াই করিত (৪)। পরে কৌমগুলি ভাঙ্গিয়া যখন বড় বড় রাষ্ট্র উদ্ভূত হইতে লাগিল, তখন দেবতাগুলি ছোট হইয়া 'এক ব্রহ্মণ' সৃষ্টি করা হয় (ব্রহ্মা বেদের দেবতা নয়)। রামায়ণে অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল যুগে আমরা বৈদিক দেবতাদের মাথার উপরে ব্রহ্মাকে অধিষ্ঠিত দেখি; এবং সর্ব্বোপরি বিষ্ণুকে দেখি। মহাকাব্য (Epic) ও পুরাণ সমূহ সামন্ততান্ত্রিকযুগে শেষ সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা তন্মধ্যে রাষ্ট্রীয় বুরোক্রাশীর প্রতিবিম্ব স্বর্গের বুরোক্রাশীরূপে বর্ণিত দেখি। মহাভারত ও পুরাণ সমূহে স্বর্গের আমলা-তন্ত্রের পূর্ণ চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় অধিপতি যথেচ্ছাচারী হইয়া-ছিল বলিয়া হিন্দুর ভগবান 'সগুণ ব্রহ্মণ'রূপে বর্ণিত হয়। এই যুগের মহাকাব্য এবং পুরাণের ইন্দ্র ও দেবতারা বৈদিক দেবতাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়; ইন্দ্র কেবল অসুর ও রাক্ষসদের দ্বারা পরাজিত হয়, তাহার সভা সমুদ্রগুপ্ত অথবা এই যুগের কোন এক সম্রাটের দরবারের প্রতিচ্ছবি। ইন্দ্রের সভায় খেমটাওয়ালী নর্ত্তকীরা (অপ্সরা) নাচিতেছে, সে সিংহাসনে মহিষীসহ উপবিষ্ট, সন্মুখে যুবরাজ জয়ন্ত রহিয়াছে, সেনাপতি স্কন্দ বা কার্ত্তিক হাজির এবং তাহার শিরোপরি ব্রহ্মা আছে; সে আবার বিপদ উপস্থিত হইলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। এই দেবতাদের মধ্যে 'শ্রমবিভাগ' আছে; ইন্দ্র কেবল স্বর্গের একজন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ (Office-master) মাত্র। প্রাচীন ঈজিপ্টের সাম্রাজ্য-বাদী একেশ্বরবাদীয় ধর্ম্মসংস্কারক ফেরো ইখনাটনের (কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে জগতের প্রথম বড় বিপ্লবী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন; (Vide J. H. Breasted, 'Development of Religion and Thaught in Ancient Egypt; Moret and Davy, 'From Tribes to Empire') একমাত্র দেবতা 'রে' (Re) পূজার প্রবর্ত্তনের পশ্চাতে যেমন ঈজিপ্টের ইতিহাস প্রতিবিম্বিত

৪। Mcdonell—Vedic Mythology.

হয়, প্যালেষ্টাইনের বারটি ইহুদি কৌমের এক এক জিহোভার উপাসনার পশ্চাতে যেমন সেই দেশে একজাতীয়তা লাভের ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভারতের ধর্ম্মের অভিব্যক্তির মধ্যে এই দেশের রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তনের প্রতিবিম্ব অনুসরণ করা যায় (৪ক)।

এইস্থলে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হইতেছে—সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি। সামন্ত-তন্ত্রবাদের প্রধান লক্ষণ হইতেছে—(i) Vassalage (প্রজারূপে আনুগত্য বা অধীনতা), (ii) Benifice or Fief (তাঁবেদার লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাকে জমি প্রদান করা ; ইহার পরিবর্ত্তে এই লোক প্রয়োজন হইলে মনিব বা আশ্রয়দাতার কর্ম্ম করে) ; (iii) Immunities (কতকগুলি রাজকর dues হইতে বা সাধারণ কর্ত্তব্য হইতে রেহাই পাওয়া কিম্বা রাজাদ্বারা আর্থিক এবং আইনের অধিকার প্রদান করা—এইগুলি ইউরোপে বেশীর ভাগ গির্জ্জা ও মঠগুলি উপভোগ করিত। রাজা সনদ দিয়া রাজকীয় অধিকার প্রদান করিত। এতদ্বারা প্রত্যেক সামন্ত স্বীয় জমিদারীতে প্রকৃত রাজা হয়। ইহারা পুরুষানুক্রমে সামন্ত হইলে ইহাদের তাঁবেদার তালুকদার বা জমির খাজনাকারীদের এইরূপ অধিকার প্রদান করিত) ; (iv) sub-feudination (রাজা তাঁবেদার একজন সামন্তকে জমি প্রজারূপে খাজনায় দিত, সামন্ত তাহার নীচে অপর একজন লোককে জমি খাজনায় দিত, সে আবার অপর একজনকে দিত, এইরূপে কৃষকের কাছে গিয়া জমি পৌঁছিত), ইহার মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষণটি হইতে পরে Manorial System (জমিদার তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের জন্য কর্ম্মচারী বা ভৃত্যদের নগদ মাহিয়ানার বদলে নিষ্কর জমি প্রদান করে ; ইহাকে বঙ্গদেশে "চাকরান" জমি বলে) উদ্ভূত হয়। চতুর্থ লক্ষণটিও বোধ হয় কতকটা দ্বিতীয়টির অন্তর্গত ; কারণ সামন্ত ও তাহার ভূমির খাজানাকারীর প্রত্যেকেই তাহার উপরের ভূস্বামী হইতে জমি খাজনায় নিত এবং তাহার বশ্যতা স্বীকার করিত। এই Feudal

---

৪ক। ভারতীয় আর্য্যদের কৌমগত রাজারা কি প্রকারে বৈদিক দেবতাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক দেবতা হইল, 'সগুণ ব্রহ্ম' ধারণা কি প্রকারে এবং কোন যুগে আসিল, এই সকলের স্তরের পর স্তর সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার এখনও অনুসন্ধান হয় নাই।

Tenure প্রথায় জমি ধাপে ধাপে নামিয়া ভোগদখলের অধিকার বিলি হইত।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই লক্ষণগুলি এইযুগের ভারতে বর্ত্তমান ছিল কিনা (৪খ)? এইস্থলে বক্তব্য যে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি যেমন অল্প অল্প করিয়া অনেক দিন ধরিয়া সংগঠিত হইয়াছে, ভারতেও ইহার বিবর্ত্তন হইতে বহুদিন লাগিয়াছে। তবে রুশিয়ার সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি যেমন ট্রটস্কির (৫) ব্যঙ্গভাষায় "দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিয়া বাহির করিতে হয়" ভারতেও প্রথমাবস্থায় কতকটা তদ্রূপ।

এক্ষণে দেখা যায় উপরোক্ত লক্ষণগুলির কতকটা আমরা প্রাচীন ভারতে পাই। জমি সম্বন্ধে জৈমিনীর (বোধ হয় খৃঃ পূঃ চারি শতকের এবং মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের লোক) মত (মীমাংসা সূত্র) আলোচনাকালে কোলব্রুক জৈমিনীর মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—The monarch has not property in the earth nor the sub-ordinate prince in the land," (রাজার পৃথিবীর উপর সম্পত্তির অধিকার নাই, এবং তাঁবেদার রাজার (সামন্ত) জমিতে অধিকার নাই।)। এতদ্বারা আমরা দেখি যে একজন রাজার অধীনে সামন্তরাজা বা রাজন্য থাকিত। জৈমিনীর মতে জমিতে রাজার অধিকার নাই; সেইজন্য জমি বিলি করিবার অধিকারও রাজার নাই, কিন্তু আমরা সামন্তরাজার উল্লেখ এইস্থলে দেখি। উক্ত মত অনুসারে রাজা জমির মালিক না হইয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিকারী (৬) কিন্তু রাজার দ্বারা বিশ্বস্ত লোককে গ্রামদান করাও একটি পুরাতন প্রথা ছিল। যাজ্ঞিক পুরোহিত বা শ্রোত্রিয়েরা গ্রামদান পাইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪, ২৪) শূদ্র রাজা জানশ্রুতি ব্রাহ্মণ রৈক্যকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য একটি গ্রাম প্রদান করে। এইপ্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা দেখি যে এই সকল ব্রহ্মোত্তর জমি-প্রাপ্তি দ্বারাই একদল ধনিক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী মহাশাল ও

৪খ। K. S. Shelvanker তাঁহার "The Problem of India" নামক পুস্তকে বলিতেছেন—চাষীদের উপর যোদ্ধৃশ্রেণীর স্তর সমূহের অবস্থানরূপ অনুষ্ঠানটি ইউরোপ ও ভারতের Feudalism-এ সমানভাবে বর্ত্তমান ছিল; পৃঃ ১০১

৫। L. Trotsky—Russian Revolution, Vol. 1.

৬। Dwijadas Datta—Peasant-proprietorship in India, P 2.

মহাশ্রেণীয়—সৃষ্টি হয় (৭)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও প্রাচীন বৌদ্ধসূত্রগুলিতে ইহাদের উল্লেখ আছে। এই প্রকারে বৈদিকযুগের শেষেই রাজার নিকট হইতে সুবিধাভোগকারী ভূ-স্বামীর দল দেখিতে পাই। তৎপর শেষের দিকের বৌদ্ধসাহিত্যে আমরা রাজন্যদের (princes) কিম্বা মূলধনীদের (capitalist) জন্য কৃষক দ্বারা জমি চাষ করার উল্লেখ দেখিতে পাই (জাতক নং ৩৩৯)। এই প্রথা ইউরোপের মধ্যযুগীয় এবং বর্ত্তমানের জমিদারী প্রথার ন্যায় ছিল বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মনুস্মৃতিতে একটি বুরোক্রাশী পোষণের ব্যবস্থা উল্লিখিত আছে (৭, ১১৪—১১৫), এবং ইহাদের ভরণপোষণের জন্য প্রজাদের নিকট রাজার যাহা প্রাপ্য তাহাই পদের উচ্চতানুসারে বর্দ্ধিত হারে এই বুরোক্রাশীর লোকেরা প্রাপ্ত হইত (৭, ১১৮—১১৯)। অবশ্য ইহা দ্বারা জমি-বিলি পদ্ধতির কোন পরিষ্কার আভাষ পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার দ্বারা কৃষক হইতে সহস্র গ্রামের অধিপতিরূপ স্তর-বিভাগ হইতে দেখি। হয়ত এইটিই কালে Feudal tenure-রূপে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু জমি যে সামন্ত-তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে বিলি হইয়া কৃষকে গিয়া পৌঁছিয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রথমে জমি রাজার সম্পত্তি ছিল না, পরে মৌর্য্যযুগে কতকগুলি বিশিষ্ট জমি, বন, খনি, পতিত জমি রাজার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয় (৮)। এইসব রাজা সম্পত্তিতে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় আইন সমূহের ন্যায় Game-law (রাজার জমিতে কেহ গাছ বা জন্তু, পক্ষী নষ্ট করিবার নিষেধাজ্ঞা) প্রচলিত ছিল (৯)। এই সময়ে ব্যক্তিগত জমি, রাজজমি, ব্রহ্মোত্তর (ব্রহ্মদেয়) জমিভোগকারী ব্যতীত "অ-করদ" প্রজার দল ছিল (১০)। ইহারা বোধ হয় রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে একটা কর প্রদান করিত। প্রথমটি ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র প্রথার প্রজা স্থিতি

৭। Dr. Narayan Chandra Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in ancient India, Vol. I. Pp 215—216.

৮—৯। Dr. Narayan Chandra Bandyopadhyaya—Kautilya, P 88.

১০। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—P 144.

করাইবার একটি সর্ত্তের সহিত মিলে। তবে শেষোক্তেরা নিজেদের জমি বিক্রয় ও দান করিতে পারিত; কিন্তু ব্রহ্মদেয় জমির ভোগকারী ও অ-করদ জমির ভোগকারী কেবল নিজেদের ন্যায় সম-সুবিধাভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিত। ইহাতে অনুমান হয় যে—অধিকার (privileges) ও রেহাই (immunity) যাহা এই প্রকারের জমিতে আছে তাহা কেবল এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয়, এই প্রকারে দুইটি বিশিষ্ট সুবিধাভোগকারী অর্থনীতিকশ্রেণী সৃষ্টি করা হয়।

ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দুযুগে সামন্ততন্ত্র পরিপূর্ণভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা তাহার প্রমাণাভাব এখনও ঐতিহাসিকদের নিকট রহিয়াছে। স্যার হেন্‌রী মেইন বলেন, 'সামন্ততন্ত্রীয়তার (feudalization) ন্যায় একটা গতি এক সময়ে নিঃসন্দেহ ভারতে ছিল। ইংলণ্ড ও ইউরোপের জমিতে বর্দ্ধিষ্ণু পূর্ণ সত্ত্বাধিকারের ঘটনার ন্যায় ভারতে সেইভাবে ঘটনা বা অনুষ্ঠান সমূহ ছিল; কিন্তু এই ভারতীয় ঘটনাগুলি একটির পর আর একটি না আসিয়া আজ পর্য্যন্ত একত্রে পাশাপাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতের সামন্ততন্ত্রীয়তা, যদি ধরা যায়, যথার্থভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই (১১)। তত্রাচ ভারতীয় সাহিত্যে এই সকল বিষয়ে যে-সকল লক্ষণ বর্ণিত হইতে দেখা যায় তাহা হইতে আমরা একটা অনুমান করিতে পারি। এই লক্ষণগুলি কি, তাহার একটু পুনরাবৃত্তি করিয়া উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শুক্রনীতিতে বলিতেছে, (১২) "রাজা দেবতাদের স্থায়ী উপাদানে সৃষ্ট, এবং স্থাবর ও অস্থাবর জগতদ্বয়ের প্রভূ (১৪১—১৪৩), রাজা দেবতাদের ন্যায় বর্দ্ধিত হয় আর কেহ নয় (৪, ৩, ৬); সেই শাসককে সামন্ত বলা হয়, যাহার রাজত্বে প্রজাদের উপর অত্যাচার না করিয়া একলক্ষ হইতে তিনলক্ষ কর্ষস মুদ্রা আয় স্বরূপ আদায় হয় (৩৬৫—৩৬৭), সেই শাসককে 'মণ্ডলিক' বলা হয় যাহার তিন লক্ষ হইতে দশ লক্ষ কর্ষস আয় আছে (৩৬৮—৩৭৪) ইত্যাদি। শাসকদের এই স্তর-বিভাগ আয় অনুপাতে সামন্ত, মণ্ডলিক, রাজা, মহারাজা, স্বরাট

১১। Sir Henry Maine—Village Community in the East and West Pp 158—159.

১২। B. K. Sarkar—"The Sukranity," Pp 12—24.

সম্রাট, বিরাট, সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এইস্থলে রাজা দেবাংশীয় এবং সর্ব্ববিষয়ের প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রজাদের উপর শাসন কর্ত্তাদেরও স্তরভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে স্পষ্টই তাঁবেদার সামন্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানগুলি সামন্ততন্ত্র পদ্ধতির লক্ষণ, তবে ইহারা পুরুষানুক্রমিকভাবে পদাভিষিক্ত থাকিত কিনা তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। এই সকল লক্ষণ ব্যতীত অধিকার (privilege), মকুব (মাপ) রূপ (immunities) সুবিধাভোগকারী জমিদারদের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জমির Sub-feudination সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজার যদি বাধ্য তাঁবেদার (vassal) থাকিত, তাহা হইলে তাহার অধীনে যে এবম্প্রকারের ক্ষুদ্র তালুকদার প্রজা থাকিত বলিয়া অনুমান করা যায় তাহা কি অযৌক্তিক হইবে ? এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি লক্ষণ আমরা সাহিত্যে পাই—noblesse oblige এবং chivalry রীতি। মহাভারতে এই রীতি আমরা বেশ ভালভাবেই পাই, এবং ইহার চরম গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাই। প্রত্যেক পদের সহিত দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সংযোজিত আছে—ইহাই হইতেছে প্রথমোক্তটির ভাবার্থ। এই কর্ত্তব্যবোধ শেষে রাজপুতদের নিকট "স্বামীধর্ম্ম"রূপে আদৃত হয়, এবং কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে যুদ্ধকালে শত্রুর প্রতি ভদ্রব্যবহার করা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখান বীরের কর্ম্ম—এই ভাব chivalry-র ভিতর নিহিত থাকে। প্রত্যেক দেশের সামন্ততান্ত্রিক যুগে chivalry ভাবটির উদ্ভব হইয়া militarism (যুদ্ধপ্রিয়তা) সৃষ্টি করে। এই সময়ে প্রাচীন Heroic Age-এর যোদ্ধার ভাবগুলি সামন্ত-তান্ত্রিক বীরদের অনুপ্রাণিত করে। শুক্রনীতি এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছে, "ক্ষত্রিয়ের বিছানায় মরা পাপ (৬০৪), যে-ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পলায়ন করে তাহার মরা উচিত (৬১৪—৬১৫)। এই ভাবটি আমরা প্রাচীন স্পার্টানদের এবং জাপানের বুসিডো (Bushido) প্রথার মধ্যেও প্রাপ্ত হই। সামন্ততান্ত্রিক যুগে যুদ্ধপ্রিয়তা তৎসঙ্গে মনিবের প্রতি আনুগত্য (স্বামীধর্ম্ম) সেই সময়কার বড় রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয় ; Troubadour-রা (চারণেরা) তাহাই গাহিয়া বেড়ায়, আর সেইযুগের বীরেরা স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষার জন্য নিজেদের তরবারী সতত উন্মুক্ত রাখে।

এই লক্ষণগুলি আমরা গুপ্তযুগের সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রকট হইতে দেখি। সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিতে স্বামীধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং বৈদিকযুগ হইতে আবহমানকাল চারণ ও ভাটেরা বীরদের গাথা গাহিয়া বেড়াইয়াছে। এইজন্যই বলিতে হয়, ইউরোপের সামন্ততন্ত্র পদ্ধতির যেমন সঠিক সংবাদ আমরা সেই মহাদেশের ইতিহাসে পাই, কিন্তু এই দেশে ইতিহাসের অভাবে তাহার কোন সঠিক নিদর্শন না পাইলেও বলিতে হইবে যে সামন্ততন্ত্রীয়তা যে ভারতের ইতিহাসে শনৈঃ শনৈঃ বিবর্ত্তিত হইতেছিল তাহা অস্বীকার করা বৃথা। ভারতের ইতিহাসে হিন্দুযুগের শেষে রাজপুতদের মধ্যে ও বঙ্গে তাঁহার নিদর্শন ভালভাবেই পাওয়া যায়।

গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভারতে আবার একজাতীয়তা স্থাপন করে; কিন্তু এই রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে (১৩) যে গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় নাগবংশীয় ও ব্রাহ্মণ ভকটক সাম্রাজ্য ছিল, গুপ্তেরা ইহাদের কর্ম্মের উত্তরাধিকারী হয়। এতদ্দারাই সহজে বোধগম্য হয় যে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য কি প্রকারে দৃঢ়বদ্ধ হয়। আবার দক্ষিণ ভারতে গুপ্ত-সার্ব্বভৌমিকত্বের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে খৃঃ দ্বিতীয় শতকে শতবাহন রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজা গোতমী-পুত্র 'ক্ষত্রিয়দের অহঙ্কার নষ্ট করেন, দ্বিজ ও

১৩। জয়সওয়াল তাঁহার History of India C 150 A. D.—350 A. D. (Journal of Behar and Orissa Research Society, Pp 1—222) প্রবন্ধে Naga Vakataka Imperial Period বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের পর নাগেরা বিন্ধ্যশক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নাগেরা 'ভারশিব' বলিয়া কথিত হইত। জয়সওয়ালের মতে ইহারাই শকদের তাড়াইয়া কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে যজ্ঞ করে। তাহাতেই তথায় এই ঘাটের নামের সৃষ্টি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের মতে এই ভারশিবেরা Hinduised Nagas of the Dravidian Stock। তিনি বলেন উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের অনেক আদিম কৌমেরা (ভূঁইয়ারা) নাগকুল বা গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া এই প্রাচীন নাগবংশের সহিত সম্বন্ধটানে (Man in India, vol. XIV, pp 305—306, Nos III & IV)। এইস্থানেই নাগবংশী-রাজপুতেরা বাস করে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রায়ের "The Hill Bhuiyas of Orissa," Pp 146, 305—306 প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কুটুবাদের (কৃষিজীবী) স্বার্থোন্নতি সাধন করেন এবং চতুর্ব্বর্ণের মিশ্রণ বন্ধ করিয়া দেন' (১৪)। শতবাহনদের পর আভীর রাজা ঈশ্বর সেন মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করেন (১৫)। এই আভীরদের পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে ও মহাভারতে শূদ্রদের সহিত সংযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বাল্মিকীর রামায়ণে তাহাদের সমুদ্র কর্ত্তৃক "দস্যু" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শতকের শেষাশেষি তাহারা পশ্চিমভারতের শক রাজাদের সেনাপতির পদাভিষিক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ভারতের এই অংশে আবার শূদ্র-শাসন ক্ষণিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি; কিন্তু ইহার পর "পল্লব," "কদম্ব" নামক ব্রাহ্মণবংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা ককুস্থবর্ম্মণ বিবাহার্থ গুপ্তরাজাদের কন্যা প্রদান করে। ইতিহাসে অসবর্ণ বিবাহের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই ভারতীয় সমাজ কি ভাবে পুনঃ সংগঠিত হইতেছিল তাহার কতকগুলি উদাহরণ এই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে বেশ বোধগম্য হয়। উপরে আমরা ব্রাহ্মণ রাজকন্যার সহিত ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত কারস্কর জাতীয় (কারস্করদের বৌধায়ন স্মৃতিতে ১, ১, ৩২ ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত বলা হইয়াছে) (১৬) গুপ্ত রাজবংশের বিবাহ উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমভারতের শক ক্ষত্রপেরা শেষে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং হিন্দু নাম গ্রহণ করে। ক্ষত্রপ চ্যস্তনের (খৃঃ ১৩০) পুত্র জয়দমন, তাহার পুত্র রুদ্রদমন। এইবংশের শেষ রাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহ ৩৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশের রাজা রুদ্র দমনের (রুদ্রদাম) কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ রাজা বশিষ্ঠ পুত্র শ্রীশতকর্ণীর (ইহার অপর এক নাম পুলুমায়ী) সহিত বিবাহ হয় (১৭)। এতদ্বারা আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, এই সময় পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন থাকায় শ্রেণীসমূহ (classes) জাতিতে (caste) পরিণত হয় নাই, এবং বিদেশীয় 'অহিন্দু' জাতি সকলও

১৪। Dr. H. C. Rai Choudhuri—P 326—340.

১৫। Dr. H. C. Rai Choudhuri—Pp 326—340.

১৬। K. P. Jayaswal—Journal of Behar and Orissa Research Society, P 114—116.

১৭। Dr. H. C. Rai Choudhuri—P 339.

হিন্দুসমাজভুক্ত হইতেছিল। কিন্তু পরে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় জাতীয়তাবাদের ঢেউ আসিয়া "সিংহ" উপাধিধারী এই ক্ষত্রপবংশকে ধ্বংস করে। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন সত্ত্বেও তাহাদের ব্রাহ্মণ্য জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। কথা এই—ক্ষত্রপ রাজবংশ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদের স্বগোষ্ঠীয় বা স্বজাতীয় অন্যান্য লোকেরা কোথায় গেল? তাহারা কি ভবিষ্যতের নব-ক্ষত্রিয় সিংহ উপাধিধারী "রাজপুত"রূপে ভারতের ইতিহাসে পুনঃ উদিত হয়? টড্ ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাহাই অনুমান করেন।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যাধীন উত্তর ভারতের সভ্যতার অবস্থা ঐতিহাসিকদের নিকট ভারতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আজকালকার ভারতীয় লেখকেরা এইযুগের বর্ণনাকালে আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠেন। ব্রাহ্মণ্য-বাদীয়দের নিকট এই যুগটা প্রাচীনকালের হিন্দু সভ্যতার চরমাবস্থা। কিন্তু এই সভ্যতার ইতিহাস পড়িলে আমরা জানিতে পারি যে ইহারা উচ্চশ্রেণীদেরই সুখ-সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রাধান্যকালে পতিতদের অবস্থা কি ছিল? ফাহিয়েন নামক এক বৌদ্ধ চীন-পরিব্রাজক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারত পর্য্যটনে আগমন করেন। তিনি দেশকে তৎকালে প্রচুর সমৃদ্ধিশালী এবং অধিবাসীদিগকে সুখী দেখিয়াছেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং পতিতদের দুঃখ দুরবস্থার কথাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নিম্নজাতীয় চণ্ডালেরা জাতিচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহাদিগকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত। মনুতে আমরা এই বিধানই দেখিয়াছি। যদি চণ্ডালদের অবস্থা উক্ত প্রকারের ছিল তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বিধান অনুযায়ী অন্যান্য শূদ্র ও পতিত শ্রেণীদের অবস্থা তখন কি ছিল তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। হিন্দুসভ্যতার চরমযুগেও তাহার class-character (শ্রেণী-লক্ষণ) বিদ্যমান ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে; তৎস্থলে উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্র সমুদ্ভূত হয়। এই সময় মধ্য এসিয়া হইতে হুন নামে একটি নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর জাতি ভারত আক্রমণ করে। ইহাদের বাধা প্রদান করিতে গিয়াই

গুপ্তরাজগণ হীনবল হইয়া পড়েন। কিন্তু গুপ্তদের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে হুনেরা মালব, রাজপুতনা ও পাঞ্জাব অধিকার করে। অবশেষে ৫৩· খৃঃ যশোধর্ম্মন্ হুনরাজা মিহিরকুলকে (আসলে নামটি হইয়াছে 'মেহেরগুল') পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করেন। হুনরাজা মিহিরকুল শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব স্থাপন করে; কিন্তু পরে পাঞ্জাবে তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জনশ্রুতি বলে যে মিহিরকুল শিবোপাসক ছিল। ইহার অর্থ এই যে শক ও ইউচিদের ন্যায় হুনেরাও ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে কথা উঠে, তাহাদের ভারতীয়ধর্ম্ম গ্রহণকারী সন্ততিগণ গেল কোথায়? অবশ্য এই সকল কৌম অতি বৃহৎ সংখ্যায় ভারতে প্রবেশ করে নাই। প্রাচীনকালের শক, ইউচি হইতে মধ্যযুগের ওসমানলী-তুর্ক কৌমের ঐতিহাসিক সংবাদ পাঠে এই উপলব্ধি হয় যে এই রকম একটি কৌমের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হইতে দুই লক্ষ পর্য্যন্ত হইত। ইহারা সকলে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং সুবিধা মাফিক বিজিত দেশে বসবাস করিয়া তথায় রাজত্ব স্থাপন করিত। প্রাচীন চীনের "Han annals" (হান রাজাদের সময়ের ইতিহাস) হইতে জার্ম্মান পণ্ডিত ওটো ফ্রাঙ্ক (১৮) তথ্য সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে অণ্টাই পর্ব্বতের হুনজাতির নিকট পরাজিত হইয়া ইউচিরা যখন মধ্য-এশিয়ায় বসবাস করে তখন তাহাদেব কৌম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। আবার ইহারা তোখারিদের পরাজিত করে। এই তোখারিরা কুসি বা কুষাণদের পূর্ব্ব-তুর্কিস্থানের উত্তর হইতে, তাড়াইয়া দেয় (১৯)। এইসব কৌম ক্ষুদ্র ছিল, তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল না। কিন্তু যেস্থলে পঞ্চাশ হাজার হইতে দুই লক্ষ সংখ্যার একটি কৌম বসবাস করে, তাহারা কালক্রমে সেইদেশে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তাহারা সেইদেশে হয় একটা নূতন নরতাত্ত্বিক মূলজাতীয় উপাদান (racial element) অথবা জাতিতাত্ত্বিক মূল উপাদান (ethnic element) অন্তর্নিবেশ

১৮। Otto Francke—"Zur Geschichte der Turkvoelker.

১৯। ইউচি ও কুষাণদের সম্পর্ক বিষয়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এবং ষ্টেন কনো একমত নন। ভারতীয় লেখকেরা শেষোক্তদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে Feist "Indo Germanen und Germanin, Pp 119—122 দ্রষ্টব্য।

করায়। এতদ্বারা সেই দেশের মূলজাতীয় একত্বের মধ্যে অন্যজাতীয় উপাদান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিভক্ত করে। এইসব বর্ব্বর লোকসমূহ (hordes) যখন বিভিন্ন দেশে লুঠতরাজের অভিপ্রায়ে অভিযান করে, তখন তাহাদের সঙ্গে নানাজাতীয় লোক জোটে। এইপ্রকারে হুনরাজা অটিলার পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণকালে অনেক পূর্ব্ব-ইউরোপের লোক জুটিয়াছিল। ভারতেও কি তাহা হয় নাই? কেহ কেহ অনুমান করেন উহা সংঘটিত হইয়াছিল (২০)।

এই ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্র ধরিয়া আমরা বলিতে পারি যে এই সকল শক, ইউচি, হুন, পারদ প্রভৃতি জাতির বংশধরেরা ভারতে কোথায় গেল? তাহাদের যে সমূলে নির্ব্বংশ করা হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং তাহারা একটা-না-একটা ভারতীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়। এইসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হেলেনিষ্টিক গ্রীকজাতীয় লোকদেরও ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় (২১)। এই সমস্ত তথ্য দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহ বলিতে পারি যে ভারতীয় সমাজই তাহাদের পরিপাক করিয়াছে (২২)। তাহারা হয় বৌদ্ধ না হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হইয়া পরবর্ত্তীকালের হিন্দু হইয়াছে!

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২০। Vincent Smith বলেন, গুর্জ্জরেরা হুনদের সহিত ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু এ-বিষয়ে প্রমাণাভাব।

২১। মিনাণ্ডারের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও হেলিওডোরুসের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্মের দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ ব্যাপার ইতিহাসে পাওয়া যায়।

২২। টড্ (Todd) বলেন,—রাজপুতকুলগুলির তালিকা মধ্যে 'হুন' বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায়; কিন্তু বৈদ্য বলেন,—চাঁদের "রসাও" পুস্তকে "হূন" নামে একটি রাজপুত কৌমের নামোল্লেখ আছে। "হুন"—অশুদ্ধপাঠ। অথচ অন্যত্র ইনি বলিতেছেন, "কুমারপাল চরিতের তালিকাতে (১০৮০-১১০০ খৃঃ) ৩৬ ক্ষত্রিয় রাজবংশের মধ্যে "হুন" (Hun) নামটি আছে, রাসোতে ইহাকে 'হুল' (Hula) বলা হইয়াছে (Vol III. P 379).

পছন্দ

মিঃ ব্যানার্জি কুমার, অর্থাৎ চিরকুমার। অনেকে মুখে বলে, বিবাহ করিব না, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকে। মিঃ ব্যানার্জি সেরূপ কুমার নহেন। সত্যই বিবাহ করিবেন না। ইহাঁর না করিবার কারণ শুধু সেন্টিমেন্টাল নয়, সুদৃঢ় সোশিও-ইকনমিক যুক্তি এবং থিওরির উপর ইহাঁর আপত্তি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু হইলে কি হয়! পরিচিত অপরিচিতেরা কেহই মিঃ ব্যানার্জির কথা বিশ্বাস করে না। কেহ বলে, মনের মত মেয়ের অভাবেই বিবাহ করিতেছেন না; কেহ বলে, কোর্টশিপের সুযোগ মিলিতেছে না; আবার কেহ বলে, যুতসই দাঁও জুটিতেছে না; আবার কেহ বলে, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন বৈলাতিক ব্যাপার আছে।

ক্রমাগত বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। পথে, ট্রামে বাসে, অফিসে, কলেজ স্কোয়ারে, গড়ের মাঠে, সর্বত্রই, কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই ঐ এক কথা, বিয়ে কর্ছেন না কেন? একটা বেশ ভাল পাত্রী আছে, ঠিক আপনার উপযুক্ত, ইত্যাদি। মিঃ ব্যানার্জি এক প্রকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। সর্বদা, সর্বত্র, প্রায় একই প্রস্তাব, একই তর্ক, একই আলোচনা—কাঁহাতক ভাল লাগে? তাছাড়া সময় নষ্ট। অনেক সময় পরিচয় বা বন্ধুত্বের খাতিরে কাজ ফেলিয়াও তর্ক করিতে হয়।

মিঃ ব্যানার্জি একটা উপায় স্থির করিলেন। কাহাকেও আর 'না' বলিবেন না। পাত্রীর বিবরণ শুনিয়াই তাহার একটা খুঁত ধরিয়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিবেন। কেহ বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেই, মিঃ ব্যানার্জি বলেন, 'হ্যাঁ তা বেশ তো। এখন তো আমি খুব ব্যস্ত, সামনের মাসের প্রথম রবিবার সকালে আসবেন। সব শুনবো।' সকলকেই ঠিক একই কথা বলেন। ফলে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবারের একটা সকাল বিবাহ-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কে কাটে। যিনি যে প্রস্তাবই করেন, মিঃ ব্যানার্জি এমন একটা খুঁত বাহির করিয়া বসেন, যে প্রস্তাবককে আপনিই চুপ করিয়া যাইতে হয়।

কোন প্রস্তাবই অগ্রসর হয় না। আশি মন তেলও পোড়ে না, রাধাও নাচে না। মাসের একটা সকাল নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাকী দিনগুলা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে। তাছাড়া বিবাহের ইচ্ছা না থাকিলেও, মাসে দু এক ঘণ্টা বিবাহ সম্বন্ধে অলোচনা নেহাত মন্দ লাগে না।

এমনই একটা রবিবার। মিঃ ব্যানার্জির ড্রইংরুমে কয়েকজন অ্যামেচার এবং প্রফেশন্যাল ঘটক উপস্থিত। মিঃ ব্যানার্জি বয়কে ডাকিয়া সকলের জন্যই এক কাপ করিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। পকেট হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া, যাঁহারা সিগারেট খান, তাঁহাদিগকে এক একটি সিগারেট দিলেন। তারপর, এক এক জন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ঘ ১। এই যে, মিঃ ব্যানার্জি, সেদিন যে মেয়েটার কথা বল্‌ছিলাম। এই তার ফটো।

মিঃ ব্যানার্জি। (ফটো দেখিয়া) নাকটা তো দেখছি, বেশ খাঁদা। খাঁদা-নাক মেয়ে চলবে না।

ঘ ১। আজ্ঞে ফটোতে কি আর ঠিক চেহারা ধরা যায়? আপনি একদিন বরঞ্চ মেয়েটিকে দেখেই আসুন।

মিঃ। কিছু দরকার নেই। ফটো দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ঘ ১। আজ্ঞে, তাহলে—

মিঃ। আপনি তাহলে আসুন—

ঘ ১। আচ্ছা, আর একটি মেয়ের সন্ধান আছে, তবে তার ফটো আমার কাছে নেই। তারা থাকে পাটনায়—

মিঃ। আচ্ছা, সামনের মাসে আসবেন।

ঘ ১। আচ্ছা, নমস্কার। (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ২। (ফটো দেখাইয়া) এ মেয়েটিকে আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। দেখুন, কি চমৎকার টিকোলো নাক!

মিঃ। কিন্তু ঠোঁট দুটো বড্ড পুরু।

ঘ ২। না সার, ফটোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি। খাসা ঠোঁট দুটো—ঠিক যেন কমলালেবুর দুটো কোয়া।

মিঃ। যাই বলুন; অত পুরু ঠোঁট আমার পছন্দ নয়!

ঘ ২। তাহলে—

মিঃ। তাহলে আমি সরি, আপনার প্রস্তাবটা আমাকে রিজেক্ট ক'রতে হ'ল।

ঘ ২। আচ্ছা, আর একটি মেয়ের ফটো দেখাচ্ছি।

মিঃ। আজ আর না। সামনের মাসে আসবেন। এঁরা সব বসে রয়েছেন। এঁদের সঙ্গেও তো আলাপ করতে হবে!

ঘ ২। আচ্ছা, তাহলে নমস্কার। সামনের মাসে আসব। (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৩। আচ্ছা সার, দেখুন তো এই ফটোখানা। কি চমৎকার! আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

মিঃ। (ফটো দেখিয়া) দেখ্‌তে তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু বয়স?

ঘ ৩। বয়স একুশ বছর। ওর বাড়ীর লোকে বলে কম, কিন্তু সার, আমি আপনার কাছে কোন কথা লুকোবো না। শেষে আমাকে দুষবেন। এই অঘ্রাণে একুশে পা দিয়েছে।

মিঃ। আপনার আক্কেলটা কি শুনি?

ঘ ৩। কেন, সার?

মিঃ। আপনি কি ব'লে একটা একুশ বছরের খুকীর সম্বন্ধ আনলেন। আমার বয়স সাতাশ, জানেন?

ঘ ৩। বলছেন কি সার! একুশ বছরের খুকী? আপনার সঙ্গে তো মোটে ছ' বছরের তফাৎ!

মিঃ। বয়সের অত তফাৎ হ'লে মনের মিল হয় না।

ঘ ৩। অবাক করলেন আপনি! আমার স্ত্রী তো আমার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। আজ বিশ বছর ঘর করছি—চুল সাদা হয়ে গেল—কই কোন দিন তো—

মিঃ। এক সঙ্গে ঘর করলেই মনের মিল প্রমাণ হয় না। মনের মিল যদি থাকে, তাহলে একজন গ্রীণল্যাণ্ড্ আর একজন অষ্ট্রেলিয়ায় থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না।

ঘ ৩। কি জানি সার! আপনাদের মত অত বিদ্যে বুদ্ধি তো আমাদের নেই। আমরা সেকেলে লোক! তাহলে—

মিঃ। আসুন। নমস্কার!

ঘ ৩। আচ্ছা, সার একটি মেয়ে আছে, বয়স বোধ হয় আপনারই মত হবে।

মিঃ। এ মাসে আর না। যদি কিছু বলতে চান তো সামনের মাসে আবার আসবেন।

ঘ ৩। আচ্ছা, নমস্কার! (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৪। দেখুন, এ মেয়েটিকে আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হ'বে। বয়স সাতাশ।

মিঃ। ওজন ?

ঘ ৪। এক মন তের সের।

মিঃ। তাহলে তো হ'ল না। আমার ওজন এক মন পঁচিশ সের।

ঘ ৪। সার, ওজনের তফাতে কি আসে যায় ?

মিঃ। যার ওজন কম, তার মনে একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স—শরীরের ওজন এবং বল সম্বন্ধে—থেকে যায়। যেখানে ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, সেখানে ভালবাসা হ'তে পারে না। ভয়, বা বড় জোর—ভক্তি, হলেও হ'তে পারে, ভালবাসা হয় না। সুতরাং—

ঘ ৪। কিন্তু মেয়েদের বেশি মোটা হওয়া কি ভাল ? পাতলা-সাতলা গড়নই তো সবাই পছন্দ করে। আজকালকার ফ্যাশানই তো শ্লিমিং।

মিঃ। আমি তা মানিনে।

ঘ ৪। আচ্ছা, শ্যামবাজারে আর একটি মেয়ে আছে, বেশ মোটা সোটা। দেখ্‌বেন তাকে ?

মিঃ। এ মাসে আর না। যদি আপনার আর কোন প্রস্তাব থাকে তো সামনের মাসে আসবেন।

ঘ ৪। আচ্ছা, নমস্কার! (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৫। দেখুন সার, আমার সম্বন্ধটা আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। মেয়েটি বেশ মোটা-সোটা, বয়সও হয়েছে আর এম, এ পাশ।

মিঃ। এ তো হ'তে পারে না।

ঘ ৫। কেন সার?

মিঃ। আমি বি, এ। আমার স্ত্রী এম, এ হ'তে পারে না।

ঘ ৫। তাতে দোষ কি? মেয়েটি খুব শান্ত আর বিনয়ী—এম, এ ব'লে একটুও দেমাক নেই। আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন।

মিঃ। আলাপ ক'রে লাভ নেই। এ রকম বিয়ে হ'তে পারে না।

ঘ ৫। কেন, সার?

মিঃ। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের এডুকেশন ঠিক এক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের না হ'লে খাঁটি প্রেম জন্মে না।

ঘ ৫। আপনার তো অদ্ভুত মত দেখছি! আর কারো মুখে তো এমন কথা শুনি নি।

মিঃ। তা শুনবেন কি ক'রে? মনে মনে বুঝলেও কেউ কি আর স্বীকার করে? নিজেদের ভুল জাষ্টিফাই করবার জন্য নানারকম অর্থহীন বক্তৃতা করে।

ঘ ৫। সবাই ভুল করে?

মিঃ। হ্যাঁ, প্রায় সবাই।

ঘ ৫। আপনার তো ভয়ানক আত্ম-বিশ্বাস দেখ্ছি!

মিঃ। তা, যাই বলুন, বেশি তর্ক ক'রে আপনার কোন লাভ হবে না।

ঘ ৫। তর্ক আমি করছি নে। তবে আর একবার ভেবে দেখুন। মেয়েটি খুব ভাল। তাছাড়া আপনার বিলেতের বি, এ তো এখানকার এম, এ-র চেয়ে ছোট নয়। সুতরাং--

মিঃ। এক্সকিউজ মি, আমি আর আলোচনা বাড়াতে চাই না। আমার মত নেই।

ঘ ৫। আচ্ছা, নেহাত যদি এ মেয়েটিকে পছন্দ না হয়, তাহলে আর একটি মেয়ে আছে সন্ধানে—সেটি বি, এ।

মিঃ। এ মাসে আর না। যদি নূতন কোন প্রস্তাব থাকে, তাহলে সামনের মাসে আসবেন।

ঘ ৫। আচ্ছা, নমস্কার! (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৬। আমি একটি মেয়ের সম্বন্ধ এনেছি, বোধ হয় আপনার পছন্দ হবে। কবে কখন আপনার দেখবার সুবিধে হবে যদি অনুগ্রহ ক'রে বলেন—

মিঃ। মেয়েটির আয় কত ?

ঘ ৬। মেয়েটির আয় ?

মি। হ্যাঁ, তাঁর মাসিক আয় কত ?

ঘ ৬। তাঁর তো কোন আয় নেই। তাঁর বাবার আয়—

মিঃ। এক্সকিউজ্ মি, আমি তাঁর বাবার আয় জান্‌তে চাইছি না। আমি তো আর তাঁর বাবাকে বিয়ে ক'রব না।

ঘ ৬। তা তো নয়ই। মেয়ের নিজের কোন চাকরি অবশ্য নেই, তবে এ বিয়েতে ওঁরা বেশ খরচ-পত্র করবেন। আপনার আন্দাজটা পেলে আমি ওঁদের বলতে পারি।

মিঃ। হোয়াট্ ননসেন্স ডু ইউ টক! আমার আন্দাজ মানে ? আমি কি ভিক্ষুক ?

ঘ ৬। না, না, সে কি ? আমায় মাপ করবেন। আমি আপনার কথা বুঝতে পারি নি। আমরা সেকেলে লোক কি না।

মিঃ। আমার মতে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের পৃথক্ এবং সমান আয় থাকা দরকার। তা না হলে ঠিক ভালবাসা হয় না। এই যে চারিদিকে যত সব দেখেন, কোথাও আসল ভালবাসা নেই। সব নিরুপায় হ'য়ে দায়ে ঠেকে ভাল-বাসে! ওতে আমার বিশ্বাস নেই। বুঝলেন ?

ঘ ৬। ঠিক বুঝলুম না। যাই দেখি, বাড়ি গিয়ে একবার খোলাখুলি জিজ্ঞেস করে, কি বলে। এ ছাপ্পান্ন বছর বয়সে আর ওসব কথা তুলেই বা কি লাভ ? সে যাক গে—আমার জানা আর একটি মেয়ে আছে, আজ বছর দশেক হ'ল, হাসপাতালে চাকরি ক'রছে। বলেন তো খবর নিই, কত মাইনে টাইনে পায়—

মিঃ। এ মাসে আর না। যদি কোন প্রস্তাব থাকে, তবে সামনের মাসে আবার আসবেন।

আরো কয়েকজন ঘটকের সহিত এই প্রকার আলোচনার পর মিঃ ব্যানার্জি

ড্রইংরুম ছাড়িয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। এক মাসের জন্য বৈবাহিক তর্ক ও আলোচনা মুলতুবি রহিল।

সামনের মাসের প্রথম রবিবার। ঘটকবৃন্দ ড্রইংরুমে সমবেত হইয়াছেন। মিঃ ব্যানার্জি আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলকে নমস্কার জানাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

পূর্বের মত এবারেও ঘটকগণ এক-এক করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিতে লাগিলেন এবং মিঃ ব্যানার্জি নানাপ্রকার আপত্তি ও তর্ক দ্বারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর সকলেই চলিয়া যাইবার পর শেষ ঘটক মহাশয় বলিলেন, আপনি বড় ফ্যাষ্টিডিয়াস!

তা যাই বলুন, সকলেরই একটা নিজস্ব মত থাকা আমি স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় মনে করি।

নিশ্চয়ই! গড্ডালিকাপ্রবাহ আমিও পছন্দ করি না।

ঠিক বলেছেন। বিয়ে ব্যাপারটাকে কখনও লাইটলি নেওয়া উচিত নয়।

আজ্ঞে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ নয়, ডাক্তার-রোগীর সম্বন্ধ নয়, অনুগ্রাহক-অনুগৃহীতের সম্বন্ধ নয়, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নয়, উত্তমর্ণ-অধমর্ণের সম্বন্ধ নয়, সবল-দুর্বলের সম্বন্ধ নয়—

নিশ্চয়ই না; আমি এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

যাক, তবু আপনি যে আমার মনোভাব কতকটা বুঝতে পেরেছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কতকটা নয়, সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি। আমার বয়স তো কম হয় নি। এর মধ্যে নিজে তিনবার বিয়ে করেছি, আর বিয়ে দিয়েছি এক শ বাইশ জোড়া বর-কনের।

সেইজন্যেই আপনি আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছেন। মোট কথা, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা একটা সমান-সমানের সম্বন্ধ, ছোট-বড়র সম্বন্ধ নয়। সব ঠিক সমান না হ'লে, দুজনের মধ্যে ভালবাসা হ'তে পারে না।

আজ্ঞে না।

এই যে চারিদিকে যত সব দেখছেন, সব এক একটা মিস্‌ফিট। কেউ কারো সঙ্গে মানায় নি। কারো সঙ্গে কারো সত্যিকার ভাব নেই। প্রত্যেকটি বিষয়ে দুজনে সমান না হ'লে এমনি মিস্‌ফিট হ'তে বাধ্য। সেইজন্য আমি এ সম্বন্ধে খুবই সতর্ক।

ঠিকই বলেছেন। ছেলেবেলায় জ্যামিতিতে পড়েছেন—মনে আছে তো—ইকোয়াল ইন অল রেস্‌পেক্টস্—স্বামী-স্ত্রীরও ঠিক তাই হওয়া চাই।

এ সব বিষয়ে রাশ্যায় ভারি সুবিধে। খরচপত্রের দায়িত্ব নেই, ছেলেমেয়ের ঝামেলা নেই, যখন ইচ্ছে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করলেই হ'ল, আবার যখন ইচ্ছে ছেড়ে দিলেই হ'ল।

তাই তো, কি চমৎকার ব্যবস্থা! বয়সও নেই, তারপর আবার বোমা-ফোমার ভয়, নইলে একবার দেখে আসতাম গিয়ে, সে দেশের কমরেড আর কমরেডনীরা কি স্বর্গ রচনা ক'রেছে!

সে যাক, আপনার কি কোন প্রস্তাব আছে? বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, আমাকে উঠতে হবে।

হ্যাঁ, অনেক কষ্টে একটি কনের সন্ধান পেয়েছি। সব বিষয়েই আপনার ঠিক সমান। একটুও ছোটও নয়, বড়ও নয়।

তাই নাকি? বয়স কত?

সাতাশ বছর তিন মাস ছয় দিন—আজকার বয়স।

ওজন?

এক মন পঁচিশ সের সাত ছটাক।

লেখাপড়া?

বি, এ।

উপার্জ্জন?

মাসে পাঁচশ কুড়ি টাকা।

কেমন ক'রে?

ওঁর বাবার আর কেউ নেই। কাজেই ওঁর বাবার আয়ই ওঁর আয়।

ও। দেখ্‌তে কেমন? ফটো আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন।

দেখতেও তো মন্দ নয়।

তাহলে আপনি রাজি?

অবশ্য বিয়ে করতে আমি কোন দিনই রাজি নই। তবে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—

কেন বলুন তো?

ঠিক এক বয়স, এক বিদ্যা, এক ওজন, এক আয়—অদ্ভুত কইনসিডেন্স।

অদ্ভুতই তো আপনি চান। আপনি তো গড্ডালিকা প্রবাহে যোগ দেবেন না।

আপনার খবর ঠিক তো?

নিশ্চয়ই, আপনি ভেরিফাই ক'রে নেবেন।

দেখুন, আমার একটা ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছে। বিয়ের ইচ্ছে আমার আগেও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু একটা সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেণ্ট করবার বড়ই লোভ হচ্ছে। এমন 'ইকোয়াল ইন অল রেস্‌পেক্‌ট্‌স্‌' বিয়ের ফল কিরূপ দাঁড়ায়, সেটা জগতের কাছে দেখিয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। বিয়ের ইচ্ছে অবশ্য আমার নেই। কিন্তু—

নিশ্চয়ই, সায়েন্টিফিক এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের খাতিরে লোকে প্রাণ দেয়! আপনি সামান্য একটা বিয়ে করবেন—

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আচ্ছা, নমস্কার!

ঘটক প্রস্থান করিলেন। মিঃ ব্যানার্জি ভাবিতে লাগিলেন।

এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করাই স্থির হইল। কনে দেখা হইল। কোষ্ঠী হইতে বয়স স্থির করা হইল। ইউনিভারসিটির ক্যালেণ্ডার হইতে বি, এ, পরীক্ষার ফল দেখিয়া লওয়া হইল। বেড়ানোর ছলে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়া ওজনটা ভেরিফাই করা গেল। কনের পিতার আয় কত তাহাও সবিশেষ জানা গেল। মোট কথা, ঘটক মহাশয়ের সব কথাই অতি সত্য বলিয়াই

প্রমাণিত হইল। সুতরাং মিঃ ব্যানার্জির এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের পথে আর কোন বাধা রহিল না।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল।

নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, হৈ হৈ রৈ রৈ, ইত্যাদি সবই হইল, তবে মিঃ ব্যানার্জি এ সব ব্যাপারে একেবারেই গা মাখিলেন না। কারণ তিনি তো আর অন্য পাঁচ জনের মত খালি বিবাহই করিতেছেন না—করিতেছেন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। তাই তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিল, তাঁহাদের এই সর্বতোভাবে সমান-সমানতার ফল লক্ষ্য করিতে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত্ত থাকিলে এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ব্যাঘাত হয়, তাঁহাদের অনন্যসাধারণ ভালবাসার জন্ম ও বৃদ্ধি ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায় না। তাই মিঃ ব্যানার্জি স্থির করিলেন, বিবাহের পর এক বৎসর কলিকাতার বাহিরে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে কাটাইবেন।

এই প্ল্যান অনুসারে ব্যানার্জি-দম্পতী এক বৎসর পুরী, ওয়ালটেয়ার, রাঁচি, দার্জিলিং, প্রভৃতি ঘুরিয়া তাঁহাদের বিবাহের বাৎসরিক দিনে কলিকাতায় ফিরিলেন। মিঃ ব্যানার্জি পত্নীকে উপহার দিলেন একটি রিষ্ট-ওয়াচ—দাম একশ সত্তর টাকা। পত্নী স্বামীকে উপহার দিলেন একটি ফাউনণ্টেন পেন—দাম বত্রিশ টাকা। উহার ক্লিপে একখানি হীরা বসাইয়া দাম একশ সত্তর টাকা করিয়া লওয়া হইল। কারণ উহাঁরা ইকোয়াল ইন অল রেসপেক্‌ট্‌স্‌, সুতরাং উহাঁদের প্রীতি-উপহারও সমমূল্য না হইলে চলিবে কেন?

বিবাহের প্রথম বাৎসরিক দিন। উভয়েরই মন সুপ্রসন্ন। সন্ধ্যার পর উহাঁরা নিরিবিলি বসিয়া একটু গল্প করিতেছেন। একটা বৎসর যেন একটি দিনের মত কাটিয়া গিয়াছে। আদর্শ প্রেমে মুগ্ধ আদর্শ দম্পতী আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

স্ত্রী বলিলেন, আমরা পরস্পরকে যেমন ভালবাসি, সবাই সবাইকে অমনি ভালবাসে?

তা কখনো হতে পারে? আমাদের মত ইকোয়াল ইন অল রেস্পেক্টস্ তো সবাই নয়!

কিন্তু, ধর, যদি অসুখ হয়ে আমি কুৎসিত হয়ে যাই?

অসুখই বা হবে কেন, কুৎসিতই বা হবে কেন? আর যদি হওই, তাতে কি আসে যায়? আমাদের প্রেম একেবারে অ্যাবসোলিউট—কোন কিছুর পরই নির্ভর করে না।

ধর, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই?

মিথ্যাবাদী কেন হতে যাবে? আর যদি হওই, তাতেই বা কি আসে যায়?

যদি জোচ্চোর হই?

কি যে বল, তার ঠিক নেই। আজকার দিনে ওসব কি কথা! আমি তো বললুম, আমাদের ভালবাসাটা তো আর যার তার ভালবাসা নয়, এটা সমান-সমানের ভালবাসা। কিছুতেই এর কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। যাক্‌গে। তোমার ওসব বাজে ঠাট্টা তামাসা এখন রাখ।

নেহাত বাজে ঠাট্টা নয়। মানে, আমার বয়স এখন কুড়ি; মানে, বিয়ের সময়ে উনিশ ছিল—সাতাশ নয়।

তাই নাকি? আমারও কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু কোষ্ঠী দেখে আর সন্দেহ করি কি করে?

ও কোষ্ঠী আমার নয়। সুতরাং বয়সে কিন্তু আমরা সমান-সমান নই।

তা—তা—নাই বা হ'ল।

তাহলে ভালবাসা?

ভালবাসা তো হয়েই গেছে।

একেবারে অ্যাবসোলিউট?

হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই।

আর, ইয়ে, আমি কিন্তু বি, এ পাশ করিনি—চার নম্বরের জন্য ফেল করেছিলাম।

তাতে কি আর হয়েছে? কিন্তু ক্যালেণ্ডারের নাম—

বয়সেই যখন আট বছরের গোলমাল, তখন আর ক্যালেণ্ডার—

তা তো বটেই!

আচ্ছা, চার নম্বরের জন্য কোন রকম মিসফিট হয় নি তো ?

কি যে বল, তার ঠিক নেই।

মানে, ঠিক সমান-সমান তো হ'ল না কি না!

তাতে আর কি?

আর দেখ, আমার ওজন কিন্তু এক মন পঁচিশ সের নয়।

আমারও কিন্তু অনেক সময়ে সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু মার্কেটের সে ওজনটা তো ঠিক ?

হ্যাঁ। কিন্তু আমার ব্লাউজের মধ্যে দশ সের তিন ছটাক বাটখারা ছিল।

ব্লাউজের মধ্যে বাটখারা! বল কি ?

হ্যাঁ, নইলে যে ওজন সমান হয় না! তুমি নিশ্চয়ই রাগ করছ।

না, না, রাগ ক'রব কেন ?

আমি হালকা বলে। মানে মিসফিট—

যাও! কি যে বল ? বরঞ্চ—

আর দেখ, আজ চিঠি পেলুম, আমার একটি ভাই হয়েছে। সুতরাং আমার আয় একেবারে শূন্য।

তা—তাতে আর হয়েছে কি ?

মানে, আমি একেবারে তোমার গলগ্রহ—সুতরাং ভালবাসা—

যাও! বলেইছি তো, আমাদের ভালবাসাটা একেবারে অ্যাবসোলিউট—

কিন্তু আমি তো কোন বিষয়েই তোমার সমান নই। এমন অসমানে-অসমানে ভালবাসা কি সম্ভব ?

তা—মানে—অসম্ভব তো মনে হচ্ছে না।

মানে, মিসফিট্—

চুলোয় যাক গে তোমার মিসফিট্, আর তোমার ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স, আর তোমার ইকনমিক ডিপেণ্ডেন্স—যাও, ওঠ, চট্ করে এক কাপ চা করে নিয়ে এস তো!

"ভাস্কর"

পুস্তক-পরিচয়

বদ্যিনাথের বড়ি।—শ্রীলীলা মজুমদার, এম. এ.। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১ বি, রসারোড, কলিকাতা। দাম—আট আনা।

পাগলা মহেশ্বর।—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, বি. এ.। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দশ আনা।

শোনা যায় ছোটদের উপযোগী বইর কাটতি সব চাইতে বেশি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিশু-সাহিত্যিকদের ক্রমশ সংখ্যাবৃদ্ধিতে। কিন্তু ছোটদের বই বেশির ভাগই যা চোখে পড়ে তা ছেলে-ভুলানো নয়, ছেলে-ঠকানো। অর্থাৎ যা' তা' গল্প—অনেক সময়ে তা' বিদেশী গল্পের অক্ষম অনুবাদ বা হাস্যাস্পদ অনুকরণ—আর চোখ-ধাঁধানো চক্‌চকে মলাট, এই হোলো তাদের উপাদান। কিন্তু এই দেখে শুধু ছোটরা নয়, তাদের অভিভাবকেরা ভোলেন। কেন না ভালো বই বাছাই করবার মতন ধৈর্য, শিক্ষা বা রুচি তাঁদের কম ক্ষেত্রেই আছে। ছোটদের দোষ দেওয়া যায় না। পড়বার আগ্রহে যেমন তেমন কিছু একটা হ'লেই তারা গোগ্রাসে গেলে। ফলে, দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা ব'লে যাদের অভিহিত করা হয়, তাদের রুচি ও শিক্ষা হয় গোড়া থেকে বিকৃত।

এর জন্যে দায়ী শুধু লেখকেরা নয়, চিত্রকরেরাও। কিম্বা যে-শিক্ষার ফলে ঐ জাতীয় চিত্রকর তৈরি হয় ও যে-ব্যবস্থার ফলে তাঁদের ছবি বাজারে কাটে সেই শিক্ষা ও সেই ব্যবস্থা। যাই হোক, এরও ফল হয় ঐ এক। ছোটরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নয়, ছবি সম্বন্ধেও ছেলেবেলা থেকে যে জ্ঞান অর্জন করে তা' না করলেই ছিল ভালো।

বিশেষ ক'রে এই কারণে বোধহয় শ্রীমতী লীলা মজুমদারের বইটি আমাকে এত মুগ্ধ করেছে। কেন না, বইখানি হাতে ক'রে পাতা উলটাতে উলটাতে প্রথমেই চোখে পড়ে এর ছবিগুলি। মলাট ছাড়া রঙিন ছবি দূরের কথা,

এক-রঙা প্লেট বা পাতা-জোড়া ছবি দিয়ে চমক লাগানোর চেষ্টা কোথাও এতে পেলাম না। গল্পের মাঝে মাঝে জুৎসই জায়গা বুঝে ছাপা পাতার এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে আঁকা ছোট ছোট ছবি। লেখিকার লেখার মতন তাঁর হাতের আঁকা এই ছবিগুলিও প্রাণবন্ত। যে-সব অদ্ভুত জীব ও অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে এই গল্পগুলি রচিত ছবিগুলির মধ্যে তারা আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। লেখার সঙ্গে ছবির এমন মিল বাঙলা শিশু-সাহিত্যে বিরল।

প্রকাশক যে বলেছেন, "অনেক রসজ্ঞ লোকের মতে সুকুমার রায়চৌধুরীর পর এ ধরণের মজার গল্প আর কেউ বাংলায় লিখতে পেরেছেন কি না সন্দেহ" —তা' গল্পগুলি প'ড়ে মানতেই হয়। কিন্তু সুকুমার রায়চৌধুরীর প্রভাব ছবিগুলির মধ্যেও বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এর জন্যে লীলা মজুমদারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কেননা, সুকুমার বাবু শিশুসাহিত্য রচনায় যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তা লোপ পেলে বিশেষ আক্ষেপের কারণ হ'ত।

আশা করি আমার কথা কেউ ভুল বুঝবেন না। লীলা মজুমদারের রচনায় সুকুমার বাবুর প্রভাব স্পষ্ট কিন্তু তবু তাঁর লেখার ধরণ তাঁর নিজস্ব। শুধু রচনাভঙ্গী নয়, তাঁর গল্প বলার কৌশল, মজার মজার ঘটনার উদ্ভাবন, ছোট ছেলেদের সঙ্গে বড়দেরও হাসি উদ্রেক করার অসাধারণ ক্ষমতা।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

> "রাত যখন ভোর হ'য়ে আসে তখন ঐ তিন বাঁকা নিমগাছটায় হুতুম-প্যাঁচাটারও ঘুম পায়। নেড়ু দেখেছে ওর কান লোমে ঢাকা, ওর চোখে চশ্‌মা, ওর মুখ হাঁড়ী। ও কেন যে চীলছাদের ছোট খুপড়ীতে পায়রাদের সঙ্গে বাসা করে না, নেড়ু ভেবেই পায় না। বোধহয় ভূতদের জন্যে।
>
> "নিমগাছতলায় ভূত আছে।"

এর পর নেড়ু স্বচক্ষে একদিন দেখল, "কোমরে রূপোর ঘুন্সী-ওয়ালা, মাথায় গুটিকতক কোঁকড়া চুল, ভূতদের ছোট কালো ছেলে নিমগাছতলায় কাঁসার বাটিতে নিমফুল কুড়ুচ্ছে। নেড়ুকে দেখেই ছেলেটা এক চোখ বুজে ভয় দেখালো। নেড়ু ভাবলো ভূত কিনা তাই ভদ্রলোক নয়।"

অতঃপর আরো অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল যা প'ড়ে ছোটরা তো অবাক হবেই আর বড়রাও নিঃসন্দেহে বুঝবেন কি ক'রে ছোটদের উপযোগী আজগবী গল্প সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়। আপাতত সেই সব ঘটনাগুলির উল্লেখ না ক'রে গন্‌শার চিঠিতে বর্ণিত সেই যাদুকর মাষ্টারটির রোমাঞ্চকর ইস্কুলের কথা উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কেননা মান্‌কের কথা অবিশ্বাস করার মতন মনের জোর আমার নাই, আর মান্‌কে নাকি স্বচক্ষে দেখেছে—

"প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভেতর সাতটা ছেলে পেন্সিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল ন'টে চিবুচ্ছে; মাষ্টার মশাই গা নাচাচ্ছেন্! পরের সপ্তাহে মান্‌কে আবার দেখেছে ঘরের ভেতর ছটা ছেলে পেন্সিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল ন'টে চিবুচ্ছে; মাষ্টার মশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের কচ্ছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখ্‌বে, ঘরের ভেতর পাঁচটা ছেলে পেন্সিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে চারটে ছাগল ন'টে চিবুচ্ছে; মাষ্টার মশায় সেফ্‌টিপিন দিয়ে কান চুল্কোচ্ছেন! শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাক্‌বে, আর ঘরের বাইরে ন'টা ছাগল ন'টে চিবিয়ে দিন কাটাবে! মাষ্টার মশায় খাঁড়ায় শান্ দেবেন!"

ম্যাজিসিয়ান মাষ্টারের ছাত্রদের এই পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ সন্দেহ নাই। সুতরাং তার হাতে ছেলেদের শিক্ষার ভার দিতে অভিভাবকেরা যে প্রবল আপত্তি করবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু যে বইটিতে এই ইস্কুলের এমন বর্ণনা আছে একবার তা পড়লে যে কোনো রসগ্রাহী অভিভাবক ছেলেমেয়েদের তা' পড়ানোর জন্যে উৎসাহিত হবেন একথা জোর ক'রে বলতে পারি।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত 'পাগলা মহেশ্বর' একটি বড় গল্প বা নভেলেট্। মহেশ্বর মানুষ নয়, হাতি। বইটি সত্যি কোনো পাগলা হাতির ধ্বংসলীলার বর্ণনা কিনা জানি না, কিন্তু পাগলা হাতি যে কি রকম ভয়ঙ্কর জীব যাঁরা তার খোঁজ রাখেন, শৈলেনবাবুর বর্ণনার যাথাযথ্য স্বীকার করতে তাঁরা কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। ছোটদের পক্ষে বইখানি শুধু

মনোগ্রাহী নয়, শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু বইটিতে শুধু পাগলা হাতির কথা নাই—সেই সঙ্গে আছে একটি ছোট মেয়ের, যে জানত দুরন্ত হাতিকে বশ করার মন্ত্র। পাগলা মহেশ্বর আর ঐ ছোট মেয়ে, এই দুজনের মধ্যে স্নেহের বন্ধন কি রকম গভীর ছিল ধ্বংসলীলার রক্তাক্ত পটভূমিকায় লেখক তা' অতি নিপুণ ভাবে ফুটিয়েছেন। বইখানির বিশেষত্ব এইখানে। ছবিগুলি রচনার উপযোগী হ'লে বইটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হ'ত।

ভারতের দেব-দেউল :—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

এক অনুপ্রাস ছাড়া 'দেব-দেউল' কথাটার সার্থকতা বোঝা কঠিন। কিন্তু যাই হোক, বইটি পড়ে খুসি হলাম। ভারতবর্ষের এমন কোনো দেখবার মতন দেউল বোধ হয় নাই যার কথা এই বইতে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক দেউল সম্বন্ধে যা' কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য—ইতিহাস, অবস্থান, শিল্পকৌশল—লেখক তা' অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রামাণিক বই বা রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ ক'রে এই বইটিতে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু তবু যে বইটি অনেক মামুলি 'গাইড' বইর মতন নীরস হয়নি তার কারণ জ্যোতিশবাবু নিজে এই মন্দিরগুলি দেখে যে আনন্দ পেয়েছেন তাঁর রচনায় তা সঞ্চারিত করেছেন।

হিরণকুমার সান্যাল।

হারানো সুর।—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম আড়াই টাকা।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী।

মাস কয়েক পূর্ব্বে 'পরিচয়ে' গ্রন্থকারের অন্য গল্পপুস্তক 'বেদেনী'র আলোচনা-প্রসঙ্গে যা বলেছিলাম, বর্ত্তমান পুস্তক পাঠ ক'রে তা আরো সত্য ব'লে মনে হ'ল আমার। যদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্পকার হিসেবেই তারাশঙ্করের প্রথম আগমন, তবু ইতিমধ্যে বৃহদাকার উপন্যাস রচনার দিকেও তিনি মন দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচনাবলী পাঠের পর এই ধারণাই মনে দৃঢ়মূল হয় যে উপন্যাস অপেক্ষা গল্পেই তাঁর প্রতিভা ভাল খোলে। এ পুস্তকেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই তুর্ল্লভ প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল আবার।

অবশ্য একটা কথা প্রথমেই ব'লে নেওয়া ভাল মনে করছি। ছোট গল্পে যে রকম তীর্য্যক, দ্যোতনাময় সমাপ্তির প্রত্যাশা করেন পাঠক, যার ফলে সমস্ত গল্পটা প্রায় কবিতার মত ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে যায় মনে, তারাশঙ্করের গল্পে সেই অনিবার্য্য এবং আশ্চর্য্যজনক দৃঢ় সমাপ্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না সব সময়ে। তার একটা প্রধান কারণ, আমার মনে হয় এই যে, গল্প রচনার সময়ে ঘটনা সংযোজনের চেয়ে চরিত্রচিত্রনের দিকেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লক্ষ্য থাকে বেশী। এ-পুস্তকে যে ক'টী গল্প আছে (সংখ্যা ৯) তাদের প্রত্যেকটিতেই সেই কারণে এ রকম চরিত্রের অভাব ঘটে না যাকে চট ক'রে না চিনে ফেলা যায়, কিন্তু সব মিলে মিশে কোন কোন গল্প শেষ পর্য্যন্ত গল্প হ'য়ে উঠতে বাধা পেয়েছে।

উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'পুত্রেষ্টি'। চমৎকার গল্পের সুরু, অগ্রসরও হয়েছে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই। 'মেজকর্ত্তা', 'রায়'—এরা তো একেবারে এক একটি টাইপ, অন্যান্য চরিত্রকেও বেশ জীবন্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু শেষের দিকে হঠাৎ সব যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল,—পুত্রেষ্টিযজ্ঞকে যদিও বা স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়, কুকুর-কান্নায় সহানুভূতি জানানোর অধ্যায় পরিপাক করা বেশ কঠিন হ'য়েই ওঠে। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'মাছের কাঁটা' বা 'চৌকিদার'-কেও সমপর্য্যায়ে ফেলা যায়। দুটোই বেশ ভাল গল্প হ'তে পারত;

কিন্তু প্রথমটাকে নষ্ট ক'রে দিল বঙ্কিমী ভগবানের অবতারণায়, আর দ্বিতীয়টা আধফোটা হ'য়ে রইল রহস্যময় (অর্থাৎ পারম্পর্য্যবিহীন) সমাপ্তির জন্যে। বনোয়ারীর মানসিক পরিস্থিতিকে একটা ধাঁধার মত মনে হয়, মনো-বিশ্লেষণের ঠিক কোন পর্য্যায়ে একে ফেলা যায় ভাবতে সময় লাগে।

এদিক দিয়ে 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' বা 'টিটি'-কে এ বইয়ের ভেতর সব চেয়ে স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব'লে মনে হয়। 'ব্যাঘ্রচর্ম্ম'-ও চরিত্র-চিত্রনের দিক দিয়ে বেশ সার্থক। বস্তুত, নেহাৎ ছিদ্রান্বেষণে বেশী ব্যস্ত না হ'লে 'হারান সুরে'-র অধিকাংশ গল্পই যে ভাল লাগবে তা অত্যন্তই ঠিক। বাঙলাদেশের লোকজনের সঙ্গে লেখকের পরিচয় রীতিমত প্রত্যক্ষ; খামখেয়ালী, তুচ্ছ এবং সাধারণ মানুষের ভেতরেও তিনি সত্যকার একটা মানবমনের সন্ধান পান,—যে মন তার সমস্ত কিছু শিথিলতা এবং বৈচিত্র্যহীনতা সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে রোমাঞ্চময়, বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটনের মত বিস্ময়কর। তাঁর এই অন্তরঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই যে সব গল্প দুর্ব্বলতাদোষদুষ্ট সেগুলোও একেবারে খারাপ হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সব বিরুদ্ধ-উক্তি করেছি, সে সম্বন্ধে নতুন ক'রে কৈফিয়ৎ দেবার দরকার ছিল না, কেননা গ্রন্থকার সেগুলোকে যথোচিত ভাবেই গ্রহণ করতে পারবেন ব'লে আমার নিশ্চিত ধারণা। কিন্তু বাঙালা-দেশের সুবিধাবাদী পাঠকদলের কথা স্মরণ ক'রে সে সম্পর্কে একটা কথা অন্তত বলা সঙ্গত মনে করছি। বন্দ্যোপাধ্যায় ম'শায়ের বর্ত্তমান গল্প-পুস্তকের সম্বন্ধে যে সব বিরুদ্ধ-উক্তি করেছি, সেগুলোকে যেন তাঁরা বইখানি না কেনবার যুক্তি হিসাবে কাজে না লাগান, যেন ব্যবহার করেন বই কেনরার পর রসবোধের প্রস্তাব বা প্রেমিস হিসাবে।

ছাপার ব্যাপারে গ্রন্থপ্রকাশকগণ কবে অবহিত হবেন বলা কঠিন। কিন্তু নিজের রচনার ওপর যে সব লেখকের মমতা আছে তাঁদের সজাগ হবার সময় এসেছে।

মণীন্দ্র রায়।

SELF-Taught Bengali Primer. Dasgupta & Co.

এই পুস্তিকাটিতে বাংলা শিখিবার অতি সরল প্রণালীর নির্দেশ পাওয়া যায়। এই জাতীয় পুস্তিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রকাশকেরা তাঁহাদের নিবেদনে বলিতেছেন যে যাঁহারা বাংলা শিক্ষা করিয়া বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে চান পুস্তিকাটি তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধির সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের সমর্থন যেমন সাধারণত দুষ্প্রাপ্য, তেমনই ওই স্বতোবিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের সহযোগী নির্দ্দেশ ব্যতীত জ্ঞানমার্গের মতো কর্ম্মকাণ্ডও অলাতচক্রের প্রকারভেদ ; এবং সেইজন্যে যদিচ আবাল্য বুঝে আসছি যে অতিমানুষ রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ চিরায়ু নন, তবু একাশী বৎসরে তাঁর আমন্থর ভবলীলাসংবরণ অন্তত আমার কাছে যে-পরিমাণ আকস্মিক লেগেছে, সে-রকম অভিভাব আপাতত আধিদৈবিক সর্ব্বনাশেরই অনুবর্ত্তী। অবশ্য প্রায় বিশ বছর আগে তাঁর অকাল মৃত্যুর অমূলক সংবাদে কলিকাতা নগরী যখন এক বার বিচলিত হয়ে উঠেছিলো, তখন ট্রামে সে-খবর শুনে, মনে পড়ে, আমি চোখের জল সাম্‌লাতে পারি নি ; এবং তার পরেও নানা সময়ে অনুরূপ জনরবে যে-শোক পেয়েছি, তার পুনরভিনয় চল্লিশোর্দ্ধে যত না অশোভন, ততোধিক অসাধ্য। উপরন্তু ইতিমধ্যে রাবীন্দ্রিক জীবনবেদের বিপরীতে চলতে চলতে, লোকযাত্রা, আমাকে ও আমার সমবয়সীদের নিয়ে, আজ যেখানে উপনীত, সেখান থেকে দেখলে, তিনিও বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট প্রভৃতি অনর্থক প্রবক্তাদের অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়াতেই মিশিয়ে যান ; এবং তৎসত্ত্বেও না মেনে উপায় থাকে না বটে যে তিনি সাহিত্যপ্রগতির অত্যাধুনিক পথপ্রদর্শকদেরও শীর্ষস্থানীয়, তথাচ সেই সঙ্গে এ-মন্তব্যও অনস্বীকার্য্য ঠেকে যে, কল্লান্তের বিক্ষোভ পর্য্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির প্রেরণা জোগায় নি ব'লেই, তাঁর ভাগ্যে শুদ্ধ রূপ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতির অবহিত ধ্যান-ধারণার অপার সুযোগ ঘটেছিলো। কিন্তু এ-সমস্তই বুদ্ধির ব্যাপার, এতে যেহেতু বিশ্বাসের অনুমোদন নেই, তাই রবীন্দ্রনাথের তিরোধান, কেবল আমার কেন, প্রত্যেক অর্ব্বাক্‌পঞ্চাশ বাঙালীর পক্ষে পিতৃবিয়োগের সমকক্ষ ; এবং এ-উক্তি উৎপ্রেক্ষামূলক রূপকমাত্রই নয়, পিতা-শব্দের সনাতন সংজ্ঞা-কটা মনে রাখলে, কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সুতরাং আজ এ-বিবেচনায় আমাদের সান্ত্বনা নেই যে রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাবলম্বী ও সিদ্ধার্থ পুরুষের কাছে বার্দ্ধক্যের স্থবির মৌন নিশ্চয়ই দুর্ব্বিষহ ঠেকতো ; এবং পুরাকালে সফোক্লিস্ আর ইদানীং গোয়টে ও টেনিসন্ বাদে

অপর কবিরা যখন আশীর পরে আর কলম চালাতে পারেন নি, তখন তিনিও সম্ভবত "ছেলেবেলা"য় তাঁর অতুলনীয় সৃজনীশক্তির উপান্তে আর "রোগশয্যা", "আরোগ্য", "জন্মদিনে" ইত্যাদি বই-কখানিতে উক্ত প্রতিভার প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। কারণ যৌথ-পরিবার-ভুক্ত পুত্র যেমন নিজের বা পিতার বয়স ভুলে স্বভাবত মনে করে যে তিনি নিত্যকালে তাকে বিপদে পরামর্শ আর সম্পদে সাধুবাদ জুগিয়ে যাবেন, তেমনই, আর সকলের উল্লেখ স্থগিত রাখলেও, অন্তত বাংলার উদীয়মান লেখকমাত্রেই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে ভেবে এসেছে যে এ-দেশের কবিগুরু অকুণ্ঠিত অভিনন্দনে তার মৌল সঙ্কোচ ঘুচিয়ে, তারই অহৈতুক আত্মপ্রসাদ বাড়াবার জন্যে, স্বকীয় সাম্রাজ্যের কোনো একটা পরিত্যক্ত বা সদ্যবিজিত অংশে তাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবেন; এবং বদান্যের দানও যেহেতু অবিস্মরণীয়, তাই বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি তাঁর প্রকৃতিকার্পণ্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তিতে আমরা বিনয়ব্যবহারের বিন্দু-বিসর্গ খুঁজে পাই নি, নিরাসক্ত-সমালোচনা-নামক কৃতজ্ঞতার বিকারে ভজাতে চেয়েছি যে, সহস্র ঋণ সত্ত্বেও, আমরা এমনই অকিঞ্চন যে, তাঁর ঐশ্বর্য্যে ফাঁকি না থাকলে, আমাদের দুরবস্থা অসম্ভব হতো। বিশ্লেষণে ধরা পড়বে এতাদৃশ মতামতের আড়ালে যে-ঈর্ষ্যা আছে, তা শিল্পী-সাহিত্যিকের সুপ্রসিদ্ধ পরশ্রীকাতরতাই নয়, এ-রকম মাৎসর্য্য নাতিহ্রস্ব অপত্য-সম্পর্কের অনিবার্য্য উপসর্গ; এবং রবীন্দ্রনাথের অবর্ত্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত অশক্তির দায় মূলাভাবে আমাদেরই উপরে পড়বে জেনে আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানি নি যে, তাঁর মধ্যে মানুষী দোষ-গুণের অপ্রতুল নেই ব'লেই, তিনিও মৃত্যুর ইচ্ছাধীন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের পিতৃ-পদবাচ্য নন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে-প্রক্রিয়ার নাম আরোপ, তারই সার্ব্বভৌম অভিব্যাপ্তিতে তিনি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক প্রতিমূর্ত্তি; এবং রাবীন্দ্রিক ভাষার কালগত সামান্যীকরণই যদিও এই অদ্বৈতসিদ্ধির মুখ্য হেতু, তবু ভাষা ও অভিজ্ঞতার সংযোগ যেকালে নিতান্ত দুশ্ছেদ্য, তখন আমাদের ভাবনা-বেদনাও, মোটের উপর, তাঁর দৃষ্টান্তে নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে, এ-রকম প্রভাব বৈবিক মাহাত্ম্যের নিঃসংশয় প্রমাণ হলেও, উক্ত সোহংবাদের দুর্ব্বিনীত বিজ্ঞাপনই বাঙালীকে আর সকল ভারতবাসীর চক্ষুশূল ক'রে তুলেছে; এবং

বাঙালীর ঔদ্ধত্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিদূষণ অন্যায় বটে, কিন্তু আমাদের আত্মশ্লাঘা তাঁর আত্মসচেতন ব্যক্তিস্বরূপেরই অপকর্ষ। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয়তা যে-পরিমাণে সর্ব্বগ্রাহ্য, বাঙালীর জাত্যভিমান ঠিক সেই অনুপাতে অস্বীকার্য্য ; এবং এ-কথা সে নিজেও জানে ব'লে, এক দিকে সে যেমন, পথান্তর সত্ত্বেও, সাধ্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্কে চলে, তেমনই অন্য দিকে, পাছে ছোঁয়াচ লেগে তার প্রাতিভাবিক কীর্ত্তিকলাপের বিলোপ ঘটে, সেই ভয়ে সে নিজের সঙ্গে অপর প্রাদেশিকদের নিঃসন্দেহ সাদৃশ্যটুকুও মানতে চায় না। একটু খুঁজলেই, ধরা পড়বে যে এতখানি মমত্ববোধ কেবল তাদের বেলায় সহজ, যারা নিজেদের অকৃতি ভুলতে না পেরে মৃত্যুর আশঙ্কায় নিরন্তর তটস্থ থাকে ; এবং মরণের উপলব্ধি যেহেতু সর্ব্বত্র পরোক্ষ, তাই উগ্রতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুমূর্ষু নিঃস্বের মানরক্ষা সম্ভব নয়। এত দিন ধ'রে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন ও অনুপম সাধনা, প্রতিবিম্বপাতে, বাঙালীর মুখ বাঁচিয়ে আসছিলো ; তাঁর দেহাবসানে বাংলার ভঙ্গুর প্রাণ-সামগ্রীর আবরণ ঘুচে, ফুটে বেরোলো তার অকিঞ্চিৎকর আর্ত্তি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালীর যথাসর্ব্বস্ব হলেও, তাঁর বিশ্ববীক্ষা অত্যল্প কালের মধ্যেই বাংলার ঐতিহাসিক, তথা ভৌগলিক, চতুঃসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো ; এবং যে-একদেশদর্শী শুভবাদ তাঁর প্রাকাম্যের উত্তর সাক্ষ্য, তাতে যদিও ধ্রুপদী মনুষ্যধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য নেই, তবু মহামানবের প্রতিনিধিত্বে তাঁর পদমর্য্যাদা ব্যাস, হোমর ও শেক্স্পীয়র-এর সমান। কারণ সংসারে অমঙ্গল ও অন্যায় যত প্রশ্রয়ই পাক না কেন, সে-সমস্তের অভিধা কখনো শ্রেয়োবোধের মতো নির্ব্বিকার থাকে নি, যুগে যুগে, উপলক্ষে উপলক্ষে বদ্‌লেছে ; এবং তাই সক্রেটিস্-প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ভাবতে পেরেছিলেন যে, বাহ্য সুযোগ-সুবিধার দিকে না দেখে, অন্তর্যামীর পানে তাকালেই, আত্মস্থ মানুষ আর্য্য সত্যের স্বরূপ চিনবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ স্থান-কাল-পাত্রের নিয়োগ সাধ্যপক্ষে সইতে চান নি ; সকল প্রকার প্রথা ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে পীড়া দিয়েছিলো ; এবং, তাঁর সাধনালব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য সহধূরীর অভাবে শেষ পর্য্যন্ত যাতে স্বৈরাচারে না দাঁড়ায়, সেই চেষ্টায় তিনি যৌবনে শান্তিনিকেতন আর প্রৌঢ় বয়সে বিশ্বভারতীর বিরাট প্রাঙ্গণে

স্বদেশবাসীকে সাহচর্য্যে ডেকেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পৌনঃপুনিক আহ্বানে দেশ-বিদেশে আশানুরূপ সাড়া না জাগলেও, তাঁর ত্যাগে পুষ্ট উক্ত শিক্ষাপরিষদের প্রযত্নে, শুধু বঙ্গীয় সংস্কৃতি নয়, সমগ্র ভারতের চিৎপ্রকর্ষই আজ বেশ খানিকটা উন্নত; এবং তৎসত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের নাম মনে পড়লে, সমতলবেষ্টিত কোনো এক সমুচ্চ শৈলশৃঙ্গের ছবিই মানস পটে ভেসে বেড়ায় বটে, তথাচ এই অপ্রতিকার্য্য স্তরভেদের গ্লানি তাঁর আদর্শ বা উদ্যমকে কদাচিৎ ছোঁয় নি, সেজন্যে দায়ী তাঁর পরমুখাপেক্ষী স্বজাতির স্বার্থবুদ্ধি। তাহলেও, আমার বিবেচনায়, তাঁর অব্যর্থ জীবনের যৎকিঞ্চিৎ বৈফল্য ওইখানেই; এবং সে-বৈফল্যের ব্যাখ্যা বোধহয় এই যে প্রাতিস্বিক মহত্ত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকে জনসাধারণকে শ্রদ্ধা করতে শিখে তিনি চোখ-কানের আপত্তিতেও বোঝেন নি যে প্রাচ্য পুরুষসিদ্ধির প্রস্তাব আদ্যন্ত মৌখিক।

অবশ্য তার মানে এ নয় যে তিনি এশিয়ার মোহপাশে জড়িয়ে প'ড়ে য়ুরোপকে তফাতে রেখেছিলেন; এবং তাঁর অধিকাংশ ইংরেজী বক্তৃতা যেমন পাশ্চাত্ত্য শোষণনীতির তীব্র প্রতিবাদ, তাঁর অনেক বাংলা প্রবন্ধ তেমনই ভারতীয় অনাচারের অপ্রিয় নিন্দা। তাহলেও দুর্ম্মুখ যে সত্যনিষ্ঠার একমাত্র আদর্শ, তা তিনি মানতেন না, তিনি জানতেন যে অনেক সময় অনুকম্পার অভাবেই অপলাপ বাড়ে; এবং সেইজন্যে তিনি আমরণ কখনো শুচিবায়ুর প্রশ্রয় দেন নি, কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে, যেখানেই স্বরাট মানবাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেখানেই তাকে অকাতরে অর্ঘ্যনিবেদন ক'রে গেছেন। আসলে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিলো অসীম; তাঁর দীর্ঘ জীবনে একাধিক বার নরপিশাচদের ধ্বংসতাণ্ডব দেখেও, তিনি মুহূর্ত্তমাত্র ভাবতে পারেন নি যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতায় সকলের অধিকার ও আস্থা সমান নয়; এবং এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদিও অন্ধ-উপাধিরই উপযুক্ত, তবু সে-অন্ধতা যে দুর্ব্বল দৃক্‌শক্তির নিদর্শন নয়, নিরপেক্ষ সঙ্কল্পের অত্যুত্তম উদাহরণ, তাও এক রকম তর্কাতীত। কারণ সুধীশ্রেষ্ঠ ফর্ষ্টর ঠিকই বলেছেন যে ব্যক্তির মৃত্যু আর সভ্যতার বিনাশ দুইই নিরতিশয় নিশ্চিত বটে, কিন্তু উভয়ত্র আমাদের কর্ত্তব্য এমন ভাবে চলা যাতে দর্শকের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ব্যক্তি অমর আর সভ্যতা চিরন্তন; এবং, উক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয় সর্ব্বৈব মিথ্যা হলেও, যে-কোনো

একটিকে ছাড়লে, মনের মুক্তি তো দূরের কথা, দেহের পুষ্টি পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য লাগে। আমার বিচারে এই দুটি লোকোত্তর প্রত্যয়ের প্রাদুর্ভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ও চর্য্যায় যতখানি স্পষ্ট, অন্য কোথাও ততটা পরিষ্কার নয়; এবং তাই তাঁকে হারিয়ে বঙ্গদেশই সর্ব্বস্বান্ত নয়, সারা পৃথিবীও দুর্দ্দশাগ্রস্ত—বিশেষত আজ যখন সমস্ত আকাশে সংবর্ত্তের ঘোর ঘটা, ঝঞ্ঝাবাতে অতিজীবিতের আর্ত্তনাদ আর নবজাতকের অবেদ্য ক্রন্দন, সন্ধিক্ষণের আলোকে অনিশ্চয়, হতাশা আর অভীপ্সার দ্বন্দ্ব।

স্বভাববৈগুণ্যে আমি আজন্ম দুঃখবাদী; আমার অনুমানে সমাজবিবর্ত্তন তো জীবপ্রগতির বিমুখ বটেই, এমনকি জড়জগতের মতো মনুষ্যসংসারেও যাদৃচ্ছিক শৃঙ্খলার আনুপূর্ব্বিক হ্রাস সকল রকম ক্ষতিপূরণের অন্তরায়; এবং সেইজন্যে আমার ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও দিগ্বিজ্ঞান ব্যতীত প্রলয়-সঙ্কুল কালস্রোতে সভ্যতার নিরুদ্দেশযাত্রা বুঝি বা কূল খুঁজে পাবে না। কিন্তু মানবেতিহাসে উপনিপাত এই প্রথম নয়; এবং প্রতি বারে যখন যুগান্তের দুর্যোগ কেটে সুপ্রভাত এসেছে, তখন এ-বারেও, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্হিত ব'লেই, নরলোক চির তিমিরে তলিয়ে যাবে না। উপরন্তু এ-সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই গণনীয় যে, শুধু আমাকে আর আমার ভোগবিলাসী সগোত্রদের ঝেঁটিয়ে ফেলে নয়, রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের আমূল উচ্ছেদেই আগন্তুক নববিধান বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল সাধবে; এবং সেই ব্যবস্থাপরিবর্ত্তনের পর রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-চিন্তা ও সংস্কারস্বপ্ন হয়তো তদানীন্তন বিবেচকদের কাছে ঠিক ততখানি কৌতুকপ্রদ ঠেকবে, বর্ত্তমান উদারচেতাদের বিচারে যতটা হাস্যকর মনুসংহিতার বিধি-নিষেধ। পক্ষান্তরে সে-দিনেও রবীন্দ্ররচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য তিলার্দ্ধ কমবে না; তখনকার বিদগ্ধেরাও এক বাক্যে মানবে যে, কি গদ্যে, কি পদ্যে, এতখানি রসকৈবল্যে খুব কম লেখকই পৌঁছতে পেরেছে; এবং সময়ের গতি যেহেতু সামান্য থেকে বিশেষের দিকে, তাই ভাবী পণ্ডিতেরা যেমন অগত্যা তাঁর সর্ব্বতোভদ্র সৃজনপ্রতিভার গুণ গাইবে, তেমনই অনাগত চিত্রকরেরা ঈর্ষ্যান্বিত চোখে দেখবে তাঁর আলেখ্যশিল্পের অশিক্ষিত পটুত্ব। তাছাড়া ভবিষ্যৎ নিসর্গবিলাসীরা তাঁর স্বভাবোক্তিতে শুনবে বঙ্গশ্রীর মর্ম্মবাণী; আগামী ঐতিহাসিকেরা তাঁর ছোটো গল্পে প্রত্যক্ষ করবে বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের প্রাত্যহিক

সুখ-দুঃখ, তথা আচার-ব্যবহার ; এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মন্দারমাল্যে ফুটে থাকবে বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের অনেকান্ত সঙ্গতি।

আমার বিশ্বাস সারস্বত সমাজ শ্রেণীবিভক্ত নয়, সে-গণতন্ত্র সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ; এবং সাহিত্যসমালোচকদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত যদিও এ-অনুমানের বিপক্ষে, তবু, লেখকবিশেষের পদবীপরিচ্ছেদ শিল্পবুদ্ধির বিষয়বহির্ভুক্ত বিবেচনায়, আমি সাধ্যপক্ষে বিচার করতে প্রস্তুত নই রবীন্দ্রনাথ ভাবী পাঠক-পাঠিকাদের ভোটে কোন্ কবির ঈষদূর্দ্ধে বা নাতিনিম্নে স্থান পাবেন। তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই আদি ও অকৃত্রিম কবি ; এবং অন্তত মনোবিকলনীদের মীমাংসায় প্রাথমিক প্রবর্ত্তনাই পরিণামের বিধানকর্ত্রী। স্মরণে আসে অন্ধ গুরুজনদের অজ্ঞ বিদ্রূপ সয়ে, যেন যুগান্তরে, রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে আমার পুলকিত পরিচয় ; এবং তার অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতৃদেবের অধ্যাপনায় কোল্‌রিজ্ প'ড়ে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলুম সত্য, কিন্তু, হয়তো মাতৃভাষার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কবিতার হৃদয়সংবেদ্য, ঐকান্তিক আবেদন আমাদের মর্ম্মে পৌঁছয় না ব'লে, "এন্‌শেন্ট্ ম্যারিনর"-ও আমাকে "গীতাঞ্জলি"-র মতো মাতিয়ে তোলে নি। অবশ্য তদনন্তর অস্তাকাশে পাখা ঝাপ্‌টাতে শিখে, দূর থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে-বিরাট দৃশ্য দেখেছি, তার পাশে স্বদেশের সব কিছুই কেমন নাতিবিস্তীর্ণ ঠেকেছে ; এবং ইতিমধ্যে রৈবিক আদর্শে কাব্যসৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টায় আত্মধিকৃত যৌবন কাটিয়ে, অবচেতন অসূয়ার তাড়নায় আমি রটাতে ছাড়ি নি যে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী কবিদের চেয়ে তো নিকৃষ্ট বটেই, এমনকি সেই সঙ্গে তিনি তাদের অক্ষম অনুকারক মাত্র। তাহলেও যখনই ভেবেছি, তখনই না মেনে উপায় থাকে নি যে কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনিই আমার অদ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ; এবং তৎক্ষণাৎ বোধির অতিযুক্তি উদ্ভাসে বুঝতে পেরেছি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে রসোপলব্ধি কেন ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। কাব্য-কলার কৌশল-সম্পর্কেও বাংলাদেশের যতখানি জ্ঞান, সে-সমস্তই তাঁর শিক্ষা-প্রসূত, তথা দৃষ্টান্তলব্ধ ; এবং সেইজন্যে, ভক্তবৃন্দের মনে আঘাত লাগবে জেনেও, আমি একবার লিখেছিলুম যে রৈবিক সাহিত্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য এই যে আজকালকার কবিযশঃপ্রার্থীদের রচনারম্ভও প্রাঙ্-"মানসী" কবিতাবলীর চেয়ে অধিক অনবদ্য।

আসলে আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্যনিরূপণ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর; এবং সে-চেষ্টায় আমি স্বভাবত উদাসীন। এমনকি আমার পক্ষে তাঁর বিভিন্ন পুস্তকের স্তরভেদনির্ণয় সুদ্ধ সহজসাধ্য নয়; তাঁর রচনারীতি, চিন্তাপদ্ধতি ও অনুভূতিপ্রকরণের নিঃসন্দেহ ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও, প্রায় তাঁর প্রত্যেক বইই আমার কাছে অনিন্দ্য ও অখণ্ড ঠেকে; এবং, সেগুলির যে-কোনোটিতে তাঁর কাব্যজীবনের সমাপ্তি ঘটলেও, আমি তাঁকে মহাকবি ব'লেই জানতুম। উপরন্তু এই প্রাতিপদিক অবৈকল্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেও সুলভ নয়; এবং মৃতিনির্গমের দাবি যদি বর্ণবিচার ব্যতীত না টিঁকে, তবে রবীন্দ্রনাথ, শুধু উল্লিখিত কুললক্ষণের জোরেই, অক্ষয় স্বর্গে উচ্চাসন পাবেন। কিন্তু সে-অমরাবতীর পরিধি যত না অপরিসর, তার অধিবাসি-সংখ্যা ততোধিক অপরিমেয়; এবং অন্তত জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে, আভিজাতিক বিবিক্তির সুযোগ জনগণের আয়ত্তে না এলে, সভ্যতা মিথ্যা, মানবজাতি অসার্থক। অতএব ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টাদ্বৈতই, আমার মতে, তাঁর চরম ও পরম পরিচয়; এবং পৃথিবী-সম্বন্ধে আমার যে-অল্প অভিজ্ঞতা আছে, তার নির্ব্বন্ধে আমি অগত্যা মানতে বাধ্য যে, নিছক কবিত্বে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোন বা না হোন, নিপট মনুষ্যত্বে তাঁর সমকক্ষ আমাদের যুগে খুব বেশী জন্মায় নি। তাই করুণা জাগে সেই অজাত নর-নারী[illegible]জন্যে যারা তাঁকে চিনবে কেবল তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যস্থতায়, যাদের মানসে তিনি আঁকা থাকবেন মাত্র নামমাহাত্ম্যে; এবং যখন মনে পড়ে যে আমার ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ স্নেহ প্রচুর পরিমাণে জুটেছিলো, তখন প্রাণধারণের গ্লানিও আর অসহ্য লাগে না, খেদ-ক্ষোভের তলায় তলায় বুঝতে পারি তাঁর সংস্পর্শে আমার দিনগত পাপের বোঝা কতখানি ক্ষয়ে গিয়েছিলো। তবে এ-রকম স্মৃতি শেষ পর্য্যন্ত হানিকর, এর উপসংহার শ্মশানবৈরাগ্যের অকর্ম্মণ্য উচ্ছ্বাসে; এবং রবীন্দ্রনাথ সর্ব্ববিধ অসংযমকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন, তাঁর ঐতিহ্যবোধের মূলমন্ত্র ছিলো অতীতের উত্তরাধিকার সমাদরসহকারে অঙ্গীকার ক'রে, পুরুষকারের সাহায্যে তার নিরন্তর চক্রবৃদ্ধি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
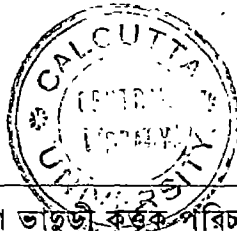
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৪৮

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

গ্রীক্ মনীষী মহাজ্ঞানী প্লেটো বলিতেন—'God geometrises' অর্থাৎ, বিশ্বময়ই বিশ্বেশ্বরের জ্যামিতিকীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কয়েকজন পাশ্চাত্য মনস্বী এ উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—যথা ঃ

Know that God geometrizes *eternally.*

—De Quincey

Do I meet God in my Geometry ? When I so much enjoy my Euclid, is it not always God geometrizing to me ?

—G. Macdonald.

অতএব ইহাকে সর্ববাদি-সম্মত সত্য বলা যাইতে পারে। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস লিখিয়াছেন ঃ—

When the mind looks at Its activities in visible nature, there is revealed a fascinating *geometrical* design.* One fact is clear, that, while the essential attribute of nature is beauty, yet that beauty has a framework of *geometry.*

—First Principles of Theosophy, 4th. Edn. pp. 285, 353

তাঁহার পূর্বে মাদাম ব্লাভাট্স্কি আদি সৃষ্টির প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঃ—
Dots, lines, triangles, cubes, circles and finally 'spheres'.—Why

* The universe reveals the mind of a 'pure mathematician', the Great Architect of the Universe. Ibid, p 352

or how? Because such is the first law of Nature and because Nature *geometrises* universally in all her manifestations. (The Secret Doctrine, Adyar Edition, vol I, p. 159)

প্রথম শুনিলে কথাটা এমন অদ্ভুত মনে হয়, যে ইহার কিছু বিচার করিতে চাই।

এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্বের বিশ্লেষণ করিলে আমরা চরমে এক মহাদ্বৈতে উপনীত হই—জড় ও শক্তি, Matter ও Energy.† এদেশে Matter-এর প্রাচীন নাম—'মাতর্' এবং Energy-র প্রাচীন নাম 'মাতরিশ্বা'। গীতা এই দোঁহাকে ক্ষেত্রভূতা অপরা-প্রকৃতি ও জীবভূতা পরা-প্রকৃতি বলিয়াছেন—

অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাম্ মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥—৭।৫

উপনিষদে এই দোঁহার নাম 'রয়ি' ও 'প্রাণ'। 'রয়ি' সাংখ্যের প্রধান, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Protyle—নির্বিশেষ, একাকার কারণার্ণব। সেইজন্য উহার সার্থক নাম 'অপ্'—অপ এব সসর্জাদৌ (মনু)

আপো বা ইদং সর্বম্—মৈত্রায়ণী উপনিষদ্, ১৪।১

নিস্তরঙ্গ অপ্-সমুদ্রে মহেশ্বরের ইচ্ছায় একদিন তরঙ্গ উত্থিত হইল—ঐ-'মাতর্'-কে 'মাতরিশ্বা' আলোড়িত করিলেন। সেইজন্যই প্রাণের নাম—'মাতরিশ্বা'—মাতরি (Matter-এ) শ্বসতি (এজতি, energises)—বাইবেল্-এর ঋষি ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—the Holy Ghost moving on the face of the *waters*. *

বলা বাহুল্য, ঐ স্পন্দন-কারী প্রাণ মহাপ্রাণ—

যদ্ ইদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্ প্রাণে এজতি নিঃসৃতম্
—কঠ উপনিষদ্, ৬।২

---

† As the Scientist examines Nature, he notes two inseparable elements —matter and force.

* The energy of the Cosmic Logos, called Fohat in 'the Secret Doctrine', thrills through the inert substance. (অপ্ বা 'the waters'—ঋগ্বেদের অপ্রকেতং সলিলম্)

—মাতরের উদ্‌বেজন-কারী ঐ শক্তি (Energy) ভাগবতী শক্তি। ভগবান্ অনন্ত-শক্তি-খচিত—অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্—এবং ঐ শক্তি বিশ্বের মধ্যে নানাভাবে প্রস্ফুরিত হয়—তাপরূপে, তাড়িতরূপে, আলোকরূপে, শব্দরূপে, চৌম্বকরূপে, কিমিয়া-যুতি (Chemical Affinity)-রূপে, জীবনী (Vital force)-রূপে এবং অধ্যাত্ম শক্তি (Psychic force)-রূপে।

প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যে বিমোহিত হইয়া আমরা মনে করি বটে—শক্তির বুঝি অনন্ত ভেদ। কিন্তু ধীর ভাবে জাগতিক শক্তিপুঞ্জের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ভৌতিক শক্তি (Physical force) যতই বিবিধ হউক না কেন, তাহারা মাত্র ছয়টি বিভাগের অন্তর্গত—আমাদের পূর্বোক্ত তাপ, তাড়িত, আলোক, শব্দ, চৌম্বক ও কিমিয়া-যুতি (Heat, Electricity, Light, Sound, Magnetism and Chemical affinity)।* তার উপর আর দুইটি শক্তি আছে;—প্রাগুক্ত জীবনীশক্তি ও অধ্যাত্মশক্তি। অতএব শক্তির মাত্র ঐ অষ্ট ভেদ।

বিজ্ঞান অনেকদিন অবধি বিশ্বাস করিত ঐ অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন। উহারা যে এক ভাগবতী শক্তিরই ভাবান্তর—এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকেব অপরিজ্ঞাত ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্যার উইলিয়ম্ গ্রোভ্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত ষড়্‌বিধ ভৌতিক শক্তিকে উপযুক্ত উপায় দ্বারা পরস্পরে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে—অর্থাৎ তাড়িত হইতে তাপ, আলোক ইত্যাদি উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ, আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম—শক্তির-সমাবর্তন—Correlation of physical forces. †

---

* Science is looking for the force of which electricity, magnetism, heat, and so forth are the differentiations.—The Secret Doctrine (Adyar Edition) vol. I, p. 118.

† The principle that any one of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms.

এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডল্‌বেয়ার বলিয়াছেন ঃ—

Each force is transformable directly or indirectly into the others. They differ from each other chiefly in the character of the motion involved in the phenomena.

হেল্ম্‌হোট্‌স্ (Helmholts) ও মায়ার (Myer) এই তত্ত্ব আরও বিশদ করেন। পরিশেষে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্‌বার্ট্ স্পেন্‌সার এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, শুধু ভৌতিক শক্তিই নয়—জীবনীশক্তি ও অধ্যাত্মশক্তিও ঐ সমাবর্তন বিধির অন্তর্ভুক্ত।* অর্থাৎ, সকল জাতীয় শক্তিই ভিন্ন জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বস্তুতঃ শক্তির উপচয়-অপচয় নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই—আছে শুধু আবির্ভাব-তিরোভাব—আছে শুধু রূপান্তর-ভাবান্তর। হার্‌বার্ট স্পেন্‌সারের ভাষায়, কোন এক অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য Power আছে (যাহাকে আমরা ভাগবতী শক্তি বলিতেছি)—যাহা রূপান্তরিত হয় মাত্র—কোনদিন বিনষ্ট হয় না।

আমরা জানি, শক্তির প্রকাশ স্পন্দনে—যাহাকে বিজ্ঞান 'vibration' বলেন। একই ভাগবতী শক্তি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি বা medium-এ স্পন্দিত হইয়া ঐ অষ্টভাবে প্রকাশিত হয়—অর্থাৎ, শব্দরূপে, আলোকরূপে, তাপরূপে, চৌম্বকরূপে, তাড়িতরূপে, কিমিয়া-যুতি রূপে, জীবনী রূপে ও অধ্যাত্মশক্তি রূপে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি শব্দের উপাধি বায়ুমণ্ডল, আলোকের উপাধি আকাশ এবং তাড়িতের উপাধি ইথার বা ব্যোম। আমরা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতেছি না—এতএব এ বিষয়ের বিস্তার করিব না। বর্তমানে আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, বিশ্বের মধ্যে ব্যাপারিত ভাগবতী শক্তি যে উপাধিতেই বিস্ফুরিত হউক না কেন—'it reveals a fascinating geometrical design'—উহা জ্যামিতিক বিচিত্রতায় আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্যই প্লেটো বলিলেন—God geometrizes। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ হইতে এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে—সকল কথা বলিবার স্থান হইবে না—আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ শব্দের কথা ধরা যাক্। যে মন্দ্র বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া

---

* The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness. —Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions p. 838.

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—Ibid p. 829.

আমাদের কর্ণশোষ্কুলিতে ধ্বনিরূপে অনুভূত হয় আমরা তাহাকে শব্দ বলি —যেমন বজ্রনাদ বা সিংহগর্জন, ঢক্কারব, পক্ষীর কাকলী, কণ্ঠ-বা-যন্ত্র সঙ্গীত। এসমস্তই বায়ুমণ্ডলে ক্ষুভিত বায়ুর বীচি-তরঙ্গ। এসম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—

The velocity of sound-waves in air is about eleven hundred feet per second, and varies with the temperature, being only 1,090 feet at the freezing point of water, increasing or diminishing about two feet per second for each degree above or below that ; and this is true for sound of all degrees of pitch.

—Prof Dolbear's Matter, Ether & Motion, p. 264

সে যাহা হউক, শব্দের জ্যামিতিকীর প্রমাণ কি ?

It has been demonstrated that rhythmical vibrations give rise to regular *geometrical* figures.

—Philosophy of the Gods, p. 23.

সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা শব্দমূর্তির (Sound-figures-এর) কথা বলিয়াছেন। ঐ সকল শব্দমূর্তি পরীক্ষালব্ধ। এ সম্পর্কে একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Suppose we strew a glass-plate with fine sand and stroke the edge with a fiddle-bow. The vibrations of the plates will make certain patterns and cast the sand upon those points of repose, to form nodal lines in various directions. The plates must, of course, be held or fastened, and a variety of ***sound-figures*** may be produced.

—Popular Scientific Recreations, p. 195.

গ্রন্থকার ঐ সকল শব্দমূর্তির যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার কয়েকটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।
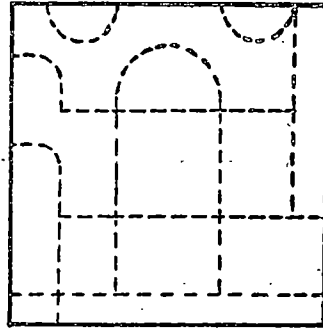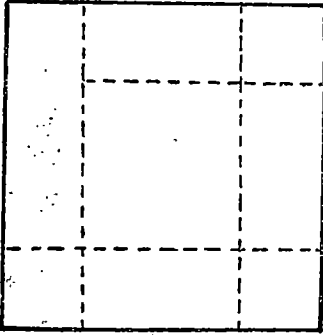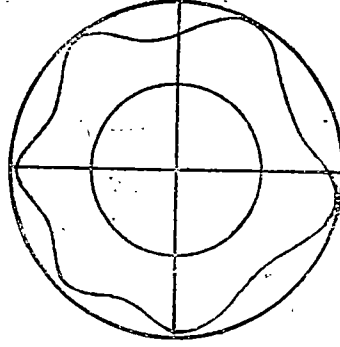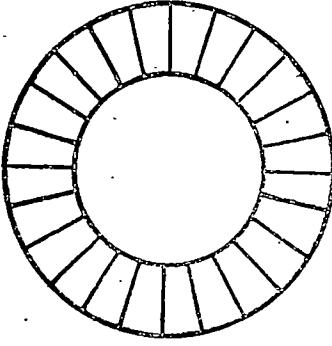
এ সকলই কি জ্যামিতিক আকার নহে ?

শব্দমূর্তি বুঝিতে হইলে শব্দতত্ত্ব একটু নিবিড় ভাবে বুঝিতে হয়। মিসেস্ বেসেণ্ট্ বলেন—

Each sound has a form in the invisible world and combinations of sounds create complicated shapes. In the suble matter of those worlds, all sounds are accompanied by colours,* so that

* This receives corroboration from a quite unexpected source—Mr Benjamin Lumley's 'Reminiscences of the Opera.'

In it he mentions an individual in whom sound produced a consciousness of colour. While listening to the singers at the opera, he saw certain shades of colour which varied in purity and intensity with the quality of the voice which he was hearing.

they give rise to many-hued shapes, in many cases exceedingly beautiful (and I may add, geometrical).

Esoteric Christianity—Chap. XII.

অর্থাৎ, শব্দ যখনই ধ্বনিত হয় তখনই সূক্ষ্মলোকে একটা মূর্তি সৃজন করে। শুধু তাই নহে—সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তির সহিত সপ্তবর্ণচ্ছদের বিভিন্ন বর্ণ উচ্ছ্বসিত হয় এবং উচ্চারিত শব্দের সমবায়ে ঐরূপে সৃষ্ট মূর্তি অনেক সময় মনোহর ও জ্যামিতিক আকার ধারণ করে। এই জন্যই কি সংস্কৃতে অক্ষরের নাম বর্ণ-মালা ?

এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আর্য ঋষিরা—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ --এই ত্রিবিধ স্বরের সহযোগে অপূর্ব মন্ত্রবিজ্ঞান রচনা করিয়াছিলেন। ঐ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল স্বর এবং বর্ণের উপর। (স্বর = Pitch ; বর্ণ = Intonation)। ঋষিরা বলিতেন, মন্ত্র যদি স্বরতঃ বা বর্ণতঃ হীন হয়—মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা—তবে তাহার প্রয়োগ নিষ্ফল। তাঁহাদিগের সঙ্কলিত বেদ ঐ স্বরশুদ্ধ বর্ণশুদ্ধ মন্ত্রময়ী ভাষা। এবং শব্দমূর্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা আরও বলিতেন, প্রজাপতি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই এই বিবিধ বিচিত্র বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছিলেন—

যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্মমে।

মন্ত্রবিজ্ঞান বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে। এ সম্বন্ধে আমি আমার ইংরাজী 'দেবতত্ত্ব'-গ্রন্থে (Philosophy of the gods') অনেক আলোচনা করিয়াছি—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

এখন সঙ্গীতের কথা বলি—কারণ, সঙ্গীতও ধ্বন্যাত্মক বিদ্যা। প্রাচীনেরা ইহার নাম দিতেন গন্ধর্ব-বিদ্যা। সঙ্গীত ত্রিবিধ—গীত, বাদ্য ও নৃত্য।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ সঙ্গীতং ত্রিবিধং স্মৃতম্।

নৃত্যের দ্বারা যে নানাবিধ জ্যামিতিক মূর্তি নির্মিত হয় ইহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু যেহেতু ঐ সকল মূর্তি মানবের সঙ্কল্প-সৃষ্ট, অতএব বর্তমানে উহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। নৃত্য বাদ দিলে রহিল যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত। প্রথম যন্ত্রসঙ্গীতের কথা বলি। বেণু বীণা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে ও মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রে কতই না বিবিধ ও বিচিত্র শব্দমূর্তি রচিত হয়।

কিন্তু যেহেতু ঐ সকল মূর্তি সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত, অতএব উহারা আমাদের চর্মচক্ষুর গোচর হয় না। কিন্তু যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছে—যাঁহারা স্বচ্ছদর্শী (Clairvoyant), তাঁহারা ঐ সকল মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং তাহাদের বিচিত্র বর্ণে ও জ্যামিতিক সৌষ্ঠবে বিস্মিত হন। এ সম্পর্কে সত্যদ্রষ্টা শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার সাহেব 'Thought Forms'-গ্রন্থে কয়েকটি প্রণিধান-যোগ্য কথা বলিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'Many people are aware that sound is always associated with colour—that when, for example, a musical note is sounded a flash of colour, corresponding to it, may be seen by those whose finer senses are already to some extent developed. It seems not to be so generally known that sound produces form as well as colour and that every piece of music leaves behind it an impression of this nature, which persists for some considerable time and is clearly visible and intelligible to those who have eyes to see.'—p. 75

দৃষ্টান্তস্বরূপ লেড্‌বিটার সাহেব প্রসিদ্ধ কালোয়াৎ মেণ্ডেল্‌সোহন্‌ (Mendelssohn)-এর একখানি গৎ ("Lieder ohne Worte") কোন গীর্জায় অর্গানে বাদিত হইয়া যে বিচিত্র শব্দমূর্তির সৃজন করিয়াছিল, তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত 'Thought Form'-গ্রন্থে ঐ চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। কী বর্ণের ঘটা ও জ্যামিতিকীর কী অপূর্বতা! লেডবিটর্‌ লিখিতেছেন—

We have here a shape roughly representing that of a baloon, having a scalloped outline consisting of a double voilet line. Within that there is an arrangement of variously coloured lines moving almost parallel with this outline; and then another somewhat similar arrangement which seems to cross and interpenetrate the first.

আমরা নিম্নে ঐ চিত্রের জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি—
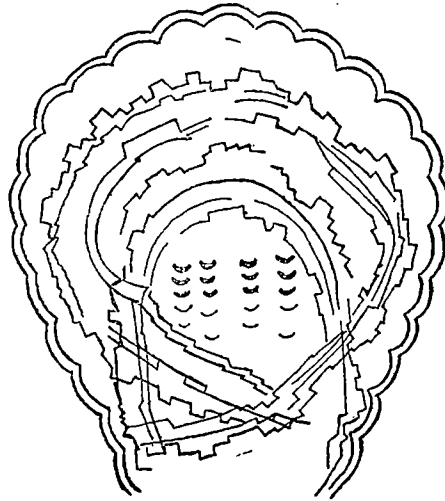
এইবার কণ্ঠ সঙ্গীতের কথা বলি। অভিজ্ঞেরা বলেন, মানবের কণ্ঠই শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র। ঐ কণ্ঠ হইতে যে রাগ রাগিণী ধ্বনিত হয়, সূক্ষ্মলোকে তাহারা বিবিধ বিচিত্র মূর্তি সৃজন করে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর নাকি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি আছে—অন্ততঃ এ দেশের প্রাচীনেরা ঐ সকল মূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন মেঘ রাগের মূর্তি, বসন্ত রাগের মূর্তি ইত্যাদি। * এই সকল মূর্তি কাল্পনিক হইতে পারে কিন্তু উহাদের ভিত্তি যে কণ্ঠসঙ্গীত-সৃষ্ট সূক্ষ্মলোকস্থিত শব্দ-মূর্তি—সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। এই সকল মূর্তির ইংরাজী নাম 'Voice-figures'। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক টিণ্ডেলের শিষ্যা মিসেস্ ওয়াট্‌স্ হিউগ্‌স্ (Mrs. Watts Hughes) 'Voice Figures' নাম দিয়া একখানি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন এবং লর্ড লীটন (Lord Leighton)-এর চিত্রশালায় 'Shapes of Sound' সম্বন্ধে চিত্র-সম্বলিত একটি বক্তৃতা (illustrated lecture) প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার সার মর্ম পূর্বোক্ত 'দেবতত্ত্ব'-গ্রন্থে আমি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। মিসেস্ হিউগ্‌স্ Eidophone-

* For instance, the Megha Raga is said to bear a majestic form seated on an elephant. The Basanta Raga is described as a beautiful youth decked with flowers, who may as well sit as model for a picture of Cupid.

নামক যন্ত্রের উপর গান করিলে তাঁহার স্বর-চাতুর্য্যে নানাবিধ বিচিত্র জ্যামিতিক মূর্তি সৃষ্টি হইয়াছিল—

"Mrs. Hughes sings into a simple instrument called an 'Eidophone' which consists of a tube, a receiver and a flexible membrane—and she finds that each note assumes a definite, beautiful and constant shape, as revealed through a sensitive and mobile medium. At the outset she placed tiny seeds upon the flexible membrane and the air-vibrations set up by the notes she sounded, 'danced' them into a definite *geometrical* pattern." (পাঠক লক্ষ্য করিবেন *geometrical* pattern)। পুনশ্চ ঃ And now it only remains to describe the shapes of the notes. Those shapes are such remarkable revelations of *geometry*, perspective and shading, that description is difficult. Snow flakes and pollen as seen under the microscope are not more dainty and 'Japanesque' than are the shapes of notes. Stars, spirals, snakes, wonders in wheels, and imagination rioting in a wealth of captivating, *methodical designs*—such were what were shown."

মিসেস্ হিউগস্ আরও কত কি দেখাইয়াছিলেন এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। পাঠক কেবল 'methodical designs' শব্দটির উপর দৃষ্টি দিলেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। অতএব শব্দমূর্তিতে যে আমরা বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী প্রত্যক্ষ করি—ইহা নিঃসংশয়।

এইবার আলোকের কথা কথা বলি এবং দেখিবার চেষ্টা করি উহার মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কি না। আলোক কি ? এ সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রথমটির সহিত নিউটনের নাম জড়িত। উহাকে Emissiom or Corpuscular theory বলে। আমরা ইহাকে 'বিচ্ছুরণবাদ' বলিতে পারি। নিউটন্ বলিতেন—সূর্য ও অন্যান্য স্বপ্রকাশ বস্তু সদা সর্বদা সবেগে নিজ নিজ দেহ হইতে অসংখ্য পরাগ বিচ্ছুরণ করিতেছে, এবং ঐ বিচ্ছুরিত পরাগ আমাদের নয়নগোচর হইলে আলোকের অনুভূতি হয়। *

* Newton held that the sun and the other light-giving bodies threw, off, with immense velocity, vast numbers of infinitely minute particles of matter, which passed into space, and by their mechanical action upon the eye brought about the sensation of light.

দ্বিতীয় মতবাদের সহিত হুইজেন্‌স্‌ ও ইউলার-এর (Huygens & Euler)-নাম জড়িত। উহাকে Undulatory or Wave Theory বলে। আমরা ইহাকে 'বিস্পন্দন বাদ' বলিতে পারি। Huygens বলিতেন যে জ্যোতিষ্মান্‌ বস্তু হইতে এক জাতীয় বীচিতরঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—উহাই আলোক। *

এই মতই এখন বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত—যদিও সম্প্রতি কেহ কেহ নিউটনের বিচ্ছুরণবাদ সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমধিক নহে। † এক কথায়—ইথারে উত্থিত বীচিতরঙ্গই আলোক—Light consists of electric waves in the ether.

অতএব আমরা এখানে বিস্পন্দনবাদেরই অনুসরণ করিব।

আমরা জানি আমাদের পক্ষে সূর্যই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সূর্য হইতেই আলোক তরঙ্গ পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিতেছে। উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬৫০০ মাইল এবং যেহেতু সৌরমণ্ডল পৃথিবী হইতে ৯ কোটি মাইল দূরবর্তী অতএব সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছিতে প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে।

সূর্যরশ্মি আমাদের চক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু যদি সূর্য হইতে নির্গত ঐ শ্বেতরশ্মির গতিপথে আমরা একটা কাঁচের তুল সংস্থাপন করি, তবে ঐ শ্বেত রশ্মি সপ্তবর্ণচ্ছেদে ব্যাকৃত হয়। ঐ সপ্তবর্ণ যথাক্রমে লাল, কমলা, হলুদ, নীল, সবুজ, গাঢ়নীল ও বেগুনি। রামধনুকেও আমরা ঐ সপ্তবর্ণচ্ছদ প্রত্যক্ষ করি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'Light is a vibration and according to the amplitude and vibration is the colour produced by

---

* Huygen suggested that light was due to some sort of wave motion transmitted through a medium.

† দৃষ্টান্ত স্বরূপ Preston's 'Theory of Light' গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ঐ বিস্পন্দনবাদেরই পক্ষপাতী।

According to the wave theory of Light, a luminous body is a source of a disturbance in the ether which is propagated in waves throughout all space. These waves falling on the eye excite the sense of vision.

—Preston's 'Theory of Light', 3rd Edition, p. 15.

it.' অর্থাৎ, আলোক এক জাতীয় স্পন্দন এবং ঐ স্পন্দনের দ্রুততা ও দৈর্ঘ্যের উপর উহার বর্ণ নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের Wave-length (বীচি-দৈর্ঘ্য) বিভিন্ন। লাল রঙের বীচিতরঙ্গের দৈর্ঘ প্রায় $\frac{১}{৩৯,০০০}$ ইঞ্চি এবং বেগুনির প্রায় $\frac{১}{৬০,০০০}$ ইঞ্চি। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডল্‌বেয়ার নিম্ন তালিকাটি দিয়াছেন ;—

The wave lengths of the different coloured parts of the spectrum of sun-light have been found to be as follows :—

Red	about	39000	to the inch.
Orange	"	41000	" " "
Yellow	"	44000	" " "
Green	"	47000	" " "
Blue	"	51000	" " "
Indigo	"	54000	" " "
Violet	"	57000	" " "
Extreme visible	about	60000	" " "

অর্থাৎ, যদি বীচিতরঙ্গের দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৩৯,০০০}$ ইঞ্চির কম হয় অথবা $\frac{১}{৬০,০০০}$ ইঞ্চির বেশী হয়, তবে তাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে'। *

নিম্ন চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয় বিশদ হইবে।
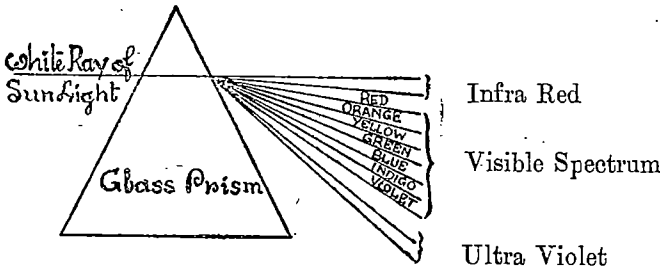
* So long as the vibrations are not larger than 38,000 to the inch, making the colour red, nor smaller than 62000 to the inch, making the colour violet, we can respond to solar vibrations and know them as colour.

তবেই আমরা আলোকরশ্মি সম্বন্ধে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম। প্রথমতঃ প্রতি সেকেণ্ডে স্পন্দনের সংখ্যা কত এবং দ্বিতীয়তঃ স্পন্দনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির কতটুকু! এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার জন্ হার্সেল্ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম*—

Colour of the Spectrum	No. of undulations in an inch	No. of undulations in a second
Extreme Red ...	37,640 ...	458,000,000,000,000
Red ...	39,180 ...	477,000,000,000,000
Intermediate ...	40,720 ...	495,000,000,000,000
Orange ...	41,610 ...	506,000,000,000,000
Intermediate ...	42,510 ...	517,000,000,000,000
Yellow ...	44,000 ...	535,000,000,000,000
Intermediate ...	45,600 ...	555,000,000,000,000
Green ...	47,460 ...	577,000,000,000,000
Intermediate ...	49,320 ...	600,000,000,000,000
Blue ...	51,110 ...	622,000,000,000,000
Intermediate ...	52,910 ...	644,000,000,000,000
Indigo ...	54,070 ...	658,000,000,000,000
Intermediate ...	55,240 ...	672,000,000,000,000
Violet ...	57,490 ...	699,000,000,000,000
Extreme violet ...	59,750 ...	727,000,000,000,000

কিন্তু এই সকল আলোক তরঙ্গ দ্রুতই হ'ক বা বিলম্বিতই হ'ক, ঐ সকল বীচি (waves) ক্ষুদ্রতায় এক ইঞ্চির অযুত ভাগ বা লক্ষ্য ভাগ বা কোটি ভাগই হ'ক—প্রশ্ন এই, ঐ সকল উর্মি কি যদৃচ্ছজাত এলোমেলো বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত—অথবা জ্যামিতিক প্রণালীতে সুসংহত ভাবে সুসজ্জিত? এ সম্পর্কে সকল বৈজ্ঞানিকই একমত যে মৃদুপবনহিল্লোলে নদীবক্ষে উত্থিত বীচিসমূহ যেমন সুসংহত ও জ্যামিতিক শৃঙ্খলাবদ্ধ, ইথারে উত্থিত আলোকতরঙ্গও ঠিক সেইরূপ। এখানেও জ্যামিতিকীর সুন্দর নিদর্শন।

এবার তাপের কথা বলি। সূর্যমণ্ডল হইতে যখন পৃথিবীর উপর আলোক

---

* পরবর্তী কালে হার্সেলের গণনার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস বলেন—'Light-waves begin for human eye at 35,184,372,088,832 per second and Light-waves end for human eye at 1,125,899,906,842,624 per second.'

নামিয়া আসে উত্তাপও তাঁহার সঙ্গী হয়। বস্তুতঃ ঐ বিচ্ছুরিত আলোক ও উত্তাপ একই স্পন্দনের ভাবান্তর মাত্র। *

অন্ধকারে তাড়িত-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলে bulb-এর মধ্য হইতে যদি একগুণ আলোক বিচ্ছুরিত হয় তবে ৬।৭ গুণ উত্তাপ বিকীর্ণ হয়। বৈজ্ঞানিক তাপ সম্বন্ধে যে 'wave-motion' বা বীচিতরঙ্গের কথা বলিলেন, ঐ তরঙ্গের পরীক্ষা করিলেও আমরা বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর নিদর্শন পাই।

তাপের একটি ব্যাপার দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা—'Heat changes the *dimensions* of bodies. Increase of volume is the normal effect, although the reverse is observed in some cases'। কিন্তু সঙ্কোচন বা প্রসারণ—তাপ যে ভাবেই কার্য করুক না কেন, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাহার মধ্যেও যে জ্যামিতিকীর ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই।

আজ এই পর্যন্ত। বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর বিষয়ে আমাদের আরও বক্তব্য আছে। ক্রমশঃ বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* Radiant heat and light are, in fact, the same thing namely, vibrations of an elastic medium, the luminiferous ether, supposed to fill all space and they obey the same laws of reflection, refraction, interference, and polarization. They also obey the general laws of wave-motion.

—The Modern Cyclopedia p. 374.

আশার কথা

সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত কমরেড মেস্কি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। পড়লুম কাগজে—

"May I express my profound grief at the passing of a great Indian writer and poet whose name was so familiar in my country and whose works were so popular with the masses of the Soviet people ?"

এই প্রথম শোনা গেল যে একজন বাঙালী জমিদারের জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে লেখা কবিতা, পদ্মা নদীর বজরায় লেখা গল্প ও শান্তিনিকেতনের আশ্রমে লেখা নাটক ও গান সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের অতি প্রিয়। গজদন্তের গম্বুজে পলায়ন করে যিনি সারা জীবনটা বেহালা বাজালেন আজ শুনছি সোভিয়েট রাশিয়ার কিষাণ মজদুর তাঁকে ফিউডাল যুগের ব্যারন বলে অপাংক্তেয় করে না, তাঁর বেহালা শুনতে ভালোবাসে।

হায়! এ খবরটা যদি তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর কানে পৌঁছাত!

কিন্তু আমাদের চোখে পড়ায় আমরা উৎসাহিত হয়েছি। এখন থেকে দ্বিগুণ উদ্যমে বেহালা বাজানো চলবে। কারণ সত্যিকারের ভালো বাজনা শুনতে বনের প্রাণীও ভালোবাসে, জনগণও ভালোবাসবে।

"শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ছুটে বনের প্রাণী
শুধু তোমার আপন ঘরে…"

যাক, ভুলে গেছি। একটা সামান্য, ক্ষণস্থায়ী ফিল্মও দেশ বিদেশের ধনী দরিদ্র কাড়াকাড়ি করে দেখে। আমাদের রচনা যদি আরো গভীর স্তর থেকে উৎসারিত হয় তবে আমরা বুর্জোয়া বলে কি জনগণের মন পাব না? তবে এটা ঠিক যে আমাদের আপন শ্রেণীতেই আমাদের দর নেমে যাবে, যেহেতু আমরা কিষাণ কিম্বা মজদুর নই, নিতান্তই বুর্জোয়া।

হাতে পড়ল আরো একটি পত্রিকা। এটির নাম The Indian P. E. N. পাঠ করলুম—

"Leo N. Tolstoy died in November 1910, a little over thirty years ago. Although even during his lifetime he was known the world over and corresponded with such great people as Romain Rolland, Bernard Shaw, Edison and Gandhi, he is now even better known and more justly appreciated. The Soviet Government has been publishing a really complete *Academic Editon* of his works which will comprise some one hundred volumes, thirty-eight of which have already appeared."

তা হলে দেখছি সোভিয়েট রাশিয়ার লোক ত্রিশ বছরের পুরানো আফিং নতুন করে খাবেই। একশোখানি কেতাবের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানি তো পারমার্থিক। ঐ পঞ্চাশ কৌটো আফিং পেটে পড়লে রাশিয়ার বিপ্লবীরা যে অধ্যাত্মবাদী হবে না তার স্থিরতা কই ?

কমরেড মেস্কির শোকবাণীর শেষাংশ এইরূপ—

"Your father will forever remain one of the highest peaks of world literature, interpreter and revealer of the soul of the great Indian people."

এখানে "soul" কথাটি বোধ হয় ছাপার ভুল। হয়ত ওস্থলে "matter" পড়তে হবে। সাহিত্যের যাঁরা মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা করেন তাঁরা কি কখনো স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষের জনসমাজের আত্মা বলে কোনো পদার্থ আছে ? এবং কী করে তাঁরা কবুল করবেন যে রবীন্দ্রনাথ উক্ত আত্মা নামধেয় পদার্থ-বিশেষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে জগতের গোচর করেছেন ?

মনে পড়ছে আমাদের এক অধ্যাপকশ্রেণীর বিদ্বান একদা ছাত্রদের সভায় অভিভাষণ সূত্রে বলছিলেন, "রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে কলকাতার piece-goods-এর কারবার ঠাকুর পরিবারের একচেটে ছিল। মনে রাখতে হবে যে মফঃস্বলের জমিদারী থেকে তাঁদের বিস্তর আয় ছিল। মনে রাখতে হবে যে তাঁদের বিরাট বাড়ীতে—"

অধ্যাপক মহাশয়ের বাক্যস্রোতে বিঘ্ন ঘটিয়ে আমি সেদিন ছাত্রদের

অভিনিবেশ ভঙ্গ করেছিলুম। রবীন্দ্রনাথের পর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে পড়লেন। সে এক অপূর্ব্ব materialist interpretation. কমরেড মেস্কি যে-ভাবে রসভঙ্গ করেছেন এর পরে অধ্যাপক মহাশয়ের কণ্ঠে কোন সুর শোনা যাবে কে জানে! হয়ত তিনিও এখন বলবেন যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তাঁর পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তির তফশীল তৈরি করতে হবে না, বরং জেনে রাখতে রাখতে হবে তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

"Nothing succeeds like success!" আমরাও যদি রবীন্দ্রনাথের মতো সফল হই তখনকার দিনের মেস্কিরা আমাদের মৃত্যুর পরে আত্মারই সন্ধান নেবেন, অবস্থার নয়। এবং মেস্কিরা যা করবেন ঘোস্কি, বোস্কি, ব্যানারস্কি, মুখারস্কিরাও তাই করবেন।

লীলাময় রায়

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

নতুন ফ্ল্যাট ঠিক বাসোপযোগী নয়, যতদিন না ভাল বাড়ি পাওয়া যায় ততদিন মাথা গোঁজবার মতন। কিন্তু সে কয়দিনের জন্যও যৎসামান্য পারিপাট্যের প্রয়োজন। পদে পদে তাতেও খগেনবাবু নিজেকে অনাবশ্যক মনে করেন। ঘরে থাকলেই খুঁটিনাটি বিষয়ে মতান্তর হবার সম্ভাবনা থাকে। ঘরের কাজ মা-লক্ষ্মীদের আর বাইরের কাজ বাবুদের—এ ধরণের শ্রমবিভাগ বর্ত্তমান যুগে অগ্রাহ্য। এক যদি এক পক্ষ রোজগার আর অন্য পক্ষ খরচই করে, তবে ব্যাপারটি সহজ হয়। কিন্তু রমলা নিজের তহবিল থেকেই টাকা তুলেছে, খগেনবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও অর্থ সম্পর্কে স্ত্রীসুলভ আত্মপর ভেদাভেদ-জ্ঞানহীনতার প্রমাণ একবারও দিলে না। খরচের দায়িত্ব যার, রুচির দায়িত্বে তার সন্দেহ প্রকাশ অভদ্রতা।

বিজন পরের দিন এসে খগেনবাবুকে খবর দিলে যে হরতাল জোরে চলছে, তবে খণ্ড খণ্ড ভাবে। ইতিমধ্যে, মালিকেরা প্রচার করেছে যে মুনাফার হার তাদের এতই কমেছে যে দুদিন প'রে তারা আর কল চালাতেই পারবে না। যুক্তিটা নিরর্থক, কিন্তু সাধারণে ভাবতে পারে যে তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কমরেডরা সকলে এখন কাজে ব্যস্ত, অতএব খবরের কাগজে তর্ক বাধাতে তাদের সময় নেই। বিপদ এই যে কংগ্রেস দলের অনেকেই ঘাবড়ে গিয়েছেন। মজদুর-সভা অবশ্য মুখের মতন জবাব দিতে পারে, কিন্তু দিচ্ছে না। কারণ কি বোঝা যায় না। বিজনের বন্ধুরা অনেকেই সেখানকার সভ্য কিন্তু তাদের জোর কম। গুজোব এই যে কানপুরের কংগ্রেস লক্ষ্ণৌ থেকে মন্ত্রীপক্ষকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আসছে কাল মিটিং হবে।

খগেনবাবু সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়লেন। কাতারে কাতারে লোক চলেছে একই দিকে। তারই টানে একটা প্রকাণ্ড ময়দানে এলেন। বিস্তর

লোক ইতিপূর্ব্বে জমায়েত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান চেনবার জো নেই। যারা ভিড়ের পরিধিতে ঘুরছে তাদের মুখে ক্লান্তির ছাপ, ভিড়ের সমীকরণ ছাপিয়ে চোখে পড়ে। চলার ধরণ নিয়মবর্জ্জিত, দুর্ব্বল দাঁড়াবার ভঙ্গী, ঘাড় গোঁজা, চোখ নিষ্প্রভ। তলতলে গলা আমের মতন, থলথলে প্রৌঢ়া ক্ষেত্রী গৃহিণীর মতন, হলহলে পুঁইশাকের ডাঁটা চড়চড়ি আর বিউলির ডালের সঙ্গে কাদা-চিংড়ী, ন্যাদনেদে, ভসভসে···কোথাও হাড়ের কাঠিন্য চোখে পড়ে না। ফ্যারোর কবর গেঁথেছে, রোমান-সম্রাটের বজরা বেয়েছে, জার্ম্মান জমিদারের জলাজমিতে লাঙল ঠেলেছে, ফরাসী রাজার জেলখানা ভরেছে, ল্যাঙ্কা-শেয়রের কলে শীতের ভোরে ছুটেছে, এদেরই জ্ঞাতি ; চীনের দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারীতে, ভারতের জমিদারী শোষণে ভুগছে, মরছে, এদেরই জাতভাই। এর চেয়ে আর কি প্রত্যাশা করা যায়! শতাব্দীর সর্ব্বগ্রাসী অত্যাচার কি কন্দর্পপ্রসূ হবে! কেন খোলামাঠে আসে এরা হাওয়া আর সবুজ ঘাস কলুষিত করতে! তার চেয়ে বাড়ি বসে, বস্তিতে পণ্ডিতজীর কথামৃত শুনুকগে, সেই সমীচীন, সুখ দুঃখ লক্ষ বৎসর আগেকার, সীতাহরণে রামচন্দ্রজী হাপুস নয়নে কাঁদছেন, লবকুশ মাকে নিয়ে বনে বনে ঘুরছে···রামলীলাই এদের পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়, মিটিং, সত্যাগ্রহ, ধর্ম্মঘট, হরতাল! বর্ত্তমানের পরশ লেগেছে এদেশে, নতুন রোগ, মৃত্যুহার একটু বেশী হবেই ত!

ভারি মজার ব্যাপার কিন্তু। বাঙলা দেশেও বিলেতী রোগ ধরেছিল, ফলে জনকয়েক ধর্ম্মত্যাগ করলে, জন কয়েক ইংরেজী শিখে আর চাকরি নিয়ে ভদ্রলোক হল ব্যস্, এই পর্য্যন্ত! থুড়ি! সাহিত্য আর ওর্জস্বিনী বক্তৃতা বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, তিনি সব অবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথ, এমন কোন লেখকের নাম করা যায় যিনি নিজের শিকড় খুঁজতে অর্দ্ধেক শক্তি অপব্যয় করেন নি? আধুনিক সাহিত্য ত' সামুদ্রিক শ্যাওলা! অনুকরণে আপত্তি নেই, কোনো সৃষ্টি আত্মজ নয়, কিন্তু এ যেন মস্তিষ্কের একটা ছোট অংশের তাগিদ! একটা মূলগত খণ্ডতা ও অ-বাস্তবতার হাত থেকে কেউ পরিত্রাণ পাচ্ছে না। ছটফট করছে, এইটুকুই আধুনিক মনের সততা, জীবনের চিহ্ন। কিন্তু বিদেশী প্রভাব এ অঞ্চলের তাঁতে টান মেরেছে। তাই বাঙালীবাবু রায় বাহাদুর, ডিপুটি, লেখক হয়েছিল, আর কানপুরের

শ্রমিক বিলেতী বুলি কপচালে, বিলেতী পদ্ধতি খাটালে, চাকরী খোয়ায়, জেলে যায়। জনতার নিষ্প্রভ চোখ থেকে বিদেশী সম্পর্কের স্বরূপ ঠিকরে আসে। অন্নের বিরোধ। অন্ধকারের গর্ভে আলোর জন্ম। বর্ষারাতে পদ্মার জাহাজ বাঁকের মুখে সার্চ্চলাইট ফেলে ; ঘাটের গুদোম ঘর, পানের দোকান, হোটেল, জমিদার বাড়ির টিনের আটচালা, ঘাটের ডিঙ্গি এক ঝলকে চমকে ওঠে। রমলার প্রভাবের অন্তরে বিরোধের বীজ। ভাগ্যিস, মা হয় নি সে! রক্ত-বীজের লোপ নেই।

ময়দানের এক কোণে সফীক একা দাঁড়িয়ে। 'আপনি এখানে!'

'এসে পড়লাম।'

বিজন আসতে সফীক্ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের লোক কোথায়?'

'প্যাণ্ডালের চারধারে।'

'ও-পাড়ার কর্ত্তৃপক্ষ বিনা পয়সায় সিনেমা দেখাচ্ছেন। পৌরাণিক গল্প যাতে এখানে না আসে।'

'যাদের আসা উচিত ছিল তারা এল না, আর এল তামাসা দেখতে আসে যারা বরাবর। ওদের সিনেমার অপারেটারকে বলেছিলে?'

'নতুন লোক। পুরাতন লোককে সন্দেহ করে তাড়িয়েছে।'

'সিনেমা-মেশিন বন্ধ করা সোজা। যা করে হোক নিয়ে এস।'

'ওস্তাদ, জানই ত ও-পাড়ার ব্যাপার। নিজে চল, নয়ত আসবে না।'

'পারবে না তুমি? বেশ মহবুবকে পাঠিয়ে দাও।'

বিজন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

প্রকাণ্ড মোটর পার্কের ফটকে থামল। লক্ষ্ণৌ থেকে মন্ত্রীপক্ষ লোক পাঠিয়েছেন হু'দলের সমঝোতা করাতে। জয়রব উঠল, অজগরের মতন দীর্ঘ জনতা ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করল, মধ্যে দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, চারধারে কংগ্রেস সমিতির সভ্য, পিছনে স্বেচ্ছাসেবকের দল। নেতা মঞ্চে উঠলেন, ঝাণ্ডায় হাত রেখে মাইক্রোফোনের সামনে এলেন ; যন্ত্র ক্যাঁক্ করে উঠল। পাঁচ মিনিট সময় গেল যন্ত্র ঠিক করতে। বক্তৃতা সুরু হল। এক একটা হিন্দী কথার ওরফে ফার্সী শব্দ ; হিন্দুস্থানী ভাষার জন্ম হচ্ছে খোলা আঁতুড় ঘরে। পয়দা ত' হল, কিন্তু বাঁচবে কতদিন? যদি সকলে গ্রহণ করে তবেই

'অর্থাৎ অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায় এবং অভ্যাসের বদভ্যাস। তবু ভাল, আপনি বলেন নি যে ভারতবাসী স্বভাবতই ধার্ম্মিক।'

'আপত্তিটা কি ?'

'চরম নিদানে বিশ্বাসী নই; এবং এক হাত জমির জন্য কিষাণরা নিষ্ঠুর হত্যা করতে পিছপাও হয় না, দেখেছি। তা ছাড়া, প্রয়োজন কথাটার অর্থ আপনার কাছে এক, আমাদের কাছে অন্য। গুঁতোর চোটে বাবা বলা, আর আদরভরে বাবা ডাকার মধ্যে প্রভেদ আছে। একটা অনিচ্ছাকৃত, অন্যটা স্বেচ্ছাপ্রসূত। স্বেচ্ছা, অর্থাৎ নির্ব্বাচন।'

'কার হাতে নির্ব্বাচন ?'

'কোনো একটি মানুষের হাতে নয়। সমাজের বিকাশধারাই বেছে নেয়। যারা সেই নীতি বুঝেছে তারাই একমাত্র সাহায্য করতে পারে।'

'আপনাদের পাতানো বন্ধুরা ধরতে পারেন নি ?'

'না।' সফীকের ঠোঁট জাঁতির মতন বন্ধ হল। দুজন মজুর যেন সফীকের সঙ্গে কথা কইতে চায়, খগেন বাবু তাই দূরে সরে গেলেন।

'এই যে করিম! কি খবর ?'

'আমাদের পাড়া তৈরী। একজন লোকও ঢুকতে পারবে না। বড় ফাটকের সামনে একশ মরদ ও পঞ্চাশ আওরাৎ পাহারা দেবে।'

'পিছনে ?'

'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে।'

'কখন থেকে ?'

'কাল ভোর বেলা থেকে।'

'আজই রাত ন'টা থেকে তারা মোতায়েন হোক।'

'আজ ন'টা! কেন ?'

'হাঁ। যা বলছি শোন। রফা হল না, শেষে যখন খবর পাবে তখন দেখবে চোঁয়ায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'আওরাৎ আজ রাত্রে কোথায় পাব ?'

'যা বল্লাম তারা বুঝবে এবং বুঝে আসবে। দেখ, যেন বাচ্ছা নিয়েই যায়। লক্ষ্ণৌ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা যেন দেখেন, এবং দেখে সরকারকে

খবর দেন যে মেয়েমানুষরা কচি ছেলে নিয়ে ধন্না দিচ্ছে মিলের সামনে। বুঝেছ ? কি বুঝেছ বল।'

'না হলে সমঝোতা হয়ে যাবে।' সফীক হেসে বল্লে, 'আপাততঃ, কথা-বার্ত্তার সুযোগে লোক ঢোকান বন্ধ করাটাই উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে, কংগ্রেস-কর্ম্মীদের আমাদের স্বপক্ষে ওকালতীর সমর্থনটাও এসে যাবে।' করিমের সঙ্গীকে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'ষ্টেশনের এন্তাজাম হল ?'

'একশ' জন সেখানে থাকবে।'

'আজই, যেমন সর্ব্বত্র।'

'গঙ্গার পুলে ? '

'সেখানে পঞ্চাশ, ঘাটে ঘাটে দশ।'

'ওস্তাদ, যদি লরি ভর্ত্তি লোক আসে ?'

'তবে···তোমরা কি ভাবছ ?'

করিম তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'যদি লরি নিয়ে আসে তবে সামনে শুয়ে পড়বার লোকেরও অভাব হবে না।'

'আওরাৎ সামনে শোবে, বাচ্ছা নিয়ে। আগে তারা আটকাবে, পরে তোমরা।'

'আগে আওরাৎ ? মরদকে অপমান করছ ওস্তাদ ? তা হয় না।'

'তাই হবে, কারণ তোমাদের হাত পা ভাঙ্গলে রোজগারী করবে কে! ওরা মরলে আবার সাদি করে নিও। এই ঠিক, যাও।' হাসির সময় সফীকের চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে যায়, ঠোঁটের বাঁ দিকটা একটু ঝু'লে পড়ে, ডান দিকটা উঁচু হয়।

সফীক খগেন বাবুর পাশে এসে একটা বর্ম্মা চুরুট ধরালে। একজন লোক কাছে এল, পরিচ্ছন্ন খদ্দরের কুর্ত্তা ও পায়জামা, কেয়ারী করা চুল একটু বেশী তৈলাক্ত, বাঁকা ভাবে খদ্দরের টুপী পরা, পায়ে ভারি বুট্।

'কেঁও জমাদার সাহাব, নেহি মিলা শিকার ?'

লোকটা থতমত খেয়ে বল্লে, 'কিসকো পুছতেঁহে ?'

'জনাবে আলিসে।'

'জমাদার কোন ?'

'দেমাক রাখনা চাহিয়ে, সাহাব !'

লোকটা ইতস্ততঃ করে খগেন বাবুর কাছে দেশালাই চাইলে। সফীক দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে লোকটা চলে গেল।

'কে ?'

'নজর রাখছে আপনার ও আমার ওপর।'

'যখন সরকার আপনাদের নিজেদের, তখনও !'

'তবে আর মজা কি! ওরা সরকারের ওপর। তা ছাড়া, শ্রমিকদলের যারা পক্ষ নেবে তারাই কম্যুনিষ্ট, অতএব তারা সকলের শত্রু। আপনিও নতুন লোক, ঘাবড়াবেন না, বাঙালী হিন্দু মাত্রেই অ-বাঙালীর কাছে টেররিষ্ট।' একজন স্বেচ্ছাসেবক সফীকের কাছে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, আপনি কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন না ?'

'ডাকলে নিশ্চয়ই যাব।'

'আপনার বক্তৃতা শুনতে সকলে উদ্‌গ্রীব ছিলাম।'

'এ-সভা অন্য কারণে, অন্যের জন্য ডাকা।'

'তবু ওস্তাদ, এত লোক জমেছে, এমন সুবিধে ছিল আমাদের বক্তব্য প্রচারের।'

'কাদের বক্তব্য ? তোমাদের! তুমি কোন ক্লাসে পড় ?'

'টেন্‌থ্‌ ক্লাসে।'

'মন দিয়ে পড়াশুনো করগে, পরীক্ষার ফল ভাল হবে; বক্তৃতা শোনবার স্পৃহাও কমবে।' ছেলেটি চলে গেল।

'খগেন বাবু, আপনার ফ্ল্যাট সাজান হল ?'

'এক রকম হয়েছে। এখনও পুরোপুরি হয় নি। উনি আবার মনোমত না হলে কাউকে চায়ে ডাকতে পারছেন না। চলুন আপনাদের ওখানেই যাই। যদি অবশ্য, তবে...'

'একটা প্রশ্ন করছি, মাপ করবেন, আপনি স্পাই ?'

'দেখে মনে হয় ?'

'না।'

'অবশ্য, আদিম অভিশাপটার কথা তুলবেন না।'

'সেটা কাটান যায়, বহু চেষ্টায়।'

'কোনটা উল্লেখ করছেন ?'

'শ্রেণীর।'

'আমি বলছিলাম, এ-দেশে ইংরাজী শিক্ষার আদিম অকৃত্রিম উদ্দেশ্যটির কথা, যার প্রেরণায় সকল শিক্ষিতরাই গুপ্তচর। তবে এইটুক রক্ষে যে চাকরী আমি করি না। এ অভিশাপ মোচন হয় ?'

'নিশ্চয়ই হয়, অভিশাপের মধ্যেই কাটান-মন্ত্র আছে। আচ্ছা, চলুন, আমাদের ওখানে এমন কিছু গোপন কাজ হয় না। লুকিয়ে ষড়যন্ত্রের কাল নেই, যদিও বাঙালীদের কাছে তার মোহ এখনও আছে, বোধ হয়।'

সফীক খগেন বাবুকে চা খাওয়ালে। ঘরে কেউ নেই দেখে খগেন বাবু বল্লেন, 'আমি চিরকাল বই ঘেঁটেছি, কখনও কাজে নামেনি, তাতে বিশ্বাসীও নই, তাই আমার ভাষা স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটা কথা আমার প্রায়ই মনে জাগে। সত্যই কি আপনি ভাবেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতার কোনো বিশেষত্ব নেই, যদি থাকে তবে তার প্রকৃতি কি ধর্ম্মমূলক নয়, এবং যদি তাই হয়, তবে তাকে অবহেলা ক'রে কোনো স্থায়ী নতুন সভ্যতা গড়া যাবে ?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে, কিন্তু অন্য কোনো দিন আলোচনা করা যাবে। এখন মুলতুবী থাক।'

রাত প্রায় ন'টার সময় মহবুব এসে খবর দিলে, 'কথাবার্ত্তা সুরু হয়েছে। উধামজী আছেন সেখানে। ওঁরা বলছেন বরখাস্তের কারণ এ নয় যে করিম কি অন্যান্য লোক মজদুর-সভার কর্ম্মী, কারণ এই যে তারা হয় অপদার্থ, না হয় গুণ্ডা।'

'তারা গুণ্ডা! আর ফি দশজনের পাশে যারা পাহারা দিচ্ছে তারা সব লক্ষ্মী ছেলে, অহিংসার খুদে অবতার! তাদের কাশী আর মির্জ্জাপুর থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে তত্ত্বাবধানের জন্য! করিমের রেকর্ড দেওয়া হয়েছে ?'

'উধামজীকে নিজে দিয়েছি।'

'কি বল্লেন ?'

'তিনি বলছিলেন যে ওরা উত্তর দেবে করিম আগে ভাল মিস্ত্রী ছিল, এখন

সে কেবল জটলা আর ষড়যন্ত্র করে, তাড়ি খেয়ে মারপিট বাধায়। তার বৌ যে মোকদ্দমা চালিয়েছিল তার রায়ের কাপিটা ওদের হাতে।'

'উধামজী কি জানেন না যে কিসের জোরে, কার পয়সায় করিমের স্ত্রী বড় উকীল দিয়ে মোকদ্দমা চালায়?'

'উধামজী জানেন বোধ হয়, শুনিয়েও দেবেন।'

'স্মরণ করাতে বলগে যাও। টাকা এসেছিল কর্ত্তাদের কাছ থেকে।'

'প্রমাণ চাইবেন হয়ত।'

'প্রমাণ? প্রমাণ মানে অনবরত কানে ঢোকান। একটা কথা একশ-বারে প্রমাণ, হাজারে বাণী। উধামজীর পাশে পাশে থেকো। এখানে প্রয়োজন নেই তোমার।' মহবুব চলে গেল।

বিজন এসে খবর দিলে যে জুহীর সিনেমা-শো ভেঙ্গে গিয়েছে, তাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, মেশিন নিয়ে অপারেটার ভেতরে পালাল।

'ওটা আস্ত আছে? কাল যেন থাকে না।'

'খগেনবাবু, রমাদি অপেক্ষা করছেন। আমাকে খেতে বল্লেন, কিন্তু নাচার। ওস্তাদ, রাত্রে আমার কোনো কাজ আছে?'

'তুমি এখানেই থাকবে, না ফ্ল্যাটে যাবে?'

'যা বল।'

'যা ইচ্ছে তোমার। আপনি খগেন বাবু?'

'আমি না হয় যাই।'

'বেশ।'

'কাল দেখা হবে?'

'এখন বলা যায় না।'

'বিজনের এখানে রাত্রে অসুবিধে হবে না?'

বিজন প্রতিবাদ জানালে। সফীক বল্লে, 'আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হতে যদি দেরী লাগে তবে অবশ্য যাবে না আপনাদের ওখানে, তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ত' পাঠিয়ে দেব।' খগেন বাবু উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় খগেন বাবুর বেয়ারা এসে তাঁকে একটা চিঠি দিলে। রমলা ছু'লাইনে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে অনুরোধ জানিয়েছে। সফীক হাসি সম্বরণ করলে। খগেন বাবু চিঠিটা

ছিঁড়ে ফেলে বল্লেন, 'আমি এখানে খানিকক্ষণ বসতে পারি?' বিজন খগেন বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সফীক বল্লে তার কোনো আপত্তি নেই, তবে খগেন বাবুর খাবার দেরী হবে। খগেন বাবু খাটিয়ার ওপর বসলেন। সফীক লিখতে বসল।

রাত দশটার পর জন পাঁচেক লোক ঘরে এল। সফীক তিনটে ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে সকলকে কাছে আসতে অনুরোধ করলে। প্রথমটিতে চাঁদার জন্য আবেদন। ধর্ম্মঘট চালাবার জন্য টাকা চাই, মজদুর-সভার এমন অর্থবল নেই যে অতলোকের খরচ চলে একদিনের বেশী। অথচ পনের দিনের খোরাকের হিসাব ধরতে হবে। মজুরদের নিজেদের হাতে যা আছে তাইতে গড়পড়তা তিন দিন চলবে। বাকী ক'দিনের মধ্যে এক হপ্তা ধারে। শেষের পাঁচ দিনের উপযুক্ত নগদ টাকা তোলা চাই। প্রথমে কানপুর, পরে একত্রে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, প্রতি সহর থেকে টাকা উঠবে। চাঁদার সমিতিতে কংগ্রেস-সভ্যের সংখ্যা বেশী থাকাই উচিত।

প্রত্যেককে সফীক আবেদন পত্রের সমালোচনা করতে অনুরোধ জানালে। আপত্তি উঠল চার দফায়। ভাষা একটু জোরাল হলে ভাল হয়। পনের দিন হরতাল চলবে কোন হিসেবে; চাঁদার হার কত লেখা নেই; সমিতিতে মজুরদের ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নেই।

ভাষা সম্বন্ধে সফীক উত্তর দিলে যে সে সাহিত্যিক নয়; ওজস্বিনী-ভাষার চেয়ে কাটা ছাঁটা আবেদন পত্রেই কাজ হয় এই তার অভিজ্ঞতা, তবে বিজন যদি চায় তবে সে ভাষা সংশোধন করতে পারে, খগেন বাবুর সাহায্যে। বিজন কাগজটি নিয়ে খগেন বাবুর কাছে গেল। খগেন বাবু মন দিয়ে পড়বার পর বল্লেন, 'হরতালের অব্যবহিত কারণগুলি স্বল্প কথায় লেখা উচিত, অনেকে হয়ত জানেন না।' সফীক রাজি হল, 'বিজন, তুমি ওঁকে জানিয়ে দাও। দু'তিন লাইনের বেশী যেন না হয়।' লেখাটা চার লাইনে দাঁড়াল। সফীক দু'একটা বিশেষণ কেটে দিলে। সকলকে পড়ে শোনাবার পর খসড়া গৃহীত হল।

পনের দিনের সীমা সম্বন্ধে সফীক উত্তর দিলে যে দু'সপ্তাহে ফল যদি না ফলে তবে বুঝতে হবে যে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি আছে। গত হরতালের

অভিজ্ঞতা এই যে দশ দিনের পর এখানকার মজুরদের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে। অর্থাৎ, তখন তারা বোঝাপড়ার জন্য উন্মুখ না হলেও প্রস্তুত হতে থাকে। এবার দেখতে হবে যেন জোয়ার আসে, অতএব ভাঁটা আসবার পূর্ব্বেই সাবধানের প্রয়োজন। আট কিংবা ন'দিনের দিন মজুরদের জানান চাই যে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকা মজুত রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা জানবে যে চেষ্টা চলছে, ব্যস্, এইটুকু। সফীকের উত্তরে সকলে নীরব রইল।

চাঁদার হার লেখা নেই, কারণ যে যা পারে তাই মাথায় তুলে নিতে হবে। চার আনা লিখলে তার বেশী আসে না। ছাত্রেরা চার আনা, উকীল দোকানদার আট আনা এক টাকা, আর মালিকরা, হাঁ মালিকরা লুকিয়ে যা পারে তাই দেবে, উধামজীর মারফৎ। এই টাকাটা প্রথমে তোলা চাই, তাই তাঁর প্রয়োজন খুব বেশী। মালিকরা তাঁকে মান্য করে। তিনি চাঁদার সমিতিতে একলা থাকবেন না, কংগ্রেসের লোক চাইবেন, প্রথমে আপত্তি দেখিয়ে শেষে রাজি হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাই অন্য পক্ষের নাম রাখা হয়েছে এখন। মজদুর সভার প্রতিনিধি হিসেবে ঐ কারণে এখন কেউ থাকছে না, পরে যখন উধামজী নিজেই দলের একাধিক লোক আনতে চাইবেন তখন আমাদের জনকয়েককে এ অজুহাতে বসিয়ে দিলেই চলবে। মুসলীম লীগের তরফে কে আসবে মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি নিজে রাজি হলেই সব দিক থেকে ভাল হয়। তাঁর স্থান খালি রাখা হয়েছে। সমিতি প্রয়োজন মত নতুন সভ্য বেছে নেবে।

মহবুব জিজ্ঞাসা করলে, 'ওস্তাদ তুমি নিজে থাকছ না ?'

স—'না।'

ম—'উধামজীর হাতে অতটা ভার দেওয়া কি উচিত ?'

স—'সব ভার তাঁকে বইতে হচ্ছে না। তাঁকে দেনেওয়ালারা শ্রদ্ধা করে তোমরা জান সকলে। অতএব টাকা তোলবার জন্য তাঁর মতন লোক মিলবে না।'

বি—'শেষে যিনি টাকা তুলেছেন তিনিই খরচ করবেন। এই ভাবে কানপুরের সব ব্যাপারই তাঁর হাতে এসে পড়ছে।'

স—'হাতে পড়ুক, মুঠোর জোর নেই। হরতালটা যদি খাঁটি হয় তবে তাঁর সাধ্য কি যে তার কাঠামো ছাড়িয়ে যান!

বি—'ওস্তাদ, কিছু মনে কোরো না, অতটা নির্ভর আমার ধাতে নেই। এই ক'রেই আমরা নিজেদের বঞ্চিত করছি, আর 'রাইটিষ্ট'দের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে! উধামজীর চারপাশে আমাদের থাকতেই হবে।'

স—'তাই হবে, তবে এখন নয়। হরতাল তুমি ভাবছ কেবল মজুরদের মজুরী ও নোকরী নিয়ে, তা নয়। হরতালের দুটো দিক আছে, পলিটিক্যাল ও ইকনমিক। প্রথম দিকে উধামজী আসতে বাধ্য; কিন্তু পরে সরে যেতেও বাধ্য, কারণ যে পরিবর্ত্তন তাঁর মনোমত সেটা মজুরদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। অতএব আমরা যদি সজাগ থাকি তবে তিনি আপনা থেকেই খসে পড়বেন। ব্যাপারটা সজাগ রাখা। আর কিছুতে ভয় পেও না। যে আগে থাকে সেই কি নেতা? এখনও নেতৃত্বের প্রতি মোহ আছে অনেকের। ওসব কথা যাক—খানিকটা টাকা তোলবার পর মজদুর-সভার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি যাকে চাইবে তাকেই আমরা পাঠাব, বিজন।' সামান্য ঠাট্টা ছিল সফীকের উচ্চারণে, বিজন আর কোনো উত্তর দিল না।

দ্বিতীয় কাগজে যাতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা না বাধে তার প্ল্যান। তার প্রথম দফা, যেন কালই প্রত্যেক মহল্লায় এক একজন কর্ত্তা ঠিক করা হয় যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হবে আপন আপন মহল্লার শান্তিরক্ষা। বাছা বাছা লোক নিয়ে সে একটি সমিতি বানাবে, প্রত্যেক সমিতি সব গোড়াতে এই প্রস্তাব মনোনীত করবে যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শ্রমিক-শ্রেণীকে দুখণ্ডে বিভক্ত করার ফন্দী মাত্র। তা ছাড়া সমিতি নজর রাখবে যে বাইরের কোনো লোক পাড়ায় না ঢোকে। সমিতি পাহারা দেবে, হিন্দু মজুর মুসলমান পল্লী আর মুসলমান মজুর হিন্দু পল্লীতে। সহরে শান্তির ভার কর্ত্তৃপক্ষের, মজুরদের ভার মজুর পাড়ায় দাঙ্গা হতে না দেওয়া, তার বেশী নয়। সফীক সকলের মত চাইলে। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের পাড়ায় মারপিট বাধবে না; তবে সহরে যদি সুরু হয়, আর, বেশী দিন চলে ও সেই সঙ্গে হরতালের উৎসাহ কমে যায়, অর্থাৎ পনের দিন কুঁড়েমির পর কি হয় বলা যায় না। সফীক 'কুঁড়েমি' কথাটি শুনে ভুরু তুললে। সেটা লক্ষ্য করে মহবুবের

চোয়াল শক্ত হল। বিজনের মতে বাইরের গুণ্ডা না আসতে পেলে আর সহরের গুণ্ডাদের আগে থেকে কয়েদ করলে কোনো চিন্তাই নেই। প্রশ্ন উঠল দুটোর একটাও সম্ভব কিনা।

বিজন—'প্রথমটা শক্ত, দ্বিতীয়টি সোজা, যদি লক্ষ্ণৌ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ওপর হুকুম আসে ১৪৪ ধারা সহরে জারির জন্য।'

করিম এতক্ষণ নীরব ছিল, কোণে যেন আত্মগোপনে ব্যস্ত, তাকে নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে এই যথেষ্ট, তার বেশী মনোযোগ যেন তার ওপর না পড়ে। মুখ বসন্তের দাগে ভরা, নাকের একটা দিক মা শীতলা কেটে নিয়েছেন, তাই ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোয় প্রতি নিঃশ্বাসে, বাঁ রগের শিরা জট পাকিয়ে ফুলে উঠেছে, মধ্যে মধ্যে দড়িটা নাচে, অজানিতে ডান হাত চাকার মতন ঘোরে আর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো হাওয়ায় ছক কাটে, চোখে বিজলী হানে কিন্তু মুখে থাকে হাসি, সরল, শিশুসুলভ, সফীকের মতন। করিম গলা খাঁকারি দিতে কথোপকথন যেন থিতোল।

স—'করিম, তুমি কি বল?'

ক—'১৪৪ ধারায় আমরাই প্রথমে ধরা পড়ব।'

স—'নিশ্চয়ই। সহরে দাঙ্গা হতে না দেওয়া আমাদের কাজ নয়, সরকারের। তা ছাড়া, সহরে মারপিঠ চলছে আর মজুর পল্লী ঠাণ্ডা এর একটা দাম আছে।'

খগেন বাবু অস্বস্তিভরে চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বসলেন। সফীক বাঁকা চোখে সেটা লক্ষ্য করে তৃতীয় কাগজে মন দিলে। এতে পূর্ব্বোক্ত দুটি প্ল্যানের কার্য্যবাহক বিবরণ। চাঁদার আবেদন পত্র ছাপান, বিলোন, খবরের কাগজে পাঠান থেকে ছাত্র সমাজের, উকীলদের, দোকানীদের, ষ্টেশনের, ঘাটের কর্ম্মী নির্বাচন পর্য্যন্ত সব খুঁটি নাটি লেখা। দ্বিতীয় অংশে মজুর-পল্লীর সর্দ্দার ও সমিতির লোকের নাম। প্রথম প্রশ্ন উঠল মিলওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে কি না, যদি হয়, তবে সে ভার কে নেবে। সফীক উত্তর দিলে, 'চাঁদিতে স্পর্শ দোষ ঘটে না। টাকা যখন আমাদের কাজে লাগে তখন সেটা পবিত্র। আমি এদের কাছ থেকে চাঁদা তোলার ওপর জোর দিচ্ছি দুটি কারণে: ওঁরা পরস্পরের প্রেমে পাগল নন, হরতালের

লোকসান যারা বহন করতে পারবে না তারা ত' দেবেই, তা ছাড়া দেবার সময় যারা জোরে লক্-আউট চালাচ্ছে তাদের অভিশাপ করবেই। মিল্-ওয়ালাদের মধ্যেও বড় ছোট আছে, ছোটরা ভাবে তাদের কম লাভ কিংবা লোক্সানের জন্য বড়রা দায়ী, বড়রাও ঠিক একই কথা ভাবে, তবে তাদের লোকসান কখনই হয় না। অতএব প্রত্যেকের ছোট স্বার্থ এই যে তার মিল চলুক, অন্য মিলে ধর্ম্মঘট হোক। এই জন্য টাকা সহজে আসবে, এবং ওদের নিজেদের বিরোধটা খুলবে ভাল। উধামজী ধুনো দেবেন দেশী-বিদেশী পার্থক্যের। সব মালিকরাই আজ কংগ্রেস ফণ্ডে টাকা ঢালতে তৎপর, সে-জন্যও উধামজীর প্রয়োজন। এ ভার তাঁরই।'

দ্বিতীয় অংশের আলোচনার সময় খগেন বাবু ক্ষমা চেয়ে, সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আগে থেকে সর্দ্দার ও সমিতি ঠিক করা কি সম্ভব?'

স—'সেইটাই সম্ভব, আপনি যা ভাবছেন সেটা অচল। তা ছাড়া, আমরা জানি কে রাজি হবে, কে হবে না।'

খ—'তবু…'

স—'তবু, ডেমক্রাটিক নয়, এই বলছেন ত? ফলে তাই দাঁড়াবে, দেখবেন'খন।'

বি—'খগেন বাবু বলছেন পদ্ধতির কথা।'

স—'সেটা পরে বিবেচ্য।'

শেষ প্রশ্ন উঠল সরকার মিটমাটের জন্য যে চেষ্টা করছেন তার সমর্থন করা উচিত কিনা। বিজন সফীককে সোজা জিজ্ঞাসা করলে এ সম্বন্ধে তার নিজের মত কি।

'নিজের মত নেই। কি ধরণের কথা চলছে খবর পাওয়া যাক প্রথমে…'

করিম বল্লে, 'ওটা আমাদের হাতে নয়। মজদুর-সভা যা করবে তাই হবে।' একজন কর্ম্মী ঘরে এল।

স—'কি খবর?'

'কথাবার্ত্তা কখন শেষ হবে জানি না। এখন ওঁরা খেতে গেলেন। উধামজীর মতে আশা আছে।'

স—'আশা, আশা, আশা নেই, থাকতে পারে না। ওহে বিজন, শুনেছ,

আশা আছে, করিম ভাই শুনেছ, আশা আছে।' সফীক হাসতে লাগল, দাঁড়িয়ে উঠে গা হাত মোড়া দিলে, হাত হু'টো সোজা মাথার ওপর উঠে একটা মুঠোয় আবদ্ধ হল, যেন এপষ্টাইনের যীশু দীর্ঘতর হয়ে আকাশ স্পর্শ করছে, তাকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দিচ্ছে না, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দূরত্ব বজায় রাখছে, হু'টোকে এক হতে দেবে না।

'বিজন, তুমি খগেন বাবুর সঙ্গে যাও। রাতে তোমার কোনো বিশেষ কাজ নেই।' এক একজন করে সকলে চলে গেল, বিজন ও খগেন বাবু তখনও বসে রয়েছে দেখে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে পৌঁছে দিতে হবে? ভাবীজী নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। কিন্তু আমার উপস্থিতি কি বাঞ্ছনীয়?' বিজনের সাগ্রহ আমন্ত্রণে খগেন বাবু সায় দিলেন।

ফ্ল্যাটের একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। কড়া নাড়তে 'বয়' দরজা খুলে দিলে। বিজনের উচ্চ কণ্ঠস্বরের আহ্বানে রমলা ঘরে এল। টেবিলে ন্যাপকীন ঢাকা খাবার সাজান রয়েছে। রমলা টেবিলের মাথায় বসে খাবার ভাগ করে দিলে। 'রমাদি, আমার মতন হতভাগাকে নিয়ে চালান শক্ত। ওস্তাদকে ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও। ওর প্রয়োজন আছে যত্নের। ভাওয়ালীতে একবার যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে কারুর কথা শোনে না, যে কে সেই!'

র—'তাই না কি!'

স—'বিজনের কথা ধরবেন না। ওটা কানপুর থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার ছুতো ছিল। আমার শরীর এখন খুব ভাল।'

বি—'তা ভাল হতে পারে, কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। একবার যখন রক্তবমি হয়েছে তখন······'

খ— 'কতদিন আগে?'

স—'তিন বছর হয়ে গেল।'

খ—'তবে কোনো চিন্তা নেই।' রমলা অন্য কাঁটা দিয়ে মাংসের টুকরো বিজনের প্লেটে দিলে।'

র—'আপনি কিছু খাচ্ছেন না। অসুবিধে হয়ত' হাতে করেই খান।'

খগেন বাবু রমলার দিকে চাইলেন। ঠঙ্ করে রমলার কাঁটা বেজে উঠল।

বি—'রমাদি, ওস্তাদ পুডিং ভালবাসে। আছে ?'

র—'কালকের কিছু থাকতে পারে, দেখছি।' রমলা পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে, 'যতটা আছে তা দেওয়া যায় না।'

বি—'তা হোক।'

র—'আরেক দিন ক'রে পাঠিয়ে দেবো। বিজন, তুমি কি এখানে আজ শোবে ?'

বি—'না, আজ থাক।'

স—'আজ নয় কেন ?'

বি—'কোথায় শোবো ?'

খ—'সে জন্য ভেবো না। আমার ঘরে জায়গা আছে।'

খাবার পর বিজন সফীককে খানিকটা রাস্তা পৌঁছে দিতে চাইলে। সফীক প্রথমে রাজী হল না। খগেন বাবুর ঘরে বিজন আর রমলা ঢুকল শোবার বন্দোবস্ত করতে।

খ—'আমি দেরিতে ঘুমুই। খাবার পর একটু হাঁটা ভাল। একটু না হয় যাই ?'

'আসতে চান আসুন।'

একটু দূরেই পথের ধারে একটা খোলা মাঠ। পার্ক নয়, মাত্র খালি জায়গা, মাটি এবড়ো খেবড়ো, ঘাস নেই, কাঁকর আর কয়লার ওপর হাঁটতে মচ, মচ, শব্দ হয়, পূর্ব্বে বস্তীর আলো টিম্ টিম্ করে, পশ্চিমে রাস্তার বিজলী বাতি নির্লজ্জভাবে জ্বলে। সফীক বস্তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে মাটিতে বসল। খগেন বাবু ঘাস খুঁজে তার ওপর রুমাল বিছোলেন।

খ—'আপনার সঙ্গে এত শীঘ্র আলাপ জমবে আশা করি নি। ভাল মিশতে জানি না। আপনাদের মতামতের সঙ্গে আমার পরিচয় বইএর দৌলতে, তাও সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে অক্ষম।'

স—কতটা পারেন ?'

খ—'গোড়ার তাগিদ মানি। মানুষকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, উন্নতির প্রবৃত্তি, মৈত্রীভাব—এগুলো সভ্যতার তাড়না, বহু পুরাতন। আরো

স্বীকার করি, সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে, এমন কি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলগে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে।'

স—'কোথায় পারেন না ?'

খ—'অতটা মেটিরিয়ালিজম গিলতে পারি না।'

স—'যদি তাগিদগুলোর অস্তিত্ব গ্রাহ্য হয় তবে মেটিরিয়ালিজমের যান্ত্রিকতা আপনা থেকে বাদ পড়ে। জড়বাদ অনেক রকমের।

খ—'তা জানি। কিন্তু পদ্ধতিটা ? হরতালের জন্য অত হিসেব নিকেশ কেন ? আপনি যে প্ল্যান শোনালেন তাতে মানুষের ব্যবহারকে যন্ত্রের পর্য্যায়ে ফেললেন। সকলে যেন পুতুল, আর আপনারা যেন খেলোয়াড়, পর্দ্দার আড়াল থেকে সুতো টানছেন, আর তারা আপনাদের আজ্ঞা পালন করছে। জীবনটা মেক্যানিক্‌স্ নয়।'

স—'সাধারণ মন্তব্যগুলো ছেড়ে দিন, আমি ঠিক বুঝি না। প্ল্যানের গলদ কোথায় ?'

খ—'আমি কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে নামি নি, অতএব আমার সমালোচনা ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু সাধারণ প্রতিজ্ঞা পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো পদ্ধতি কার্য্যকরী হবে না। আপনি পনের দিন ধর্ম্মঘট চলবে ধরছেন, কেন ? বিরোধের সন তারিখ ঠিক করা যায় না। তার ছন্দ আছে, উত্থান-পতন আছে নিশ্চয়, কিন্তু যদি মজুরদের সচেতন রাখা উদ্দেশ্য হয় তবে বিরোধ কোনো এক তারিখে ঝুলে পড়বে ভেবে কাজ করা নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। বিরোধকে চিরন্তন ভাবাই আপনাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। ক্ষমা করবেন। এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি অন্য দিক থেকে। সেটাও জীবনের দিক, তাই অন্য দিকেও তার স্বার্থকতা থাকতে বাধ্য। খণ্ড খণ্ড দেখার বিপদ আছে সন্দেহ হয়।'

স—'আপনার মত অনুসারে প্ল্যানকে কতটা সংস্কৃত করবেন ?'

খ—'তা আমি জানি না।'

স—'বেশ। ভেবে দেখবেন। অন্য আপত্তি ?'

খ—'পূর্ব্বেই জানিয়েছি। আপনারা কেন, নিজেরা, পল্লীসমিতির সর্দ্দার ও সভ্যের নাম লিখলেন ? কিছু মনে করবে না, এখানেও জনসাধারণের

জীবনশক্তিতে অবিশ্বাস ফুটে উঠছে। 'ডেমোক্রাসি' শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সাম্যবাদীর সমাজ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অপমান করে, তবে জন-সাধারণের দশা কি হয় ভাবুন দেখি।'

স—'আরো কিছু বক্তব্য আছে ?'

থ—'আপাতত কিছু নেই। তবে আবার বলি, অত হিসেব-নিকেশ, অত প্ল্যান সৃষ্টি আমার শিক্ষার হোক বা না হোক, অভিজ্ঞতার প্রতিকূল। জন-সাধারণের ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম ছাড়া নয়, সেই ধর্ম্মবলে শক্তির স্ফুরণ হয় অন্তর থেকে। অতএব, হরতাল সুরু হবে, সামান্য ঝগড়ার বিষয় ছাপিয়ে সেটা দুকূল ভাসাবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আপন বেগে চলবে—এসব সম্ভব একমাত্র আপন শক্তিতে। মানুষ, নেতা, স্রোতের খড় কুটো মাত্র, এই দেখলাম।'

স—'আপনি কখনও দলভুক্ত হয়ে কাজ করেছেন ?'

থ—'না। করতে পারি নি। একবার দলে এসে পড়ি, কিন্তু প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। আমি বলছিলাম, ব্যাপারটা চল্‌তি, স্থাণু নয়।'

স—'কে বলছে স্থাণু। অনেক রাত হল না ?'

থ—'তা হোক গে। খোলাখুলি তর্কের সুযোগ দিয়েছেন ব'লে সত্যই কৃতজ্ঞ। অবশ্য তর্ক আর হল কৈ। আপনি মুখ খুললেন না এখনও পর্য্যন্ত।'

স—'আপনি যা বল্লেন তার আংশিক সমর্থন আছে। ১৯০৫।৬ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সুরু হয় সেটা বন্যার মত এসেছিল। তাতে সর্ব্বপ্রকার বিবর্ত্তন এসে পড়ে, মানসিক পর্য্যন্ত, কিন্তু স্থায়ী হল না এই জন্য যে বন্যাকে খাতে বওয়াবার কোনো উপায়, অর্থাৎ পার্টি ছিল না। তাই দশ বছর বৃথা গেল, তাই অত দামও দিতে হল, তাই অবশ্য অত লোকে কাঁদতেও পারলে। এই প্রকার ঘটনাকে সার্থক সংক্রান্তিতে পরিণত করতে পারে পার্টি। তার কাজ এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসের দিক্ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, পূর্ব্ব থেকে তার খাত তৈরী, সাধারণকে তার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন করা। পার্টির নেতৃত্ব মানে সংস্থান বুঝে বিরোধকে ঠিক পথে চালান, তাকে বাঁচিয়ে রাখা, সামাজিক শ্রেণীগত সম্বন্ধের নীচুতে বিরোধকে নামতে না দেওয়া, তাই থেকে শক্তি আহরণ ও তাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। এটা আপনাদের জীবন-স্রোতের

নিজের ক্ষমতার বাইরে। সেটা অন্ধ, তার চোখ দেয় পার্টি। তাই পার্টির একটা প্রাথমিক দায়িত্ব আছে, কিন্তু, তার কাজের মধ্যেই ডেমক্রাটিক পদ্ধতি খুঁজে পাবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচন জনমতের অতিরিক্ত নয়, তার চেতনাংশ মাত্র। জীবনস্রোতে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। এতদিন ধরে ত' সেটা বইছে, তবু তার জোরে দৈনিক দুমুঠো অন্ন খড় কুটোর মতন গরীবের পেটে ভেসে আসছে না কেন? সেখানে যে চড়া! কেন সেটা ব্যাঙ্কের দিকেই অনবরত ছুটছে? সত্য কথা এই: মুখে বলছেন স্রোত, কিন্তু ভাবছেন বৃষ্টি, ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতন আকাশ থেকে ঝরছে, আমরা শুদ্ধস্নাত হচ্ছি। যদি এক জেলায় না পড়ল, বলবেন তাঁর খামখেয়াল, অন্য জেলায় বেশী প'ড়ে যদি ভেসে গেল, তবু ভাবছেন তাঁরই লীলা। আপনি বল্লেন, মানুষকে অপমান করছি আমরা, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কারা করছে বলুন ত! মানুষকে গাছ পালারও অধম ভাবছেন। তার বুদ্ধিকে, তার কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে, তার বাঁচবার চাহিদাকে, সমবেত চেষ্টায় যে-সভ্যতা গড়ে উঠেছে এতদিনে, এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এত রক্তপ্রবাহের ভেতর দিয়ে, সেই সভ্যতাকে, সব জিনিষকেই আপনার ঐ স্বতঃপ্রবৃত্ত জীবনশক্তি নাকোচ করছে না কি? ঐ বস্তুটির প্রতি আস্থায় একটা দাম্ভিকতা আছে, যাকে পণ্ডিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আখ্যা দেন, কিন্তু যার স্বরূপ হল একটি মাত্র শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখার ধোঁকা। সেটার জন্ম ইংলণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন তার বোলাবালাও, সেটা বাড়ল ফ্রান্সে যেখানে বারটা ঘরোয়ানা সমগ্র দেশের ওপর কায়েমী স্বত্ব দাখিল করছে। তার যৌবন দেখতে চান ত' জার্ম্মাণী, ইটালীতে যান, তারাও জীবনস্রোতের দোহাই দিচ্ছে। তাই ফেবীয়ান বার্ণাড শ' মুসোলিনিকে সমগ্র সভ্যতার শত্রু ভাবেন নি। দু'জনেই যে জীবনস্রোতে বিশ্বাসী! অনেক রাত হল না?'

খ—'আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, এইবার ওঠা যাক।'

সফীক খগেন বাবুকে ফ্ল্যাট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলে। ড্রয়িং রুমের আলো জ্বলছে, বিজন সোফার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, বুকে একটা বই। নিজের ঘরের আলো জ্বাললেন, বিছানা পাতা, ছোট টেবিলে এক গ্লাস জল, ঢাকা নেই। রমলার ঘরের দরজা একটু ঠেলতেই শব্দ হল···বন্ধ। ফিরে এসে

ড্রয়িং রুমের দরজায় খিল দিলেন। আলো নেভাবার পর নিজের ঘরে এসে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে পড়লেন।

পার্টির প্রয়োজন স্বীকার করা তাঁর পক্ষে শক্ত। আশ্রমবাস তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল। নীচ কলহ, প্রাথমিক উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতা, যৌক্তিকতার বলিদান, গুরুভক্তি, সঙ্কীর্ণতা, সর্ব্বোপরি, পরিবর্ত্তন বিমুখতা ও সমগ্র জাগতিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রাণপণ প্রয়াস তাঁকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করে ফেলছিল। পালিয়ে এসে তিনি বেঁচে গেছেন। তার পর রমলার সঙ্গে যোগ হল। দৈহিক সম্বন্ধে অশান্তির শেষ হবে আশা করেছিলেন। রমলার আশা ছিল ভিন্ন। সে চাইলে ফল, যার দেহ আছে, প্রাণ আছে, যাকে হাতে তোলা যায়, বুকে রাখা যায়, সাজান যায়, পুতুল খেলা যায়, যাকে কেন্দ্র করে সে স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তা হল না, অমনি গেল বিগড়ে। পারিবারিক জীবন দৈনিক যুদ্ধের ছোট ঘাঁটি, লোহা আর সিমেণ্টের পিল্‌বক্‌স্। হুড়মুড় করে তার চারধারের কাঁটাতারের বেড়াজাল না ভাঙ্গলে সেই ঘুন্টি থেকে নতুন বিপত্তির সৃষ্টি হবে, বিপদ বাড়বে, কারণ, গুলি চলবে পিছন থেকে। না, আর দল নয়। অন্ততঃ ও-ধরণের নয়।

তবে যদি সচেতন ব্যক্তির সঙ্ঘ হয় তবে পৃথক কথা। কারা সচেতন? যারা অভিব্যক্তির ধারাটি বুঝেছে। অভিব্যক্তি জীবজগৎ থেকে আরম্ভ, সমাজের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। প্রথম দিকটায় না হয় জীবনস্রোতের খেলা, তার পরে কিন্তু মানুষের নিজের প্রয়াসই বেশী। প্রয়াস মানে পরিশ্রম নয় কেবল, ভেবে-চিন্তে পরিশ্রম। চিন্তার বিষয়বস্তু থাকা চাই, নিরালম্ব চিন্তা মস্তিষ্কের চঞ্চলতা। বিষয় হল সামাজিক বিবর্ত্তনের রীতি আবিষ্কার। সেটা সম্ভব তখনই যখন বিবর্ত্তনের প্রতিজ্ঞা মানুষের করায়ত্ত। প্রতিজ্ঞাটা হল বিরোধ। কিন্তু কার সঙ্গে কার? ওরা বলছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। অত কাটা ছাঁটা বিভাগে প্রত্যয় আসে না। বিভাগ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট। অবশ্য, স্পষ্ট হলেই সত্য হবে, এবং অস্পষ্ট হলেই সেটা মিথ্যা, এ-ধরণের যুক্তি অচল। কবিতায় যে-ভাব প্রকাশিত হয় সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অথচ যে-কবিতা যত অস্পষ্ট ভাবকে গোচরে আনে সে-কবিতা তত ভাল, তার কবির তত বাহাদুরী। সচেতন পুরুষ এই হিসেবে আর্টিষ্ট। এবং বৈজ্ঞানিকও

জানবার পদ্ধতিতে। গ্রহ-উপগ্রহের প্রকৃতি অবিদিত ছিল সে দিন পর্য্যন্ত আজ তার ধাতু, তার ব্যবহার সবই প্রায় জানা গেছে। তা ছাড়া, চিন্তার উদ্দেশ্য আছে। আত্মোন্নতি···সেটার পরিমাণ নেই, প্রমাণ নেই, আত্মপ্রসন্নতা ছাড়া তাতে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে যে-চিন্তার উদ্দেশ্য সামাজিক বিবর্ত্তনকে সাহায্যদান তার সাধনাই মঙ্গল। একার কাজ নয় কিন্তু। সমগোত্রের সহানুভূতি চাই। চৈতন্য যতই উন্নত হোক না কেন, একজন, দু'জন, তিনজন পুরুষের চৈতন্য অসম্পূর্ণ। এইখানে পার্টির আবশ্যকতা।

তবু কোথায় যেন খিচ্ লাগে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সৎ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। সফীকের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় যে সে উপায়ের মর্য্যাদা দেয় না, তার কাছে উপায় উদ্দেশ্যের অধীন। এটা অ-যৌক্তিক। এইখানেই সন্দেহ হয় যে তার যুক্তি অবরোহী; সত্তাকে যে মূলাধার, সারাংশ ভাবে, তার ক্রমিক গতি, তার পরম্পরায়, তার প্রকাশে সে বিশ্বাসী নয়। অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য খুলবে উপায়ের সৌজন্যে। যে ব্যক্তি দুটোকে পৃথক রাখে সে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য। সফীকের মধ্যে একটা জবর-দস্তীর ভাব অছে, তার সঙ্গে মিশেছে সীনিসিজম্, হতাশ আদর্শবাদ। তার ঔচিত্যজ্ঞান অ-বৈজ্ঞানিক, কারণ সেটার যুক্তি-প্রণালী উদ্দেশ্য-রূপ প্রতিজ্ঞা থেকে কর্ম্মে আরোহণ করছে না। সে বলবে এইটাই বৈজ্ঞানিক, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর বাইরের সামাজিক সংস্থান, যেটা ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির সম্পর্করহিত, নৈরাত্ম্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মানুষে যখন বিচার করে তখন তার ভয়-ভাবনা আশা-ভরসা বিচারের সঙ্গে মিশে যায়। সেগুলি বাদ দেওয়া হোক্। কিন্তু বাদ দিলেই কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ হল! অবজেক্টিভিটির চর্চ্চাই বিজ্ঞানের সর্ব্বস্ব নয়, তা ছাড়াও যুক্তি-তর্কের অন্য বিশেষত্ব আছে। অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে না তুললে বিজ্ঞান নিরর্থক। অভিজ্ঞতা ছক্ কেটে চলছে সর্ব্বদা, অতএব উদ্দেশ্যও স'রে যাচ্ছে। তাই যদি হয় তবে অমন গোঁড়ামী সম্ভব কিসের জোরে? অভিজ্ঞতাই মূল। অবশ্য সচেতন অভিজ্ঞতা। আবার সেই 'চেতনা' ঘুরে ফিরে এসে গোলমাল বাধায়।

তার চেয়ে তাকে ধুয়ে মুছে তাকের ওপর তুলে রাখাই মঙ্গল, তার মাথায়

হাতুড়ি মেরে বিছানায় ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রাখাই ভাল, কবর দেওয়ার আগে যেমন বিলেতী রাজোয়াড়াদের রাখা হয়, মাথায় জ্বলুক মোম বাতি, পায়ের কাছে দাঁড়াক সুসজ্জিত প্রহরী ঘাড় নীচু করে, তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে, ভোর বেলায় আসবেন রাণী হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায় মুখ বাড়াতে, রাজার হাতে চোখের জল ফেলতে। খগেন বাবুর হাতটা ছ্যাঁক করে উঠল। 'তুমি ? কেন, কেন আবার এলে ? এত কষ্টই বা কিসের ? এই ত' রয়েছি।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

বর্দ্ধন যুগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

উত্তর ভারতের খণ্ডরাষ্ট্রগুলির মাৎস-ন্যায় ধ্বংস করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের অধীনে আবার একজাতীয়তা সংগঠিত হয়। 'বর্দ্ধন' গোষ্ঠি জাতিতে বৈশ্য (বাণভট্ট দ্রষ্টব্য) এবং থানেশ্বর তাহাদের পৈতৃক রাজত্ব। হুন ও গুর্জ্জরদের পরাজিত করিয়া প্রভাকর বর্দ্ধন নিজের ক্ষুদ্র রাজত্বকে শক্তিশালী করেন এবং তাহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৮ খৃঃ) উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পর সমগ্র ভারতে পুনঃ নিখিল-ভারতীয় একজাতীয়তা স্থাপন প্রচেষ্টায় তিনি পরাভূত হন। এই প্রচেষ্টাকল্পে দক্ষিণা-পথ আক্রমণকালে তথাকার চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী কর্ত্তৃক বিজিত হন।

এই ঘটনার পূর্ব্বে উত্তর ভারতেও হর্ষের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—ইনি হইতেছেন বাঙ্গলার শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত (১)। শশাঙ্ক শৈবধর্ম্মাবলম্বী এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। ইতিহাস ইহার অনেক অকীর্ত্তির মধ্যে বুদ্ধ-গয়ার বোধিদ্রুমকে কাটিয়া ফেলা ও মগধের বৌদ্ধদের উপর অগ্নি ও তরবারীর দ্বারা ভীষণ অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আজকালকার স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু বাঙ্গালী লেখকেরা শশাঙ্ককে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাহার অকীর্ত্তি ও নিষ্ঠুরতার নানা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শশাঙ্ক কর্ত্তৃক কেন হঠাৎ বৌদ্ধদের উপর এই ভীষণ অত্যাচার হইল তাহার কোন তথ্য কেহ আবিষ্কার করিতেছেন না।

১। Nagendranath Vasu—History of Kamrupa, Vol. III-এ উল্লিখিত হইয়াছে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্র গুপ্ত দুইজন পৃথক ব্যক্তি।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগ অল্পদিন স্থায়ী হইলেও আবার উত্তর-ভারতে সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগের কিঞ্চিৎ আভ্যন্তরীণ সংবাদ বৃহস্পতি-স্মৃতিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন (২)। এই সময়ে গিল্ডগুলির কার্য্যকরী সমিতি (Executive Council) একজন সভাপতি এবং দুই হইতে পাঁচজন কর্ম্মচারী লইয়া গঠিত হইত। ইহারা বেদজ্ঞ এবং অভিজাত বংশ হইতে নির্ব্বাচিত হইত (বৃহস্পতি ১৭,৯১)। এই সময়ে উপরের দুই শ্রেণীর কর্ম্ম পূর্ব্বের মত ছিল, কিন্তু বৈশ্যদের পেশায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কৃষি গো-রক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্"—এই কথা বৈশ্যদের প্রতি খাটেনা! এই সময়ে কৃষি ও পশুপালন শূদ্রের পেশা হইয়াছিল, বৈশ্যেরা কেবল ব্যবসায়জীবী ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন জীবনের শেষ ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হন; তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ রাজানুগ্রহ লাভ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'জীব-হিংসা অধর্ম্ম'—এই বৌদ্ধমত ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার ফলেই বৈশ্যদের ব্যবসায়ে এই পার্থক্য সম্পাদিত হয়। বৈশ্য হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ হওয়ায় কি বৈশ্যশ্রেণীর মধ্যে পেশার এই পার্থক্য সংঘটিত হয় অথবা বৌদ্ধ-ভাব বৈশ্যদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল? কিন্তু পাঞ্জাবে ও অন্যান্য স্থানে যেসব বৈশ্যেরা তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পেশায় উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটায় নাই, তাহারা শূদ্রশ্রেণীতে অবনমিত হইয়া যায়। এই সময়ের আর একটি বিশিষ্ট সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে, চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়েন-সাং (৩) তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—রাজপদ অনেক পুরুষ ধরিয়া ক্ষত্রিয়দের একচেটিয়া ছিল। বিদ্রোহ এবং রাজহত্যাও মধ্যে মধ্যে হইয়াছে, অন্য জাতি (শ্রেণী) এই পদ গ্রহণ করিয়াছে। ইনি পূর্ব্বে (কামরূপে) ব্রাহ্মণ রাজা ও পশ্চিমে সিন্ধুকূলে শূদ্র রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; এবং হর্ষবর্দ্ধন যে বৈশ্য ছিলেন তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমরা বৃহস্পতিতে এই

২। S. K. Das—Pp. 283—290.

৩। Hieun-Tsang's Travels in India, translated by Watters, Vol. I. P 170.

যুগের স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে নারদ অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে দেখি (৪)।

এই সকল সংবাদ হইতে আমরা ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, সমাজ এই যুগে একটা নূতন বিবর্ত্তনের ধাপে আসিয়াছে। প্রাচীন শাসক শ্রেণীসমূহ স্থানচ্যুত হইয়াছে; অধস্তন শ্রেণীসমূহ পেশার পরিবর্ত্তন দ্বারা পৃথক হইয়াছে; এখন বৈশ্য আর চাষা নয়, সে ব্যবসায়ী ধনীশ্রেণীতে গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতে শাসকবংশও উদ্ভূত হইয়াছে। এই অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের সময় যে-সকল বৈশ্য পুরাতন পেশা পরিবর্ত্তন করে নাই তাহারা শূদ্ররূপে নাবিয়া গেল (৫)। পক্ষান্তরে শূদ্ররাজবংশের সংবাদও আমরা এই সময়ে পাই। ইহার দ্বারা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি যে, এই যুগে ভারতে একটা ঘোর অর্থনীতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। গিল্ডগুলি অভিজাতবংশ দ্বারা অধিকৃত হইতে দেখা যায়; পূর্ব্বের প্রলেটারিয়েট দ্বারা একদল ব্যবসায়ীশ্রেণীতে উন্নীত হয়। এই বৈশ্যশ্রেণীই তৎকালীন বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। যে-সকল শূদ্র পূর্ব্বের পেশাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল তাহারা পতিত হইয়া রহিল। এই অর্থনীতিক বিপ্লবের ফলেই সামাজিক ওলট-পালট সংসাধন সম্ভব হইয়াছিল এবং এই বিপ্লবের ফলেই স্ত্রীলোকেরাও আরও অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই যুগের বিবর্ত্তনে আমরা একটা বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিব্যক্তি দেখি। এই যুগে আমরা সেই পুরাতন কৌমগুলির খবর আর পাই না। এখন ধনীবংশ ও ধনীশ্রেণী এবং তাহাদের শাসনের কথা শুনিতে পাই। গিল্ডগুলি এখন ধনীদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে; এই সব অভিজাতেরা নিশ্চয়ই সেই সকল প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজন্যবংশীয় ছিল না। সম্ভবতঃ ইহারা ধনী ব্যবসায়ী বংশীয় লোক (merchant princes) ছিল। বৈশ্য হর্ষের উত্থান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শশাঙ্কের বৌদ্ধ-দলন এবং আজীবন এই বৈশ্য রাজার প্রতিকূলাচরণের পশ্চাতে কি সামাজিক শক্তিসমূহ লীলা করিতেছিল, এই ব্যাপারের ভিতর কি শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

৪। Kane—P 209.

৫। Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, P 260.

মাৎস্য-ন্যায় যুগ

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায় ; উত্তর-ভারতে আবার মাৎস্য-ন্যায় লীলার পুনরাভিনয় আরম্ভ হয়। হর্ষের মৃত্যুর দুই শত বৎসর পর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পর্দ্দা পুনঃ উত্তোলিত হয়, এবং পূর্ব্বে পাল-রাজবংশ ও পশ্চিমে গুর্জ্জর প্রতিহারবংশীয় ভিলমলের রাজাদের ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট ধ্রুব এবং তৃতীয় গোবিন্দরাজের উত্থান অবলোকন করা যায়। নবাবিষ্কৃত মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে (৫ক) বাংলার এই সময়ের সংবাদ কিছু পাওয়া যায়। বাংলায় শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বিবিধ বিবর্ত্তনের পর একজন খঞ্জ শূদ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজা হন। ইনি কিন্তু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই ঘৃণা করিতেন। ইহার পর প্রজাবিদ্রোহ হয় এবং একটা সাধারণতন্ত্র (Republic) সংস্থাপিত হয়। অতঃপর মাৎস্য-ন্যায় বিরাজ করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ (public, দয়িতবিষ্ণুর বংশে ব্যপটের সন্তান গোপালকে রাজপদে বরণ করে। গোপাল শূদ্রবংশীয় ছিলেন। এই গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল একবারে কান্যকুব্জ জয় করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতের সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হন, কিন্তু তিনি গুজরাটের অন্তর্গত ভিনমলের গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজাদের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন। অবশেষে দক্ষিণের তৃতীয় গোবিন্দরাজ গুর্জ্জর-প্রতিহারদের পরাভূত করিয়া সমগ্র ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব কিছুদিনের জন্য দখল করেন।

এই সময় হইতে আমরা ভারতের ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন ভারতের আবির্ভাবের আভাষ পাই। সেই পুরাতন ক্ষত্রিয়কুলের আর সংবাদ নাই ; সেই বৈদিক যাগযজ্ঞের কথা নাই, রাজনীতিতে বৈশ্য প্রাধান্যের কথাও আর নাই, এখন শূদ্রের পুনরুত্থান দেখি! বাংলার পালবংশ যদি শূদ্র ছিল, ভিনমলের গুর্জ্জর-প্রতিহারেরা কি জাতীয় লোক ছিল? ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, ইহারা মধ্য-এশিয়ার একটি বর্ব্বর জাতি। তাঁহার যুক্তির ভিত্তি এই যে হুনদের সঙ্গে গুর্জ্জর-প্রতিহারদের নাম সংযুক্ত হইতে দেখা যায়। এইজন্য তিনি অনুমান করেন যে, ইহারাও হুনদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আসে। কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন নহে বলিয়াই মনে হয়, গুর্জ্জরদের বিদেশাগত বলিয়া কোন জনশ্রুতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহারা নিজেদের

---

৫ ক। আর্য্যমঞ্জুশ্রীকল্পে শশাঙ্কের নাম "সোম" বলিয়া উল্লেখ আছে।

"গো-চর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। এই 'গো-চর' হইতেই 'গুজার' (সংস্কৃত 'গুর্জ্জর' নামটি আসিয়াছে, প্রতিহারেরা এই গুজারদেরই একটি শাখা বিশেষ। রিসলীর নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধানানুসারে গুজারেরা অন্যান্য স্থানীয় ভারতবাসী হইতে শারীরিক লক্ষণ বিষয়ে এক ও অভিন্ন (৬)। বরং ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে আসলে ইহারা একটি ভারতীয় পশু-পালক যাযাবর জাতি (pastoral tribe) ছিল; ভারতের এই যুগের অর্থনীতিক সামাজিক বৈপ্লবিক কটাহ মধ্য হইতে এই নিম্নশ্রেণীর জাতিটি অস্ত্রবলে নিজেদের একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে, এবং কালে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বেশীর ভাগ স্বীয় শাসনাধীন করে। গুর্জ্জরেরা যাহা করিয়াছে এসিয়াতে সকল সময়েই তদ্রূপ বিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; ভারতে এই প্রকারে শূদ্রমারাঠারা সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং জাঠেরা উনবিংশ শতাব্দীতে অস্ত্রবলে শাসকপদে উন্নীত হইয়াছে। ইহার পর তাহাদের আভিজাত্য জনশ্রুতি, সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সৃষ্টি হইয়াছে!

এই নূতনযুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, বৌদ্ধ হর্ষের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিপক্ষে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, বেশীর ভাগ ভারতে শূদ্র-বংশীয় রাজ-শাসন স্থাপিত হইয়া তাহার পরিণতি হয়! বঙ্গ ও মগধে বৌদ্ধ পালবংশের ইতিহাস এই দুই দেশের ইতিহাস। কিন্তু পালদের সময়ের বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযানপন্থীয় (মতের) ছিল এবং উহা হইতে নিঃসৃত বহু সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মমতগুলি সবই পতিতদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং পতিত জাতিসমূহের লোকেরাই এইসকল সম্প্রদায়ের গুরু ছিল। বঙ্গে এই সময়ে পতিতেরা অন্ততঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে সাম্য ভোগ করিত।

একটি মত প্রচলিত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া একটা সাম্যবাদী সমাজ সংগঠন করিয়াছিল। উক্ত মতের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই; ভারতের আইন ও জনশ্রুতির দিক দিয়া তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি ইহা সত্য হইত তাহা হইলে বৌদ্ধ রাজশক্তির প্রাধান্য-কালে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আইন হইতে বৌদ্ধ আইনকে পৃথক হইতে দেখিতাম, জাতি ও শ্রেণীভেদকে রদ করিবার আইন ঘোষিত হইতে

৬। Risley—Peoples of India; এই বিষয়ে রিসলি স্মিথের সহিত একমত নন।

দেখিতাম। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদের সম্মান করিতে এবং পাল রাজাদের ব্রাহ্মণদের মন্ত্রীত্বপদ ও জমি প্রদান করিতে দেখি। পুনঃ পালদের উচ্চবর্ণের লোক বলিয়া দাবী করিতেও দেখি! শেষাশেষি বৌদ্ধপালগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং তথকথিত দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রকূট রাজাদের কন্যা বিবাহ করিতে দেখি। বাঙ্গলায় প্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মণেরা পালদের ব্যঙ্গ করিয়া বলিত—

"বলাইত সাম্যবাদী, বিবাহ করিত ছত্রিশ জাতি,
ভূমীপ হইলে হইতে চায় ক্ষাত্র, রাজন্য বলিয়া বলায় যত্রতত্র॥"
—(নুলা পঞ্চানন)

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে বিপ্লবী ছিল। অশোকের অধীনে একটা সাম্যবাদীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তারপর তাঁহাদের সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে আর দেখা যায় না। মহাযান শাখা প্রচলিত সংস্কার সমূহ স্বীয় শরীরগত করিয়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পদ্ধতির বিশিষ্ট বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যে-গোলামদের কৌটিল্য দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বৌদ্ধেরা সেই সকল গোলামদের নিজেদের সংঘ মধ্যে গ্রহণ করিত না, কারণ গোলামেরা অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (৭)।

বোধ হয় এই সময়ের বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মধ্যে একটা মেলামেশার চেষ্টা চলিতেছিল। এইজন্যই পারিপার্শ্বিক রীতিনীতিকে বৌদ্ধেরা অস্বীকার করিতে পারে নাই; এইজন্যই অর্থ হইলে তাহাদেরও 'চন্দ্রবংশীয়' বা 'সূর্য্য বংশীয়' হইতে উদ্ভূত হইবার ইচ্ছা ও আগ্রহ হইত। বোধ হয় নূতন ধনী বৌদ্ধরা বা শূদ্রেরা এই ইচ্ছা-প্রসূত মনস্তত্ত্বানুসারে খুঁড়াইয়া বড় হইবার চেষ্টা করিত। এইজন্যই যদি পালদের শেষে "সোম বংশীয়" ক্ষত্রিয় (৮) বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখি, গুর্জ্জর প্রতিহারদেরও সেইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে দেখি! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে প্রতিহার শাখাটি নব-ক্ষত্রিয় "রাজপুত"

৭। Dr. Narayan Chandra Bandyopadhyaya—Economic Life and Peoples in Ancient India, Vol. I, Pp 270—271.

৮। রমাপ্রসাদ চন্দ্র—গৌড় রাজমালা।

জাতি মধ্যে স্থান পাইল, আর গুর্জ্জরেরা শূদ্র "গুজার" হইয়া আজ পর্য্যন্ত নিম্নজাতির লোক হইয়া রহিয়াছে।

উত্তর ভারতের অবস্থা যখন এই প্রকার, দক্ষিণ ভারতেও সেই সময় বিভিন্ন বংশের রাজত্বের উত্থান ও পতন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র চোল (১০১২—১০৪২ খৃঃ) বিশেষ প্রতাপশালী হন ; এমন কি, বঙ্গ পর্য্যন্ত অভিযান করেন। এই সময়ে তামিলভাষীরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে ; কিন্তু এই বংশগুলির মধ্যে কোনটিই শূদ্র বংশীয় ছিল না,—শূদ্র এবং পতিতেরা তথায় চিরকাল পদদলিত হইয়াছে। দক্ষিণে চিরকালই উচ্চবর্ণের প্রাধান্য হইয়াছে বলিয়াই তথায় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য আজও পর্য্যন্ত সেখানে এত প্রবল !

আমরা এখন এমন এক যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন ভারতের একাংশ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরবদের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রথম আরবদের আক্রমণ হয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। যে আরব সৈন্য পারস্য বিজয় করে তাহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় অংশ যাহা আজকাল আফগানীস্থান নামে অভিহিত হয়, তথায় অভিযান করে। কিন্তু আরব সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্থানীয় রাজারা আবার বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিত। অবশেষে খলিফা হারুণ-উল-রসিদের সময় আরবেরা 'শকস্থান' (একদল 'শক' এইস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল) যাহা আজকাল 'সিস্তান' বলিয়া অভিহিত হয়, সেই স্থানটি অধিকার করতঃ আফগানীস্থানে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের জয় ও নূতনধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল। এই প্রকারে দেশ জয় ও মুসলমানকরণ চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত চলে ; কাবুলের বৌদ্ধ (তুর্কি 'সাহি' বংশ) ও হিন্দু (ব্রাহ্মণ 'সাহি' বংশ) রাজারা মুসলমান আক্রমণ চারশত বৎসর পর্য্যন্ত হটাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষে তুর্কি 'সবকতেগীন' হিন্দুর নিকট হইতে কাবুল জয় করে এবং তাহার পুত্র মামুদ পাঞ্জাব জয় করিয়া উহা স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রকারে এই অঞ্চলে মুসলমানকরণ চলে। ফার্শি ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে আফগানেরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমান হয়।

সিন্ধুপ্রদেশে আরবেরা অষ্টম শতাব্দীতেই হানা দিয়াছিল। ৭১২ খৃঃ

সিন্ধুদেশের (তৎকালে বর্ত্তমান বেলুচিস্থান সিন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল) রাজা দাহিরের সহিত আরবদের কলহ উপস্থিত হয় ; এবং শেষে মহম্মদ-বিন-কাসেম মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পারস্য হইতে আসিয়া মূলতান পর্য্যন্ত সিন্ধু জয় করে এবং উহা আরব সাম্রাজ্যভুক্ত করে। কাসেমের এই অভিযানে হিন্দু ব্রাহ্মণ, ঠাকুর (রাজপুত), বৌদ্ধ মোহান্ত, রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশীয়দের সহিত যোগদান করিয়াছিল (৯)। এমন কি 'নেরুন' (বর্ত্তমান 'হাইদারাবাদ') (৯ক) নামক দুর্গের বৌদ্ধশ্রমণ-নেতা পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণ পারস্যের আরব শাসন কর্ত্তা 'আল-হেজাজের সঙ্গে গোপন সন্ধিতে (চুক্তি) আবদ্ধ ছিল এবং আরবদের সেই কেল্লা প্রদান করে।

এই বিধর্ম্মী ও বৈদেশিক অভিযান যখন ভারতের পশ্চিম দ্বারে হানা দিতেছিল তখন ভারতের অভ্যন্তরে মৎস্য-ন্যায়ের এক আশ্চর্য্য লীলাভিনয় চলিতেছিল। বিভিন্ন রাজারা পরস্পর খেওখেয়ি করিতেছিল। ভারতের একজাতীয়তা পুনর্গঠনে কেহই দৃষ্টি দেয় নাই, কারণ একচ্ছত্র রাষ্ট্র কেহই সংস্থাপন করিতে পারে নাই।

এই সময়ে শ্রেণীসমূহ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে ; কারণ দশম শতাব্দীর পর হইতে অসবর্ণ বিবাহের কোন সাবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই সময়ের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মনোবৃত্তি দেখিয়া সমাজের অবস্থা বুঝা যায়। 'সংত্রিমিসাং-মাতা' নামক স্মৃতিতে (ইহা মিতাক্ষরা, হরদত্তের পুস্তকে গ্রাহ্য হইয়াছে) উল্লিখিত আছে যে "বৌদ্ধ, পাশুপত্য, জৈন্য, নাস্তিক এবং কপিলের শিষ্যদের গাত্র স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়" (১০)। কানে (Kane) অনুমান করেন যে, উক্ত স্মৃতিপুস্তক খৃষ্টীয় ৭০০—৯০০ শতকে লিখিত হয়। আবার "বিষ্ণু ধর্ম্ম সূত্র" গ্রন্থে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিহিত সাধুদের (বৌদ্ধ) ও কাপালিকদের দর্শন মঙ্গলজনক নহে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৬৩, ৩৬)। এই স্মৃতিতে ম্লেচ্ছ অন্ত্যজদের সহিত

৯। Chhach-Nama—Translated into English by Gidumal.

৯ক। Dr. R. C. Mazumder—The Arab Invasion of India, Pp 27-28 (vide Dacca University Supplement, Bulletin No. XV.

১০। Kane—P 239

বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে (৭১, ৫৯); এবং ম্লেচ্ছদেশে পর্য্যটনও নিষেধ করা হইয়াছে (৮২,২) ! ইনি বলেন, "চতুর্ব্বর্ণব্যবস্থানং যস্মিনদেশে ন বিদ্যতে। সম্লেচ্ছদেশাবিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্ত অতঃপরঃ" ॥ (৬, ৮৪, ৪)। আর্য্যাবর্ত্তের সংজ্ঞা তিনি এতই ছোট করিয়া দিয়াছেন ! পুনঃ অপরর্ক (বৃহৎ যাজ্ঞবল্ক্যে উদ্ধৃত) বলেন, "পারসীকের অঙ্গস্পর্শ চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ ও ভিলের স্পর্শতুল্য" (১১)। অথচ সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খস্রুর সহিত রাজদূত প্রেরণ কার্য্য বিনিময় করিয়াছিলেন (১১ক)। আর একখানা পুস্তক যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির উপর বিশ্বরূপের "বালক্রিড়া" নামক টীকায় "ম্লেচ্ছ" অর্থে 'পুলিন্দ' ও 'তাজিক' (আরবদের মধ্যএসিয়ায় মুসলমান আক্রমণের প্রথমে 'তাজিক' বলিত ; এক্ষণে সেই স্থানের ফার্সীভাষী কৃষকদের এই নামে অভিহিত করা হয়। মহম্মদঘোরীর ভারত-আক্রমণকারী সৈন্যদলে 'তাজিকেরা' ছিল) বলা হইয়াছে (১২)। আর একটি নিষেধাজ্ঞা দেখিয়া মুসলমান আক্রমণ যুগের মনোভাব বুঝা যায়। হরদত্ত (গৌতমসূত্রের টীকা ১৭, ৩৩) হিঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তৎপর পদ্মপুরাণেও তুরস্কদের সহিত বাক্যালাপ নিষেধ করা হইয়াছে।

এই সকল নিষেধাজ্ঞা দেখিয়া মনে হয়, বিদেশী মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষের সময় এইসব পুস্তক লিখিত হয় ; হিন্দুরাও তখন সংকীর্ণমনা হইয়া ক্রমশঃ কূর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হইতে সুরু করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'সৎত্রিমিশংমাতা' পুস্তকে নানা প্রকার পাপ ও স্পর্শদোষজনিত অপবিত্রতা হইতে পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে (১৩)। ইতিপূর্ব্বেই মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বৌদ্ধ প্রধান দেশ সমুহ ব্রাহ্মণবর্জ্জিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অত্রি বলিয়াছেন, মগধ, মথুরা অন্য তিন স্থানের ব্রাহ্মণেরা বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হইলেও

১১। Kane—P 188

১১ক। অজন্তাগুহায় আবিষ্কৃত Fresco Painting দ্বারা পারস্য রাজদূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার ব্যাপারটি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

১২। Dr. R. C. Mazumder—The Arab invasion of India, Dacca University Suppl. Bulletin, No. XV, P 27—28.

১৩। Kane—236,259.

শ্রাদ্ধতে সম্মানিত হন না (৪৫)। এক্ষণে বৌদ্ধদের সঙ্গে ম্লেচ্ছদের সংযোগ সংস্থাপন করা হইল! এমন করিয়া ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা নিজেদের বেষ্টন করিতে লাগিল। এই সময়ে জাতিভেদ, স্পর্শদোষ, বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যন্ত বাড়াইয়া তোলা হইল! এমতাবস্থায় পতিতদের ভাগ্যে অতীব দুর্দ্দশা ভিন্ন আর কি জুটিবে? ব্রাহ্মণ্যবাদী ছুঁৎমার্গীয় জাতিভেদের ভীষণ কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ সম্বলিত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই সুরু হয়।

নূতন সমাজ সংগঠন

যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে, যখন বৌদ্ধ-রাজারা বৈদিক দেবদেবী ও ক্রিয়াকাণ্ডে অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন পুরোহিতশ্রেণীর মাথায় বাজ পড়িল! ক্ষত্রিয়েরা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও সাম্যবাদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, পুরোহিতদের বনিয়াদী স্বার্থে আঘাত পড়ে; এই সময় শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ প্রবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা অবৈদিক ও অসংস্কৃত ভাষী লোকদের নিজেদের শিষ্য করিতে লাগিল। একদিকে বৌদ্ধরা যেমন ভারতীয় ও অভারতীয় স্ত্রীলোক ও বালক সকলকে নিজেদের সংঘে আকর্ষণ করিতে লাগিল, অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক সভ্যতার বাহিরের লোকদের মন্ত্র প্রদান করিতে লাগিল! স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, উভয় দলই দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া শিষ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা স্বীয়-স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়াই দক্ষিণের দ্রাবীড়-ভাষী জাতিদের মন্ত্রশিষ্য করিতে লাগিল। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণদের লাভ বেশী; একটা গ্রাম একজন ব্রাহ্মণের মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, সেই ব্রাহ্মণের কয়েক পুরুষের যজমানী করিয়া বসিয়া খাওয়া চলে। যদি উত্তরের আর্য্য-নামধারী শিষ্যেরা হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণের ও অন্যান্যস্থানের লোকেদের শিষ্য করিলে বিশিষ্ট সুবিধা হইবে—এই মনোভাব লইয়া তাহারা অনার্য্যভাষী ও আর্য্যসভ্যতার বহির্ভূত লোকদের "হিন্দু" করিতে

লাগিল (১৩ক)। ইহার ফলে, দক্ষিণ ভারত ধর্ম্মে আজ "হিন্দু" হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় উত্তরভারতীয় লোকদের উপনিবেশ কম হওয়ায় তথাকার ভাষা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, যদিচ তাহা সংস্কৃত শব্দবহুল হইয়াছে।

অন্যদিকে যে-সকল বিদেশী জাতি ভারতে প্রবেশ করে আমরা তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখি। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়—যে-সব বর্ব্বর-জাতি সভ্যজাতি সমূহের সংস্পর্শে আসে তাহারা নিজেদের সুবিধানুযায়ী একটা সভ্যতা ও তৎসংক্রান্ত ধর্ম্ম পছন্দ করিয়া নেয়। এই পছন্দ বিষয়ে কোন ধর্ম্মটা অভ্রান্ত সত্য অথবা কোনটা যুক্তিসম্মত—এই তর্ক উঠে না। বোধ হয়, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা উদার এবং আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন বুদ্ধের মতবাদ এইসব বৈদেশিকদের অধিক সুবিধা প্রদান করিয়াছিল; সেইজন্যই আমরা কনিষ্ককে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখি। কিন্তু কালে আবার এই বৈদেশিকজাতি-সম্ভূত কোন কোন রাজাকে পৌরাণিক দেবতার ভক্ত হইতে ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে দেখি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু ঠাকুরের ভক্ত হইলেও যে, তাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি যে গুজরাট অথবা পশ্চিমভারতের ক্ষত্রপবংশ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ ও 'সিংহ' উপাধি ধারণ করতঃ ব্রাহ্মণ রাজবংশে বিবাহ দিয়াও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় গুপ্তরাজাদের নিকট বিদেশী বলিয়া অভিহিত হয় এবং তজ্জন্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরা এইসব জাতিদের চরিত্র বিশেষভাবে অবগত ছিলেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছ, যবন, পহ্লব, পারদ, শক প্রভৃতি জাতিদের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবৃত্তি নিজেদের কাজে লাগাইতে আরম্ভ করে (১৪)। "গরজ বড় বালাই" জানিয়া ব্রাহ্মণেরা ভারতে পুনঃ পুনঃ যাহা করিয়াছে, অর্থাৎ অন্যান্য মূলজাতীয় লোকদের আর্য্যসভ্যতাপন্ন সমাজে গ্রহণ করিয়াছে,

---

১৩ক। ব্রাহ্মণদের উক্ত প্রচেষ্টা যুগে যুগে হইয়াছে; মুসলমান যুগে ইহা বন্ধ হয় নাই। বর্ত্তমানেও এই প্রচেষ্টা সতেজে চলিতেছে।

১৪। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন,—শক, গুজর প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলি হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ করেন এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিও আবার বৈদ্যের মতের বিরোধিতা করেন।

আর একবার এই সকল বিদেশী বংশ-সম্ভূত লোকদের জন্য সেই ব্যবস্থা করে। জনশ্রুতি অনুসারে, গুজর্রাটের আবু পাহাড়ের উপর ব্রাহ্মণেরা জৈনদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা সৃষ্টি করিবার জন্য এক যজ্ঞ করে। এই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড হইতে চারজন লোক উত্থিত হয়; তাহারা অগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া "অগ্নিকুল" (১৫) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই চারিজন জাতিতে বর্ণাশ্রমান্তর্গত ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে গণ্য হয় এবং রাজপুত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। পরে এই চারিজন লোক হইতে বহুসংখ্যক "অগ্নিকূল রাজপুত" কৌমের উদ্ভব হয়। এই সময় হইতে ভারতের চারিদিকে "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুত বলিয়া একটা জাতির নাম উল্লিখিত হইতে থাকে। বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার যুগে কোন সময়ে ব্রাহ্মণেরা জৈন ও বৌদ্ধ দলনের জন্য স্বদেশীয় লোকদের না পাইয়া এইসব ভারতীয় ভাবাপন্ন বিদেশী বংশোদ্ভব লোকদের হিন্দুত্ব প্রদান করে। এইজন্য তাহাদের শুদ্ধি করিয়া নিবার জন্য একটা বড় চমকপ্রদ নামধারী ঘটা (যজ্ঞ) করিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করিয়া "জাতে" উঠাইয়া নেয়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে পশ্চিম ভারতের যে-অংশে শক ক্ষত্রপেরা রাজত্ব করিত, সেইস্থানেই এই শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার অর্থ কি ক্ষত্রপ চস্তনের "সিংহ" উপাধিধারী বংশধরেরাই শুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং "অগ্নিকূল রাজপুত" নাম ধারণ করে? ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় (১৫ক)।

"রাজপুত" কথাটা সংস্কৃত "রাজপুত্র" শব্দের অপভ্রংশ; পূর্ব্বের "রাজন্য" শব্দের সহিত সম অর্থবাচক। এইযুগে দেখা যায় যে, "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুত জাতি উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতের সর্ব্বত্র গজাইয়া উঠিতেছে! উত্তর ভারতের মধ্যে বাঙ্গলা এবং দক্ষিণভারত এই বিষয়ে বাদ পড়ে (১৬)।

১৫। এই 'অগ্নিকূল' উৎপত্তির কাহিনীটি কেবল রাজপুতদের মধ্যে আবদ্ধ নয়; পশ্চিমের কায়স্থদের মধ্যেও 'অগ্নিকূল' কায়স্থ কৌমের নাম শুনা যায়। বাঙ্গালার কায়স্থদের যাহারা পশ্চিমাগত বলিয়া দাবী করে তাহাদের কান্যকুব্জ হইতে আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে 'অগ্নিকুলের নাম উল্লেখ দেখা যায়।

১৫ক। Dr. B. N. Datta—"The Rise of the Rajputs" in Journal of Bihar & Orissa Research Society; March, 1941.

১৬। "গৌড় লেখমালা" ও "গৌড় রাজমালা" গ্রন্থে "সিংহ" নামধারী সামন্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায়।

ইহার অর্থ কি এই যে, যে-সব স্থানে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নূতনভাবে ক্ষত্রিয় জাতির "সংগঠন" হইয়াছে তথায়ই "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুতের বাস দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার অর্থ কি কেবল কতকগুলি যোদ্ধৃবৃত্তি সম্পন্ন জাতি হইতেই এই রাজপুত জাতির সৃষ্টি করা হয়? অথবা যে-সব লোক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিল তাহারাই রাজপুত হইল?

বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতির বিপক্ষে নিজেদের স্বার্থের champion (রক্ষাকর্ত্তা) অনুসন্ধানকালে যাহাদের ব্রাহ্মণেরা নিজেদের দলে পাইয়াছিল, তাহাদিগকেই নব-ক্ষত্রিয়ত্ব পদ প্রদান করে এবং ইহাদের সকলেই "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুত নাম গ্রহণ করে (১৭)। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে এক সময়ে নূতন ক্ষত্রিয়শ্রেণী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা একটা ভারত-ব্যাপী আন্দোলন করা হইয়াছিল। এই ঘটনা নূতন নহে, পুরাণোক্ত রাজা বিশ্বস্ফার্ণিও একটা নূতন ক্ষত্রিয়শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। এইবারও একটা আন্দোলন হইয়াছিল যদ্বারা নানাশ্রেণীর লোকদ্বারা একটা নূতন জাতি সংগঠিত হয়, ইহাদের প্রাচীন "রাজন্য" নাম না দিয়া 'রাজপুত্র' বা 'রাজপুত' নাম প্রদত্ত হয়।* এই রাজপুত জাতি-সংঘ মধ্যে হয়ত অনেক লোক ছিল যাহারা পূর্ব্ব হইতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিত এবং বিদেশীয় বংশোদ্ভব এবং নিম্নতর শ্রেণীয় লোকও ছিল (১৮)। রিসলী প্রদত্ত রাজপুতজাতির শারীরিক মাপের বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মিশ্রিত উপাদান সমূহ বাহির হয়। রিসলী প্রদত্ত রাজপুতদের নাসিকার গঠন (nasal index), গুজার ও জাঠ হইতে নিকৃষ্ট,

---

১৭। শিখধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিখেরা সাধারণ "হিন্দু" নাম ধারণ করিত; কিন্তু গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদের যোদ্ধৃশ্রেণীতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে "সিংহ" উপাধি প্রদান করেন। এই "সিংহ" উপাধি—সিংহের ন্যায় তেজব্যঞ্জক এই অর্থে ব্যবহৃত। বোধ হয় উক্ত উপাধি রাজপুতদের অনুকরণে গৃহীত হয়।* উত্তর বঙ্গের কোচেরা হিন্দু হইয়া "রাজবংশী" নাম ধারণ করত এখন "ক্ষত্রিয়" নাম জাতিবাচক বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।

(১৮)। অধ্যাপক জয়চন্দ্র নারং তৎপ্রণীত "ইতিহাস প্রবেশ" নামক হিন্দী পুস্তকে রাজপুতদের প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ এখনও রাজপুত সৃষ্টি হইতেছে।

অর্থাৎ চণ্ডড়া এবং অস্পৃশ্য "মিনা" ও "চুড়া"র উপর (১৯)। আবার রাজপুত-দের আদিস্থল যুক্তপ্রদেশের ছত্রিদের যে মাপ রিসলী দিয়াছেন তাহারও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ লোক সাধারণ ভারতীয়ের ন্যায় লক্ষণযুক্ত (Dolichoid-mesorrhin) এবং তাহার পরের ভাগ আদিম অধিবাসীদের নাসিকার ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত (Dolichoid-chamoerrhin) এবং রিসলীর ইণ্ডো-আর্য্য ও ডেনিকারের 'ইণ্ডো-আফগান" (Dolicocephal-leptorrhine) নামক জাতির লক্ষণ রিসলী দ্বারা মাপ নেওয়া (somatological measurements) লোকদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল লক্ষণ দ্বারা এই বোধগম্য হয় যে এই নব-ক্ষত্রিয়ের দল নানা মূল উপাদানে (Racial elements) সৃষ্ট—ইহারা একটি মিশ্রিত জাতি! এখন হইতে আমরা "শ্রেণী"র পরিবর্ত্তে "জাতি" (caste) শব্দ ব্যবহার করিব; কারণ দশম শতাব্দীর পর হইতে অসবর্ণ বিবাহের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না (২০)। এখন আমাদের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উক্ত অনুষ্ঠান মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কি পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত অনুষ্ঠানটি দেশের যে-যুগে সংগঠিত হইয়াছিল সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস নাই। এই সময়কে ভারতের "অন্ধকার যুগ" (Dark age) বলিতে হইবে। হর্ষবর্দ্ধনের পরে ভারতে বৌদ্ধদের রাজনীতিক প্রাধান্য হয় নাই; পূর্ব্ব ভারতে (মগধ ও বঙ্গ) তাহার দুইশত বৎসর পরে বৌদ্ধ পালরাজাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিম্বা স্বভাবতঃ উদারতার জন্য, পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকল ধর্ম্মের লোকদের সহিত সমান ব্যবহার করিত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক এবং ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের রাষ্ট্রে উচ্চপদ পাইত। তত্রাচ এই "শুদ্ধি" আন্দোলন ব্রাহ্মণদের রাজপুত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা বাঙ্গলায় হয় নাই বলিয়াই প্রতীত হয়। বাঙ্গলায় যদি খাঁটি "ক্ষত্রিয়" জাতির অভাব ছিল তথাপি মনূক্ত "ব্রাত্য" ক্ষত্রিয়ের অভাব ছিল না! মনুর

১৯। Dr. B. N. Datta—"Das Indische Kasten System" in Anthropos" Bd. 22, 1927.

২০। Dr. R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India, Pp 372—374.

সেই বিখ্যাত শ্লোকে, "পৌণ্ড্রকা...খশাঃ" (১০,৪৩—৪৪) বাঙ্গলার পৌণ্ড্রদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত (জাতিচ্যুত বা ব্রাত্য) ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর বিহারের ভগ্নাবশেষ মধ্যে মৌর্য্যদের যে তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্বারা জয়সওয়াল বলেন যে, মৌর্য্যযুগের উত্তর বঙ্গীয় "সামবঙ্গীয়েরা" (২০ক) উত্তর-বিহারের ভজ্জিদের ন্যায় ব্রাহ্মণ বিরহিত ক্ষত্রিয় জাতি ছিল। ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার এইসব উপাদান বঙ্গে থাকিতেও সেইযুগে এই প্রদেশে কেন "রাজপুত" (২০খ) সৃষ্ট হইল না তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ঐতিহাসিক টড (Todd) বলেন ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট রাজপুতেরা তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা সাজিয়া বৌদ্ধদলন করে (২১)। বাঙ্গলা বৌদ্ধপ্রধান দেশ এবং বঙ্গ ও

---

২০ ক। Vide Bhandarkar—Epigraphica Indica, April, 1931, 88 ff. এই বিষয়ে আরও আলোচনা অধ্যাপক এইচ, সি, রায়চৌধুরীর History of Ancient India, ফুটনোট্‌ দ্রষ্টব্য, ২২৪ পৃঃ, Ed. 1938 ; K. P. Jayaswal in "Journal of Bihar and Orissa Research Society," 1936. ff. এবং Presidential speech at Indore Oriental Conference দ্রষ্টব্য।

২০খ। "সেখ শুভোদয়া" নামক আবিষ্কৃত সংস্কৃত গ্রন্থে বাঙ্গলায় "রাজপুত" নামক ক্ষত্রিয় জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে ইহা মোগল আধিপত্যের প্রারম্ভে লেখা হয়, এবং ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ নয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে লিখিত 'বল্লালচরিতে' ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্র জাতিদের উল্লেখ আছে।

২১। এই সামাজিক অনুষ্ঠান যাহার আংশিক সংবাদ পূর্ব্বোক্ত আবু পর্ব্বতের যজ্ঞ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না তাহা একটা বিরাট সংঘবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা সর্ব্বত্রই নব-ক্ষত্রিয়েরা একনাম গ্রহণ কি প্রকারে করে! প্রাচীন সংস্কৃত "ক্ষত্রিয়" শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ "ছত্রি" নাম ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকারী সকল প্রকার লোকই নিজের জাতিবাচক সংজ্ঞা বলিয়া ব্যবহার করে; কিন্তু সকল "ছত্রি"ই "রাজপুত" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মিথিলায় "ছত্রি" ও "রাজপুত" পৃথক জাতি (তথায় ছত্রি অপর জাতিটি হইতে উচ্চ ও বিশুদ্ধবর্ণের বলিয়া দাবী করে) বাঁকুড়া জেলার মল্লেরা নিজেদের "ছত্রি" বলে এবং উপবীত ধারণ করে; কিন্তু তথাকার ঔপনিবেশিক রাজপুত হইতে তাহারা বিভিন্ন! যাহারা দক্ষিণ ভারতে (রাজ, ভেল্লেলা জাতিরা) ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে তাহারা ক্ষত্রিয় হইলেও রাজপুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে না, এবং তাহাদের মধ্যে কুল-প্রথা (clan-ship) নাই! অন্ধ্রদেশের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীদাররা তেলেগু সমাজের একটা

মগধের রাজশক্তি বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে ছিল বলিয়া কি বৌদ্ধদলন জন্য পূর্ব্ব ভারতে "শুদ্ধি" বা "সংগঠন" দ্বারা "রাজপুত" সৃষ্টি করিবার সুযোগ ব্রাহ্মণেরা পায় নাই (২১ক)। এইজন্যই কি বাঙ্গলায়" নব-ক্ষত্রিয়" উদ্ভূত হয় নাই?— আর যাহা হইয়াছে তাহাও কি বৌদ্ধশাসনের অবসানের পর হয় নাই?

এই সময় হইতে ভারতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম আর একটি রূপ পরিগ্রহ করে। ব্রাহ্মণ ও তাহাদের নূতন champion দল মিলিত হইয়া একটি বনিয়াদীস্বার্থের দল গঠন করে। এই নব-ক্ষত্রিয়েরা সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের ন্যায় নিজেদের "প্রথম বর্ণ" বলিয়া দাবী করে নাই; নিজেরাই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী এবং নিজের ও উপাস্যের মধ্যে পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতা প্রয়োজন নাই বলিয়া কোন দাবী করে নাই। ইহারা বরং neophyte's zeal (নূতনধর্ম্মগ্রহণকারীর আগ্রহ) দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী হয়। প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষার ফল ইহারা পায় নাই; বরং সর্ব্বত্র নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিতেরা যেমন নব-ধর্ম্মের জনশ্রুতিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে তদ্রূপ ইহারাই করিয়াছিল।

বিশিষ্ট অঙ্গ; তাহারা নিজেদের "রাজু" নামে অভিহিত করে—তাহারা "রাজপুত" বলিয়া পরিচয় দেয় না। এতদ্বারা আমাদের এই অনুমান হয় যে ভারতের একটি বিশিষ্ট অংশে সুবিধানুযায়ী একটা অন্দোলন হইয়াছিল; উহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধবাদীয় দলকে ধ্বংশ করা। এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় একটি শ্রেণী সৃষ্ট হয় যাহা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া ব্রাহ্মণদের বনিয়াদী-স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য কৃতসংকল্প হয়। এই রাজপুতেরা সব ভূ-স্বামীর দলে পরিণত হয়, সকলেই কমবেশী জমি ভোগদখল করিত; এই-জন্যই ইহাদের অপর একটি নাম "ঠাকুর" (Lord)! এই ভূম্যধিকারীর দল ভারতে পুনঃ পুরাদস্তুর কুল-প্রথা ও উহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠান—যথা, বদলী-প্রথা বা বৈরী, (blood-feud), 'বৈরীদায়' (Wer-geld) ও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীযুক্ত বৈদ্য তাঁহার History of Mediaeval India, Vols. II & III গ্রন্থে "অগ্নিকুল রাজপুত" সৃষ্টির কথা অস্বীকার করেন। তিনি রাজপুত ও মারাঠাদের প্রাচীন বৈদিক ক্ষত্রিয়দের বংশোদ্ভব বলিতে চাহেন, কারণ উভয়দলের গোত্র ও প্রবর এক! কিন্তু ইহা অযৌক্তিক—এবিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

২১ ক। বিহারের রাজপুতেরা পশ্চিম হইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ভোজপুরীয়ারা হিন্দুযুগের পর বিহারে আসিয়াছে; এই বিষয়ে Hunter's Imperial Gazetteer দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কেবল "সূর্য্যবংশ" বা "চন্দ্রবংশ" হইতে নিজের বংশ-তালিকা আবিষ্কার করা।

এইস্থলে একটি কথা উঠিবে যে, যদি এইসব ক্ষত্রিয়দের অনেকে পুরাতন নিম্নশ্রেণী ও বিদেশীয় জাতীয় লোক হইতে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহারা কেন শ্রেণী-জ্ঞানে সম্বুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই? শ্রেণী-চেতনার অভাব কেন তাহাদের মধ্যে হয়? ইহার উত্তরে ইহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, গোলামের মনোবৃত্তি এবং পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি (petty-bourgeois mentality) বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ের অনুসন্ধানকালে বর্ত্তমানের এবম্বিধ অনুষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিতে হইবে। আজকাল যাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে চাহিতেছেন তাহাদের কেহই সাম্য চান না ; এমন কি, তথাকথিত অস্পৃশ্যেরও ইচ্ছা নাই যে সমাজে সকলে সমান হউক। কেবল সে সমাজের উপরের স্তরে উঠিয়া একটু বড় হইবে—ইহাই তাহার দাবী! যে "জলচল" নয় সে উপরের স্তরের লোকের সহিত "জলচল" হইতে যায়, কিন্তু নিম্নস্তরের লোকের হাতে জল পান করিতে স্বীকার পায় না (২১খ)। ইহার অর্থ সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমাজকে যে-পদ্ধতির মধ্যে রাখিয়াছে তাহারই ভিতর লোকে ঢুকিয়া একটা স্থান গ্রহণ করিতে চায়। বৌদ্ধ-বিপ্লব সমাজে কতটা সাম্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা এখনও তর্কের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। জনশ্রুতি, রীতি, আইন বিষয়ে বৌদ্ধেরা অন্য সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। হয়ত সাধারণতঃ বৌদ্ধেরা আজকালকার বিভিন্ন মন্ত্রের উপসকদের ন্যায় একই সমাজ মধ্যে বাস করিত ; হয়ত যাহারা জাতি-ত্যাগ করিয়াছিল তাহারা "জাত বষ্টুম"-র ন্যায় অথবা বর্ত্তমানের বাঙ্গলার 'ব্রাহ্ম'দের ন্যায় একটা ক্ষুদ্র পৃথক সমাজ গঠন করিয়াছিল। কিন্তু সকলেই আর্য্য জনশ্রুতি, আচার ও আইন গ্রহণ করিয়া এক জনসংঘ (people) গঠন করিয়াছিল। এইজন্যই বিদেশীয় মুসলমানেরা ভারতে আসিয়া সর্ব্বধর্ম্মের লোকদের "বুদপরস্ত" (মূর্ত্তি-উপাসক) ও "হিন্দু" এই সাধারণ আখ্যা প্রদান করে। অনুমান হয় বৌদ্ধেরা ভারতীয় মুসলমান-

২১খ। লেখক অনুসন্ধান করিয়া এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছেন।

দের ন্যায় একটা সম্পূর্ণ পৃথক সমাজ গঠন করে নাই বলিয়া বৌদ্ধদের হাত হইতে রাজশক্তি অপসৃত হইলে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের বা ব্রাত্যদের [পূর্ব্বোক্ত মনুশ্লোকে (১০, ৪৩—৪৪) দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, -চীন, কিরাত, দরদ, খস প্রভৃতিদেরও বৃষল বলা হইয়াছে] বৌদ্ধ হইয়া "জাত হারাইয়া বষ্টুম"-র ন্যায় সমাজের এক কোণে থাকিবার কোন ইচ্ছা ছিল না ; বরং ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধির সঙ্গে এই স্রোতে যোগদান করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের দ্বিতীয় স্তরের লোক হইয়া আভিজাত্য-সম্মান পাইবার লিপ্সা অত্যাধিক হইয়াছিল। আর ইহারা যখন নিজেদের "ঠাকুর" (ভূস্বামী) বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করে তখন ইহারা নিশ্চয়ই পতিতশ্রেণীয় ছিল না। কাজেই ইতিহাসের বাস্তবব্যাখ্যানুসারে, "ভূমীপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলিয়া বেড়ায় যত্রতত্র" বলিয়া যাহারা জমি দখল করিয়াছিল, সেই ভূমীপেরা "রাজপুত" নামধারী নব-ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হয় (২২)। 'পতি-বুর্জোয়া' (petty-bourgeois) মনস্তত্ত্বানুযায়ী লোকে উপরের স্তরের লোককে আদর্শ করে, গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীয় লোক ধনীর পদ ও মর্য্যাদাকে অভিলষিত বস্তু বলিয়া আদর্শ করে। পুরাণের কাহিনীতেই ইহার ব্যাখ্যা আছে যে ইহ জগতের রাজা স্বর্গের ইন্দ্রত্ব চাহিয়াছে, ইন্দ্র ব্রহ্মত্ব চাহিয়াছে। আর গোলামের মনস্তত্ত্বানুযায়ী গোলামেরা মনিবের আজ্ঞাবহ হয়, মনিবকে সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণ করে। তজ্জন্য এই নব-ক্ষত্রিয়েরা বৈদিক ক্ষত্রিয়দের পদ গ্রহণ করিবার জন্য এবং তাহাদের শরীরগত বংশধর বলিয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া সমাজে সম্মানিত হইবার জন্য ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আজ্ঞাধীন হয়।

কিন্তু এই ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রদান বিষয়ে class-character বিশেষভাবে লীলা করিয়াছে। গুর্জ্জরপ্রতিহার কৌমের মধ্যে প্রতিহারেরাই শাসকশ্রেণী ছিল বলিয়া তাহারা "পরিহার" রাজপুতরূপে বিবর্তিত হয় ; কিন্তু গুর্জ্জরেরা শূদ্র গুজার হইল, তদ্রূপ জাঠেরা এতদিন ধরিয়া শূদ্র ছিল, এবং কোন কোন

২২। মুসলমানযুগেও এই প্রকারে ভোগরা, গুর্খা, মণিপুরী, টিপ্‌রা প্রভৃতি নব-ক্ষত্রিয় হইয়াছে। মধ্যভারতের "গো-বংশীয়" ও নাগ-বংশীয়েরা"ও এই প্রকারে উদ্ভূত বলিয়া সন্দেহ হয়।

রাজপুত রাষ্ট্রসমূহ-মধ্যে ব্রাহ্মণবর্জ্জিত পতিত জাতির মধ্যে গণ্য হয় বলিয়া শ্রুত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে জাঠেরা যখন কয়েকটি রাষ্ট্র স্থাপন করে, তখন জাঠ জাতির একাংশ অন্ততঃ "ছত্রি" বলিয়া দাবী করিতেছে। অনেকে সন্দেহ করেন যে পশ্চিমের 'বৈশ রাজপুত' (Bais-Rajput) ও আহির-রাজপুত জাতিরা বৈশ্য ও শূদ্র আহির হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে ভারতের সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায় যে একটা জাতির শাসক-স্তরই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই জাতির সাধারণ লোকেরা শূদ্র অথবা পতিত হইয়া রহিয়াছে (কোচ, তিপ্রা, প্রভৃতি জাতির অভিজাত স্তর এই প্রকারে সাধারণ হইতে পৃথক হইয়াছে)। একটা জাতির (caste) সমাজে উত্থান ও পতনের মূলে থাকে উহার অর্থনীতিক অবস্থা, তজ্জন্য ধনীরাই উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়।

এই নূতন সমাজ-সংগঠনের সময় পুরোহিতশ্রেণীও ভূম্যধিকারীশ্রেণীর স্বার্থ এক হয়। বোধ হয় এই সময় হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে। বঙ্গ ও মগধের বাহিরের ভারতে বৌদ্ধ রাজশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় বৌদ্ধ ও শূদ্রেরা শোষিত ও পদদলিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল এবং যাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করিল না ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিল না তাহারা অস্পৃশ্য ও পতিতরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল।

ক্রমশ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

ধূলি ধূসর

আষাঢ়ের গুমট আকাশ ; গরমে সারাদিন ছটফট করেছে পারুল। সকালে এক পশলা বৃষ্টির পর বাতাস ঠাণ্ডা ছিল, এখন একেবারে অসহ্য। টিনের ঘর, ওপর থেকে আগুন ঝরে পড়ছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তার আশঙ্কা হচ্ছিলো—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে ; এর চাইতে মৃত্যু বোধ হয় সহজ। বার দুই বমি করবার চেষ্টা করলো সে, কোন ফল হল না। মাটিতে অনাবৃত গায়ে শুয়ে শুয়ে আগ্রহে বাতাসীর অপেক্ষা করতে লাগলো। রাস্তার কলে জল-প্রার্থীদের ভিড় জমছে আস্তে আস্তে। জলের অপর নাম জীবন, সকালে মাত্র দশটা পর্য্যন্ত বস্তির কলে জীবনের স্রোত থাকে ; তারপর জীবন মিলিয়ে যায় শূন্যে, মরণান্তিক প্রয়োজনেও আর জল মিলবে না ; পর্‌সিলেন টাবে বাথ্‌-সল্ট মেশানো শীতল জলে কত বরাঙ্গনার গৌর তনু মসৃণ আর চকচকে হয়ে উঠছে ঐ জলে!

ঘরে জল নেই এক ফোঁটা ; কিন্তু ছুঁড়ির দেখা নেই এখনও, শেষ পর্য্যন্ত যদি না এসে পৌঁছয়—মুস্কিল হবে। প্রেসে যাবার সময় কালীপদ বলে গিয়েছিলো, 'খুব জল খাবে, বুঝলে পারু, সারাদিন জল খাবে, আট থেকে দশ গ্লাস, জলে অনেক সার আছে।'

সার অনেক কিছুতে আছে, পারুল তা জানে, জলের বদলে বিশেষ কোন কিছু খাবার ইচ্ছে তার বহুদিন লোপ পেয়েছে। 'আর—বুঝলে—খুব সাবধানে থাকবে!' প্রায় তাকে স্পর্শ করেই বেচারা কালীপদ বলেছিলো। আশ্চর্য্য —পারুল ভেবেই পায়নি এই অপরিসর, আসবাব-বহুল ঘরের মধ্যে অসাবধানতার কিই বা সে করতে পারে! তবু যদি ছাদ থাকতো আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ দেখবার জন্যে হয়তো বা কোন ফাঁকে ছাদে যাওয়া সম্ভব ছিলো ; আর সে-ছাদ যদি খোলা থাকতো তাহলে হয়ত পা পিছ্‌লে (কে জানে) একেবারে রাস্তার খোয়ার ওপর গড়িয়ে পড়া অবশ্য এমন কিছু অসম্ভব ছিলো না। রাস্তার ও-পাশে চারতলা বাড়ীর প্যারাপেট-লাগানো ছাদে কোন কোন বিকেলে সে কয়েকটি মেয়েকে দেখে আর দেখে। পারুল দেখে আর

আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কত আর বয়েস ? তারই সমান হবে হয়তো। কি স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল তাদের ভাবভঙ্গি, এই ত একজন সেদিন ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ! একজন আবার ওদের মধ্যে মোটর গাড়ী চালায়, একা—ড্রাইভার থাকে না। কোথায় যায় ? গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে সেই নির্জন, কালো রাস্তা দিয়ে বুঝি বা গাড়ী চালায় মেয়েটি ! পারুল অবাক হয়ে যায়। বহুদিন আগে এক সন্ধ্যায় কালীপদর সঙ্গে ট্রামে চড়ে সে গড়ের মাঠে গিয়েছিলো বেড়াতে। কলকাতায় যে এত বেড়াবার জায়গা আছে কালীপদ কেন আগে সে-কথা বলেনি সে-জন্য পারুল তাকে তিরস্কার করেছিলো। সে যে রাত করে বাড়ী ফেরে তার কারণটা কি ? অফিসে অনেক লোকই ত চাকরী করে, কিন্তু কেউ ত এত গভীর রাত্রে বাড়ী আসে না ! সে নিশ্চয় তাকে লুকিয়ে মাঠে বেড়াতে আসে ! এখানে কত লোক আর কত আলো ! কালীপদকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলো প্রতি রবিবারে সে তাকে বেড়াতে নিয়ে আসবে, রবিবারে ত তার ছুটি। কিন্তু তারপর কোনদিনই তার বেড়াতে আসা ভাগ্যে ঘটেনি। রবিবারটা ছুটির দিন, পারুলের সঙ্গে অযথা সময় নষ্ট করবার তার ধৈর্য্য থাকে না। দুপুরটা টেনে ঘুম, তারপর বিকেলে 'আসছি' বলে সেই যে পিট্টান দেয় আর তার দেখা পাওয়া যায় না। পারুলও তাকে বিরক্ত করে নি কোনদিন, শান্ত মেয়ে সে।

পাঁচটা বোধ হয় বাজে, এখনও বাতাসীর দেখা নেই। রান্নার জল দূরে থাক, কালীপদ বাড়ী এসে খাবার জল চাইলেও সে দিতে পারবে না। পুরো দু'গ্লাস জল তার চাই; সারাদিন মেশিনে কাজ করে করে বিকেলের দিকে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, রাস্তায় এসে ক্লান্তি দূর করবার জন্যে সে একটা বিড়ি ধরায়; পায়ের নীচে ফুটপাথটা মনে হয় কাঁপছে, যদিও ফুটপাথ না তার শরীর সে বুঝতে পারে না কিছুতেই।

পারুলের অস্বস্তি বেড়েই চললো, উঠে বসবার সামর্থ্যও তার নেই, তবু যদি বাতাসীটা এসে পড়তো উনুনে আঁচ দেয়াটা অন্ততঃ হয়ে যেতো। রাঁধতে সে আজ পারচে না, অসম্ভব। কালীপদ নিজেই চারটি ফুটিয়ে নিতে পারবে এ-বেলা, নিতেই হবে, সে আজ তা বলে উঠে বসতে পারবে না। বাতাসীকেও অনুরোধ করা যায় না; এমন অনেক দিন গেছে যে দিন পারুলের অক্ষমতার

দরুণ সে আনন্দে তাদের রেঁধে দিয়েছে। কিন্তু কেন ওর ওপর এই অত্যাচার করা ? দয়া করে সে যে এখনও আসে—সৌভাগ্য বলতে হবে।

পারুল তার শীর্ণ হাত খানা বুকের ওপর রাখলে। করুণ, হতাশ দৃষ্টিতে তাকালে স্তনের দিকে ; শিথিল, কুঞ্চিত চামড়া মাত্র ! এই স্তন একদিন যৌবনে পরিপূর্ণতা এনেছিলো কে বলবে ? বাইশ বছর বয়সেই সে একেবারে ক্ষয় হয়ে গেছে, ঝরে গেছে ! চোখ থেকে উষ্ণ এক ফোঁটা জল কানের ওপর গড়িয়ে পড়লো ; আঁচলটা সে বুকের ওপর তুলে দিলে। জল থেকে শরীরে রক্ত হয় কোন ডাক্তার বলবে না।

বাতাসীর মা দুধের ব্যবসা করে, বয়েস এমন কিছু একটা সাজ্ঘাতিক নয় ; আর ব্যবসাটা সে বোঝেও ভালো। করপোরেশনের ছোকরা ইনস্পেক্টরকে বাগিয়ে বিনা লাইসেন্স-এ প্রায় পঁচিশটা গাই সে নির্ব্বিবাদে পালন করে। ইনস্পেক্টরকে রাত্রির দিকে দেখা যায় মাঝে মাঝে, তখন প্যাণ্ট কোটের পরিবর্ত্তে ধুতি আর পাঞ্জাবী, অফিস-ফাইলের পরিবর্তে হাতে থাকে একখানি সৌখিন ছড়ি। বাতাসী লুকিয়ে পারুলের জন্য দুধ নিয়ে এসেছে কতদিন, সে অবশ্য নিষেধ করেনি, কেননা তাতে কোন ফল হত না, বাতাসী-চরিত্র তার অজানা নয়। কিন্তু তার এই গোপন ভালবাসা গোপন থাকেনি, তার মা যদিও আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেয় না—দুধ নেয়া তার বন্ধ হয়। তা ছাড়া বাতাসীর সঙ্গেও মনোমালিন্য করতে সে চায় না। বাতাসীকে সে ঈর্ষা করে, যত্ন করে, শাসন করে, আগলে রাখে, আর বুঝি ভালবাসে। ভালবাসে নিজের দৃষ্টি দিয়ে নয়, কামুক পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে। বাতাসীকে সে স্পর্শ করে কোন দিন, অলক্ষ্যে তার উন্নত, দুর্বিনীত স্তনে হাত দেয়, সর্বাঙ্গে তার বিদ্যুৎ খেলে।

পারুলের দুশ্চিন্তা দূর হল ; যথাসময়েই দেখা গেল বাতাসীকে। ঘরে পা দিয়ে শায়িতা পারুলকে দেখে শঙ্কিত গলায় সে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হল দিদি ?' কণ্ঠে তার প্রকাশ পেলো অপরিসীম স্নেহ আর মমতা ; 'ডাকবো কাউকে ?'

'কাকে আর ডাকবি ?' হাঁফাতে হাঁফাতে পারুল উত্তর দেয়, এবার বোধ হয় ব্যথাটা থামবে, কল থেকে দু'বালতি জল ধরে নিয়ে আয় লক্ষ্মী।'

দু-হাতে দুটো বড় বালতি ঝুলিয়ে বাতাসী রাস্তার ধারে কলতলায় এসে দাঁড়ালো; কোলাহল আর প্রতিযোগিতার উষ্ণ ভাষায় জায়গাটি সরগরম। পারুল শুয়ে শুয়ে তাদের কলরব শুনতে পায়; কণ্ঠস্বর শুনে প্রত্যেককেই সে চিনতে পারে।

'মর! ছুঁড়ির ঢং দেখ্না!' পানওয়ালা বিভূতির বৌ-এর গলা—বাতাসীর উদ্দেশ্যে। বস্তির মেয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে সেই ছিল জৌলুষে আর পরিচ্ছদে শ্রেষ্ঠ; প্রায় সকলেরই নজর ছিলো তার প্রতি, কিন্তু বিভূতির প্রতি প্রেমের আধিক্যেই হোক আর পাশব দ্বন্দ্বের ভয়েই হোক সে ঠেকিয়ে রাখতো সবাইকে। তাদের জীবন-যাত্রায় যে বিশেষ কোন আইন কানুন নেই সেটা বিভূতির বৌ-কে কেউ অবশ্য বলে দেয়নি, কিন্তু এক টুকরো হাসি, বা এক লহমার চটুল কটাক্ষে যে লঙ্কা-কাণ্ড বাধতে পারে এটা সে ভালো করেই জানে! কোথা থেকে যে বাতাসী মেয়েটা একদিন কানের পাশ দিয়ে চুল টেনে, রঙ্গীন জামা গায়ে—আর বলতে গেলে নির্লজ্জের মত (বিভূতির বৌ-এর মতে) সাড়ীর আঁচল নামিয়ে কলতলায় বালতি ঝুলিয়ে এসে হাজির হল—সে-থেকেই বিভূতির বৌ গেল তলিয়ে, প্রত্যেকের অবজ্ঞাত অন্তরালে; এমন কি বাবরি-কাটা চুল ফাজিল সাইকেল-মিস্তিরিটা পর্য্যন্ত আর তার সঙ্গে ইয়ারকি দেয় না। কেউ আর তাকায় না তার দিকে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না একটি লোকও। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই—সে জানতো—চোখের ক্ষীণতম ইসারাতেই তার জন্যে অসাধ্য সাধন করতে পারতো। তারাই আজকাল বালতি অথবা সাবান গামছা নিয়ে বাতাসীকে পথ ছেড়ে দেয়; অম্লানবদনে দাঁড়িয়ে থাকে—যতক্ষণ না তার জল ভরা হয়; উন্মুখ হয়ে থাকে তাদের ব্যগ্র দৃষ্টি যাতে কেউ না তাকে বাধা দেয়, জলের অপেক্ষায় তাকে না অনাবশ্যক দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

বাতাসী বিভূতির বৌ-এর আক্রমণ ফিরিয়ে দেয় না; হাসে, আর হাসে, তার হাসিতে সোনা ঝরে পড়ে!

জল নিয়ে সে ফিরে আসে। দাওয়ায় উনুনে আঁচ দেয়। পারুল তখনও মাটিতে পড়ে পড়ে হাঁফায়। ধোঁয়ায় ভরে যায় সমস্ত ঘরটা, ক্ষীণ গলায় পারুল চীৎকার করে ওঠে হঠাৎ, নিঃশ্বাস তার বন্ধ হয়ে এলো বুঝি!

বাতাসী ছুটে আসে, ঘরে ঢুকেই সে বুঝতে পারে; কিন্তু উনুনটা নেবে কোথায়? আর কয়েক মিনিট ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ঢুকলে পারুলদি যে দম আটকে মরবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনুনটা সে রাস্তায় নিয়ে এলো। ভাঙ্গা পাখার বাতাসে ঘরের ধোঁয়া হালকা করে দেয়। পারুলের নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এলো।

চালের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে বাতাসীর কালীপদর ওপরে রাগ হয়, লোকটা কি অপদার্থ! কিন্তু পারুলকে সে বলে না কিছুই।

'জলটা শুধু চাপিয়ে দে,' পারুল বলে, 'ও এসে সব করবে।'

'তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক, আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে।' উনুনটা সে নিয়ে এলো দাওয়ায়; জল চাপিয়ে দিলে, তারপর এলো নকুলের দোকানে। রাস্তার উত্তর ধারে শ্রেণীবদ্ধ টিনের ঘরগুলির মধ্যে নকুলের দোকান। আসলে দোকানটা মসলার, কিন্তু আলু, পিঁয়াজ এবং আরও পঞ্চাশ রকমের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষও নকুল বিক্রি করে।

'আলু দাও চার পয়সার।' বাতাসী বক্র দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। কয়েকজন ক্রেতা উপস্থিত ছিলো, নকুল তাদের ক্ষিপ্র হাতে বিদায় করে।

'আলু কি হবে? আলুনি খাবার সাধ গেছে বুঝি?' নকুল নিঃশব্দে হাসে।

'আর এক সের চাল, তাড়াতাড়ি দাও।'

'তোর ত সব সময়েই তাড়া, আগের সাড়ে সাত আনা পয়সা দেবে কে?'

'কে আবার দেবে? আমিই দেবো।'

নকুল চাল আর আলু দেবার কোন আগ্রহই দেখায় না, বাতাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর হাসে! বয়েস বছর চল্লিশ। মসলার দোকান পাতবার আগে চুলের ফিতা আর কাঁটা ফিরি করেছে। দীর্ঘ দেহ তার ধনুকের মত বাঁকা। মেয়েদের কাছে জিনিষ বিক্রি করতে হত সেই কারণে সর্বদাই সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো, প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামাতো, কিন্তু আজ তার এমনি দুর্ভাগ্য—এক সপ্তাহ গালে ক্ষুর লাগায়নি।

'শোন বাতাসী।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললে, 'আমাকে বিয়ে করবি?'

এমন সোজা, সরল প্রশ্নের ঘায়ে বাতাসী একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

'তোকে আমি সুখে রাখবো,' নকুল আবার বলে, 'আমার কে আছে বল ? কার জন্য এই দোকান ? ওদের কাছে পড়ে আছিস কোন সুখে ? আর এই যে দু'বেলা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটছিস্—'

'তোমার তাতে কি ?' বাতাসী অবশেষে বলে।'

'আমার আর কি বল ?' অসহায় কণ্ঠে নকুল উত্তর দেয়, 'তোর জন্যেই বলছি!' আশ্চর্য্য! এমন একগুঁয়ে মেয়ে সে দেখেনি!

'আমাকে বিয়ে করতে তোর আপত্তিটা কি শুনি ?'

'কেন আমার কি আর বর জুটছে না ?' বাতাসীর মনের মত উত্তর একটিও হচ্ছে না।

'কোন গোয়ালার হাতে পড়বি—মারের চোটে ঘুণ ধরিয়ে দেবে।'

'দুধের ব্যবসা করলেই গোয়ালা হয় না। আমার মা একদিন ভদ্র ঘরের মেয়ে ছিলো তার খোঁজ রাখো ?'

'তা অনেকেই থাকে', নকুল এবার রাগ করে, 'কিন্তু কে তোর মা শুনি ? ঐ মাগীটা ?'

অন্য সময় হলে বাতাসী এ-অপমানের প্রতিশোধ নিত, কিন্তু এখন সে তার কাজের ক্ষতি করতে পারে না। নিজেকে সংযত করে সে উত্তর দিলে, 'গাল দিয়ে আমাকে বিয়ে করবার আশা কর নাকি ?'

খদ্দের এলো কয়েকজন; এই সুযোগে বাতাসী বললে, কৈ জিনিষগুলো দাও না! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো ?'

একটা ঠোঙ্গায় চাল আর আলু নকুল এক সঙ্গে এগিয়ে দিলে।

বাতাসী ফিরে এসে দেখে পারুল উঠে বসেছে। 'হাতে কি রে ?' সে জিজ্ঞেস করলে।

'চাল।' বাতাসী আর দাঁড়ালো না। এ নিয়ে বাদানুবাদ করবার ধৈর্য্য পারুলের নেই। আগে এরকম অনেক হয়েছে। পনেরো টাকা মাইনেয় কালীপদ সংসার চালাতে পারে না; তাও মাসের মধ্যে দশ দিন সে রাত জেগে প্রেসের মেসিন চালায় কয়েকটি টাকা উপরির জন্যে। ওরাও আজ পর্য্যন্ত কোন দিন এক সঙ্গে মাইনে দেয়নি। বহু কাকুতি মিনতির পর দু'টাকা, পাঁচ টাকা, সাত টাকা করে সে আদায় করেছে। কয়েক বার বিরক্ত হয়ে

কাজে ইস্তফা দেবে জানিয়েছে, তাতে প্রেস-ওয়ালাদের কি আর এসে যাবে? মাঝখান থেকে চাকরিটাও যাবে, বাকি টাকাটাও কোন দিন আদায় হবে না।

শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল বলে পারুল উঠে বসেছে। এতক্ষণ অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলো, এবারে রীতিমত চেঁচাতে আরম্ভ করলো। বাতাসীকে কাছে ডেকেও লাভ নেই, সে আর কি করবে?

কিন্তু কালীপদ অবশেষে এসে পড়লো। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই ত বুঝতে পারলে বিপদ আসন্ন। কাছে গিয়ে সে বললে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে পারু?'

'আর সহ্য করতে পারছি না।' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পারুল উত্তর দিলে।

কালীপদ আর দাঁড়ালো না, হাত মুখ ধোবার কথা সে বেমালুম ভুলে গেল। কর্পোরশনের ধাত্রী ডাকবার আর সময় নেই। তা ছাড়া ওদের সে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না, মনে মনে মনে রীতিমত অশ্রদ্ধা করে পর্য্যন্ত! কিছু না শিখে কেমন করে ওরা নির্বিবাদে চাকরি করছে—এটাই সে ভেবে পায় না। ধনুকধারীর সুস্থ, জোয়ান বৌ-টাকে ঘাড় মটকে সেদিন মেরে ফেললে ওদেরই একটা ছুঁড়ি।

রাস্তার উত্তর ধারে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা। সে-সব বাড়ীতে টেলিফোনের বেল বাজে, রেডিওতে হাওয়াই দ্বীপের গান শোনা যায়। বস্তিতে উনুনের ধোঁয়া হলে দারওয়ান এসে শাসিয়ে যায়, বলে: পুলিসে দেবে। পাঞ্জাবী পোষাক-পরা সৌখিন বাঙ্গালী মেয়েদের ফুসফুস অত সস্তা নয় যে কারবন-ডাইঅকসাইড্ গ্যাসে ঘুণ ধরিয়ে দেবে। দক্ষিণের বাতাস কলুষিত করবার অধিকার বস্তির বাসিন্দাদের নেই।

কালীপদ দুরু দুরু বক্ষে ডক্টর আর, এন, চৌধুরীর বাড়ীর গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো। গায়ে ছাপাখানার কালি-মাখা সার্ট। চাপকান-পরা দারওয়ানকে বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার সাহেব আছেন?'

'হায়, লেকিন মুলকাত নেই হোগা।'

'মুলকাত করতেই হবে', কালীপদ বললে, 'তুমি গিয়ে খবর দাও, জরুরি কেস আছে।'

দ্বার-রক্ষক বললে, 'গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, চোখ নেই দেখতে পাচ্ছো না?

কয়েকজন মেয়ে এসেছেন, ডাগ্‌দার সাব এখন খানাপিনা করছেন, দেখা হবে না ?

'খানাপিনা করলে চলবে কেমন করে ?' কালীপদর কণ্ঠ ধৈর্য্যহীন, বিরক্ত, 'রুগী মারা যাচ্ছে।'

'মরনে দেও।'

'তা দিতে পারি না,' কালীপদ বললে, 'ডাক্তার বাবুই বলেছিলেন খবর দিতে, 'তিনি যদি এখন রুগীর অবস্থা না জানতে পারেন তোমার চাকরি যাবে, তখন ছাতুর পয়সাও জুটবে না।'

দারওয়ান দাঁড়িয়ে বললে, 'ক্যা নাম ?'

'বল কালীপদ বাবু এসেছেন।'

দারওয়ান গেল ; কালীপদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো ; এখানে যদি না হয় ও কোথায় যাবে ? ডাক্তার যে দেখা না করেই তাকে ভাগিয়ে দেবেন এ বিষয়ে সে স্থির-নিশ্চিন্ত।

দারওয়ান ফিরে এসে তাকে একেবারে বসবার ঘরে নিয়ে এলো। বসতে তাকে বললে না অবশ্য ! মূল্যবান সোফাগুলোতে এই পোষাকে কি বসা যায় ? সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সে। ওজন নেবার যন্ত্রটায় একবার দেখলে হয় তার ওজন কত ! ছাপাখানায় ঢোকবার আগে শিয়ালদা ষ্টেশনে সে একবার দেখেছিলো, একমণ বত্রিশ সের, তার খর্ব দেহে এতখানি ওজন কখনও সে আশা করে নি। আর আজ ? এক মণ বার সের কি না সন্দেহ ! আধ মণ ইথারে মিলিয়ে গেছে !

সোনালী পর্দ্দার বাইরে খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা গেল। কালীপদ একেবারে আমূল চমকে উঠলো। ডাক্তার চৌধুরী ঢুকলেন ঘরে। কালীপদ তার দিকে তাকিয়ে ভাবলে ঃ এত অল্প বয়সে এত বড় ডাক্তার ! বিলেতে নাকি সাত বছর ছিলেন ভদ্রলোক, নামের সঙ্গে সাতটি ডিগ্রি। চৌধুরী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিই খবর পাঠিয়েছিলেন ? বসুন ! কোন কেসটা বলুন তো ?'

কালীচরণ অগত্যা বসলো। বললে, 'আজ্ঞে আমার স্ত্রী বড্ড অসুস্থ !'

'আমি কি আগে তাঁকে দেখেছিলাম ?' চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন.

আপনাকে বড্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছে, আপনি—আসুন, একটা সিগারেট খান।' চৌধুরী একটা দামী সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলে। কালীপদ লজ্জায় আর ভয়ে প্রায় মরে গেল। 'নিন একটা !'

কম্পিত হস্তে সে একটি সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে রাখলে, দেশলাই জ্বেলে চৌধুরী আগুন ধরিয়ে দিলেন।

কালীপদ কিছু বলবারই অবসর পেলে না, এক মিনিট পরে বুঝতে পারলে মুখ দিয়ে চিমনীর মত ধোঁয়া বার করছে। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠে বললে, 'না, আপনি কখনও যান নি আমার স্ত্রীকে দেখতে, এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা হবে বুঝতে পারি নি, এখন একেবারে ছটফট করছে, কোথায় যাব বুঝতে না পেরে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'চলুন যাচ্ছি।' চৌধুরী উঠে পড়লেন, 'আপনি আমার গাড়ীতে গিয়ে উঠুন, আমি জিনিবপত্র নিয়ে আসছি।'

'গাড়ির দরকার হবে না, সামনের বস্তির মধ্যেই—'

'দাঁড়ান তা হলে এক মিনিট, আপনার ওখানে গরম জল পাওয়া যাবে ত ?'

'যাবে।'

ক্ষিপ্র পায়ে চৌধুরী প্রস্থান করলেন। কালীপদ দাঁড়িয়ে রইলো বোকার মত ; আশ্চর্য্য ! আসল কথাটাই সে পাড়তে পারলো না ; টাকা আশা করেন নিশ্চয়ই, না হলে কি আর এক কথায় রাজী হন ! কিন্তু টাকা—

ডাক্তার এসে পড়লেন, পেছনে ব্যাগ এবং নানাপ্রকার যন্ত্রাদি নিয়ে একজন বেয়ারা। 'চলুন।'

'দেখুন একটা কথা'—কালীপদ ঘরের বাইরে এসে স্তিমিত গলায় বললে।

'ব্যথাটা কতক্ষণ ধরে বোধ করছেন বললেন ?' চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রায় বলতে গেলে সকাল থেকেই।'

'আসুন তাড়াতাড়ি !'

আগে কালীচরণ, পরে ডাক্তার চৌধুরী এবং তার পেছনে বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। পারুল তখন প্রায় গড়াচ্ছিলো ; বাতাসী বসেছিলো পাশে, নিরুপায়

ভাবে পাখা করছিলো, ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। চৌধুরী তাকালেন তার দিকে, তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ?'

এ-প্রশ্নে কালীপদ বিব্রত বোধ করলে। চৌধুরী পারুলের পাশে মাটিতে বসে পড়লেন, বললেন, 'একটু স্থির হোন, কোন ভয় নেই।'

পারুল চোখ খুলে তাকালো, সামনের বাড়ীর ডাক্তার বাবু, এক নিমেষে তার যন্ত্রণা যেন অর্দ্ধেক কমে গেল। কালীপদর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর তার পূর্ণ হয়ে গেল, না জানি তার জন্যে আজ কত টাকা বেরিয়ে যাবে।

ব্যাগ খুলে চৌধুরী ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অনেকগুলো ভয়াবহ যন্ত্র বার করে বললেন, 'শিগ্‌গির এ-কটা গরম জলে ফুটিয়ে আনুন, দেরি করবেন না, আর ইনি মাটিতে শুলে চলবে না, পরিষ্কার কিছু থাকে ত বিছিয়ে দিন'। বাতাসী যন্ত্রগুলো তুলে নিয়ে গেল। 'আরও গরম জল চাই, ঐ জানলাটা খুলে দিন,' বেয়ারাকে—'তোয়ালে আর কয়েকখানা চাদর নিয়ে আয়, জল্‌দি। আর সাবান ;' কালীপদকে—'এই নিন, লিখে দিচ্ছি, দুটো ওষুধ আর ইন্‌জেক্‌সনের সিরিঞ্জ আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আসুন, চাইলেই দেবে, যান তাড়াতাড়ি; একবার দেখে যান জিনিষগুলো ফুটছে কি না! পাত্র শুদ্ধ নিয়ে আসতে বলবেন।'

কালীপদ বাতাসীকে যথারীতি উপদেশ দিয়ে প্রায় ছুটে গেল ডাক্তারের বাড়ী। ওষুধ নিয়ে আসতে তার কয়েক মিনিট মাত্র লাগলো। বেয়ারা নিয়ে এলো তোয়ালে আর খান দুই চাদর। কালীপদর হাত থেকে সিরিঞ্জটা প্রায় কেড়ে নিয়ে পারুলের বাম বাহুতে একটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে দিলেন। বেয়ারাটা আর কোন কাজ নেই জেনে প্রস্থান করলো।

'যান হয়ে গেছে, যন্ত্রগুলো নিয়ে আসুন।'

কালীপদ বাইরে গেল; কয়েক মিনিট পরে গরম প্যানটা নিয়ে এসে দেখলো একখানা পরিষ্কার চাদরে পারুল শুয়ে আছে আর একখানা সাদা চাদরে তার আবক্ষ আবৃত। পরণের ময়লা সাড়ীখানা একপাশে স্তূপীকৃত। প্যানটা নামিয়ে রেখে কালীপদ কয়েক মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে ডাক্তার চৌধুরীর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আচ্ছা ! আর দরকার নেই আপনাদের, আপনারা বাইরে যান।'

* * * *

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার দরজা খুলে দিলেন, নিস্তেজ গলায় কালীপদর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'bad luck, আগে যদি টের পেতাম ওটাকে কেটে বার করে ফেলতাম, মরা ছেলের জন্য প্রসূতিকেও প্রায় শেষ করে এনেছে।'

ভয়ে আর শঙ্কায় কালীপদ ঘরের ভেতর তাকাতে পারলে না, 'কি বললেন ?' সে জিজ্ঞাসা করলে।

'না, আশা করি তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই, ভেতরে যান না !'

কালীপদ স্খলিত পায়ে পারুলের কাছে এলো ; নিমীলিত চোখ, বক্ষের অতি ক্ষীণ উত্থান পতন, পাতলা, সুন্দর ঠোঁটে জীবনের কোন চিহ্ন নেই, মুখ রক্তহীন। পাশে অনেকগুলো রক্তাক্ত কাপড় আর ন্যাকড়ার স্তূপ। গামলার জল রক্তে লাল। কালীচরণের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। কিন্তু পায়ের কাছে তোয়ালে-ঢাকা রক্তের ছোপ-লাগা বস্তুটি পুনরায় ফিরিয়ে আনলো তার লুপ্ত চৈতন্য, মাথার মধ্যে প্রবাহিত হল রক্তের তীব্র স্রোত। নিচু হয়ে আস্তে আস্তে সে আবরণ খানিকটা সরিয়ে দেখলো, তার শরীরের মধ্যে কোথায় যেন একটা তীক্ষ্ণ আঘাত লাগলো। ভালো করে দেখলে অবশ্য চেনা যায়—মনুষ্য-শিশু। রক্তের কোন পিচ্ছিল পথ বেয়ে গভীর অন্ধকার গুহা থেকে সরীসৃপের মত নেমে এসেছে। কালীপদ শিউরে উঠে আবৃত করে দিলে। পারুল শুয়ে আছে, সর্বাঙ্গে তার নিষ্ঠুর নিস্পৃহতা ! সে যেন আজ অনেক দূরে, কালীপদর কদর্য্য সংসারের একেবারে নাগালের বাইরে।

হঠাৎ তার কানে এলো ডাক্তারের কণ্ঠস্বর, 'জ্ঞান ফিরে এলে এক পেয়ালা গরম দুধ দিতে পারো, কোন কারণেই যেন নড়া-নড়ি না করে। যদি সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে জ্ঞান ফিরে না আসে—আমাকে নিশ্চয়ই খবর দিও।'

বাতাসী জিজ্ঞেস করলে, 'তখন আপনাকে পাওয়া যাবে ত ?

'হ্যাঁ, তা যাবে বৈকি ? আচ্ছা !' ডাক্তার চৌধুরী নিষ্ক্রান্ত হলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁর বেয়ারা এসে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে গেল।

ঘরটা পরিস্কার করে বাতাসী কালীপদকে বললে, 'যান, এগুলো ফেলে দিয়ে আসুন দূরে কোথাও, আমি আছি পারুলদির কাছে।'

কালীপদ চলে গেল।

আবার নূতন করে রান্নার ব্যবস্থা করবার ধৈর্য্য বাতাসীর নেই। উনুনটা নিবিয়ে দিয়ে সে পারুলের কাছে এসে বসলো, দরজার কাছে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বলছে। ছেলে পারুলদির কি দরকার? সে যে বেঁচেছে কোন রকমে—এর জন্যই বাতাসীর মনে আনন্দের সীমা নেই। তার নিজের কোন বোন নেই, পারুল তার বোন, তার মা। সে পারুলের পায়ে হাত রেখে চমকে উঠলো, একেবারে ঠাণ্ডা! হাত দুখানি তুলে নিলে নিজের হাতে, উষ্ণতার চিহ্ন নেই। নাকে হাত দিয়ে দেখলে নিঃশ্বাস অতি ক্ষীণ। বাতাসী ব্যস্ত হয়ে পড়লো, ভয় পেলো। ছুটে গিয়ে কি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসবে? আটটা কি বেজেছে? নিজের মনকে সে প্রবোধ দিলে—বিপদও কেটে গেছে, এবারে পারুলদি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে। উনুনে কাগজ জ্বালিয়ে সে জল গরম করে বোতলে ভরে নিয়ে এলো, অতি সন্তর্পণে পারুলের পায়ে আর হাতে সেঁক দিতে লাগলো। আবার স্পর্শ করে পরীক্ষা করলে সে, প্রাণের তাপ বুঝি ফিরে এসেছে।

কালীপদ ফিরে এলো, 'কেমন আছে?' প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে

'ভালো'। আপনি ততক্ষণ বসে বসে গরম জলের সেঁক দিন, আমি বাড়ী যাচ্ছি, একবার এসে গরম দুধ দিয়ে যাবো, আপনার জন্যে আজ আর রান্নার ব্যবস্থা করতে পারলাম না।'

'ও—আমার খিদে পায়নি, তুমি যাও না।'

'ও কি! অমন হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন কেন? জামাটা ছাড়ুন, মুখ ধুয়ে আসুন। দুধ আমি কিছু বেশী করে নিয়ে আসবো, আদ্ধেকটা আপনিও খেতে পারবেন।'

কালীপদ মুখ ধুয়ে এসে পারুলের পায়ের কাছে বসলো গরম জলের বোতল নিয়ে। বাতাসী চলে গেল! রাস্তায় পা দিতেই নকুলের দোকানের পেছনের ঘরগুলির মধ্যে একটা চাপা কোলাহল শোনা গেল, বস্তির নিত্য

ব্যাপার, বাতাসী নকুলের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে রাস্তার অপর পার দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। দোকানের পাশে সরু কাঁচা রাস্তার মুখে উত্তেজিত লোক ঠেলাঠেলি আরম্ভ করেছে! পেছনের মাটির ঘরে থাকে পানওয়ালা বিভূতি আর তার বৌ। কিন্তু ব্যাপার কি? বাতাসীর কছে নিত্যনৈমিত্তিক, সাধারণ ঘটনা বলে বোধ হল না।

দোকানে বসে বসেই নকুল হাঁক দিলে, 'এই'!'

ওর দৃষ্টি সে এড়াতে পারেনি, এই হাটের মধ্যে তাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে এখুনি হয়তো নাম ধরে ডাকবে! বাতাসী রাস্তা অতিক্রম করে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, নকুলকে কোন প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই সে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে ওখানে?'

'বিভূতি আর বিভূতির বৌ-কে ছুরি মেরেছে?' নকুল বললে।

'কে?' বাতাসী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

'শোন, আরও অনেক রহস্য আছে।' নকুল বাতাসীকে একেবারে অবাক করে দেয়, 'মেয়েটি নাকি বিভূতির বৌ নয়; দিউলটি না কুলটি কোন জায়গা থেকে মেয়েটিকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। পানের দোকান করবার জন্য মেয়েটিই ওকে টাকা দেয়; ওর স্বামী এতদিন পরে খোঁজ পেয়ে দু'জনকেই খুন করে তার প্রতিশোধ নেয়।'

'খুন মানে? মরে গেছে নাকি?' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাতাসী জিজ্ঞেস করে।

'না, মেরে ফেলবার জন্যেই লোকটা ট্রেণে করে এতদূরে এসেছিলো বটে, কিন্তু পারে নি; ওকে দেখেই মেয়েটা ভীষণ চীৎকার করে উঠেছিলো—তাই রক্ষে! বিভূতির গলায় ছুরি মেরেছে, বেচারা জল খেতে চাইলে; জল গিলতে গিয়ে গলার কাটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রায় সবটাই। ওদের নিয়ে গেছে হাসপাতালে; লোকটাকে পুলিসে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।' নকুল চুপ করলো, বাতাসীকে ঘটনাটার এই ভয়াবহ বিবরণটা দেওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে পড়েছিলো; কারণ বস্তির জীবনে তার ঘৃণার উদ্রেক করা। 'শোন্ বাতাসী, চল—আমরা চলে যাই এখান থেকে, একটা ঘর নিয়ে থাকবো, আমি আর তুই, তোকে বিয়ে করবো আমি।'

'হবে, সব পরে হবে,' হঠাৎ বাতাসী উত্তর দিলে, 'চললাম, অনেক কাজ

আমার, এখন বক বক করবার সময় নেই। গলির বাঁকে বাতাসীর দেহ মিলিয়ে গেল।

'কি হবে?' নকুল বাতাসীর উদ্দেশ্যে অন্ধকারে ছুড়ে মারলো। কিন্তু কোথায় বাতাসী?

এ-পাশের গলিটা অন্ধকার, নির্জ্জন; আরও ঘন বসতি। তাদের বাড়ীর দেয়াল ঘেঁসে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছ, গাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড কালো মোটারখানা আজও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, চট্ করে হঠাৎ চোখে পড়ে না। অবসর-প্রাপ্ত কোন এক জজ সাহেবের গাড়ি। তার মার কাছে আসেন ভদ্রলোক, প্রায় প্রত্যহই আসেন। কোন্ দিন থেকে গাড়িখানা সে যে তেঁতুল গাছের আড়ালে দেখে আসছে—সেটা তার মনে নেই। কদাচিত তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, মাথার প্রত্যেকটি চুল সাদা, গলায় জড়ি-পাড় সাদা চাদর, ফিনফিনে কাপড়ের পাঞ্জাবী, পালিস-করা জুতো। সবই নিখুঁত।

আজও গাড়িখানা লক্ষ্য করে সে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ অন্ধকারে কে একজন তার হাত চেপে ধরলো, আর একটু হলেই সে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো, দেখলো—একটি স্ত্রীলোক।

'শোন্ রে! কথা আছে তোর সঙ্গে!' বাতাসীর মা।

বাতাসী একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। 'কি?' সে প্রশ্ন করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করলো হাতটা ছাড়িয়ে নেবার।

'শোন্, জজ সায়েব তোকে ডাকছেন, গাড়ীর মধ্যেই বসে আছেন, গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে দিলে অন্ধকারে কাক পক্ষী টের পাবে না। চল, জীবনে তোর কোন অভাব থাকবে না।'

'হাত ছাড়!' বাতাসী শুধু বললে।

ওর মায়ের মুষ্টি আরও দৃঢ় হল।

'শিগ্গির হাত ছাড়।' বাতাসী হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতে ফল হল না দেখে ও একটা ঝটকা মারলে; বাতাসীর মা ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লো, কিন্তু আবার ছুটে এলো তাকে ধরতে, বাতাসী হাতের মুঠো পাকিয়ে ওর গলার কাছে প্রচণ্ড আঘাত করলে,

সেই আঘাতে টলতে টলতে ও দুম করে গিয়ে পড়লো গাড়ীর ওপর। বাতাসীর ইচ্ছে হল চুলের গোছা ধরে মোটরের সঙ্গে মাথা ঠুকে দেয়, জজ সায়েব বসে বসে দেখুক! কিন্তু ওতেই যথেষ্ট হয়েছে, খানিকক্ষণ পরেই হিষ্টিরিয়ার ফিট্ দেখা দেবে।

বাতাসী ঘরে এলো, সৌভাগ্য বলতে হবে, গরম দুধও এক বাটি যোগাড় হয়ে গেল। আঁচল ঢাকা দিয়ে ও যখন দুধ নিয়ে এলো তখন ঘরের মধ্যে কালীপদ নেই। পাশের ঘরের যে বিধবা বৌটি মুড়ি বেচে—সে-ই বসে আছে পারুলের পাশে; দরজার পাশে হ্যারিকেনের ভাঙ্গা চিমনীটা প্রায় কালো হয়ে এসেছে।

'কালীবাবু কোথায় গেলেন?' বাতাসী দুধের বাটিটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলে।

'কি জানি বাবু!' বৌটি উত্তর দিলে, 'ডাক্তার নিয়ে আসছি বলে সেই যে চলে গেলেন আর দেখা নেই; তুমি ত রইলে, আমি চল্লাম—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কিসের যে দেরি হচ্ছে বাতাসী জানে; ফর্সা কাপড় পরে মুখে খড়ি মেখে ও গিয়ে পায়চারি করবে রাস্তার মোড়ে। মাসে তিন টাকা ঘর ভাড়া খেলার কথা নয়।

শায়িতা নিঃশব্দ পারুলের দিকে তাকিয়ে তার সন্দেহ হল; এখন প্রায় ন'টা বাজে! লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এসে বাতাসী পারুলের মুখের ওপর তুলে দেখে চোখ তেমনি বন্ধ! নিঃশ্বাস ফেলবার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। নাকের কাছে হাত রেখে সে পরীক্ষা করলে।

বাতাসী বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালো, দরজাটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে সে চৌধুরীর গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো। দারওয়ান বোধ হয় রুটি পাকাতে গেছে, গেট খোলার শব্দ হতে বেয়ারাটা উপস্থিত হল, স্বল্পালোকে সে বাতাসীকে চিনতে পারে নি; জিজ্ঞেস করলে, 'কাকে চাই?'

'ডাক্তার বাবু কি আছেন?' মৃদু কণ্ঠে বাতাসী জিজ্ঞেস করলে, 'যদি থাকে ত একটু খবর দাও, বল রুগী মারা যাচ্ছে!'

রুগী মারা যাচ্ছে—অথচ এ সময়ে ডাক্তার নেই; মুনিব হলে কি হবে?

ও বললে ; 'আর রুগী ! উনি নাচে গেছেন, কখন আসেন কিচ্ছু ঠিক নেই।'

'নাচে ?' বাতাসী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

'হ্যাঁ নাচে, রুগী মারা যাবার পরেই তিনি ফিরবেন, কোন ভাবনা নেই।'

বাতাসী অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে গেটের বাইরে এসে পড়লো। এখনও পাঞ্জাবী চায়ের দোকানের পাশে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে পাওয়া যেতে পারে!

বাতাসী ছুটলো।

'একবার আসবেন ?' বাতাসী তখনও হাঁফাচ্ছিলো।

ডাক্তার কি একখানা বই পড়ছিলেন, বাতাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দু'টাকা লাগবে।'

'দেবো !' বাদানুবাদ করবার সময় বাতাসীর নেই।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে ডাক্তার বাতাসীর অনুসরণ করলে।

'এই যে! এ-ধারে আসুন।' বাতাসী ডাক্তারকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল ; লণ্ঠনটা তুলে ধরে বললে, 'দেখুন! তাড়াতাড়ি!'

ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে হাতখানা তুলে নিলে নিজের হাতে ; বাতাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'বয়েস কত ?

'বাইশ তেইশ হবে!'

'গায়ে জামা আছে ?'

'না।'

ডাক্তার ষ্টেথেস্কোপ কানে লাগিয়ে পারুলের বুকের চাদরটা সম্পূর্ণ সরিয়ে দিলে, পরমুহূর্তেই চাদরখানা গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে বললে, 'অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে!'

বাতাসী নিঃশব্দে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে একবার পারুলের দিকে আর একবার ডাক্তারের দিকে তাকালে, প্রশ্নহীন, কৌতূহলহীন, উত্তেজনাহীন সে দৃষ্টি।

ডাক্তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে হাত পাতলে। বাতাসী সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলে।

'আমার ভিজিট ?'

'কি করেছেন আপনি ?' অতি শান্ত গলায় বাতাসী জিজ্ঞেস করলে।

প্রশ্ন শুনে ডাক্তার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ডাক্তারের পয়সা দেয় না—বস্তির লোকগুলোও সাংঘাতিক !

'আমি কিন্তু জোর করে আদায় করবো,' অবশেষে নিরুপায় কণ্ঠে ডাক্তার বললে।

'চেষ্টা করে দেখুন না !' বাতাসী বললে।

চলে যেতে যেতে ডাক্তার পেছনে ছুঁড়ে মারলে, 'জোচ্চোর, ছোটলোক !'

ডাক্তার চলে যাবার পর বাতাসী কয়েক মিনিট দাড়িয়ে রইলো চুপ করে; তারপর হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এলো। ছুটে সে রাস্তায় এলো; অন্ধকার পথ, সামনের কোন একটা বাড়ীতে বিদেশী অর্কেষ্ট্রা বাজছে।

রাস্তা অতিক্রম করে সে ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালো; ঠিক সেই সময়ে একখানা প্রকাণ্ড মোটর এসে থামলো। বাতাসী সরে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। ড্রাইভার এবং আর একটি স্যুট-পরা লোক ডাক্তার চৌধুরীকে ধরাধরি করে নামালো, উগ্র মদের গন্ধে বাতাসীর নিঃশ্বাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। গাড়ী থেকে নামলো একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে, সমস্ত পিঠ এবং বুকের অর্দ্ধেকটা খোলা নীল গাউন পরণে। ডাক্তার চৌধুরী একেবারে সংজ্ঞাহীন, তাঁর কপালে একটি চুমো দিয়ে মেয়েটি বললে, 'Oh ! dear, dear !'

বাড়ীর মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল।

বাতাসী পালিয়ে এলো সেখান থেকে।

রজত সেন

সাহিত্যের দিগ্‌নির্দেশ

এ কথা বোধ হয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে নূতন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ ব'লে যা অভিহিত কালে কালে তা' উল্লেখযোগ্য সব দেশের সাহিত্যে দেখা গিয়েছে। এই বিরোধেই তো জেগেছে প্রচুর বাদবিতর্ক, বিরোধ দ্বারাই জন্ম হয়েছে নূতন আন্দোলনের—সে আন্দোলনেরই ধারা বেয়ে সাহিত্য নূতন পথ ক'রে চলেছে। বাইরের অবস্থা-বিবর্তনের প্রভাবে এই যে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের দ্বন্দ্ব একেই কেউ কেউ মার্কসীয় ডায়েলেকটিক অনুসারে বিচার ক'রে থাকেন : সে বিচারে সৃষ্টিছাড়া, উদ্ভট কিছু নেই। সে বিচারকে না মানলেও বিরোধকে না মেনে উপায় নেই।

নূতন পথ কাটবার দুঃসাহসিকতার মূল্য একদা রবীন্দ্রনাথকেও দিতে হয়েছিল। তারপর বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র তেরো-চৌদ্দ বৎসর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা বনাম অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে নূতন-পুরাতনের বিরোধ আবার প্রবল হ'য়ে উঠল। বিরোধের ভেতর দিয়ে যে সামঞ্জস্য লাভ, মার্কসীয় ভাষায় তাকে সিন্‌থেসিস বলা হ'য়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে এই অতি আধুনিকের সমন্বয় যে ক'রে হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথই যে তার ধারক ও বাহক হয়েছিলেন, এ সত্যও এখন সুবিদিত। তবে সে সমন্বয় এখনও সাহিত্য রচনায় পূর্ণ রূপ লাভ করেনি।

এমনি সময়ে আবার যে বিরোধের আভাষ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল তা'ও যুগধর্মই বটে। প্রগতি সাহিত্যের দাবীতে এর আগে অতি আধুনিকতা তীব্র হয়েছিল, আজ তা গণাধিকারের রূপ ধ'রে এল। গণশ্রেণীর বিকাশমান চেতনা সাহিত্যে কতটা রূপ পেল, আজকের প্রশ্ন তাই। সেই মানদণ্ডেই আজ সাহিত্যের বিচার হচ্ছে।

কিন্তু বিচার যারা করছেন, তাঁরাও যে সত্যিকার গণজীবনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে অনেকটা সার্থক হয়েছেন, এমন মোটেও নয়। যে সাহিত্য তাঁদের দ্বারা রচিত হচ্ছে, তাও বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত জীবনেরই প্রতিরূপ। সে জীবনে জেগে উঠেছে ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক পথহীনতায় আজ সে জীবন বিক্ষুব্ধ। আপন

শ্রেণীর ব্যর্থতা দিয়ে মধ্যবিত্ত সাহিত্যিক জনজীবনের হাহাকার উপলব্ধি করতে চাইছেন ঃ উপযোগী ছন্দ ও ভাষায় তা' রূপলাভ করেছে। অবশ্য তার নামে অনেক অসাহিত্যও দেখা দিয়েছে, কিন্তু যে চিন্তাধারার আওতায় তার জন্ম তা' সত্য। কিন্তু সে চিন্তাধারা নেতিমূলক, তা' একটা শূন্যতার প্রকাশ—একটা অবসানের, অভাবের সূচক। অর্থনৈতিক অবস্থাচক্রে পায়ের তলার মাটি সরে যাবার দরুণ সব বিষয়ে আস্থাহীনতার যে "সিনিসিজম" মধ্যবিত্তশ্রেণীকে আচ্ছন্ন করেছে আধুনিক সাহিত্যে তারই প্রকাশ। এবং তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে শ্রেণীগণ্ডী হ'তে মুক্ত কোনো কোনো সাহিত্যিক গণশ্রেণীর গানে হাত বাড়াতে পেরেছেন। কিন্তু তা'তেই গণজীবনের সাহিত্য সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনের অনুভূতি মাত্র সৃষ্ট হয়েছে।

এই প্রয়োজন যে পৃথিবীর ইতিহাসের গতি থেকেই উদ্ভূত, তা'ও বোঝা কঠিন নয়। জগৎ জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় জেগেছে তা'তে ব্যক্তিও আর আপনাতে আশ্রয় পাচ্চে না, তার ভাগ্যকে সে সমষ্টির সঙ্গে উত্তরোত্তর অধিক জড়িত দেখছে। ফলে সাহিত্যিককে সমষ্টিজীবনের আবেষ্টন ক্রমেই অধিক স্বীকার ক'রে নিতে হচ্চে, সমষ্টির সমস্যা সাহিত্যিকের পরিপ্রেক্ষিতে নিবিড় হয়েছে। ইতিহাসের গতিপথে আজ যে জনসাধারণ রাষ্ট্র ও সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেদের স্থান দাবী করছে তাদেরই প্রয়োজনে আজ সাহিত্য গণাভিমুখী। জীবনের জয়যাত্রার সীমান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

> সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
> তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশেকালে
> সে অন্তরময়
> অন্তরে মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
> পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
> বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
> চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
> তাঁতি বসে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে-শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে' কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।

এই স্বীকৃতি তাঁর, এই নির্দেশও তাঁর। এ নির্দেশ কবুল করি ব'লেই কি বলা চলে যে আমরা বলেছি যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ চোখে ডায়েলেক্‌টিকসের ঠুলি এঁটে সাহিত্যের ঘানি টানেন না, সেই হেতু তাঁর সাহিত্য সেই তেল যোগাতে পারছে না, যার অভাবে আজকের দিনে মানুষের ঘরে নাকি আলো আর জ্বলবে না। (১)

(১) দেশ, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৮—কেরাণী রবীন্দ্রনাথ—অমল হোম।

ব্যক্তিজীবনের রবীন্দ্রনাথে পরম আশ্রয়, দেশের জীবনকে তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত জীবনাহ্বানে চঞ্চল করেছে, সার্থক করবে—জগতের জীবনে মানুষের আত্মসমাহিত পূর্ণতার পানে রবীন্দ্রনাথের ইসারাঃ আপনি রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সম্পদ। যে কবির বাণী লাগি তিনি কাণ পেতে আছেন সে কবে আসবে জানিনেঃ কিন্তু তার আসার জন্যে পথ ঘাট সাফও তো আমরা করতে পারি।

সে আসার প্রয়োজন আছে, গণপ্রাণের ব্যথা বেদনাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার প্রয়োজন রয়েছে। কৃষকের জীবনের যে ছবি ইদানীং কাব্যে ও কথাসাহিত্যে ফুটেছে, শ্রমিক-জীবনেরও যে আভাষ ফুটে উঠেছে তাতে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, জাতির আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণতার দিকে যেতে পেরেছে। তাতেই জীবনের অপূর্ণতা ঘুচে গেলো না, তবু পূর্ণতর আত্ম-পরিচয়ে জাতি সম্মুখের নিশানা পেতে পারবে। রাষ্ট্র ও সমাজ যে ক্রমেই গণাভিমুখী হচ্চে এ স্বীকার করবার সম্ভাবনাও সেখানে জাগবে এবং তাইতে সাহিত্যের গতি নির্ধারণে গণাধিকার স্বীকৃত হবে। ফিউডাল বা বুর্জোয়া সমাজ থেকেও সাহিত্য অফুরন্ত রস আহরণ করেছে, তা' জানিঃ জানি যে এই কবিতা বেদনা-মাধুরীতে অনুপম যদিও এর অন্তরালে সামন্তযুগীয় মধ্যরাত্রির বেণুবন-মর্মরধ্বনিঃ

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হ'য়ে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকী আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রা সহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবী মঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে ;
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেবো তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

কিন্তু সমাজের ক'জন এ কবিতার নাগাল পেয়েছে? দেশের জনসংখ্যার কত অংশ রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের জীবনে লাভ করেছে, তাঁর তিরোধানের মুহূর্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে? পারেনি যে তার

কারণ শুধু পরাধীনতা নয়, সেই রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থা অশিক্ষা দ্বারা যা' জনগণের অধিকাংশকে সাহিত্যের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত করেছে—সেই অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে যা' শিক্ষিতদেরও রসানুভূতি বিকাশের অবসর রাখে নি। কে এমন বল্‌বে যে এর প্রতীকারের প্রয়োজন নেই, নেই প্রয়োজন সে সাম্যবাদী সমাজ-প্রতিষ্ঠার যাতে সকলের জীবন-স্ফুরণের সমান সুযোগ হয়?

তার জন্যে কাজ করা চাই, শুধু সাহিত্য রচনায় হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন, "মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টল্‌তো তাহ'লে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে।' সাহিত্য মানুষের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে অর্থনৈতিক বিপ্লবের স্বয়ংক্রিয় নিয়মে বিশ্বাসী মার্কসীয় দর্শন এ কথা স্বীকার করে না : কিন্তু অর্থনৈতিক বিপ্লবের চেতনা জনগণের ভিতরে জাগিয়ে দেবার যে কাজ বিপ্লবীর সাহিত্যে তা' জীবনের সর্বতোমুখী প্রকাশে সত্য হ'তে পারে এবং জনগণের মানসভূমি বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত করতে পারে। বিপ্লবে সাহিত্যের কাজ এ ভাবেই সার্থক হ'য়েছে এ বারবার দেখা গিয়েছে; ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের আগেও দেখা গিয়েছিল। অবশ্য সাহিত্য তার নিজের ধারারই অনুসরণ ক'রে চলেছে, রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে সে চলে নি।

স্বদেশের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন যখন সাহিত্যে আপন দাবী পেশ কর্‌ছে, রুশ বিপ্লব ও তার অনুপ্রাণনায় জগৎ জুড়ে জনশক্তি যখন সংহত হ'বার প্রয়াস পাচ্চে, তখনই বাংলা সাহিত্যে নূতন যুগের আলোড়ন জাগ্‌ল। কিন্তু কেবল মধ্যবিত্ত জীবনের শূন্যতায় এ আলোড়ন সার্থক হবে না :

জীবনে জীবনে যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা

এখানেই আমরা আধুনিক সাহিত্যের অসম্পূর্ণতার কারণ পেতে পারি। সে যে যা ছিল তাতে আর চল্‌ছে না এর বেশী কিছু বল্‌তে পারছে না তার কারণ এই যে যা হবার সময় হ'য়েছে তার সংগে তার জীবনের যোগ নেই।

সে সেতুরচনা করুচে মাত্র, কিন্তু তা' পেরিয়ে গণজীবনে উত্তীর্ণ হ'তে পারুচে না। এতদিন স্বশ্রেণীর পরিবেশে সাহিত্যিকের সৃষ্টিকার্য্য চল্‌তে পেরেচে : কিন্তু কেবল উপর থেকে বা বাইরে থেকে সহানুভূতি গণজীবনের সাহিত্য-রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজের ভেতর দিয়ে আজ গণজীবনের সংগে একাঙ্গ হ'তে হবে, সাহিত্যিকের নির্লিপ্ত বিচার আজ অবান্তর। তা' হ'লেই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সে আত্মবিশ্বাস আস্‌বে পেতি বুর্জোয়া শ্রেণীতে যার অভাব তারও পরিপ্রেক্ষিত আচ্ছন্ন ক'রে আছে। এ অভাবের দরুণই তার ভাবনা অনেক সময় হাহুতাশে পর্যবসিত হয়, নয়তো কল্পনাসম্বল সেই আশাবাদীতায় আশ্রয় লাভ করে যার সংগে বাস্তবানুগ কোনো পথনির্দ্দেশ নেই। সাহিত্যরচনায় যাথার্থ্য আস্‌তে পারে তবেই যদি সাহিত্যিক চলন্ত জীবনের সাথে নিজের এগিয়ে যাওয়া এবং সে জীবনকে এগিয়ে নেওয়া অনুভব করতে পারে। যার সঙ্গে নিজের প্রকৃত সংযোগ সে অনুভব করে না, সাহিত্যে তার প্রকাশও যথার্থ হয় না। ঘনায়মান বিপ্লবের সংগে সাহিত্যিকের সংযোগের গতিপ্রকৃতি আপ্‌না থেকেই নিরূপিত হবে, কিন্তু সে সংযোগ নইলে চল্‌বে না। রুশ বিপ্লবের ক্রমপরিণতির পথে সাহিত্যের ক্রমাগ্রগতি আমরা দেখেছি : টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কি, গোর্কি এবং আরো অনেকের সংগে সংযোগে সে পথ জনচিত্তে প্রসার লাভ করেছিল। স্বদেশীযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ আমরা প্রত্যক্ষ করেচি। আজ সাহিত্যের গণাভিমুখিতার দিনে গণবিপ্লবে নিজের জীবন মেশাতে না পারলে সার্থক সাহিত্যরচনার আশা নেই। ইউরোপের অনেক সাহিত্যিক নিজেদের প্রাণ দিয়ে একথা ব'লে গেছেন : রাল্‌ফ ফক্স, আর্ণষ্ট টোলারের আত্মাহুতি তো আমরা চোখের সামনেই দেখ্‌লাম। মর্ম্মন্তুদ আত্মকাহিনীর উপক্রমণিকাতে টোলার লিখে গেছেন Beneath the yoke of barbarism one must not keep silence ; one must fight. Whoever is silent at such a time is a traitor to humanity.

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের যে সংঘাত আজ জগৎ জুড়ে ভয়াবহ হয়েছে সাহিত্যিক তাতে উদাসীন থাকৃতে পারে না ব'লেই তার মূলে যে গণশ্রেণীর

অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত তা' তাকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কালকের পৃথিবী আজ নেই; নূতন পৃথিবীর সাথে তাল রেখে চল্‌তে হবে ব'লেই তার যা সমস্যা তা' থেকে তাকে পেছোলে চল্‌বে না। আমাদের দেশে আজ সাম্প্রদায়িক আগুনে বহু শতাব্দীর বন্ধন ছারখার হ'য়ে যেতে চাইছে: সাহিত্যিককে এ অবস্থারও সম্মুখীন হ'তে হবে—সোজা রাস্তা তার নেই, পাশ কাটিয়ে যাবার যো নেই। নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিতে যে সমাধান মেলে না জনপ্রাণের সংগে গভীর পরিচয়ের দ্বারা তার নির্দ্দেশ দেওয়াও হয়তো সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব নয়। দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে মানুষের যা কিছু অন্তরের প্রয়োজন তার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে অপূর্ণতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সাহিত্যিক সাহায্য করতে পারে। জীবনের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে অসম্পূর্ণ রাজনীতিতে সাহিত্যিকের হস্তনিক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় নয় এবং শতধা বিচ্ছিন্ন বর্তমান ভারতে সে প্রয়োজন অতীব বাস্তব। আজকের বিপর্যয়ে যে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক ইঙ্গিত তারি পূর্ণতার পানে সাহিত্যিককে তাদের সংগে একাত্ম হ'তে হবে যারা

"চিরকাল—
টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল"।

বসুধা চক্রবর্ত্তী।

ইন্‌সমনিয়া

নিরেট আঁধার ফুঁড়ে ফুঁড়ে চোখ খোঁজে ঘুম—ঘুমলোপ ;
ঘুমহারা চোখ জোর ক'রে বুজে রই ;—
বন্ধ চোখের সাম্‌নে চল্‌ছে হাজরো বায়োস্কোপ
আর কিছু নয়, কিল্‌বিল্‌ করা বই—

ভেংচি কাট্‌ছে মুখেরা বেবাক্‌—চেনা অচেনায় মিলে,
নেংটি ইঁদুরে সাপেরা করছে তাড়া ;
নাকের ডগায় সাঁই ক'রে প'ড়ে ছোঁ দিয়ে যায় চিলে ;
চেঁচিয়ে খেঁকীটা মাথায় ক'রছে পাড়া।

বোলিং করছি লেগ্‌ব্রেক আর ইনসুইংগার খাঁটি ;
কার্ত্তিক বোস পেলে না সিলেকশান্‌।
বিনু মানকড় অমরনাথের মার না ত'—যেন চাঁটি,
হিন্দুরা পিটে তুলেছে পাঁচ শ' রান্‌।

ত্যুত্তোরি ছাই ! আসে না যে ঘুম—আচ্ছা এবার দেখি—
পাশ ফিরে শুই, বালিশ জড়িয়ে নিয়ে ;
ভর্‌ রাতে—মর্‌ !—কার্ণিশ বেয়ে ঝগড়া করছে নেকী
পাশের বাড়ীর হুলোর সঙ্গে গিয়ে।

ক্ষেপে—জল ঢেলে—বেড়াল তাড়িয়ে, ভাবলাম গেল ন্যাটা
পাশের ঘরেতে খুট্‌ খুট্‌ করে কী যে !
ইঁদুর, না চোর ! এই রামা ! যেন কুম্ভকর্ণ ব্যাটা—
আলো জ্বেলে শেষে উঠ্‌তেই হোলো নিজে !

দুটো গেল বেজে—এইবার আর ঘুম না হ'লেই নয় ;
চেপে চুপে শুই ;—টপ্‌—টপ্‌—টপ্‌—টপ্‌ !!!!
ট্যাঙ্কের কল রামা ব্যাটা খুলে রেখেছেই নিশ্চয়—
ব্যাটা দেই তোকে ঘা কতক শপাশপ।

কলটা পেঁচিয়ে বন্ধ করেছি—চারদিক নিঝ্‌ঝুম,
উশ্‌খুশ্‌ করি আশপাশ পাল্‌টাই ;
মশারিটা গুঁজে—সাবধানে, শুয়ে বুঝি বা এসেছে ঘুম,—
ভোরে ঘুম মোর হয় চিরকালটাই।

কানের ফুকরে শঙ্খনিনাদ—চম্‌কিয়ে উঠে শেষে
ঠাস ক'রে মারি গালের উপরে চড়,—
টর্চ জ্বেলে লাগি মশার-যুদ্ধে—মশারিটা গেল ফেঁসে,
রেগে মেগে মিছে ক'রি শুধু ধড়ফড়।

এত যে কাণ্ড, তবু ত' ওঠে না, ব্যাটা রামা, হনুমান !
মরেনি যে তার প্রমাণে ডাকছে নাক ;
ইচ্ছে করে কি, টেনে তুলে আনি সাপটিয়ে দুই কান ;
কি যে করি ছাই—মশারী চিচিং ফাঁক।

আর ত সয় না—জ্বলে দুই চোখ—জলের ঝাপ্‌টা মারি,
চোখ কান বুজে, মশারিটা মুড়ে শুই ;
খুল্‌বনা চোখ—মরুক—পুড়ুক—গোল্লায় যাক্—ভারি।
হঠাৎ ক্ষিদেয় পেট করে চুঁই-চুঁই।

দিলদার হুসেন

আমন্ত্রণ

মৃত মানুষের জনতা এখানে নেই
এখানে মানুষ পাথরে খোদাই যেন
মন্থর ট্রেণ মধ্য রাতের বুকে
টিকিট লাগবে টাকা দেড়েকের শুধু।

আমার টিকিট ফিরতি টিকিট, সখা,
দিন দশেকের মেয়াদ মাত্র বাকি
ইতিমধ্যেই আসতে তোমায় হবে
—কয়েকটা দিন উচ্চ মিনারে যেন।

এখানের গ্রামে কুয়াসা জমেছে ভোরে
দূরে দেখা যায় নীল পাহাড়ের ছবি।
এখানের মাঠে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে
টকটকে চাঁদ খেজুর গাছের পাশে।

দিন রাত্রির বেপথু সম্মিলনে
ভোরের পাখির অদ্ভুৎ কথকতা
তোমার ওখানে কর্কশ ষ্টোভ জ্বলে
মিলনে ওখানে পাণ্ডুর ব্যর্থতা।

মৃত মানুষের জনতা এখানে নেই
রাত্রে এখানে আকাশ নিরেট কালো
খেয়ালি পথেরা প্রান্তর ভেদ করে
হিজি-বিজি কাটে সুদূর গ্রামের দিকে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অহল্যা

অহল্যা—
শীতলা নারী
গৌতমের প্রিয়া
ঘুমাতে পারে না।

শ্যাম, শ্লথ তৃপ্ত ধরা
যেখানে ঘুমায়—
সূর্য্যবীজ সোহাগিনী
সেখানে শয়ান তার ;
অনুর্বর, গৈরিক বেদনা বুকে
অহল্যা পাষাণী নারী
ঘুমাতে পারে না।

জ্বালা-স্রাবী চোখ দুটি
অস্বস্তির তীব্র জ্বালা
সমিধের শেষ ;
অঙ্গারের কালো চোখে
নির্নিমেষ দাহ যেন লাল,
রজনীর কানায় কানায়
জমে ওঠে।
অহল্যা শীতলা নারী
ঘুমাতে পারে না।

উপরে আকাশ—
মেঘের নির্মোক-মুক্ত উলঙ্গ আকাশ ;
সহস্র নক্ষত্র-চোখে
শুক্রের কামনা—
উৎসারিত রজত নিস্রাবে
আর্দ্র ধরা ;
স্তনাগ্র চূড়ায় তার সৃষ্টির উচ্ছ্বাস
কাঁপে।
শুক্তির সলজ্জ গাথা
বোনা হয় ;
আর যবাঙ্কুর বীজের খোলস হতে
চোখ মেলে চায়
সবুজ।
বাদার ঘন জঙ্গলে
মহুয়া ফুলের বীজে—
পোকারা সৃষ্টির গুঞ্জন তোলে
সূচি-মুখ বন্ধ্যা-ব্যথা
ঘুমাতে পারে না
অহল্যা।

বরফের গাঢ় ঘুমে
অতীত নিঃসাড়।
স্মৃতির খনিত্র দিয়ে তোলা যায় ;
কত রাত আর দিন ;
বসন্ত কুসুমে
হরিদ্রাভ শিলিমুখ

নাগর-বৃত্তিক।
হোমাগ্নি আকাশ ছোঁয়
বাসন্তী বাতাসে
অঙ্গ লাগি অঙ্গের ক্রন্দন ;
—কত মাদকতাহীন
আত্মসমর্পণ।
তারপর
নির্বাণ কামনা ;
বীজশক্র স্বষ্টির আঁধারে
ভ্রাম্যমাণ।
তৃপ্তনারী—
গৌতমের অভিশাপে
পাষাণী অহল্যা।
অতসী কাচের দৃষ্টি—
ঘুমন্ত অতীত
চোখ চায়।
অহল্যা গৌতম-নারী
ঘুমাতে পারে না।

তারপর দুর্বির ঘট্টনে
ঋতু, বর্ষ আবর্তিত
গ্রহ উপগ্রহ ;
অহল্যা পাষাণ, পাষাণ অহল্যা !

নিষ্ফল কামনা তার—
অনাঘ্রাত কুমারীর বুকে
গণিকার রূপালী হাসিতে
তরুণের দুর্দাম যৌবনে
অভিশাপ, অভিশাপ শুধু।
অহল্যা শিথিল
শীতলা !

আজো তাই চেয়ে আছে—
শাণিত সন্ধানী আলো মেলে—
রাতের কন্দরে
তাঁর আশে।
দেহলীতে দীপ জ্বালা
কফিনের বন্ধ্যা আত্মা—
নারী—নারী হবে।

আগে তার—
স্বষ্টির অর্গল রুদ্ধ ;
বন্ধ্যা ভূমি
শ্যাম স্বপ্ন দেখে
—ঘুমাতে পারে না—
অহল্যা
শীতলা নারী
ঘুমাতে পারে না।

অশোক গুহ

পুস্তক-পরিচয়

দৃষ্টি-কোণ। জ্যোতির্ম্ময় রায় প্রণীত। কবিতা ভবন। মুল্য দেড় টাকা।

বইখানি প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি দুই খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দশটি প্রবন্ধকে বলা যায় খেয়ালী প্রবন্ধ। যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়-গুলিকে দেখা হয়েছে মোটামুটি তা কৌতুকের। এ প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালী পাঠককে আনন্দ দেবে। কৌতুকের আড়ালে যতটা চিন্তা থাকলে মন খুসি হওয়ার সঙ্গে বুদ্ধিও নিজেকে তৃপ্ত মনে করে এখানে তার অভাব নেই। এবং এ শ্রেণীর রচনায় ভাষার যে লঘু ও লীলায়িত গতির প্রয়োজন লেখকের তা আয়ত্তে।

"বিজ্ঞাপন আজ সহুরে-সভ্যতার মনের মালিক। জান্তে বা অজান্তে তারই উপদেশে আমরা কিনিকাটি, খাইদাই, দেশ ভ্রমণে বা'র হই। তাই এটাকে যন্ত্রযুগ না ব'লে বলা উচিত বিজ্ঞাপনী-যুগ। এ-যুগের প্রতীক হচ্ছেন পঞ্জিকা —যার হাড় ক'খানা বাদ দিয়ে বিপুল বপুর সবটাই বিজ্ঞাপন।"

(নবযুগ। ৮ পৃঃ।)

"আমার পাশের বাড়ীতেই থাকে মস্ত একটি যৌথ পরিবার। দিনের ভিতর একশো বার তার কড়া খট্‌খট্‌ ক'রে ন'ড়ে উঠছে। সে নড়ার বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করবার মতো। সাড়ে চারটে বাজতেই কড়াটা ছন্দোহীন দুরন্ত বেগে তার আংটার মধ্যে নেচে ওঠে। বাড়ীর গিন্নী অমনি হেঁকে ওঠেন, 'অ-ঝি মন্টু এসেছে, দরজা খুলে দাও'। নড়ার সেই চপলতা ও দুরন্তপনার মধ্যেই মা পান তাঁর মন্টুকে। কর্ত্তা এসে কড়া নাড়েন,—খট্‌—খট্‌—খট্‌—খট্‌। ভারী মন্থর তার চাল; শব্দের মধ্যে তাঁর কর্ত্তৃত্বের দৃঢ়তা ও আস্থা—শব্দই যেন বলছে, এটুকু কানে গেলে যে যত ব্যস্তই থাক, ছুটে আসবে।"

(কড়া। ১৩ পৃঃ)

খেয়ালী প্রবন্ধ হিসাবে এ-প্রবন্ধগুলি সার্থক। এগুলি নিছক খেয়াল নয়, চিন্তার হাড় এর মধ্যে আছে; কিন্তু তার চাপে খেয়ালের কৌতুক চাপা পড়ে নি।

দ্বিতীয় খণ্ডের কয়টি প্রবন্ধে লেখক ভূমিকায় বলছেন যে "বিষয়গত গুরুত্ব বজায় রেখে বলার ধরণকে" তিনি "যথাসম্ভব সহজবোধ্য রাখতেই" চেষ্টা করেছেন।—"অর্থাৎ ভঙ্গিটা মজলিসী বা দরবারী কোনোটাই না ক'রে" করেছেন "ঘরোয়া"। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হচ্ছে 'চিত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভা"। এই প্রবন্ধে লেখকের যা বক্তব্য তা তিনি নিজের চিন্তায় নিজের মনে সুস্পষ্ট করেছেন, এবং যে ভাষা ও ভঙ্গীতে তাকে প্রকাশ করেছেন তাতে আছে সাহিত্যের সুষমা। প্রবন্ধ-সাহিত্য শিল্পীর গড়া সৌধের মত। ওর চিন্তার গড়ন, অর্থাৎ বক্তব্য ওর মুখ্য বস্তু। একটা বিশেষ বক্তব্যকে মনন দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ক'রে গ'ড়ে তুলতে না পারলে লেখা 'প্রবন্ধ' হয় না। আবার P. W. Dর কাজ-চলা-সর্ব্বস্ব দালানের মত বক্তব্যকে কোনও রকমে বলতে পারলেই প্রবন্ধ 'সাহিত্য' হয় না। চিন্তা ও তার সাহিত্যিক প্রকাশের সমবায়ে যথার্থ 'প্রবন্ধ' সৃষ্টি হয়। বাংলার বর্ত্তমান প্রবন্ধ-সাহিত্যে এ সমবায় পূর্ব্বের চেয়ে বেড়ে চলেছে তা মনে হয় না। বরং এর লাঘব ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর, কি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের তুল্য-মূল্য প্রবন্ধ বাংলায় কি এখন লেখা হচ্ছে? প্রকাশের সাহিত্যিক ভঙ্গীটার সম্ভব উন্নতি হয়েছে, কিন্তু প্রকাশ্য চিন্তার প্রসার ও গভীরতা দুই-ই কমেছে। তার এক কারণ আমরা যেন চিন্তার সাহস হারাচ্ছি। ইউরোপীয় আধুনিক লেখকদের চিন্তা, তা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লেখকদেরও চিন্তা, আমরা বিচার না ক'রে খুব মূল্যবান মনে করতে আরম্ভ করেছি; বিশেষ লেখক যদি ইংরেজী না হ'য়ে অন্য ভাষার লেখক হ'ন। এ মোহ দূর করার উপায় ইউরোপের প্রাচীন ও নবীন প্রথম শ্রেণীর লেখকদের লেখার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট পরিচয়—সেই সব লেখক যাঁরা নিজেরাই প্রকৃত চিন্তা করেছেন, এক লেখকের চিন্তা সম্বন্ধে অন্য লেখক কি বলেছে তার আলোচনা করেন নি।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মাথায় চিন্তার ক্ষমতা ও হাতে সাহিত্যের কলম আছে। আশা করি বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে তিনি নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান গ'ড়ে তুলবেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আজকের রাশিয়া—শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস। দু' টাকা।

গ্রন্থকার নিবেদন করেছেন যে তাড়াহুড়া করতে যেয়ে সামান্য যা-কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেল সেজন্য পাঠকেরা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। বর্ত্তমান সমালোচকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে ভুলত্রুটি যা থেকে গেছে তা নেহাৎ সামান্য নয় কিন্তু তথাপি গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানির ভূমিকায় ঠিকই বলেছেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তার কারণ আমাদের দেশের জনসাধারণের জানা দরকার যে হিটলারের আক্রমণ ব্যর্থ করবার মত শক্তি সোভিয়েট রাষ্ট্র সঞ্চয় করেছে। কিন্তু জনসাধারণ বলতে তিনি যে শ্রেণীর পাঠকবর্গের কথা ভেবেছেন সেই অল্পশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী আলোচ্য গ্রন্থখানিকে ধৈর্য্য ধরে প্রণিধান করবে বলে মনে হয় না। সেইটিই হচ্ছে রচনার প্রধান ত্রুটি এবং সে ত্রুটিকে নিশ্চয় সামান্য বলা যায় না।

গ্রন্থকার অল্প কয়েকটি কথায় জারের আমলের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ ক'রেই 'হস্তক্ষেপ' (intervention) ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং সেখান থেকে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এসে পড়েছেন লেনিনের বিখ্যাত 'নব অর্থনৈতিক পদ্ধতি'-র আলোচনায় এবং তারপর গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে প্রকাশ করেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির সংখ্যাসার ফিরিস্তি।

তুলনামূলক ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এর প্রমাণ সহজবোধ্য ব্যাপার কিন্তু নিছক অঙ্কের ভাষায় বিপ্লবের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রকাশ করা যায় না। সংখ্যার সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন যখন ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকে। গ্রন্থকারের উচিত ছিল প্রাক্-বিপ্লব যুগের ইতিবৃত্তকে বিশদ ভাবে ব্যাখা ক'রে তারপর বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় দেওয়া আরও মনোজ্ঞ ভাবে।

যে দেশের রাষ্ট্র চালনায় পরিকল্পনার কোন নাম গন্ধ নাই, দুর্দ্দশার মাপ জোক নাই, রাজ্য চলে ব্যক্তিগত লাভের অনুশাসনে, শাসনযন্ত্র বিদেশীর অনুগত, যে-দেশের জনসাধারণ স্বপ্নাবিষ্টের মত অজ্ঞানের ঘোরে 'দিনগত পাপ

ক্ষয়' ক'রে থাকে সে-দেশের চৈতন্য উদ্বোধ করতে হলে আরও মোটা কথায় আঘাত দিতে হয়।

বলতে হবে ওদেশের সাধারণ মানুষ আর্থাৎ চাষী, মজুর, সৈনিক, মাঝি, গাড়োয়ান, কারিগর এরা সবাই কি ভাবছে, অবসর সময় কেমন ভাবে কাটাচ্ছে, আমোদ প্রমোদের কি সুযোগ পাচ্ছে, শিক্ষার ব্যবস্থাই বা কি হয়েছে তাদের আর তাদের ছেলেমেয়ের।

শুধু বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যনিবাস ও প্রমোদ-গৃহের তালিকা দিলে সব কথা ব্যক্ত করা হয় না। বলতে হয় বিরাট বিরাট প্রদর্শনীতে কি দেখানো হয়; বলতে হয় ভ্রাম্যমান পাঠাগারের কথা, অভিনব শিক্ষাপ্রদ নাটক ও ছায়াচিত্রের কথা, দিতে হয় বিবিধ বৈজ্ঞানিক অভিযানের সংবাদ। লেনিন ও ষ্টালিন-এর কয়েকটি উক্তিমাত্র অনুবাদ না করে প্রকাশ করা উচিত ছিল তাদের ও পার্টির অসুবিধা ও সাফল্যের আশ্চর্য্য বিবরণ। গ্রন্থকার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু আবহমান কাল হতে উৎপীড়িত, উপেক্ষিত, অধম মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্ফুরণে কতখানি শক্তি ও সামর্থ্য উজ্জীবিত হলো সে সংবাদ দিয়েছেন পরোক্ষ ও নিরস ভাবে।

সমায়াভাবের ওজর গ্রাহ্যনীয় নয় কারণ গ্রন্থকার যে যথেষ্ট কষ্ট ক'রে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই এবং তার চেয়ে অধিকতর কষ্ট স্বীকার করেছেন প্রতিশব্দের উদ্ভাবনে। হীরেন্দ্র বাবু ভূমিকায় বলেছেন যে ভাষায় মাঝে মাঝে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্য করেছেন, তার কারণ অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা বাংলা ভাষায় করতে হলে শব্দচয়নের দুরূহতা অপরিহার্য্য। কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি যে অল্পশিক্ষিত পাঠকের পক্ষে সে শব্দগুলির অর্থ গ্রহণ করা হবে আরও দুরূহ।

গ্রন্থকার Ski-ing এর বাংলা করেছেন 'রণ-পা দিয়ে দৌড়ানো।' কষ্টকর দিন যাপনকে বলেছেন 'দিন গোঙানো।' উদ্বর্তপত্র (balance sheet) ইত্যাদি শক্ত কথার প্রবর্তন করেছেন অথচ বেকারী (রুটির কারখানা) ও বেকার (unemployed)-কে প্রায় একাকার করেছেন। কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত ব্যাধিকে বলেছেন 'শ্রমশিল্প সুলভ রোগ।' পুড-এর অর্থ বলেছেন কিন্তু 'হেক্টার' ও 'মিটার' বলতে কি বোঝায় তা বলেন

নি। বিখ্যাত আর্টিক অভিযানের কোন আবিষ্কার বা কার্য্যাবলীর কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নি। ছিদ্রান্বেষণ ক'রে ত্রুটি বার করতে হলে অনেক কিছু ভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশেষ ক'রে মুদ্রণ প্রমাদের। এই সকল অনবধান ও গাফিলিকে প্রামাণ্য ও মার্জ্জনীয় বললে দেশের স্বাভাবিক শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

যাই হোক, গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং প্রকাশভঙ্গীর সহজ সরল ওজস্বিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছ থেকে নূতন সভ্যতার আরও বিশদ পরিচয় আশা করি এবং বাহুল্যের সম্ভাবনা সত্বেও নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয়ের প্রণিধান প্রার্থনা করি ঃ

১। এ্যাংলো সোভিয়েট জার্ণাল।

২। দি সোশ্যালিষ্ট সিক্স্থ অফ দি ওয়ার্ল্ড্।

৩। কমরেড এ্যাণ্ড সিটিজেন্স।

৪। দি কণ্ডিসান অফ দি ওয়ার্কার্স্ ইন গ্রেট ব্রিটেন, জার্ম্মানী এ্যাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়া, ১৯৩২।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।

Oxford Pamphlets on World Affairs. 3d each. Nos 22—39.

কিনে, চেয়ে বা চুরি ক'রে খবরের কাগজ পড়েন না এমন শিক্ষিত লোক আমাদের দেশে বোধ হয় খুব কমই আছেন। বিশেষ ক'রে এই যুদ্ধের সময়ে। ট্রামে, বাসে, বৈঠকখানায়, পার্কে ও বিশেষ ক'রে চা চপ কাটলেটের দোকানে যুদ্ধের 'ষ্ট্র্যাটেজি' ও 'ট্যাক্‌টিক্স্' সম্বন্ধে গরম আলোচনা অহরহই শোনা যায়। অথচ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নাই। শুধু 'ষ্ট্র্যাটেজি' ও 'ট্যাক্‌টিক্স্'এর কথা বলছি না। 'বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান' বাঙালীর কাছে ঐ তুটি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের প্রত্যাশা নিতান্তই অসঙ্গত।

কিন্তু খবরের কাগজে নিত্যই দেখি এমন সব জায়গায় নাম আর এমন সব প্রসঙ্গের উল্লেখ যার কিছু মনে হয় খুবই চেনা আর কিছু একেবারেই নতুন। অথচ যখন জিজ্ঞাসা করলে চেনা-অচেনা সবই যায় গুলিয়ে তখন লজ্জা হয় নিজেদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি ক'রে। এই অক্‌স্‌ফোর্ড প্যাম্ফলেটগুলির প্রকাশকদের কাছে তাই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কেননা এগুলি পড়ে ঐ জাতীয় লজ্জা থেকে অনেকটা রেহাই পেয়েছি।

ধরুন মধ্য ও পূর্ব-ইওরোপে দু বছর আগে জার্মানি-কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ থেকে সুরু ক'রে আজ এই তুমুল রুশ-জার্মান যুদ্ধ পর্যন্ত কত অদ্ভুত জায়গার নাম কাগজে আমরা পড়েছি অথচ ঐ জায়গাগুলি সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই জানি। এই অজ্ঞতা ঘুচবে An Atlas of the War (২২ নং) ওলটালে। সামান্য কয়টি পাতার মধ্যে এই জায়গাগুলির শুধু নক্‌সা নয় তাদের সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর যে-সব বিভিন্ন দেশ এই যুদ্ধের বাজারে বিশেষ ক'রে আমাদের চোখে পড়ে তাদের সম্বন্ধেও একটির পর একটি ক'রে পুস্তিকা এই সিরিজে প্রকাশিত হচ্ছে। যথা South Africa (২৯ নং), Palestine (৩১ নং) ও India (৩২ নং)। তাছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা বেরিয়েছে—The Life & Growth of the British Empire (২৯ নং)। এই পুস্তিকাগুলি মূল্যবান সন্দেহ নাই কিন্তু এই সিরিজের সব থেকে মূল্যবান পুস্তিকার মধ্যে এগুলিকে আমি ধরি না, কেননা দক্ষিণ-আফ্রিকা বা প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে যদিবা আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ হই তাহলেও সেই অজ্ঞতা দূর করার মতন কেতাবাদির আমরা সহজেই সন্ধান পেতে পারি।

ভারতবর্ষ বিষয়ক পুস্তিকাটির কথা একেবারেই আলাদা। শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা ও পলিটিক্‌স্‌ সম্বন্ধে ৩২ নং পুস্তিকা প'ড়ে যেটুকু জ্ঞানলাভ করবেন তার চেয়ে ঢের বেশি ভুল খবর পাবেন বিদেশীরা এই পুস্তিকাটি প'ড়ে। কেননা, এর প্রণেতা যে-দৃষ্টি নিয়ে তথ্যের সমাবেশ ও বিশেষভাবে তাদের ব্যাখ্যা করেছেন তা' একতরফা ও সঙ্কীর্ণ।

আমি এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে সব চাইতে মূল্যবান মনে করি সেগুলিকে যেগুলিতে সমর-সজ্জা, সমরোপকরণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

কেননা, এই সব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদেরও জানবার সুযোগ অল্প। তাই The Naval Role in Modern Warfare (২৬ নং) ও Britain's Air Power (২৮ নং)—পুস্তিকাদ্বয় এত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। ইংরেজের নৌবলের কথা কে না জানে, কিন্তু কি ভাবে এই নৌবল ব্যবহৃত হয় আর বিমান-বাহিনীই বা কি ভাবে স্থলে ও জলে দেশরক্ষার কার্যে নৌবলের প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বেশির ভাগ লোকেই জানে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে। এই দুটি পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ পড়লে আকাশ-যুদ্ধ ও জল-যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের বেশ ভালো রকম ধারণাই হবে।

ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীর ও আকাশ-বাহিনীর এক বড় কাজ 'ব্লকেড' বা অর্থনৈতিক অবরোধ। গত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই অবরোধের সাফল্য। কিন্তু তখন নৌবল ছিল অবরোধ সাধনের একমাত্র উপায়। বিমান-বাহিনীর কাজ ছিল গত মহাযুদ্ধে নিতান্তই গৌণ। বর্তমানে একদিকে নৌবল, অপরদিকে বিমান-বাহিনী—জার্মানির তুলনায় সংখ্যায় হীন হ'লেও দক্ষতায় ইংল্যাণ্ডের বিমান-বাহিনী যে হীন নয় তা ভালো ক'রেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে—এই উভয় অস্ত্রের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড কি ভাবে জার্মানির আমদানি রপ্তানির ও উৎপাদনের পথ বন্ধ ক'রে তিলে তিলে তার অর্থনৈতিক শক্তিক্ষয়ের চেষ্টা করছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে ৩৮ সংখ্যক (Britain's Blockade) পুস্তিকায়।

অবশ্য বলা বাহুল্য অর্থনৈতিক শক্তি যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধসজ্জার ভিত্তি। এই অর্থনৈতিক শক্তির পরিপূর্ণ সংগঠন ছাড়া যুদ্ধজয় অসম্ভব। কি ভাবে ইংল্যাণ্ডে এই সংগঠন সাধিত হচ্ছে তার বিবরণ আছে ২৩ নং (The Sinews of War), ২৫ নং (Paying for the War) ও ৩০ নং (How Britain's Resources are Mobilized)—এই তিনটি পুস্তিকায়।

যুদ্ধের জন্যে কোটি কোটি টাকা টাকা খরচ হচ্ছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধ'রে। কি ভাবে এই টাকার সংস্থান হচ্ছে ও কি ভাবে তা' দিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সন্ধান ক'রে তেল, লোহা, টিন, এবং আরো বহুবিধ সমরোপকরণ, তাছাড়া অন্নবস্ত্রের যোগাড় ও বিতরণের জটিল ও বিস্তৃত আয়োজন চলেছে, এই তিনটি পুস্তিকায় তাই বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধসংক্রান্ত সকল প্রসঙ্গের মধ্যে এই প্রসঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সব চাইতে বেশি। তাই এই শিক্ষাপ্রদ সিরিজের সব চাইতে শিক্ষাপ্রদ পুস্তিকা বোধ হয় এই তিনটি। এগুলি পড়লে যুদ্ধ ছাড়া বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও আমরা জ্ঞানলাভ করব, বিশেষভাবে বুঝব যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে অর্থনীতির সম্বন্ধ কি রকম ঘনিষ্ঠ।

হিরণকুমার সান্যাল।
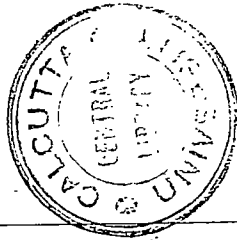
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
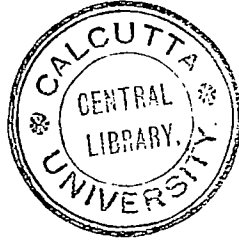
১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৩৪৮

পরিচয়

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

(২)

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে মাতর্ বা নির্বিশেষ Matter (বিজ্ঞান যাহাকে Protyle বা 'uniform ether of space' বলেন) মাতরিশ্বা বা ভাগবতী শক্তি দ্বারা উদ্বেজিত হইলে তবে সৃষ্টিক্রিয়া আরব্ধ হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপারিত ঐ ভাগবতী শক্তি শব্দ-রূপে, আলোক-রূপে, তাপরূপে, চৌম্বকরূপে, তাড়িতরূপে, কিমিয়া-যুতিরূপে, জীবনীরূপে এবং অধ্যাত্মশক্তিরূপে প্রস্ফুরিত হয়। ঐ সকল শক্তি বিচিত্র হইলেও বিভিন্ন নয়—তাহারা এক ভাগবতী শক্তিরই রূপান্তর বা ভাবান্তর। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, শক্তির প্রকাশ স্পন্দনে (vibrations-এ)—এবং শব্দাদি ঐ অষ্টবিধ ভাগবতী শক্তি যে কোন উপাধিতে বিস্ফুরিত হউক না কেন—'It reveals a fascinating geometrical design'—উহা বিচিত্র জ্যামিতিক আকারে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম প্রবন্ধে আমরা শব্দ, আলোক ও উত্তাপের বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ জ্যামিতিকী সপ্রমাণ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমরা চৌম্বক ও তাড়িতের প্রসঙ্গের আলোচনা করিব এবং দেখিব চৌম্বক শক্তিতে এবং (রাসায়নিক পরমাণুর সংযোগ ও সংহনন ঘটিত ব্যাপারে) তাড়িতশক্তিতে কিরূপ জ্যামিতিকীর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম চৌম্বকশক্তির কথা বলি। যাহাকে আমরা অয়স্কান্তমণি বা চুম্বক-পাথর বলি, তাহার ইংরাজী নাম Magnet। এক জাতীয় প্রস্তরে ঐ চৌম্বক শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—সেই পাথরকে আমরা চুম্বক পাথর বলি। চৌম্বকের ধর্ম লৌহ-আকর্ষণ। চুম্বকের এক মেরু লৌহ আকর্ষণ করে আর এক মেরু লৌহ বিকর্ষণ করে। এই দুইয়ের ভেদ নির্দেশ করিয়া আমরা পুং চুম্বক শক্তি (positive magnetism) ও স্ত্রী চুম্বকশক্তি (negative magnetism) বলি। আরব্য উপন্যাসে গল্প আছে সিন্ধবাদের জাহাজ সমুদ্রের উপকূল দিয়া যাইতেছিল। নিকটস্থ একটা চুম্বক পর্বত ঐ জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেকগুলি আকর্ষণ করিয়া লইল। সুতরাং জাহাজ জলমগ্ন হইয়া সিন্ধবাদ বিপন্ন হইলেন। আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানিয়াছি যে, সাধারণ লোহার দণ্ড (a soft-iron rod) যদি গতিশীল তাড়িতের চক্রমধ্যে প্রবেশ করান যায়, তবে যতক্ষণ ঐ বৃত্তে তাড়িত বহমান থাকে ততক্ষণ ঐ লৌহদণ্ড চুম্বক বা magnet-এ পরিণত হয়। তাহার এক মেরু হইতে পুং চৌম্বকশক্তি বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মেরু হইতে স্ত্রী চৌম্বকশক্তি বিচ্ছুরিত হয়।

আমরা বলিলাম চৌম্বকশক্তি লৌহকে আকর্ষণ করে। ঐ আকর্ষণ কি এলোমেলো বিপর্যস্ত ভাবে কার্য করে, অথবা তাহার ব্যাপারে একটা ধারা আছে? এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

As magnetism operates, *geometrical* design at once appears.
—First Principles, p. 354.

অর্থাৎ, এখানেও ঐ জ্যামিতিকীর ব্যাপার। পাঠক ইচ্ছা করিলে একটা সামান্য পরীক্ষা দ্বারা এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। ধরুন একটা চুম্বক দণ্ডের উপর একখানা কাগজ সংস্থাপন করা হইল এবং তাহার উপর কতকগুলা লোহার গুঁড়া (iron filings) ছড়াইয়া দেওয়া হইল। দেখা যাইবে ঐ লৌহচূর্ণগুলি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখায় সজ্জিত হইবে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডল্‌বেয়ার লিখিতেছেন—

When such a bar-magnet has a sheet of paper laid upon it, and iron filings are sprinkled upon the paper, the filings are arranged in curious curved lines, starting from one pole and traceable to the other, and quite round the magnet on both sides. This arranging power of the magnet

extends in every direction about it, as one can satisfy himself by trying the same experiment with the magnet turned on different sides.—Dolbear, p. 201.

এই কৌতুকী ব্যাপার প্রদর্শন করাইবার জন্য ডলবেয়ার তাঁহার গ্রন্থে একখানি চিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহার প্রতিলিপি দিলাম। এখানে লক্ষ্য করিতে হয় যে 'what are called magnetic lines are also *geometrical* in form.'
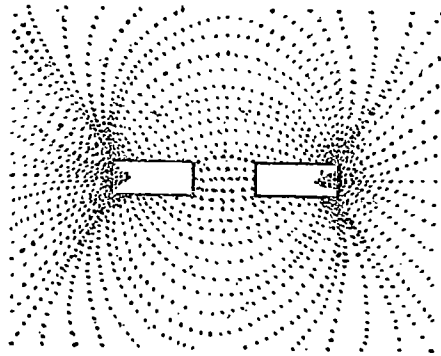
কিন্তু চুম্বকশক্তির জ্যামিতিকী আরও স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে। অধ্যাপক মেয়ার একটি সরল পরীক্ষাদ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কতকগুলি লোহার সূচ লইয়া তিনি প্রথমে তাহাদিগকে চুম্বকিত (magnetised) করিলেন এবং ছোট ছোট কাকে ঐ সূচীগুলি বিদ্ধ করিয়া ঐ সূচগুলির পুং মেরুগুলি (positive poles) উপরে রাখিয়া ঐ কাক্‌গুলি একটি জলপূর্ণ গামলায় ভাসাইয়া দিলেন এবং সেই ভাসমান চুম্বকিত শলাকা-গুলির উপর একটি শক্তিশালী তাড়িত-চুম্বক (electro-magnet) বিলম্বিত করিলেন। ফলে দেখা গেল ঐ কাক্‌গুলি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক ভঙ্গিতে সজ্জিত হইয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিল। নিম্ন চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে পাঠক এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন। *

---

* মায়ার-এর ঐ পরীক্ষা সম্বন্ধে আমরা একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

The reciprocal action of magnetic poles may be conveniently illustrated by an elegant method devised by Prof. A. M. Mayer. Steel sewing
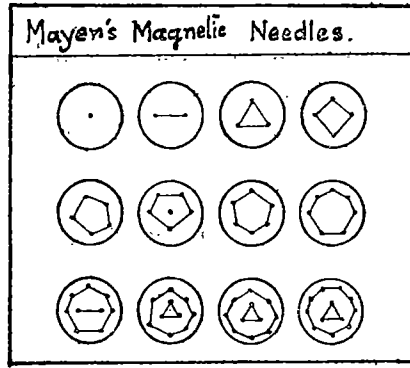
যদি এই পরীক্ষায় বিস্মিত হইয়া কেহ প্রশ্ন করেন, কেন এই সকল চুম্বকিত শলাকাগুলি জ্যামিতিক আকারে সজ্জিত হয়—why do the magnets arrange themselves in these geometrical designs—এ প্রশ্নের উত্তর এই—because God geometrises.—ইহা বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর খেলা।

---

needles are magnetised so that their points are north poles, and their eyes, which are thus south poles, just project through minute cork discs, so that when placed in water the magnets float in a vertical position. If the north pole of a strong magnet is brought near a number of these floating magnets, they are attracted by it and take up definite positions, forming (geometrical) figures which depend on the reciprocal repulsion of the floating magnets, and on their number.

—Ganot's Physics, pp. 721-2.

Of these, the very beautiful experiments of Mayer, though designed for quite other purposes, are perhaps the simplest to reproduce.

A large number of needles are magnetised together in a solenoid, and are floated vertically in a basin of water by pushing all their (say) north poles into small corks—their south poles being at the same depth below the water. These latter repel each other, just as do the electrons according to an inverse square law. To represent the action of the positive sphere, we may place a strong electro-magnet beneath the bowl with its north pole upwards. It can be shown that the attraction of this magnet for the tiny south pole is approximately proportional to their distance from a point immediately above the pole.

—J. A. Crowther's Molecular Physics, p. 95.

এইবার তাড়িতশক্তির কথা বলি। তাড়িতশক্তির প্রক্রিয়াতে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী কতটা যে দেদীপ্যমান, তাহা মনে ভাবিলে চিত্ত বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া যায়।

তাড়িত কি আমরা জানি না। চৌম্বক কি তাহাও জানি না—তবে বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনি—'magnetism is the force induced by electricity'। যদি জনকই অজ্ঞাত তবে জনিতের জ্ঞান হইবে কি রূপে? সে কথা যাক্—এখন তাড়িতের ব্যাপারের কিছু কিছু পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন—'All matter is electricity' অর্থাৎ, সমস্ত জড়ের মূলীভূত তাড়িত শক্তি। বলা বাহুল্য, এ তাড়িত ভৌম তাড়িত নয়, সার্বভৌম তাড়িত (cosmic electricity)—মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি যাহাকে 'ফোহৎ' (Fohat) বলিতেন,—'which thrilling through the bosom of inert substance (pre-genitic matter বা মূল প্রকৃতি) impels it to activity and guides its primary differentiation.'

এই বিশ্ব-তাড়িত সম্বন্ধে মাদাম্ আরও বলিয়াছেন—

It metamorphoses itself into a male and a female, i.e. polarises itself into positive and negative electricity। তখন আর ফোহৎ 'It' নয়—'He'। 'He has seven sons who are his brothers. The seven son-brothers personify the seven forms of cosmic magnetism—electricity, magnetism, sound, light, heat, cohesion etc. etc.'

কিন্তু সম্প্রতি এই বিশ্ব-তাড়িত বা ফোহৎ আমাদের আলোচ্য নহে—আমরা ভৌম তাড়িতের ব্যাপারেরই আলোচনা করিতে চাই।

এই যে বিশাল বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হইতেছে এবং যাহার বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি—যদি ধীরভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই তবে দেখিব যে, সেই জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুই কোটিতে বিভক্ত। স্থাবর = Inorganic (নিরঙ্গ) এবং জঙ্গম = Organic (সাঙ্গ)। সাগর, ভূধর, নদী, আকাশ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী,

কীট, সরীসৃপ, মানুষ—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত। প্রথম স্থাবরের কথা বলি, পরে জঙ্গমের কথা বলিব।

যে কোন স্থাবর বস্তুকে যদি খণ্ডিত করিতে করিতে চলি, তবে দেখিতে পাইব যে চরমে উহা কতকগুলি molecules বা অণুর সমষ্টি। অর্থাৎ, "Molecule is the smallest portion of a definite kind of matter"। Molecule যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। তবে, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এক একটি molecule যদি অন্ততঃ ছ'কোটি গুণ বর্ধিত করিতে পারিতাম, তবে তিগ্ম অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। * ঐ অণুকেও যদি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) বিশ্লিষ্ট করি তবে Atom বা পরমাণুতে উপনীত হইব। †

লক্ষ্য করিতে হয় যে molecule বা অণু দ্বিবিধ, অমিশ্র—যেমন স্বর্ণের অণু, এবং মিশ্র—যেমন জলের অণু। সজাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত যে molecule বা অণু তাহাই অমিশ্র এবং বিজাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত যে অণু তাহাই মিশ্র বা compound। স্বর্ণের অণুকে যদি বিশ্লিষ্ট করি, তবে স্বর্ণ পরমাণুই পাইব, কিন্তু জলের অণুকে যদি বিশ্লিষ্ট করি তবে জল পাইব না—দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু পাইব। ইহাই অমিশ্র ও মিশ্র অণুর প্রভেদ। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের অণু বা molecules

---

* We do not know the size of a molecule. But the smallest portion of a definite kind of matter, say of water or iron, that can be seen by a very efficient microscope, is composed of not less than sixty million, and not more than one hundred million, molecules. * * Those surprisingly small pieces of matter, when put together, produce a thing so minute that it must be magnified from 60 to 100 million times before it is visible.—The Story of the Chemical Elements by M. M. Pattison Muir, p. 168.

† পরমাণুর ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ডলবেয়ার বলিতেছেন—

With the largest telescope, less than a hundred million of stars are visible ; but what shall one say when he learns that beyond a peradventure the number of atoms in a single cubic inch of matter of any sort is more than a million of millions times all the stars in all the heavens visible in the largest telescope.

—Matter, Ether & Motion, p. 19

গুরুত্ব ও অন্যান্য গুণে অভিন্ন—"All the molecules of any particular element or compound are identical in weight and in all other properties."

অধিকন্তু—'every element and compound has a grained structure.'—অর্থাৎ, তাহারা কণিক বা দানাদার—

'If one could magnify enormously a small portion of any definite substance, say water, one could see an immense heap of extremely small particles of water piled together with interstices between them' এবং any definite substance fills space as apples fill a barrel and not as jelly fills a mould.

এক কথায়—molecules বা অণু সাবয়ব পদার্থ—'it has itself a structure. It is built up of parts.' ঐ সকল অবয়বই অণু বা atom। 'When molecules are complelely disintegrated, the parts of the molecules are called atoms'। অর্থাৎ, অণু বা molecule-কে বিশ্লিষ্ট করিলে আমরা যে অবয়ব প্রাপ্ত হই তাহাই atom বা পরমাণু এবং ঐ সকল পরমাণু বিশিষ্ট প্রথায় সজ্জিত হইয়া ঐ ঐ molecule রচনা করে—"and these parts (atoms), one is forced to admit, are arranged in a *definite* way relatively to one another."

—The Story of the Chemical Elements, p. 166.

আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে ঐ অবয়ব-সংস্থান—একটা এলোমেলো অসংবদ্ধ ব্যাপার নহে—উহা জ্যামিতিক আকারে সজ্জিত—অর্থাৎ 'here also God geometrises.'

বিশ্বে যে কিছু স্থাবর পদার্থ আছে—তাহার বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহারা ৯২ জাতীয় মূলভূত বা elements-এর সংযোগ-সংহননে রচিত। অর্থাৎ, বিশ্বে সর্বসমেত ৯২ জাতীয় পরমাণু আছে। যদি জঙ্গমের বিশ্লেষণ করি—তা সে জঙ্গম পাদপ (vegetable)-ই হউক বা পশু (animal—মনুষ্যও উহার অন্তর্গত)-ই হউক—তবে আমরা দেখিব যে তাহাদের শরীর সংখ্যাতীত কোষাণু বা cell-দ্বারা গঠিত। ঐ কোষাণুর ভিত্তি

প্রটোপ্লাজ্ম্ (protoplasm)—the primary living substance out of which all cells are made and which is composed of Hydrogen, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Sulpher, Phosphorus, Chlorine, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium and Iron atoms। তবেই দেখা গেল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জড়জগৎ ঐ ৯২ প্রকার মূলভূত—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য গন্ধক, কার্বন প্রভৃতির পরমাণু বা atom-এর সংযোগ ও সংহননে রচিত। পাশ্চাত্যে যাহাকে Chemistry বা রসায়ন-বিদ্যা বলে, এ আলোচনা সেই বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। ঐ বিজ্ঞান দ্বিবিধ—Inorganic বা নিরঙ্গীয় এবং Organic বা সাঙ্গীয়। নিরঙ্গীয় রসায়নের প্রতিপাদ্য স্থাবর এবং সাঙ্গীয় রসায়নের প্রতিপাদ্য জঙ্গম। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে তবে যেটুকু আলোচনায় আমরা বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর সাক্ষাৎ পাইব, মাত্র তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আমরা পরমাণুর সংযোগ-সংহননের কথা বলিলাম। ইহা রাসায়নিকের কথারই প্রতিধ্বনি। রাসায়নিক বলেন,—These primary elements combine among themselves to make new substances। যেমন দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া একটি জলীয় অণু রচনা করে। একটি সোডিয়াম পরমাণু আর একটি ক্লোরিন পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া একটি লবণ অণু গঠিত করে—

So elements combine with elements to make the myriads of organic and inorganic substances which make up our world. While only two atoms of Carbon, with six of Hydrogen and one of Oxygen, are necessary to make one molecule of alcohol, we require, to make one molecule of Hæmoglobin (the red colouring-matter of the blood), no less than 712 Carbon, 1,130 Hydrogen, 214 Nitrogen, 1 Iron, 2 Sulpher and 425 Oxygen atoms.

রাসায়নিক ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে ঐ যে পরমাণুতে পরমাণুতে মিশ্রণ —তাহারও একটা বিধি-নিয়ম আছে—যাহাকে 'valency' বলে—'The

chemical elements combine according to certain habits, characteristic of each element'.

পরমাণুরা (atoms) পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় কি প্রকারে? ইহা রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল প্রশ্ন—'Underneath all chemical reactions, there lies the question as to *why* atoms combine at all'। যে শক্তিবলে পরমাণুরা সংশ্লিষ্ট হয় বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন chemism—'which term is used to signify the ability possessed by atoms to enter into definite combinations'। ইহাকেই আমরা কিমিয়া-যুতি বলিয়াছি। সম্ভবতঃ ইহা তাড়িত (electricity)-রই প্রকারভেদ। একটি জলের অণু বা molecule হইতে ঐ শক্তি তিরোহিত হইলে জল আর জল থাকে না—জলের যে অবয়ব—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—তাহাতে বিশ্লিষ্ট হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিতে হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে যদিও অবয়ব-সংযোগ সম্পর্কে দুইটি পদার্থ সম্পূর্ণ অভিন্ন, তথাপি তাহারা একেবারে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ—অর্থাৎ, গুণকর্মে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন—যেমন urea ও ammonium cyanate. উভয়ের রাসায়নিক formula একই—N_2OCH_4! অর্থাৎ—both have absolutely the same elementary composition. 'Each compound contains 46·66 per cent of nitrogen, 26.67 per cent of oxygen, 20.0 per cent of carbon, and 6.67 per cent of hydrogen.'—অথচ urea ও ammonium cyanate-এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর দুইটি মিশ্রভূতের কথা ধরুন। উভয়েই Cobalt হইতে উদ্ভূত—Violeocobaltammine ও Praseocobaltammine। উভয়ের রাসায়নিক অবয়ব অভিন্ন—

In both there are 2 atoms of chlorine with four groups of Ammonia, each of which is made up of 1 Nitrogen and 3 Hydrogen atoms.

অথচ প্রথমটির বর্ণ বেগুনি, দ্বিতীয়টির বর্ণ সবুজ। এ ভিন্নতার কারণ আর কিছু নহে—সংস্থানভেদ। একটিতে গঠক পরমাণু যে ভাবে সজ্জিত, অপরটিতে সেভাবে সজ্জিত নয়। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

It has been suggested that the difference of colour is due to the difference of position in an octohedron of the two chlorine atoms ; where the two atoms of chlorine are at the opposite apices of the octohedron, the cobalt-derivative is violet, while when these two atoms are at the end of an edge of the octohedron, the derivative is green.

— First Principles of Theosophy, p. 238.

সে যাহা হউক, আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে—

"As chemical elements combine, they combine so as to make geometrical figures."

অর্থাৎ, যখন পরমাণুরা অবয়ব-রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে, তখন ঐ অবয়বভূত পরমাণুসকল জ্যামিতিক আকারে সজ্জিত হয়। ঐরূপ দুইটি মিশ্র পদার্থ লওয়া যাক্—প্রথম Marsh gas (জলা বাষ্প) যাহা হইতে আলেয়ার উৎপত্তি হয়, এবং Ethene। জলাবাষ্পের formula এই—
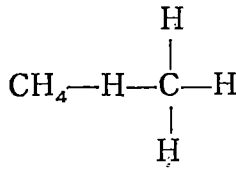
অর্থাৎ, Marsh gas-এ একটি কার্বন ও ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। বৈজ্ঞানিকবর কেকুলে (Kekule´) বলেন, That the spatial positions of the five atoms are such that the carbon atom stands in the middle of a tetrahedron, and the four Hydrogen atoms are placed at its four corners। নিম্ন চিত্রে ঐ সংস্থান চিত্রিত হইল। পাঠক দেখিবেন জ্যামিতিক সজ্জা কি না।

এথিনি (Ethene)-র formula এইরূপ—C_2H_6—

$$H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-H$$
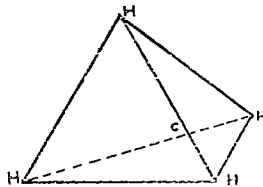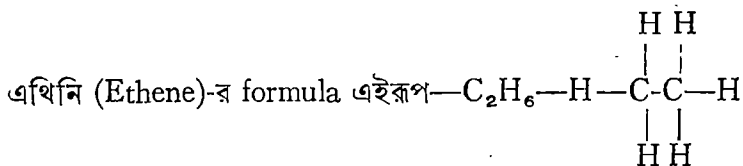
অর্থাৎ, একটি এথিনি অণুতে ২টি কার্বন ও ৬টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। ঐ আটটি পরমাণু কি ভাবে সজ্জিত? It has been suggested that the positions of the eight atoms are such that the apices of two tetrahedra interpenetrate each other, there being at each apex 1 Carbon atom and 6 Hydrogen atoms being placed at the other corners of the two tetrahedra. তবেই এখানেও ঐ জ্যামিতিকীর ব্যাপার লক্ষিত হইল। নিম্ন চিত্রে নির্দিষ্ট পরমাণু-সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিলে পাঠক একথার অনুমোদন করিবেন।
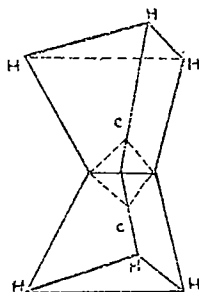
এ পর্যন্ত আমরা নিরঙ্গীয় রসায়ন (Inorganic Chemistry) হইতে উদাহরণ দিলাম। এইবার সাঙ্গীয় রসায়ন হইতে উদাহরণ দিই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হোলিম্যান (Holleman) তাঁহার 'Text Book of Organic Chemistry'-গ্রন্থে টার্টারিক এসিডের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

Four acids of the composition $C_4H_6O_6$ are known, all with the constitutional formula—COOH—CHOH—CHOH—COOH. They are called dextro-rotatary tartaric acid, lævo-rotarary tartaric acid, racemic acid and meso-tartaric acid. * * In accordance with the constitutional formula given above, the tartaric acids contain two asymmetric C-atoms in the molecule * * The formula of such a substance can be represented by c (abc)—c (def).

—Third English Edition, pp. 240—1.

পরে হোলিম্যান ঐ ফর্মুলা এই ভাবে প্রদর্শন করিয়া—
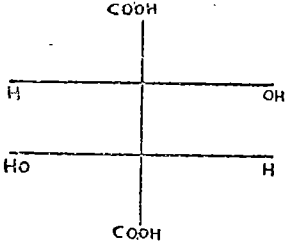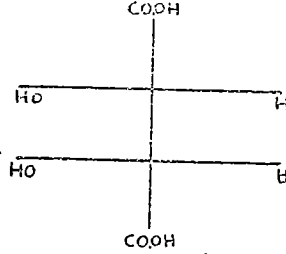
বলিতেছেন ঃ—

If formula I is assigned to dextrotartaric acid, it is evident that to convert it into meso-tartaric acid (formula II), it is only necessary for two groups in union with a simple asymmetric C-atom to change places, while racemic acid can only result through exchange of the groups linked to both C-atoms.

এখানেও আমরা সংস্থানভেদের প্রমাণ পাইলাম।

টার্টারিক এসিডের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিভেদে পরমাণু সকল কি ভাবে সজ্জিত—অধ্যাপক হোলিম্যান্ তাহার এইরূপ চিত্র দিয়াছেন—
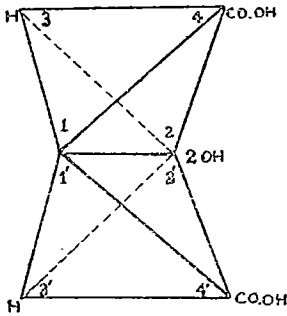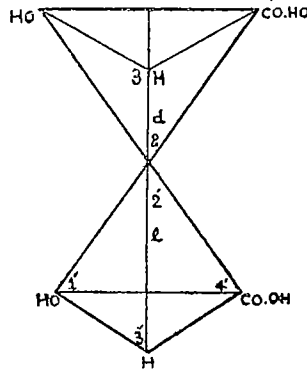
Maleic Acid Meso-tartaric Acid

এ সকলই জ্যামিতিকীর সুন্দর উদাহরণ নয় কি ? সত্যই 'God geometrises'। আগামী প্রবন্ধে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর আরও কতকগুলি বিচিত্র উদাহরণ দিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মোহানা

(৪)

রমলা ভাবে দূরত্ব বেড়েই চলল। লেডী ডাক্তারে বলেছিল নিয়মিত ওষুধ খেলে তার সাময়িক বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে। এতদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ খেয়েছে, অথচ পরীক্ষা করবার সুযোগ মেলে নি। দম্ভের বশে পৃথক ঘরে রইল, কেন সে মান খোয়াবে? খগেন বাবুর জন্য সে কি কিছুই ত্যাগ করে নি, সুনাম, সামাজিক স্থান, সামান্য সুবিধা? অথচ, তার প্রতিদানে প্রভেদ কমল না, নতুন আগ্রহ, নতুন ভাবনা এসে জুটল, নতুন সঙ্গী হল, সফীক, বিজন তাকে 'ওস্তাদ' বলে ডাকে, বিজন, হাঁ, বিজন পর্য্যন্ত। যতদিন মাসীমার দাসত্ব ছিল, ততদিন তবু আশা ছিল। মেয়েতে মেয়েতে যুদ্ধ সম্ভব। মাসীমা কতটা দিয়েছেন—স্নেহ, মমতা, আশীর্ব্বাদ, টাকা, আদর? তার বেশী সে দিতে পারে, দিয়েছে, সঙ্গ, রূপ, যৌবন, বেশ রূপ না হয় নেই, যৌবন না হয় গেছে, তবু যা আছে তাতে, ওর না হয় লোভ নেই, অন্যের, সুজনের, হয়ত লোভ আছে। কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের যুদ্ধ অন্যায়। সফীক তাকে অপমান করলে কৈ ও ত' প্রতিবাদ করলে না! ওর কি উচিত ছিল না অন্যের সম্মুখে তার সম্মান রক্ষা করা? সফীক কী এমন দেবে, তার দলের কাছে ও কী এমন পাবে, যাতে ক্ষতিপূরণ হয়! ক্ষতিই বা কোথায়! এমন কি টাকার দিক থেকেও নয়। তবু কেন এমন ঘটে! কেনো সে বোঝে না তার কথা! তার কি কোন দিকই নেই! সব পুরুষই স্বার্থপর। ওদের উদ্দেশ্য কেবল নিজের কার্য্যসিদ্ধি, দেহের ক্ষুধা মেটান, আরাম পাওয়া আর গৌরব-বোধ, সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, পায়ে লুটচ্ছে, কাঁদছে, মরছে। মেয়েদেরও ওপর ঘৃণা আসে। তার চেয়ে দরজা বন্ধ থাক···ডাকলে খিল খুলবে না, ডেকে ডেকে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু, দেহের শিরা উপশিরায় ডাকবার সময় বিদ্যুৎ চমকায়, বুক গুরু গুরু করে, পা শির শিরিয়ে ওঠে, খানিক পরে দেহ অবশ হয়, চোখে অকারণে জল আসে। চিরটাকাল এই দৈহিক দৌর্ব্বল্যে ও যন্ত্রণায় মেয়েদের ভুগতে হবে, কোনো অব্যাহতি নেই কি! এই বাধ্য-বাধকতার ওপর ভিত্তি করে সমাজ

আর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। রাতে ডাকলে মুখে উত্তর না দিলেও দেহে সাড়া দেয়—এই আদিম, প্রাথমিক জৈব দুর্ব্বলতাকে নিজেদের কাজে লাগান কি নীচ নয়! মেয়েরা পারে না থাকতে, এইটাই পুরুষের শক্তি। ইচ্ছা হয়, সব মেয়েরা সমগ্র পুরুষ জাতকে দুর্ব্বল করে দিক, সেজে, লোভ দেখিয়ে, নির্লজ্জ-ভাবে। ও বল্লে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে, 'দেহের উগ্র বিজ্ঞপ্তি'। কেন বিজ্ঞাপন হবে না? মেয়েদের সম্মান নেই, রাগ হয় না! যতদিন এই ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন মেয়েরা নিজেদের যার-তার হাতে সমর্পণ করুক, বেটাছেলেরা জব্দ হোক, তাদের দম্ভ টুটুক, সমাজ ভাঙ্গুক, পারিবারিক সম্বন্ধ উচ্ছন্ন যাক্।

এক এক সময় আবার রমলার সন্দেহ হয় খগেন বাবু অন্য পুরুষ থেকে ভিন্ন। সে বুঝতে চায়, তার দরদ আছে, অন্তত ছিল। গেল কেন? প্রথমে সন্ন্যাসী, তার পর বিজন, ঐ সফীক, ঐ বাইরের টানের জন্য। ও চায় না সংসারে জড়াতে, ও চায় বাইরে থাকতে। তা হয় না। তাই যদি বাসনা ছিল তবে কেন কানপুরে আসা? দুর্ব্বল, দোলায় দুলছে, কচি খোকার মতন ঝুমঝুমি আর চুষিকাটি দিয়ে ভোলাতে হবে—তাই তার যোগ্য, তাই তার প্রাপ্য। ও চায় না সত্যি মানুষটাকে পেতে, ভুলতে পেলেই ও খুশী। বেশ, সেই ভাল। রমলা ঘর সাজাতে তৎপর হল, আবদার ধরলে সপ্তাহে এক সন্ধ্যা অন্তত সিনেমা যেতে হবে, আর ক্লাবের মেম্বর হবে। বিজন এ কাজে সহায়তা করবে, তাই বিজনেরও চাহিদা বাড়ল রমলার কাছে।

লক্ষ্ণৌ, ফরাক্কাবাদ, জয়পুরের ছিট সহরে প্রচুর পাওয়া যায়, দামও সস্তা। কিন্তু ছিট্ দিয়ে চেয়ার কোচ টেবিল ঢাকা যায় না, ঘরদোর যেন খালি সেমিজ পরে রয়েছে মনে হয়। তার চেয়ে বিলেতী কাপড়ে আভিজাত্য আছে। খদ্দর অচল। ভাড়াটে আসবাবে বসতে ঘেন্না করে, ট্যাঁস ফিরিঙ্গীর এঁটো। বিজন নতুন স্বদেশী ডিজাইনের আসবাব দেখালে, দূর থেকে দেখতেই ভাল, কিন্তু বসা যায় না পা ঝুলিয়ে, পিঠে লাগে, অজন্তা আর মোগলাই-এর মিশ্রণে অসুবিধাই ফুটে ওঠে। তার চেয়ে বিলেতী আসবাবই ভাল, হোক তার গদির গরম, তবু দেহের বাঁকগুলো মেনে চলে। বিজন বল্লে বুর্জ্জোয়া রুচি। সেও সহনীয়, ভারতীয় বুর্জ্জোয়া রুচি নয় এই ভাগ্য। খগেন বাবুকে মধ্যস্থ মানাতে তিনি রমলার মতে সায় দিলেন।

রমলা দেশী ফিল্‌ম্‌ কিছুতেই দেখবে না। তার ভাববিলাস, তার মন্থরগতি, তার গান বাজনার আধিক্য, তার দৈর্ঘ্য, তার গল্পাংশের দুর্ব্বলতা, তার অনুকরণ, তার ফোটোগ্রাফি, কোনোটাই তার পছন্দসই নয়। মাত্র দু'তিনটে দেশী ফিল্‌ম তাকে দেখতে হয়েছে, আর দেখবার দুরাশা তার নেই। বিজন কিন্তু অতটা খারাপ বলে না, নতুন ছবিগুলো মন্দ হচ্ছে না, আদর্শ-বাদের একটা ছাপ পড়েছে, গানও মন্দ নয়, ফোটোগ্রাফি প্রায় নির্দোষ। তবে গল্প দুর্ব্বল নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায় কি? সামাজিক সম্বন্ধকে অতিক্রম করা অসম্ভব কোনো আর্টের পক্ষেই। তবে ফিল্‌মের ভবিষ্যৎ আছে জনমতের পরিবর্ত্তন সাধনের দিক থেকে। খগেন বাবু এক্ষেত্রেও রমলার সঙ্গে একমত। বিলেতী ছবির ভাববিলাস অন্য ধরণের। তার অন্তরে একটা সন্দেহ লুকিয়ে থাকেই থাকে। দেশী ফিল্‌ম্‌ অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, বালিগঞ্জের লেকের ধারে বেঞ্চিতে এণ্ডির পাঞ্জাবী পরা, কোঁচান চাদর ঝোলান সদরঅলার মতন, কেবল একশিরার জন্য যা একটু হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় উঠে যায়।

ক্লাবের কথা উঠতে খগেন বাবু কেবল এইটুকু বল্লেন, 'না পার একলা থাকতে, পরে দেখা যাবে। আগে লোকজনের সঙ্গে আলাপ হোক তার পর ভাল দেখে একটা ক্লাবের সভ্য হলেই চলবে। এত তাড়া কিসের?' বিজন অবশ্য ইডীয়লজির দিক থেকে ক্লাব-ট্লাবের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে মধ্যে মধ্যে যেতেই হয়, টেনিস খেলতে। তা ছাড়া যারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামছে না তাদের পক্ষে সময় কাটান দুঃসহ। অবশ্য, আজকালকার ক্লাবে এমন দু'একজন লোকের সন্ধান মেলে যারা ব্রীজ খেলা আর গাল-গল্প করাকে জীবনের চরম সাফল্য ভাবে না। তাদের অনেকেই বেশ পড়াশুনো করেছে; বিলেতী সঙ্গীতে দখল রাখে, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলে, প্রায়ই মার্ক্সিষ্ট, বেচারীরা কোথাও কথা কইতে পায় না, তাই সন্ধ্যায় ক্লাবে আসে। তবে ব্যাপারটা বুর্জ্জোয়া এটা ঠিক। মোটর নেই অথচ ক্লাবে যাব, এটা অসম্ভব।

খগেন বাবু রমলার পরিবর্ত্তনে খুশীই হলেন। দু'জনে যখন একত্র বসবাস করতেই হচ্ছে, তখন সহজে আদান-প্রদান ভিন্ন গতি নেই। রমলা না এলেই পারত। এমন ত কত দৃষ্টান্ত হিন্দু-সমাজেই রয়েছে যেখানে দু'জনে পরস্পরকে

আন্তরিকভাবে চাইছে, অথচ মিলন অসম্ভব জেনে আপন আপন নিয়তিকে গ্রাহ্য করে নিয়েছে। ছেলেপুলেও হচ্ছে, ভাবও থাকছে। অবশ্য মন ব্যাকুল হয়, কিন্তু নিরুপায়, তাই সম্বরণই রীতি, সংযমই নীতি। খগেন বাবু নিজেও এই বিপুলা পৃথ্বীর কোনো অজানা দেশে প্রবাসী হলেই পারতেন, বিদেশ যাবারও দরকার হত না, লাইব্রেরীর মধ্যে বইএর ওপর মুখ গুঁজড়ে থাকলেই চলত, কোণে একটা নরম চেয়ার, পাশে একটা ছোট টেবিল, হাতলের ওপর লিখবার তক্তা, আর একটা ভাল চাকর, যে কফি আর পাইপ সাফ্ করতে জানে, আর তাক থেকে বই এনে দিতে পারে। সে জীবনটা মন্দ ছিল না, কিন্তু প্রতীতি জন্মাল যে বহির্মুখিনতায়, কর্ম্মপ্রবাহে দ্বন্দ্বের অবসান আসবে। এইটাই জড়বাদের জয়, অশান্তির ক্ষয়, তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়। দেহের চর্চ্চায় যে সহজ আনন্দ জন্মায় তার মূল্য এই বিচ্ছিন্ন জগতে কম নয়। যখন হিন্দু সভ্যতা জোরাল ছিল তখন জড়বাদ হেয় হয় নি, তখন কামশাস্ত্রে চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটির কদর ছিল, খোঁপা বাঁধারই বা কত ঢঙ, গন্ধমাত্রারই বা কত রকম, মালাই বা কত রঙ বেরঙ ফুলের, তা ছাড়া, গান বাজনা নাচ, ম্যয়, পান সাজা পর্য্যন্ত। দেহের প্রতি অঙ্গের পরিশীলনে যেটা ফুটে উঠবে সেটা হবে দেহাতীত, এই ছিল উদ্দেশ্য। জড়, বস্তু, তথ্যই প্রথম, প্রথম হলেই সর্ব্বস্বতা আর থাকে না, ব্যাপারটা গৌণ হয়ে ওঠে। নচেৎ তাকে অবহেলা করলেই সেটা উঁকি মারবে, অজানিতে সব কৃষ্টিকে টেড়া করে দেবে, ফলে কাঁটার জন্ম, ফুল নয়, ফলও নয়। অতএব রমলার স্ত্রীত্বটাই তার সঙ্গে সম্পর্কের আদিম প্রতিজ্ঞা। তার ওপর খগেন বাবুর ব্যবহার যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন খগেন বাবু অন্য কাজে মন দিতে পারলেন।

ইতিমধ্যে কানপুরের ঘটনাবর্ত্তের চাঞ্চল্য তাঁকে স্পর্শ করেছে। গুমোট ঘরে পাখার ঝড় ছাপিয়ে ঝির ঝিরে মৃদু মন্দ হাওয়া এল। লক-আউট আর হরতালে এখন কোনো প্রভেদ নেই। হরতাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে, প্রথমে সমগ্র মজুর সংখ্যার শতকরা বার জন হরতালী ছিল, এখন কুড়ি। কাগজে লিখেছে, অনুপাতটা যৎসামান্য, অতএব আন্দোলনটা আংশিক ও জনকয়েক বাইরের লোক, যাদের কাজকর্ম্ম নেই, যারা সম্ভবতঃ কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের টাকা খেয়েছে, যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ ও মজুর-কিষাণদের মধ্যে

ভালবাসার সম্পর্ক, ভদ্রতা, এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্তকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত, যারা জাতীয়তার পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন না বুঝে একটা কাল্পনিক শ্রেণীর স্বার্থ ও তারই বিশ্বজনীনতাকে শ্রেয় ভাবে, তাদেরই কারসাজি মাত্র। খগেন বাবুর বুদ্ধি ঐ সব যুক্তি গ্রহণ করল না, মন বিরক্ত হল তার অসারত্বে। দৈনিক কাগজ তিনি নিয়মিত কখনও পড়তেন না, পড়লেও ব্যস্ত হতেন না। এখন সকালে অন্তত তিনখানি দৈনিক চায়ের টেবিলে থাকবে হুকুম দিলেন। তারপর কাটিং রাখার পালা, বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সংবাদ সংগ্রহেই যায়।

ঐ সব কাগজের টুকরো নিয়ে, প্রত্যেক দিনই তিনি বিজনদের আড্ডায় যেতেন। সফীকের সঙ্গে আলোচনা হত। অনেকেই আসত, তার মধ্যে করিমকে বিশেষ ভাল লাগল। জীবনে তিনি ঐ ধরণের লোকের সঙ্গে মেশেন নি, তথাকথিত বড় লোকের সঙ্গ তিনি চর্চ্চা করেননি অবশ্য, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যাদের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন তারা কেউই অন্ন-কষ্টে ভোগেনি। শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদারের প্রতিবেশই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই সর্ব্বপ্রথম অশিক্ষিত ও গরীবদের মধ্যে বুদ্ধি ও তেজের নিদর্শন তিনি পেলেন। বরাবর তিনি এই ভেবেছেন যে শিক্ষার অভাবেই দেশ স্বাধীন হবে না। অতএব জনগণের মধ্যে শিক্ষার যত বিস্তার হয় ততই মঙ্গল। উচ্চশিক্ষা না হলেও চলবে, কিন্তু অন্তত পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত, বি, এ, ডিগ্রী হলেই ভাল। অর্থাৎ মনটা সজাগ না হলে স্বরাজ-সাধনা স্বপ্নবিলাস।

করিমকে দেখে সজাগ রাখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। প্রথম উদ্দেশ্য যদি স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা হয়, তবে করিমের অ-শিক্ষাই যথেষ্ট। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, তার অতিরিক্ত সমাজের স্বার্থ, অর্থাৎ মঙ্গল। করিম অবশ্য সমগ্র সমাজের কল্যাণ কামনা ও কল্পনা করতে অসমর্থ, কিন্তু মনে হয় যে-ধরণের মঙ্গল সে চাইছে সেটা অধিকতর পরিব্যাপ্তির প্রতিকূল মোটেই নয়, বরঞ্চ অনুকূলই সে ভাবছে। এটা ঠিক, করিমের দল বল এখনকার ওপর স্তরের লোকজনকে সে-ভাবে দেখবে না যে রকম বড় লোকরা এখন গরীবদের দেখছে। কারণ সোজা, তখন ব্যবসায় মুনাফার হারবৃদ্ধির তাড়না থাকবে না। তবে করিমের চেতনায় ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি স্পষ্ট নয়। আবার সেই চেতনার

কথা ঘুরে ফিরে আসে। সেটা বুদ্ধি নয়, শিক্ষার্জ্জিত ফল নয়, জ্ঞানও বলা চলে না তাকে। খগেনবাবু তার কোনো সংজ্ঞাই দিতে পারেন না।

সফীককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে কূটতর্ক এড়িয়ে চলে, কিন্তু অক্ষমতার দরুণ নয় বেশ বোঝা যায়। অবান্তর ব'লে, না, অনেক গোড়ার কথা কইতে হয়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেটা সে চায় না, এই জন্য? মৌনতায় শক্তি বাড়ুক আর নাই বাড়ুক শক্তি ক্ষয় হয় না নিশ্চয়। ভাওয়ালীর নির্দ্দেশও হতে পারে। ভাওয়ালীর নামে প্রাণে আতঙ্ক জাগে। যারা নতুন সমাজ গড়তে যাচ্ছে কোথায় তাদের প্রাণের প্রাচুর্য্য থাকবে, পরিবর্ত্তে তাদেরই মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বেশী। প্রকৃতির কি ক্রূর পরিহাস? তারই প্রত্যুত্তরে কি সফীকের ঠোঁট বাঁকা? প্রকৃতির না প্রতিষ্ঠানের? যক্ষ্মা সামাজিক ব্যাধি, দারিদ্র্যের রোগ; হয়ত সাম্যবাদ যক্ষ্মারোগীর সর্ব্বজনবিদিত আশা-সর্ব্বস্বতা, বাঁচবার ব্যাকুলতা। তবু, রমলা কেন অসভ্যতা করলে! ইতিপূর্ব্বে টেবিলে সে কখনও অভদ্র হয় নি। আশ্চর্য্য লাগে। জিজ্ঞাসা করলে সেও কারণ বলতে পারবে না, কিংবা বলবে না, সফীকেরই মতন নীরব থেকে ব্যবহারকেই চরম পরিচয়ের বিষয়, সেইটাই মানব সম্বন্ধের একমাত্র যোগ, এবং তার অতিরিক্ত জ্ঞানের অপ্রয়োজনীয়তাই প্রতিপন্ন করবে। চারধারেই দরজা বন্ধ, দেওয়ালে মাথা ঠোকে, সর্ব্বত্রই জড়। তবে কি চেতনা কোথাও নেই, কোন্ ছিদ্র দিয়ে বহির্গত হয়ে মানুষ মানুষকে বোঝে, কবি স্বল্পবাক্যে অশরীরী ভাবকে মূর্ত্তি দেয়, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করে, একজন আরেকজনকে ভালবাসে? ব্যবহারটাই যথেষ্ট মানা অসম্ভব—আচরণের অনুরণন রয়েছে, উদারা মুদারা তারা পৃথক নয়, একত্রে বাজে, রেশ বাদ দিয়ে স্বর নেই। আচরণ চৈতন্যের আশ্রিত, চৈতন্যের কাছে লোকে স্পষ্ট অর্থ প্রত্যাশা করে। পায় না, কারণ আচরণে অনেকখানি জড় মেশান রয়েছে—বিশেষতঃ মেয়েদের। রমলা বুদ্ধিমতী নিশ্চয়, কিন্তু ব্যবহারে অনিশ্চিত। কোন্ দিকে বেড়াল লাফাবে কে জানে? যদিও পড়বে শেষে সেই খাবারই ওপর, মাটির পরে। মেয়েদের মধ্যে মার্জ্জার-অংশই বেশী। সফীক জড়বাদী, তবু তার ব্যবহারে জড়ত্ব নেই। রমলারই মতন ব্যবহার-সর্ব্বস্ব, তবু সে সুনিশ্চিত। চৈতন্যের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—আগে বীজ না আগে ফল

এ তর্ক বিফল—যে জানে অচ্ছেদ্য সেই সহজ, যে ভাবে পৃথক সে লজ্জা পায়, তাই সে অনিশ্চিত, খামখেয়ালী।

প্রথম প্রথম খগেনবাবুর আর সফীকের মধ্যে যে আড়ষ্ট ভাব ছিল সেটা ঘুচে গেল একটা কাজের মারফতে। সফীক খগেন বাবুকে অনুরোধ করলে যে যদি তাঁর সময় থাকে তবে মন্ত্রীপক্ষের জন্য একটা নোট লিখতে হবে। বিষয়টি হল এই : মালিকদের এমন কোনো অধিকার আছে কি না যাতে তারা মজুরদের তাড়াতে পারে। খগেন বাবু রাজি হলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত খেটে তিনি একটা খসড়া তৈরী করলেন। খগেন বাবুর মতে কোনো অধিকারই নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব, কিংবা অবাস্তব ও জন্মগত নয়, অধিকার থাকলেই কর্ত্তব্য থাকবে। অধিকার ও কর্ত্তব্য দুয়ে মিলে আইনের চুক্তি। অন্য দেশের মজুর-সভার সঙ্গে মালিকদের বোঝাপড়া থাকে যাতে মজুরীর সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হয়, সেই বোঝাপড়া সরকার স্বীকার করে নেয়। এ ক্ষেত্রে মজুর-সভাকেই অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, অতএব বোঝাপড়া, অঙ্গীকার, স্বীকারের কথাই আসে না। তবে অন্য দিকে বলা চলে, প্রভু-ভৃত্যের আইন-সম্মত সম্বন্ধে বরখাস্ত করবার ক্ষমতা মালিকদের ওপর ন্যস্ত হলেও সুনির্দ্দিষ্ট কারণের অবর্ত্তমানে চাকরী থেকে তাড়ানতে ক্ষতিপূরণের দাবী জন্মায়। কিন্তু কারণ দেখান মালিকের পক্ষে যেমন সোজা, অ-প্রমাণ তেমনই মজুরদের পক্ষে কঠিন, কারণ, ব্যয়সাধ্য। অতএব, 'কলেক্‌টিভ্ বার্গেনিং'-এর অধিকার অর্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত মালিকরাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

সফীক নোটটি পড়ে বল্লে এটা মন্ত্রীপক্ষের হাতে দেওয়া চলে না। খগেন বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলেন, 'এখনকার ব্যবস্থা যা তার অতিরিক্ত লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

স—'তা ঠিক। কি ভাবে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে সে সম্বন্ধে ধারণার অভাবে এর বেশী বলাও যায় না।'

খ—'বরখাস্তের অধিকার নিয়ে বিবাদ এখন সমীচীন নয়। আমার মতে কলেক্‌টিভ বার্গেনিংএর ওপরই আপনারা জোর দিন।'

করিম বল্লে,—'সেটা পরে আসবে, আগে মজদুর-সভা যে ক্নানপুর শ্রমিক

শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি এটাই ওদের স্বীকার করান চাই। অবশ্য বাবু যা বলছেন সেটাই দরকারী।'

খগেন বাবু উৎসাহের সঙ্গে করিমের বক্তব্য সমর্থন করলেন। সফীকের রূঢ়তায় মনটা ভারী হয়েছিল, এখন লঘু হল।

করিম বল্লে,—'বাবু সাহেব, সব চেয়ে কম মজুরী, যার কম দিলে কর্ত্তাদের জরিমানা হয় শুনেছি, সে বিষয় কেতাবে কি বলে? অন্য দেশে ঐ রকম কানুন আছে শুনেছি, এখানে হবে না কেন?'

বিজন—'ওরা বলছে মাত্র একটা সহরে, একটা প্রদেশে ঐ আইন চালান দুষ্কর, কোথাও এমনতর হয় নি।'

খ—'কাগজে দেখলাম বটে। ওদের মতে, নিম্নতম পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করতে পারে একমাত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র, কাজটা প্রাদেশিক সরকারের নয়; কারণ প্রাদেশিক হার কম-বেশী হলে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শ্রমিকরা চলে যাবে।'

স—'মূলধনও ভাগবে ভয় দেখিয়েছেন।'

বি—'এর জবাব কি, ওস্তাদ?'

সফীক আর করিম, উভয়েই খগেন বাবুর দিকে চাইলে। খগেন বাবু সঙ্কল্প করলেন যে তিনি ব্যাপারটি বিশদ করে বুঝবেন প্রথমে, তারপর যদি নোট চায় ওরা, তবে একটা লিখে দেবেন।

পরের দিন একজন কর্ম্মীর সঙ্গে খগেন বাবু লাইব্রেরী ঘেঁটে বেড়ালেন। যা বই ও রিপোর্ট পাওয়া যায় সেগুলি পুরানো, তাতে কাজ চলে না। মজদুর সভার বাড়িতে ও বালাই নেই, খানাতল্লাসীর ভয়ে এবং অর্থাভাবে। সহরে অনেক কলেজ আছে, তারা নাকি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে চায় আবার। মজুর-সমস্যা সংক্রান্ত পাঠের কোনো বন্দোবস্ত নেই। যা পাওয়া গেল তাই পড়ে খগেন বাবু আড্ডায় গেলেন। ইংরেজীতে বল্লেন সফীককে যে কর্ত্তৃপক্ষদের আপত্তি টেঁকে না। ক্যানাডায় প্রথমে প্রদেশে প্রদেশে, এমন কি আরো ছোটো ছোটো জায়গায়, রিজ্যনে, সর্ব্বাগ্রে নিম্নতম মজুরীর হার ঠিক হয়েছে, পরে কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য অদল বদল করে সেই বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছে। সফীক খগেন বাবুর কাছ থেকে ছোট একটি

নোট লিখিয়ে সেটা তখনই উধামজীর কাছে পাঠালে। খগেন বাবু জানতে চাইলেন, যদিই বা যুক্ত-প্রদেশে নিম্নতম হার ঠিক হয়, তবে ভিন্ন প্রদেশে মজুরীর হার কমবে না বাড়বে ?

সফীক—'কমত-বাড়ত, যদি প্রবাসী হবার মোহ থাকত লোকের। তারা ঘরের কোণেই জন্মাবে ও মরবে। হার কতকটা তারই ওপর নির্ভর করছে। যদি উঁচু হয়, তবে গ্রামে যাদের জমি নেই তারা কানপুর আসবে। কোলকাতা বোম্বাই, শোলাপুর, আমেদাবাদের গড়পড়তা মজুরীর চেয়ে এ-অঞ্চলে নিম্নতম মজুরি কিছুতেই যখন বেশী হচ্ছে না তখন ও-অঞ্চলের ক্ষতি হবে না। সেইখানেই এই প্রদেশের মজুর বেশী গিয়েছে। অতএব ক্ষতি কিছুতেই কারুর অর্শাবে না। এখানকার হার যদি সত্যই বেশী হয়, তবে কানপুর লোক আকর্ষণ করবে, সেটা লাভ, কারণ…'

খ—'ক্ষতি হবে মালিকদের, তারা কি মজুরীর অতিরিক্ত ভারে নুয়ে পড়বে না ? কিছুদিন পরে তারা অন্যত্র মিল খুলবে, যেখানে ঐ সব ঝঞ্ঝাট নেই।'

স—'মিথ্যে কথা ! তাদের লাভের হার দেখেছেন ? যতদিন শ্রমিক-আন্দোলন চলেছে ততদিনে তাদের উৎপাদন বেড়েছে, কমেনি। কেবল তাই নয়—এরই মধ্যে ক'টা নতুন কোম্পানি ও কল খোলা হয়েছে জানেন ? গোলমালের হাত থেকে রেহাই পেতে যদি অন্যত্র, আশ পাশের রিয়াসতে ফ্যাক্টরী খোলা হয় তবে সেখানকার লাভ, সেখানকার ফিউড্যালিজম্ শীগ্‌গির ধূলিসাৎ হবে। খাল কেটে কুমীর ঢোকানটা ভারি মজার ! বোম্বাই থেকে স্যাসুনের মিলগুলো উঠে গেল, না খেতে পেয়ে পুঁজিদাররা মরে যাচ্ছে ? টাকা সেখানে মাটিতে পোঁতা রয়েছে ?'

বিজন বল্লে, 'তা ছাড়া মজুরী বাড়লে কর্ম্মক্ষমতাও বাড়ে। সেই দিক থেকেও ওঁদের লাভ।'

বাড়ি ফিরে খগেন বাবু স্নানের কামরায় গেলেন। শুখনো গরমে নেয়ে সুখ নেই, তখনই তেষ্টা পায়। রাস্তায় ধূলো আর কয়লা, সফীকদের ঘর খুব নোংরা নয়, তবু তার অপরিচ্ছন্নতা খারাপ লাগে। পুরুষের চেষ্টায় ঘর দোর পরিষ্কার সহজেই রাখা যায়, তবে ছেলে-ছোকরাদের ওদিকে খেয়াল

থাকে না। রমলার নজর অবশ্য একটু বেশী, চাকর খাটায় সাবিত্রীর চেয়ে, কিন্তু সাবিত্রীর গিন্নীপনায় আপত্তি জমত, রমলার প্রভুত্ব সহজ। চাকর-বাকরে বেশ বুঝে নেয় কোথায় ও কতখানি অবাধ্যতা চলবে। কারণ, গোটা মানুষের ব্যবহারে ফাঁক থাকে না যার ভেতর দিয়ে অবাধ্যতার আগাছা ফুঁড়ে বেরুতে পারে। কম মেয়েরাই আস্ত জীব। রমলার ব্যবহারে পূর্ব্বে একটা সামঞ্জস্য ছিল, কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, নইলে সাবানের বাক্সে জল থাকে? এই ধরণের ঢিলেমি তিনি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করেন নি। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। লোকে ভাবে সামান্য জিনিষ এগুলো, কিন্তু ভেবে দেখলে এই খুঁটিনাটি গাফিলতীতে অযত্ন ধরা পড়ে, চরিত্রের দুর্ব্বলতা, মনোভাবের পরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়। বিশেষত যখন নিজের সাজসজ্জায় ত্রুটি নেই, ক্রমেই সেটা উগ্র হয়ে উঠছে।

রমলা আর বিজন টেবিলে অপেক্ষা করছিল। খগেন বাবু বসে গেলেন। বয় সুপের প্লেট নিয়ে যাবার পর আড়ষ্টতা ভাঙ্গল। বিজন কাঁটা ঠুকতে-ঠুকতে বল্লে, 'উনি নাকি চাকরী করবেন!' খগেন বাবুর মুখে কোনো ভাবের চিহ্ন ফুটল না দেখে বিজন নিজেই মন্তব্য করলে, 'চাকরী অমনি কথার কথা আর কি! তার চেয়ে মজুর পল্লীতে ছেলেমেয়েদের পড়ান ভাল! কি বলেন, খগেন বাবু?'

খ—'আমি কি বলব! ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।'

র—'তোমাদের ঊর্দ্ধ্ব আমি জানি না।'

খ—'পাড়াও অত্যন্ত নোংরা।'

র—'এখানে বাঙালী মেয়েদের স্কুল নেই?'

বি—'আছে, খুব ভাল স্কুল। কিন্তু দশটা চারটে, মনে থাকে যেন, পারবে? তা ছাড়া একটা বড় কথা আছে···সাধারণ ভাবে বলছি।'

খ—'বলই না! বড় কথাই ত' শুনতে চাই।'

বি—'ঠাট্টা ছাড়ুন; সব বাঙালী অ-বাঙালী, মেম মাষ্টারণীদের দেখলে দুঃখ হয়। যেন খেতে পায় নি কতদিন, চোখের কোল বসা, কণ্ঠার হাড় বেড়িয়েছে, হাতের চুড়ি ঢলঢলে, যেন জোর করে ঘরোয়া সাজ পরেছে। অথচ,

একটু নজর দিয়ে দেখুন, সব যেন ওত পেতে বসে আছে, বিয়ের বেনারসী পরবার জন্য। আমি জানি ব্যাপারটা কি।'

র—'খুব খাটিয়ে নেয় বুঝি? শুনেছি সকলকেই প্রায় বাড়ীতে টাকা পাঠাতে হয়?'

বি—'তা, খাটুনি আছে বৈ কি! স্কুলের সেক্রেটারী, সমিতির সভ্য, বড়লোক অভিভাবকদের বাড়ি ধন্নাটাও বাদ যায় না। তবে, টাকা? সে ত' মজুররাও পাঠায়। বাহাদুরীটা কোথায়?'

র—'কষ্ট আর অপমান দু-ই বেশী লাগে তাদের। ভদ্রঘরের মেয়ে সকলেই।'

বি—'ওটা মস্ত ভুল রমাদি। ভদ্রঘরের মেয়েদেরই অপমান কম লাগে। একবার মজুর-গিন্নিদের দেখো, এক একটি যেন রায়-বাঘিনী। কথায় কথায় স্বামী ত্যাগ।' বলেই বিজন অপ্রস্তুতে পড়ল। কথা ঘোরাবার জন্য খগেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি মেয়েদের রোজগার করা পছন্দ করেন?'

খ—'আমার পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায়? সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সব শ্রেণীর মেয়েদের খেটে ঘরে টাকা আনা দরকার।'

বি—'আলাদা তহবিল থাকলে আত্মসম্মান বজায় থাকে।'

খ—'কেবল তবিল নয়, রোজগার। স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, ওটা প্রারব্ধ নয়। রোজগারিতে কেবল আত্মসম্মানটাই একমাত্র লাভ নয়।'

বি—'তা ঠিক, ঝগড়াঝাঁটি থেকে পরিত্রাণটাও মস্ত জিনিষ।'

র—'তাতে অত ভয় কেন?'

বি—'মেয়েদের ও-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় যত না দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।'

খ—'সেটা সত্যকারের বিরোধ নয়।'

বি—'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ওরা শ্রেণী নয় খগেন বাবু, ওরা ভিন্ন জাতি!'

র—'বিজন তোমার জ্ঞান খুব এগিয়েছে দেখছি। কোথা থেকে শিখলে এত?'

খ—'যতটা পৃথক থাকলে জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হয়, ততটা দূরত্ব বিজন বজায় রেখেছে কি না, তাই।'

বি—'যা বলতে ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু রমাদির মতন মেয়েও পারবে না। ঐ ভিন্ন জাতের জন্য, দেখবেন তখন। ওঁর মধ্যে যে বিরোধের বীজ আছে তাতে ফল ধরে না, ধরলেও সেই মাকাল। ফল ধরে কেবল শ্রেণী সংঘর্ষে।' রমলার চিবুক দৃঢ় হল।

খগেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমঝোতার বিষয়ে বিজন তোমার মত কি?'

বি—'ওটা হবে না আমার বিশ্বাস। তাড়িয়ে দেবার অধিকার মালিকরা কখনও ছাড়ে! অধিকার জন্মগত নয়, যাদের ভবিষ্যত আছে, তাদেরই শক্তির জোরে অধিকার আছে, অন্যদের অধিকার স্বার্থরক্ষা। অবশ্য ওস্তাদ ভাবে, অধিকার নিয়ে লড়াই করা বৃথা।' রমলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে, 'তবে ত' দেখছি ওস্তাদের মত অগ্রাহ্য করবার সামর্থ্য ধর!'

বি—'নিশ্চয়ই, কেন ধরব না? ওদের অধিকার থাকলে আমারও আছে খেটে খাবার। দুই অধিকারে লড়াই হোক!'

খ—'দুঃখ এই বিজন, প্রথমটার স্বীকার সরকারের পক্ষে সোজা, দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞান।'

বি—'আমাদের মন্ত্রীপক্ষে এমন লোক আছেন যাঁরা অজ্ঞান নন, তাঁদের আমরা খবর দিয়েছি। তাঁরা এসে পড়লে যাই বোঝাপড়া হোক না কেন আমাদের লাভ বই ক্ষতি হবে না।'

খ—'সুখবর দিলে বিজন। একটা নিষ্পত্তি হলে রমাদি তোমাকে আরো কাছে পাবেন।'

বি—'তা আর পাচ্ছেন না। অনেক কাজ থাকে যেগুলো বাহাদুরীর নয়, তবু না হলে সব কেঁচে যায়। যেমন ধরুন পাড়ায় পাড়ায় ফাটকে ফাটকে বক্তৃতা, রাত্রে মজুরদের ছেলে পড়ান, রিপোর্টের মালমশলা যোগাড়। ওস্তাদ আপনার নোটের তারিফ করছিল। এই ত চাই! এত লেখা-পড়া শিখলেন, পুঁজি নিয়ে কি হবে? নেমে পড়ুন, বেড়ার ওপর আলগোছে চিরকাল বসে থাকা অচল। বিলেতে অনেক দৃষ্টান্ত আছে, দিগগজ পণ্ডিত এধারে, অথচ শ্রমিকদলের সভ্য, পার্টির কাজও করছে। আপনি ভাবছেন স্বাধীনতা যাবে, নয়?'

খ—'অনেকটা ঠিক।'

বি—'অনেকটা নয়, পুরোপুরি। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা ঐ ছুতো তোলেন। কিন্তু স্বাধীনতা কোথায় ও কতটুকু? বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি!'

খ—'সেটা চিন্তারই গলদ। ভয় ভাবনার খাদ সর্ব্বদাই মিশে রয়েছে, সেটা যখন যাবে তখন…'

বি—'তখন খাঁটি সোনাটুকু পড়ে থাকবে, এই বলছেন ত! বেশ, মানলাম যে ভাবের মিশ্রণ সর্ব্বদাই থাকে। কিন্তু ভাবগুলো কোত্থেকে উঠছে? আপনার শ্রেণী-স্বার্থ থেকেই। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তে তাদের অজানিতে বর্ত্তমান বন্দোবস্তর সমর্থন নেই? দোষ দিচ্ছি না, কারণ এই সংস্থানের কৃপাতেই তাঁরা খাচ্ছেন দাচ্ছেন। বুদ্ধির দিক থেকে এটা বিশুদ্ধ? বড় বড় অর্থনীতির অধ্যাপক প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী নন কেন? কারণ সোজা। প্ল্যানিং হলে তাঁদের হাতে কলমের জায়গায় কাস্তে ও হাতুড়ি আসবে, খাটতে হবে বেশী, আধিপত্য, খাতির সব যাবে ক'মে। ভিক্‌টোরীয়ান যুগে এক স্ত্রীই ছিল ফ্যাশান, অমনি পণ্ডিতরা খুঁজে পেতে দিলেন যে অসভ্য জাতি, এমন কি পশুপক্ষীদের মধ্যে বহু বিবাহ কখনও কোথাও প্রচলিত নেই, এমন কি এক স্ত্রী এক স্বামীর সম্বন্ধটি জীবতত্ত্বের প্রাথমিক প্রবৃত্তি। আচ্ছা, আচ্ছা আমার দৃষ্টান্ত না হয় ভুলিই। স্বাধীন চিন্তা কাদের পক্ষে সম্ভব? যারা ভাল স্কুলে কলেজে পড়েছে, বই কিনতে পেরেছে। কারা তারা? যাদের বাপের পয়সা আছে। কিন্তু যারা পড়তে পায় নি, স্কুলের খাতা পেনসিল কেনবার যাদের সামর্থ্য নেই, আর বই কেনা যাদের স্বপ্নাতীত, যাদের চাকরী নেই, থাকলেও মাসিক বিশ টাকা, চারধারে বুভুক্ষু আত্মীয়স্বজন, তাদের চিন্তা নেই, সুযোগ নেই, অতএব স্বাধীনতার তাগিদই নেই। আপনি কি তাদের বাদ দিচ্ছেন সমাজ থেকে? তাদেরই যে সংখ্যা বেশী, খগেন বাবু! ধরলাম যে তারা প্রত্যেকে বড় কবি হবে না, তবু চারধারে ষ্টাণ্ডার্ড না উঁচু হলে আপনার চিন্তার স্তরই যে নেমে যাবে! কি রকম জানেন? যেন চারপাশে ঠেল চাই তবে আপনারা দাঁড়াতে পারবেন, সার্থক হবেন। মাপ করবেন, খগেন বাবু, আমি সুজনদার মত বইটই পড়িনি, ছেলেবেলা টেনিস খেলেছি, মোটর চড়েছি, রমাদির আদর খেয়েছি, কিন্তু কানপুর আমাকে নতুন করেছে, ভেঙ্গে

চুড়ে গড়েছে। ভাবি, আজ যদি ওস্তাদের সঙ্গ না পেতাম, তবে সাউথ ক্লাবের সভ্য হয়েই জীবনটা কাটত। রমাদি, তোমার কাছে আসা কতদূর নিরাপদ জানি না।'

রমলা এতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক ছিল। বিজনের শেষ কথাগুলিতে তার চমক ভাঙ্গল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ার থেকে উঠে নিজের ঘরের দিকে গেল। যাবার সময় স্বপ্নাবিষ্টের মতন উচ্চারণ করলে, 'বেশ এস না।'

'রাগ হল, রমাদি!'

রমলা ম্লান হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে কি একটা শব্দ হল, চেয়ারটা বোধ হয় উল্টে গেছে, বিজন ছুটে ঘরের মধ্যে যাচ্ছিল, পর্দ্দায় রমলার সঙ্গে ধাক্কা খেলে।

খ—'কি পড়ল ?'

র—'কিছু না। বোসো, বিজন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।' রমলা দাঁড়িয়ে রইল, বিজন বসল।

র—'শুনলাম তোমার কথাবার্ত্তা। অথচ তুমি ষ্টেশনে সেদিন বল্লে, ভালই করেছি। কোনটা ঠিক ? আমার সঙ্গতে যদি ক্ষতিই হয়, তবে আমাকে ত্যাগ কোরো। তোমার ওস্তাদ আছে, তাই তুমি পারবে। তোমারও কি ঐ মত ? আমাকে তোমরা দুজনে অপমান করছ কেন ? আমার দ্বারা যদি সবই অসম্ভব তবে কেন কানপুর এলাম ?'

খ—'রমলা, তুমি শোওগে যাও।'

র—'যাব না, বলতে হবে। কি করেছি আমি যাতে বিজন প্রমাণ পেলে যে আমি…ঐ রকম ?'

বি—'আমি কিছুই বলিনি, রমাদি। সাধারণভাবে কথা হচ্ছিল, তুমি সামনে ছিলে, তাই তোমার নামটা জুড়ে দিলাম।'

র—'আমার সঙ্গ বিপজ্জনক কেন ?'

বি—'মোটেই নয়, ঠাট্টা বোঝ না তুমি। মেয়ে মানুষ, পয়লা নম্বরের। আচ্ছা, আমি এখন যাই। সারাদিন ঘুরেছ, বিশ্রাম নাওগে যাও। কাল যদি সময় পাই আসব।'

র—'আসতে হবে না।' বিজন ধীরে ধীরে চলে গেল। খগেন বাবু নীরবে বসে রইলেন। রমলা ঘরে যাবার পর টেবিলে বসে কাজ সুরু করলেন।

ডিভিডেণ্ড দিয়েছে শতকরা দশ থেকে পনের, বিশ পর্য্যন্ত। মূলধনে আবার মুনাফা জমা হয়েছে, তাই হার কম দেখাচ্ছে। এ-কোম্পানী ও-কোম্পানীর সঙ্গে জোড়া, একটার কম লাভ, হয়ত লাভ নেই, অন্যটার পনের—বোঝা যায় না লাভের গড়পড়তা হার কত। মোটামুটি দশের কম নয় যদি ধরা যায়, তবে পনের টাকা নিম্নতম মজুরী ঠিক করলে উৎপাদন খরচায় জোর আড়াই পারসেণ্ট বাড়বে, তবু থাকে ৭॥০ শতকরা, মন্দ কি ? গবর্ণমেণ্ট পেপারগুলোর হার তিন, তার দুগুণ থাকবে তবু। অবশ্য বড় ফ্যাক্টরীগুলো। ছোট ফ্যাক্টরীতে মজুরী আরো কম, সংখ্যাও বেশী নয়। তাদের আপাতত বাদ দিয়ে বড় ফ্যাক্টরীর মজুরী ধরলে বিশেষ ক্ষতি হবে না মনে হয়। প্রেফারেন্স শেয়ারগুলোর বাজার দর অত কেন ? নিশ্চয়ই যারা শেয়ার খেলে তারা জানে লাভ রীতিমত হচ্ছে। তারা আট-দশের কম খেলেই না। কেন যে মিলওয়ালারা বলছে পারবে না বোঝা গেল না। তাদের হিসেবে নিশ্চয়ই গলদ আছে। কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। হররকমের কাজ পিছু কত মজুরী তারও পাত্তা নেই। কোনো সিদ্ধান্তে আসা চলে না। সন্দেহ হয় যেন পনের টাকা মজুরী ঠিক হলে লাভের হার শতকরা এক টাকা কমবে, যদি অবশ্য উৎপাদনের খরচের অন্যান্য অঙ্গগুলো যা ছিল তাই থাকে। খগেন বাবু পৃষ্ঠা তিনেকের একটা নোট লিখলেন।

ভেতরে যেতে ইচ্ছে হয় না। রমলা হঠাৎ মেজাজ না দেখালেই পারত। বিজন এমন কিছু অপমানসূচক কথা ব্যবহার করে নি যার জন্য রমলা তাকে কটুকথা শোনাতে পারে। তার ধারণা সে জানিয়েছে মাত্র। হয়ত ভুল। বিরোধের বীজকে লালন পালন করানই ত' মেয়েদের ধর্ম্ম। মাতৃত্বের অর্থই তাই। নতুন বৌ এসে ভাইএ ভাইএ মনোমালিন্য ঘটায়, তার উদ্দেশ্য নতুন ঘর বাঁধা। অবশ্য তার পর কেবল সেই সংসারকে পাকা করা ছাড়া অন্য কিছু কর্ত্তব্য থাকে না তবু একটা সীন্থেনীস্ হয় ত! বিজন এইটাই বলতে যাচ্ছিল। ছেলে মানুষ, তাই মন্তব্য পরিষ্কার সাজাতে পারে নি। কিন্তু

মাথা বেশ পেকেছে এই অল্প বয়সে। এখনও ভাবের ঝোঁক রয়েছে, তা থাক, কিন্তু শিখল কোথেকে? ওস্তাদের ওপর ভক্তি অগাধ। তাঁর সঙ্গে মতের পার্থক্য থাকতে পারে এ-সন্দেহটুকুর অস্তিত্ব সে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, তাই সেটা ধরিয়ে দিলে চটে। ভক্তির প্রসাদে চিন্তা সরল হয় না কি? নিজের বেলা হয় নি। অবশ্য ভক্তির যুগ তাঁর নিজের জীবনে আসেনি। নিশ্চয় অন্য কারণ। চিন্তার চর্চ্চা না করেই বিজন আসরে নেমেছে। কর্ম্মের আগুনে বুদ্ধি সাফ হয় না, ঝলসে যায় কেবল। কি ভাবে হল কে জানে, তবে বিজন আরেক ধাপে উঠেছে। সেখান থেকে সে কথা কইল এতক্ষণ। বক্তৃকার মক্স···তা হোক। রমলা সে-ধাপে ওঠে নি, তাই গেল চটে। যেন সাবিত্রীরই দিদি, রাগ আর রাগ, মুখ ঝামটা দেওয়া মজ্জাগত। অঙ্গার শতধৌতেন···মাষ্টারী পারবে না। কিন্তু চাইল কেন করতে? একলা থাকার ভয়ে? কত রকম একাকিত্বই না আছে এই সংসারে! এক নীরবতার মধ্যে আরেক নীরবতা, সহরের নিরর্থক শব্দপ্রবাহতে থেকে মন নিরাগ্রহ হল, একটা ফাঁক এল, মন বসল কবিতা রচনায়, অশরীরী রূপ পেল, অমনি এল আরেকটি অবসর, সেটি পড়লে সহৃদয় পাঠকে, লেখক পাঠকের মিলনে চতুর্দ্দিকে অবকাশের সৃষ্টি হল। কেন, কি ভাবে একাকিত্বের এই চীনে বাক্স তৈরী হয় বোঝা যায় না। শূন্য শাঁখে সমুদ্রের ডাক। মিলনের মধ্যেও বাষ্পের পর্দ্দা, সেটা বিকিরণকে রুদ্ধ করে। বুকের মধ্যে মুখ লুকালো রমা, ধুক ধুকুনি শুনলে, তবু একা, নচেৎ, কেন মাষ্টারী করতে চায়! পার্থক্য সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়, তর, তম-তে পৌঁছবার আগেই ভয়ে কম্পন, গেল ছিঁড়ে, গেল ছিঁড়ে। ছিঁড়ে যাবে—বিজন বলেছে রমা পারবে না।

নোটটি আবার পড়লেন। ভাষা ভাল হয় নি। ইংরেজীতে তৈরী কথার ছড়াছড়ি, ধরতাই বুলির চোরা-বাজার, সস্তায় যত চাও পাবে। বাংলা ভাষার গুণ ঐখানে। নতুন ধরণের বাংলা গদ্য অবশ্য। পুরাণো চালের বাংলা গদ্যে খাদ বেশী। তবে শুনতে ভাল লাগত। খগেন বাবু কাটাকুটি করে নতুন খসড়া লিখলেন। সফীকের পছন্দ হবে কি না কে জানে! সে জমকাল বিশেষণ-বহুল ভাষার পক্ষপাতী নয়। ভাষা হবে কার্পান্তিয়ারের দেহের মত, এক টুকরো অতিরিক্ত মাংস থাকবে না, চওড়া হাড় নিতান্ত প্রয়োজনীয়

মাংসকে গ্রথিত করবে। রমলা বলবে রক্ত মাংস নেই। তা বলুক গে! কাজের ভাষায়, সব ভাষারই গোড়ায় ও শেষে কাজ, চাই হাড়, শক্ত হাড়। খসড়াটি আবার পড়লেন। সংখ্যায়, দফায় সাজানই ভাল। মন্দ দাঁড়ায়নি··· তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তথ্যগুলো ঠিক কি না কে জানে, যদিও বা ঠিক হয়, তবু তর্কে অনেক ফাঁকি রয়ে গেল। সফীক ও করিম চেয়েছে তাই লেখা। সফীকের ভাল লেগেছে বিজন বলছিল, তা মনে হয় না। ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না জানলে জ্ঞান বিবৃতিতেই আটকে যায়। সফীক ঠিক ধরেছে, পণ্ডিতী রচনার দোষই তাই। বিজন একটা আস্ত ছেলেমানুষ যেমন বিজনের মতে রমা একটা আস্ত মেয়েমানুষ। তবু শ্রদ্ধা বটে! কথায় কথায় ওস্তাদ, নাম উচ্চারণে বাধে, কিন্তু উল্লেখের জন্য উন্মুখ। যেন ওস্তাদের ভাল লাগাটাই শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক। খগেন বাবুর মুখে হাসি ফুটল।

রমলার ঘরের দরজা বন্ধ নয়—নিশ্চয় ভুলে গেছে, স্বেচ্ছায় খুলে রাখবে না, অন্ধকারে রমলার গালে হাত পড়তে রমলা উঠে বসল।

'তুমি এখনও ঘুমোও নি?'

'না। আলো জ্বালো।'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'তা হোক, আলো জালো।' খগেন বাবু আলো জ্বাললেন। রমলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। 'চল, বাইরের ঘরে।' বাইরের ঘরে এলেন। 'ঐখানে বোসো।' খগেন বাবু কোণের ঈজিচেয়ারে বসলেন।

'একটা কথার উত্তর দেবে? আমাকে এনে ব্যতিব্যস্ত হয়েছ, নয়? তোমার ঘাড়ে-বোঝা হয়েছি, নয়? আমাকে ঠকিয়ো না, যা ভাবছ আমাকে বল, বিহিত করব।' খগেন বাবু উত্তর দিলেন না। 'তোমাকে আমি দোষী সাব্যস্ত করছি না, নিজে তোমার সঙ্গে এসেছি, জানি নিজে, অতএব স্মরণ করাতে হবে না। কিন্তু আমাকে না হলে তোমার চলছিল না ভেবেছিলাম, এখন দেখছি বেশ চলে।'

'কেন রমলা এ-সব কথা তুলছ? আর এ-সব মান অভিমানের পালা ভাল লাগে না। তুমি ত' অন্য ধরণের...অন্ততঃ এই আমার বিশ্বাস। সেটা ভেঙ্গো না।'

'অন্ততঃ, অন্ততঃ অন্ততঃ···বেশ, আমি একটা মাষ্টারি খুঁজে নেবো, বাধা দিও না।'

'পারবে ?'

'যে চলে আসতে পারে সে ওটুকুও পারবে।'

'ঐ জন্যেই যদি না পাও' বলেই খগেন বাবু চমকে উঠলেন। ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল···কেন বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়···'রমা, চল যাই।'

তাড়াতাড়ি উঠে রমলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। চৈতন্যের অগোচরে বাক্যের সৃষ্টি···কোনটাই বা চৈতন্যের অধীন! কপালে এক্স্-রে যন্ত্র নিয়ে বেড়ান আর মাথায় গল্পের সেই চক্র নিয়ে জীবন যাপন একই বস্তু। অন্তরালের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়োজনই বা কি! থাক সেটা ঢাকা, তবেই সুখ বজায় থাকবে—বিশ্লেষণের শেষ বেগ একটা অভিশাপ মাত্র। অন্যায় হল···কিন্তু আসতই একদিন অমন-ধারা যখন রমলার সঙ্গে সম্বন্ধটি মন-ভোলান মাধুর্য্যে আবৃত থাকত না। যেটা সত্যি, তাকে স্পষ্ট দেখাই মঙ্গল, যত সত্বর তার স্বভাব প্রকট হয় ততই মঙ্গল। মনকে চোখ ঠেরে দিন যাপন নিরর্থক। কাজ করুক রমলা, কে বাধা দিচ্ছে! ঝোঁক কেটে যাবে, শরীর পাত হবে তখন বুঝবে। বুঝেছে বল্লে। ছাই বুঝেছে। দেহের গোলমাল, তাই মাথার মধ্যে পোকা ঘুর ঘুর করে উঠল। সাবিত্রীরও ঐ রকম হত! সব শেয়ালের এক রা।

খগেন বাবু আবার নোট নিয়ে বসলেন টেবিলের ধারে। ক্ষতি হবে না মিলওয়ালাদের, মুনাফায় এমন টান ধরবে না যাতে তারা মিল বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ধর্ম্মঘটে যা লোক্সান হয়, তার বেশী আর কি হবে! তা ছাড়া, মজুরী পনের টাকা ধার্য্য হলে তারা ফুর্ত্তিতে কাজ করবে—পরে লাভ, এখন না হয় টানাটানি। বেশী মজুরীর গুণ ঐখানে। এতদিন লাভ করেছে মোটা, এখন না হয় একটু কম হোক, সফীক এই বলবে। ঠিকই। চিরটা কাল এক কদমে সংসার চলে না, কখনও লাভের, কখনও ক্ষতির বরাত।

হঠাৎ মনে হয় পুরাতন কক্ষ থেকে চ্যুত হয়ে নতুন কক্ষের আবর্ত্তে ঘুরছেন। মাথায় চক্কর লাগে। কুঁজো থেকে জল নিয়ে রুমাল ভেজান, সেটা মাথায় রাখেন। মাথাঘোরা থামে···অভ্যাস হবে ধীরে ধীরে। (ক্রমশঃ)

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব"

শ্রাবণের 'পরিচয়ে' শ্রীযুত পুলকেশ দে সরকার ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। তার কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলতে পারে।

বাঙালী কেন সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব হারাতে বসেছে? এর প্রকৃত কারণ খুঁজে পেতে হলে অনেক অপ্রিয়ভাষণ অবশ্যম্ভাবী। শুধু শিল্প-জগতের কর্তৃত্ব হারানোই এর কারণ নয়, এর কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্র, শিল্পব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। এ ছাড়া আরও কিছু কারণ নিহিত আছে বিশেষ কিছু ঘটনাবলীর মধ্যে। এক একটি করে আলোচনা করা যাক্।

বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের গোড়া হতে বিশেষ কটি ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপনা বাংলা দেশে। মাদ্রাজ ক্লাইভের প্রথম বিজয়ভূমি হলেও তাঁর স্থায়ী কীর্ত্তি বাংলাতেই। ফলে প্রথম পরাধীনতার ফল বাংলা দেশে দেখা গিয়েছিল। এর একটি ফল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যা অন্য দেশে হয় নি। এমন একটি ভূমিব্যবস্থা গড়ে উঠল যাতে আমাদের সমাজের চেহারা গেল বদলে, জমির স্বত্ব উপস্বত্ব হতে নানা শ্রেণী গড়ে উঠল যাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকলেও দুটি বিষয়ে তাদের মিল রইল। প্রথম, তাদের সদ্ভাব শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে; জানা ছিল, শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহেই এ শ্রেণীগুলির নির্ভর। তাই দ্বিতীয়তঃ দেশী সামন্ততন্ত্র বৈদেশিক বুর্জোয়াতন্ত্রের সহায় হল ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। ফলে বাংলায় বুর্জোয়া সমাজ জন্মাবার সুযোগ পায়নি, শিল্পপ্রচেষ্টার বীজ বাংলার মাটিতে বাঁচতে পারেনি। আধুনিক সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে বাংলার সমাজের যোগ রইল না, বরং বাঙালী সমাজ বিবর্ত্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সমাজের চেহারা ধীরে ধীরে বদলেছে, কিন্তু বাংলায় শ্রেণীস্বার্থ পুরোনো চেহারায় রয়ে গেছে, তার রূপ বদল হয় নি। বাংলার সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব হারাবার এ একটি কারণ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্বীকার করা চলে না কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার সর্ব্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। কি কারণে এ নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছিল? এও অনেকাংশে বিশেষ ক'টি ঘটনার ফল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে সাম্রাজ্য দৃঢ় করার জন্য যে যে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ছিল তার বহুল আমদানি বাংলা হতেই। কেরাণী, মুৎসুদ্দি, বড়বাবু, বেনিয়ান হতে ডেপুটী, সিবিল সার্বিস, জজ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই বাঙালীর তৎপরতা। এ শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাহিরেও। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম সুযোগ লাভ করে বাঙালী, অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় ১৮৩৬ সালেও মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান এই তিনটি জেলায় শিক্ষক সংখ্যা মোট ১১১৮, কিন্তু দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুতে ৩৬৫ জন শিক্ষক। পরে এ পার্থক্য সম্ভবতঃ আরও সুস্পষ্ট, কারণ ১৮৩৬ সালে পুরোপুরি ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয় নি। এখনও মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাংলা দেশে বেশি। এই শিক্ষার ফলে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাঙালীর এবং বাঙালী হিন্দুর খুব বেশি এবং রাজ্য শাসনে তাদের ক্ষমতা বেশি। কিন্তু অন্য প্রদেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছ হতে এ সাহায্য ইংরেজ লাভ করেনি। সেই জন্য যেমন যেমন দেশ জয় হয়েছে তেমনি শাসকদের সঙ্গে বাঙালীরাই শাসনব্যবস্থার বনিয়াদ শক্ত করেছে, সিমলা হতে শিলচর পর্য্যন্ত। বাঙালীর নেতৃত্ব লাভের এ একটি কারণ। যখন এই সব দেশ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ফিরল, তখন বাংলার চিন্তানায়কত্ব অস্বীকার করার উপায় রইল না।

সেই সঙ্গে সিপাহীবিদ্রোহ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিপাহী বিদ্রোহকে অনেক সময়ে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা হয়। কথাটা সত্যি হলেও এই যুদ্ধের প্রকৃতি লক্ষ্য করার মতো। এর একটা বড়ো কথা, বর্ত্তমান যুগের শ্রমিক বিপ্লবের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। একটি বিজিত জাতের অর্থ-সম্পত্তিশালীরা (এবং তাঁরাই তখন চিন্তানায়ক) অপর একটি জাতের অধীনতা স্বীকার করতে চাইছিলেন না। সেইজন্য সিপাহী বিদ্রোহে প্রকৃত গণসংযোগ ছিল না—সেটি এদেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরই বিদ্রোহ। মজার কথা, এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব বাংলার হাতে ছিল না, নানা সাহেব, কুঁয়র সিং হতে সুরু করে নানা অবাঙালীর নাম এই উপলক্ষ্যে বার বার শোনা গেছে।

কিন্তু বাংলার নব গঠিত জমিদার শ্রেণী তাঁদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি—বরং এ রকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায় সে সময় বাংলার জমিদারেরা লোকবল অর্থবল দিয়ে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ যখন শেষ হল তখন অবাঙালী চিন্তানায়কদের দিন ফুরিয়েছে। রাজরোষ, মৃত্যু, নির্ব্বাসন, সম্পত্তিনাশ এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার ফলে সে সম্প্রদায়ের ধ্বংস হল। ঠিক সেই সময়ে নব গঠিত বাঙালী সমাজের অধিকাংশই ইংরেজের সহায়ক এবং যদিও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছে তবুও সে আবেদন নিবেদনেরই পালা। তাই যে সময় অন্য প্রদেশে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা কায়েম হল এবং সে ব্যবস্থার কর্ণধার বঙালীরা হলেন তখন তাঁদের অধিকারের অংশ দাবী করার মত অবস্থাও বোধহয় অন্য প্রদেশের উন্নত শ্রেণীগুলির ছিল না। বাঙালীর সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বের এ আর একটি কারণ।

এই গেল সহযোগের পালা। ক্রমে সহযোগের দিন এল। সেখানেও বাংলার নেতৃত্ব। অস্বীকার করা চলে না বাঙালী চিন্তানায়কেরাই সব প্রথম স্বদেশের কথা ভাবতে সুরু করেছিলেন। অবশ্য এই চিন্তানাকদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানসম্মত ছিল না বা এক ধরণেরও ছিল না এবং সকলের অনুভূতিও সমান গভীর নয়। কিন্তু তবুও বঙ্গিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল হতে সুরু করে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রভৃতিরা বিভিন্ন দিক দিয়ে এই সমস্যার আলোচনা সুরু করেছিলেন, প্রত্যক্ষ আন্দোলনও হয়েছিল। কাজেই সমাজবিবর্ত্তনের অলঙ্ঘ্য নিয়মে অসহযোগের দিন যখন এল, তখন বাঙ্গালীর পক্ষেই এ অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা সহজ এবং স্বাভাবিক। যে সহযোগের অভিজ্ঞতা অসহযোগের পূর্ব্বদূত সে অভিজ্ঞতা বাঙালীরই সব চেয়ে বেশি ছিল। সেই জন্য অসহযোগের প্রথম যুগে বাংলার প্রাধান্য—এমন কি এমন একটা গর্ব্বও হয়তো অমূলক নয় যে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি এমন কোন পথে যায়নি যে পথ বাংলা আগে দেখায়নি। প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন এবং সে অর্থে গণআন্দোলন এখনও এ দেশে হয়নি। কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরই সমধর্ম্মী এবং স্বগোত্র। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে 'স্বদেশী'

মন্ত্রের ব্যবহার বাংলাতেই প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। তা ছাড়া সে সময় বাঙালী শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি; তার সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এ কথার দৃঢ় উপলব্ধি হতেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের উদ্ভব। একথা হয়তো নির্ভয়ে বলতে পারা যায়, হরিজন আন্দোলনে গান্ধিজী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত সামাজিক দিকটির দিকে জোর দিলেও, সংস্কৃতির দিকে সর্ব্বভারতের নজর অতি অল্প দিনই পড়েছে। এমন কি ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা, বিদ্যামন্দির প্রচেষ্টা, প্রভৃতি সাম্প্রতিক কয়েকটি ব্যাপারের কথা ছেড়ে দিলে জীবনের সমগ্রতার দিক হতে রাজনীতিকে দেখবার চেষ্টা হয়ত বাংলাতেই প্রথম। এমন কি কর্ম্মসূচী ও সংগ্রাম কৌশলেও এখনও এমন কিছু এদেশে দেখতে পাওয়া যায়নি যা বাংলাই প্রথম উচ্চারণ করেনি।

এই রকম নানা বিশেষ ঘটনাবলীর ফলে বাংলা সহজেই সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিল। এইবার তার নেতৃত্ব হারানোর কাহিনী আলোচনা করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত পুলকেশ দে সরকার বলেছেন শিল্প জগতের নেতৃত্ব হারানোই প্রধান কারণ। কথাটি সত্য। পূর্ব্বেই বলেছি বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্র বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে এদশে শিল্প প্রচেষ্টা ভাল ভাবে গড়ে উঠ্‌তে পারেনি এবং সে কারণে আধুনিক সমাজে বাংলা বহু অংশে নেতৃত্ব হারিয়েছে। কিন্তু কথাটি সত্য হলেও সম্পূর্ণ নয়। বাস্তবিকপক্ষে বাংলার এই দুর্গতির আরও কয়কটি কারণ আছে। দেখা গেছে বিশেষ কটি ঘটনা বাংলার নেতৃত্ব লাভের সহায়তা করেছিল। তেমনি বিশেষ কটি ঘটনা তার নেতৃত্ব হারানোরও অন্যতম কারণ বলা চলতে পারে। এর একটি ঘটনা—রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথম প্রবল হল বাংলা দেশেই। গোটা ভারত বাংলার সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে নি; ফলে ভারতে হল মডারেটদের প্রতিষ্ঠা, বাংলায় সন্ত্রাসবাদের জন্ম হল। আহত আত্মাভিমানে বাংলা আত্মকেন্দ্রিক হল, ভারতবর্ষ—হয়ত সন্ত্রাসবাদের জন্যই—বাংলার রাজনীতি বিশেষ সুচক্ষে দেখলে না। তার আরও একটি কারণ, সে সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে, তাদের দেশ শাসনে বাঙ্গালীর

কায়েম রাজত্ব বরদাস্ত করতে তারা রাজি নয়। উড়িষ্যায় মধুসূদন দাস মহাশয়ের এবং বর্ত্তমানে বিহারে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের দেশপ্রেমে সন্দিহান না হয়েও, বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাঁদের নীতি নির্ব্বিবাদে সকলে মেনে নিতে নিশ্চয়ই রাজি ন'ন।

এই সময়ে আর একটি কারণ দেখা দিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সফল হলেও তাতে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় সুখী হয়েছিল একথা বলা চলে না। বরং একথা এখনও নানা রিপোর্ট, বই, প্রবন্ধে দেখতে পাওয়া যায়, যে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে মুসলমান সমাজের দ্রুত অগ্রগতির পথে বাধাই পড়েছিল। সেই জন্য এই আন্দোলন সফল হলেও সে সময়ই একটা সন্দেহ ধূমায়িত ছিল এতে হিন্দুদেরই উপকার হল বেশী। ফলে মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া সুরু হতে বেশি দেরী হয়নি। ও দিকে সময় বুঝে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ সহযোগিতার নীতি প্রচার করেছেন, সেই জন্য যখন পরে অসহযোগ আন্দোলন বাংলায় এল, সে সময় অখণ্ড বাংলার সাহায্য পাওয়া গেল না—অন্তর্বিভেদ দেখা দিল। তাই সহযোগের পালায় বাঙ্গালী যেমন অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল, অসহযোগের দিনে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ সব জেলায় তেমন অগ্রসর হতে পারল না। এর কদর্থ হতে পারে,—কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে সমগ্র জনসাধারণ যেমন একমত হয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে, বাংলায় সে সংহতি ইদানীং—বিশেষ করে ইঙ্গ-মুস্‌লিম সদ্ভাব হওয়ার ফলে—দেখতে পাওয়া গেছে কি ?

এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এমন কি একথাও বলা চলতে পারে এক দিক্ দিয়ে বাংলার সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব হারানোর মূল এইখানেই। এই মতবিরোধ থাকার ফলে কতকগুলি জিনিষ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম, আমাদের মূল সংঘর্ষ যেখানে, সেদিকে আমাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগের উপায় নেই, কারণ বৈদেশিক শক্তির বিরোধিতায় আমরা একদল নই। দ্বিতীয়তঃ, দেখা গেছে, একমত হবার আশায় আমাদের বহু সময়ে বিবেক-বিরোধী কার্য্য করতে হয়েছে যা আমরা অন্তরে অন্তরে কেউই সমর্থন করি না। এই দুটি ব্যাপারের উদাহরণ ভূরি ভূরি। সাম্প্রতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে নজরে

পড়বে, আইন সভার গত নির্ব্বাচনে লীগ ও প্রজাদলের সেই ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হওয়ার পরও দুই দলে সম্মিলিত ভাবে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে অগ্রসর হলেন, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব যদি বা সম্ভব না হত, কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধিতা করতেও প্রজাদলকে পাওয়া গেল না। ফলে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও প্রজা-লীগ মিলন সম্ভব হল। তেমনই চাকরীর হার নির্দ্ধারণ হতে সুরু করে কর্পোরেশনের কংগ্রেস-লীগ চুক্তি প্রভৃতি বহু জিনিষ আমাদের মেনে নিতে হয়েছে যার সম্পূর্ণ সমর্থন হয়তো আমরা অনেকেই অন্তরে অন্তরে করতে রাজি নই।

সেই সঙ্গে এই ঘটনাচক্রেই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কয়েকটি দোষ আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম আমাদের অভিমান। অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করার জন্য মার্জ্জনা চাচ্ছি। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব হতে এই জাত—বাংলার যে জাত একদিন শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল—সেই জাত পিছিয়ে পড়ছে, এই বোধ আমাদের চেতন ও অবচেতন মনে অভিমান জাগিয়েছে। আমাদের ধারণা সর্ব্বভারতে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সর্ব্বসময়েই একটি ষড়যন্ত্র চলছে। কথাটা কোন কোন সময়ে সত্য হলেও (জানিনা, জাতিগত মোহে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হচ্ছে কিনা,—কিন্তু ত্রিপুরী প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারের পর অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস না জন্মানো অসম্ভব), সম্ভবতঃ সব সময়ে সত্য নয়। অপর প্রদেশের যে সমস্ত জননায়কেরা বাংলার উপর বিদ্বেষ পোষণ করেন না বলেই ধারণা, তাঁদের অসহায় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় জওহরলালের আত্মজীবনীতে—

Before I went back to prison again I wanted to pay a visit to Bengal. This was partly to meet old colleagues there, but really it was to be a gesture in the nature of tribute to the people of Bengal for their extraordinary suffering during the past few years. I knew very well that I could do nothing to help them. Sympathy and fellow-feeling did not go far, and yet they were very welcome and Bengal was specially suffering from a sense of isolation, of being deserted by the rest of India

in her hour of need. That feeling was not justified, but nevertheless it was there.

কিন্তু আমাদের স্বকীয় ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনার পরিবর্ত্তে আমরা বহু সময় অপর প্রদেশগুলির উপর কটাক্ষপাতেই নিশ্চিন্ত থাকি, আমাদের কর্ত্তব্য ধীরভাবে বিবেচনা করার উপায় থাকে না, আমাদের প্রত্যেকটি কথাকে—ন্যায় হোক্—অন্যায় হোক—এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে, এরকম জিদ্‌ও মনে জাগা অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বলতা ত্রিবিধ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সফল হওয়ার ফলে, বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সুর চড়ে গেছে। কিন্তু বারে বারে চড়া সুরে তার বাঁধলে, সে তার সহজেই ঢিলে হয়ে পড়ে—স্নায়ুর কম্পন বেশি হলে অবসাদ শীঘ্র আসতে বাধ্য। সেইজন্য আমাদের আন্দোলনের মধ্যে উদ্যমের নবীনতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা যেন বাস্তবিকই কম। এ যেন আমাদের করতেই হয় এবং সে অনুসারে করে যেতেই হবে। কোন বিষয় নির্ব্বিবাদে মেনে নেওয়া যখন চলে না, তখন প্রতিবাদ করে যেতেই হবে—তাতে হয়ত কোন ফলোদয় নেই, এবং দুই একটি প্রতিবাদ সভাতেই তার পরিসমাপ্তি। যদি বা ফলোদয় হল, সরকারের মন ভিজল (মোটেই মনে করার কারণ নেই সরকার ভয় পেয়ে যান), তাহলে কিঞ্চিৎ কিছু কণিকা প্রসাদ পাওয়া গেল। আপাততঃ তাতেই পরিতুষ্ট হতে হবে। নিঃশ্বাস ফেলা গেল এই ভেবে যে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। এ যেন একই গানের ধুয়ো, বিরক্তি এলেও নিস্তার নেই, তালের খাতিরে ঠেকা দিয়ে যেতেই হবে,—যদিও তাল এসে প্রায়ই শেষ হয় সমে নয়, ফাঁকে।

দ্বিতীয়তঃ এই চড়া সুর বাঁধার ফলে রাজনৈতিক জীবনে আমরা অসত্যের আশ্রয়গ্রহণে পটুত্ব লাভ করেছি—এও সেই ঘটনাবলীর পরোক্ষ ফল। আমাদের দেশে যখনই রাজনৈতিক আন্দোলন হয় তখনই তার আরম্ভ এত কঠোর, এত বিপ্লবী, কিন্তু তার পরিণাম শোকাবহ। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যে-কোনও পরাধীন দেশে শুধু এক কথায় সাফল্য

অর্জ্জন করার আশা আকাশ কুসুম মাত্র। বাস্তবিক সে আশা যদি কেউ করে থাকেন, তাঁর সে আশা বিফল হতে বাধ্য এবং হওয়া সঙ্গতও। কিন্তু তবুও আদর্শের ও বাস্তবের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য অমঙ্গল আনতে বাধ্য। বাস্তবিকপক্ষে Political campaign করতে হলেই high pitch হতে সুরু করতে হবে রাজনৈতিক অন্দোলনের এই ধারণাই আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে; politics মানেই লোকচক্ষুর অন্তরালে নানা তার-টানাটানি, ভেতর বাইরে এক না হওয়া—এই যেন রাজনীতির স্বরূপ। কিন্তু খুব ছোট নিরাড়ম্বর ভাবে কাজ আরম্ভ করা কিন্তু মরণপণ করেও সেটিকে স্বার্থক করা—তার মধ্যে সোজা কথা স্পষ্ট করে বলা, একধারে আন্দোলন, অন্যধারে negotiations-এর কোনই স্থান নেই—রাজনৈতিক আন্দোলনের এ রূপ আমরা ভুলে যেতে বসেছি। ফলে কিছু অসত্য আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবেশ করেছে যার ফল শুভ নয়। যাঁরা উদ্যমী কর্ম্মী, তাঁরা এ কারণে হতাশ্বাস হতে বাধ্য, জনসাধারণ cynic হতে এবং প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, জনসভায় সংগ্রাম ঘোষণা করলেও বাস্তবিক কাজে সহজে অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক হতে বাধ্য এবং সে কারণে জননায়কেরাও যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃত হিতসাধনে অপারগ হতে বাধ্য।

আমাদের তৃতীয় রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা আমাদের রাজনৈতিক দল সংস্থানের ফলে। বাংলাদেশে অন্ততঃ যখনই জাতীয়তা বিরোধী কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, তখনই আমরা তার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে (শেষের কথাটি লক্ষ্য করার মতো) অগ্রসর হই। কিন্তু যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকে এ প্রতিবাদের যদি বা কিছু মূল্য থাকে, সে কেবল মিটমাটের পন্থা আবিষ্কার করার সাহায্য স্বরূপে; যাঁরা অনভিজ্ঞ, আশাভঙ্গই তাঁদের একমাত্র পুরস্কার। এইটাই যে আমাদের মনের ইচ্ছা, এমন কথা বলছি না। কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে এই রকমই। যেখানে এর আসল প্রতিকার সেই স্বরাজ-সাধনায় বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায়কে ছেড়ে, অন্য প্রদেশকে ছেড়ে বাংলার শুধু দুই একটি সম্প্রদায়ের একলা দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই; কিন্তু অপরের সঙ্গে হাত মিলানোও পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে সম্ভব হয় না। ফলে আমরা জাতীয়তা বিরোধী প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রতিবাদ করি সন্দেহ নেই, কিছু কিছু

চেষ্টাও করি সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ থাকা চলতে পারে—কিন্তু অন্তরে অন্তরে অবিশ্বাস রয়ে যায়, যেন ধারণা থাকে এ একটি losing cause, শুধু সংঘর্ষ ও সংগ্রামেই এর সার্থকতা। সে কারণে যাঁদের সে মানসিক দৃঢ়তা ও শক্তি আছে তাঁরা এতে হতাশ্বাস হন না, তাঁরাই কর্ম্মী রয়ে যান, কিন্তু যে গণ-সংযোগের ফলে আন্দোলন সফল হতে বাধ্য, সে গণমন যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করে না, তার cynicism বৃদ্ধি পায়। ইদানীং আমরা সেই cynicism-এর যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী আরও একটি কারণ আছে বলে সন্দেহ হয়। সেটি আমাদের সামাজিক শ্রেণীবিভাগ। এইখানে অন্য প্রদেশের সঙ্গে কিছু তুলনামূলক আলোচনা অবান্তর হবে না। প্রথমে আমাদের সামাজিক কাঠামোর কথাটাই বলি। পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে লেখক বলেছেন—"নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনে আর কোন দিক থেকে বাধা না আসে চিত্তরঞ্জন তাই হিংসাপন্থীদের সঙ্গে প্যাক্ট করেছিলেন। এ কথা বললেও চলে যে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের এইখানেই অবসান হল।" আমাদের দেশের সমাজবিবর্ত্তনের গতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করলে কিন্তু একথা মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে পশ্চিমী সমাজে বিবর্ত্তনের ধারার সঙ্গে প্রাচ্য সমাজবিবর্ত্তনের ধারার বহু পার্থক্য আছে। সে হিসেবে মার্কস্ পাশ্চাত্য সমাজবিবর্ত্তনের যে পর পর ধাপ নির্দ্দেশ করেছিলেন আমাদের দেশে তার কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে যদিও সে ইঙ্গিত তিনিও দিয়ে গিয়েছিলেন। সে হিসেবে মার্কস্ যে অর্থে বুর্জ্জোয়া পাতিবুর্জ্জোয়া শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ঠিক সে অর্থে সে শ্রেণীর সন্ধান এদেশে পাওয়া কঠিন হবে। তাছাড়া বৈদিশিক বণিকতন্ত্রের কৃপায় স্বদেশী বুর্জ্জোয়া সমাজ-গঠনের বিরুদ্ধতা করেছে সামন্ততন্ত্র, যদিও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সেই সামন্ততন্ত্রের মস্তিষ্ক স্বরূপে কাজ করেছিল। সে কারণে মার্কস্ যে কল্পনা করেছিলেন, "The lower middle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisian, the peasant, all these fight against the bourgeoisie to save from extinction their existence as fractions of the middle class."—এদেশে সে ঘটনা ঘটেনি। বরং সামন্ততন্ত্রের

সঙ্গে তাদের স্বার্থ অভিন্ন ভেবে তারা সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ফলে মার্কস্ বলেছিলেন অন্যান্য দেশে যেমন বুর্জ্জোয়া-তন্ত্রের বৃদ্ধির পর বহু সময়ে নেতৃত্ব বুর্জ্জোয়া হতে পাতি বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যাবে, তেমনই এদেশে সামন্ত-তন্ত্র পরিচালনার ভার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে পড়েছে। আমাদের নবগঠিত খাঁটি বুর্জ্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের বরং বিরোধিতাই, যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা তো নয়ই।

এ কারণে বাঙ্গালী সমাজে তিনটি বড় শ্রেণী। একদিকে যাঁরা সামন্ত-তন্ত্রের ধ্বংশাবশেষ তাঁরা এবং তাঁদের চারপাশে নানা শ্রেণী ও শ্রেণীর অংশ (এ দলে উকিল, ছোট চাকুরিয়া, গ্রামের বিত্তশালী গৃহস্থেরা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক অংশ আছেন) প্রতিক্রিয়াপন্থী হয়ে আছেন। অপর দিকে প্রকৃত গণআন্দোলন এদেশে এখন দেখা যাচ্চে না। বাংলাদেশে বিহারের মত চাষীদের সংজ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ—যে বিদ্রোহ দমন করার জন্য বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীদেরও দণ্ডপাণি হতে হয়েছিল—দেখা যায়নি। বাংলার মিলে যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয়েছে, সে ধর্ম্মঘটও কতদূর বিপ্লবী তা বলা কঠিন ; সন্দেহ হয়, তার মধ্যে স্বার্থের দাবী যত ছিল, সমাজ ও শ্রেণীবোধ ততটা ছিল না। সেজন্য এগুলি বিপ্লবের পূর্ব্বসূচী হলেও বিপ্লব নয়,—এর নেতৃত্ব এখনও শ্রমিকদের হাতে নয়, উচ্চতর শ্রেণীর হাতে—যাঁরা মার্কসের ভাষায় "have raised themselves to the level of comprehending theoretically the historical movements as a whole." এর মধ্যে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করেছে হিন্দুমুসলমান বিভেদ। হিন্দুসমাজে যে শ্রেণী এ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রগামী হয়ে এসেছে, মুসলমান সমাজে ঠিক তার অনুরূপ শ্রেণী পাওয়া যায় নি, তার নবসংগঠন হচ্ছে মাত্র। সেই জন্য যদি বা সামন্ততন্ত্রের সভ্যেরা হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে এক হতে পারেন, হিন্দু নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ এবং মুসলমান নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে সংঘর্ষ অনিবার্য্য ; কারণ হিন্দুমধ্যবিত্ত সমাজ এ পর্য্যন্ত যে যে জীবিকায় পুষ্ট হয়েছে এবং যে যে কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, ইংরাজদের অনুগ্রহে সে জীবিকাগুলি নবগঠিত মুসলমান নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর করতলগত এবং তাদের কোনও অসন্তোষের কারণ এখনও ঘটেনি। ফলে অবস্থা অতি শোচনীয়।

নিতে পারা যায়। যুক্তপ্রদেশে ধর্ম্ম সমস্যা শ্রেণীসংগঠনে বিভেদ বেশী আনে নি। সম্ভবতঃ নিম্নতম শ্রেণীতে এ বিভেদ একেবারেই দেখা যায় নি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ছোট খাট ঘটনার উল্লেখ করব। মনে আছে, কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবার পর কাশী গিয়েছি। অনেক দিন পরে। নজরে পড়ল খালি গায়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পণ্ডিতেরা গঙ্গার ধারে চলেছেন কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় সাদা কংগ্রেসী টুপি। অলিতে গলিতে টুপির স্রোত। মনে হল মাটী শুকিয়ে ছিল; হঠাৎ বর্ষায় অজস্র ফুল ফুটে গেছে। এ সভা সমিতির বক্তৃতার কথা নয়, এ অন্তরের কথা, যে কথা কংগ্রেসী টুপিকে কাশীর ব্রাহ্মণ্য জীবনে মন্ত্রপাঠের মতই বেঁধে দিয়েছে। আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার আসার প্রয়োজন হয়েছিল এলাহাবাদ হতে চিতকী ষ্টেশানে। পথে দেখা গেল ষ্টেশানের আগে কাঁচা রাস্তার এপার ওপার জল যাবার নালা। চাষীরা মোটর যাবার রাস্তা বন্ধ করেছে। রাস্তাটি যদিও অব্যবহৃত, কিন্তু তবুও মোটর যাবারই সরকারী রাস্তা। এবং ওদিকে ট্রেণ টাইম আসন্ন। একটু মানসিক চাঞ্চল্য সহকারেই একটি চাষীর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "এ রাস্তা তোমরা খুঁড়লে কেন?" নির্ব্বিকার জবাব পেলুম—চাষের জন্য খুঁড়েছি। উত্তরে বলেছিলুম—রাস্তার তলা দিয়ে নালা করলে না কেন? তখনই জবাব পেলুম, নিজে খরচ দাও, অনুগ্রহ করে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে দিয়ে করিয়ে দিতে পার। বাংলার গ্রামের মধ্যেও এরকম ঘটনায় একবার পড়েছি, কিন্তু মোটরবিহারীদের সামনে চাষীদের এরকম দৃঢ়তা নজরে পড়েনি। আরও মনে পড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল যখন পদত্যাগ করে, তখন নৈনীতালে একজন নিরক্ষর গাড়োয়ালী মুদি প্রশ্ন করেছিল, "এবার যদি নতুন উজীর হয় তারা তো পাঁচশ' টাকা মাইনে নেবে না? কিন্তু বাজেট পাশ হয়ে গেছে শুনেছি। তবে বেশি টাকা কি করে পাওয়া যায় বলতে পার বাবুজী?" অথচ এমন ঘটনাও বাংলা দেশে শোনা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে গ্রামের হাট বন্ধ হওয়ায় চাষীরা আক্ষেপ করে বলছে, "একজন বড়লোক মারা গেছে, তার জন্য আমাদের আজকের লোকসান হল।" আমি স্বজাতির কুৎসা করছি না। এমন কি এরকম ঘটনা—যুক্তপ্রদেশেও সম্ভব। কিন্তু তবু মনে হয় ওদেশে আন্দোলনের মূল আরও নীচে নেমেছে, গভীরে

প্রবেশ করেছে। আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এলাহাবাদের পুরুষোত্তম পার্কে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের সভাপতিত্বে জনসভা ১৯৩৯ সাল নভেম্বর মাস। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়ে গেছে, যার পরবর্ত্তী অধিবেশনে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস war aims ঘোষণার দাবী করলেন। বক্তাদের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দ্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ এবং সীমান্ত গান্ধী আছেন। প্রায় সাত আট হাজার লোক, কিন্তু অধিকাংশই চাষী। বক্তৃতার বিষয়টিও সহজ নয়, তাতে পার্লামেণ্টের আলোচনা, ভারতসচিবের উক্তি প্রত্যেকটিরই সমালোচনা ছিল। সব চেয়ে দুর্ব্বোধ্য ছিল মৌলানা আজাদ এবং সীমান্ত গান্ধীর ভাষা, যা ওখানকার হিন্দীভাষাভাষীদেরও দুষ্পাচ্য। কিন্তু তবু আশ্চর্য্য হতে হয়েছিল দেখে যে সেই শীতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সভা হওয়া সত্ত্বেও একটি লোকও উঠে যায়নি, গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনেছিল। তাদের নিরুচ্ছাস, গভীরতা, নির্ম্মোহ শ্রদ্ধা এবং সুবিচার বিশ্বাস লক্ষ্য করার মতো। অথচ বাঙ্গালীর জনসভায় অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায় এ অভিনিবেশ ও সংযমের পীড়াদায়ক অভাব ঘটেছে।

রাজনীতি শুধু যে আমাদের চিত্তবৃত্তি কণ্ডুয়ন নিবারণের জিনিষ নয়, রাজনৈতিক বক্তৃতা যে শুধুই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, আমাদের এ ধারণা লুপ্তপ্রায়। আমরা সেইজন্য আমাদের বুদ্ধির আড়ালে জীবনকে ঢেকে রেখেছি, যার ফলে চমক লাগানো Intellectualismই আমাদের আন্দোলন, চমক লাগানো intellectual কথাতেই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য আবার বলি আমাদের আন্দোলনের মূল বুদ্ধির প্যাঁচ খেলানোতে আটকে গেছে, তার শিকড় গভীরে প্রবেশ করতে পারছে না। রাজনীতি অবাস্তবই রয়ে যাচ্ছে, মুখের শুনানো কথা ছাড়া কাজে তার পরিচয় নেই, থাকা সম্ভবও নয়, আমরা থাকতে দিতে রাজীও নই। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক লিখেছেন বাংলায় ফ্যাশিবাদ উঁকি মারছে। তারও মূল আমাদের রাজনীতির এই অবাস্তবতায়, অগভীরতায়, অসফলতায়! বাঙ্গালী জাতি অভিমানে অন্য জাতি হতে সরে দাঁড়িয়েছে, তাকে তার নেতাদের সমর্থন করতেই হবে, সে যাই হোক্। নানা বিভিন্ন দল আসার ফলে আমাদের যে দুর্ব্বলতা, সেই দুর্ব্বলতার জন্যই আজ নেতারা বাধ্য হয়েছেন তাঁদের অনুচরদের নির্ব্বিচার আনুগত্য দাবী করতে। তা না হলে সামান্য কিছু করাও

বন্ধু

শীতের কন্‌কনে হাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সর্ব্বাঙ্গ ওভার-কোটে আবৃত ক'রে গিগি মিয়ার লাঙ্গো টিভিয়ার ডি মেলিনিতে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছেন। আফিস তাঁর ভায়া প্যাসট্রেঙ্গোতে—তাড়াতাড়ি ট্রাম ধরতে না পারলে আপিসে পৌঁছুতে বেলা হয়ে যাবে।

কিন্তু ট্রামে যাঁরা চড়েন তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ট্রামের জন্য যখন অপেক্ষা করা যায় তখন ট্রাম দুর্লভ হয়ে ওঠে। হয় কারেন্টের অভাবে মাঝ পথে ট্রাম নিশ্চল হয়ে আছে, নয়তো কোন মোটর বা লরীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে অযথা বিলম্ব করছে।

তীক্ষ্ণ উত্তুরে বাতাস শন্ শন্ করে বইছে। মাঝে মাঝে পা ঠুকে গিগি মিয়ার শরীরটাকে একটু গরম করে নেবার চেষ্টা করছেন। অদূরে ধূসর রঙের যে ক্ষীণ নদীটি দেখা যায়, মনে হচ্ছে সে-ও যেন দারুণ শীতে জড়সড়—তার সে উচ্ছল লীলাচঞ্চল গতি নেই, হিমেল হাওয়ায় যেন তার সর্ব্বাঙ্গ নীথর, অসাড়।

খানিক পরে দূরে ট্রাম দেখা গেল—টঙ্ টঙ্ করতে করতে এগিয়ে আসছে। চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে ওঠবার জন্য গিগি মিয়ার তোড়জোড় করছেন এমন সময় হঠাৎ নতুন সেতু—পণ্ট কাভুরের ওপর থেকে কে একজন তাঁর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে সুরু করল।

"গিগি! গিগি!"

গিগি মিয়ার দেখলেন এক ভদ্রলোক টেলিগ্রাফ পোষ্টের মতো দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করে নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গী করতে করতে ছুটে আসছেন তাঁর দিকে। টঙ্ টঙ্ করতে করতে ট্রাম চলে গেল সামনে দিয়ে—গিগি মিয়ারের ওঠা হল না। চলন্ত ট্রামের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ—আলিঙ্গনের প্রচণ্ড চাপে মনে হল আগন্তুক যেন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

"তোমাকে দূর থেকেই দেখেই আমি চিনতে পেরেছি, গিগি···এক মুহূর্ত্তও

দেরী হয়নি ··আশ্চর্য্য নয় কি ? কিন্তু বন্ধু, তোমার চেহারা এমন বদ্‌লে গেল কি করে ? এরি মধ্যে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ দেখছি—চুলে পাক ধরেছে। বাস্তবিক তোমার মুখখানা দেখাচ্ছে ঠিক যেন বুড়ো পাদ্‌রীদের মতো—তেমনি প্রশান্ত ও গম্ভীর। তোমার ঐ গম্ভীর মুখে একটা চুমো খেতে ইচ্ছে করছে আমার।···তোমায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন আমারই জন্য তুমি অপেক্ষা করছ—তাই তুমি যখন ট্রামে ওঠবার জন্যে হাত তুললে তখন আমার মন বলে উঠল, এ ভারী অন্যায়, নিছক বিশ্বাস-ঘাতকতা·····”

“হ্যাঁ, আমি আপিসে যাচ্ছিলাম,” জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে মিয়ার বললেন।

“আপাততঃ ওসব বিরক্তিকর প্রসঙ্গের উত্থাপন নাই বা করলে ?”

“তার মানে ?”

“তার মানে এই যে, আজ আর তোমার আপিস যাওয়া হবে না।”

“বল কী ? তুমি তো ভারী অদ্ভুত লোক হে ?”

‘হ্যাঁ, অদ্ভুত বৈকি। কিন্তু বল দেখি, আমি যে এখন আসবো তা তুমি আশা করেছিলে কি ? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি করো নি।”

“হ্যাঁ, করিনি···সত্যি কথা বলতে কি···”

“কাল সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছেচি। আমার মারফৎ তোমার ভাই তোমায় সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুনলে তুমি হাসবে নিশ্চয়, তিনি আমায় একখানা পরিচয়পত্র দিতে চেয়েছিলেন তোমার কাছে। আমি বললাম, বলেন কী ? গিগিয়োনের কাছে পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে হবে ? আমরা ছেলেবেলাকার বন্ধু···একসঙ্গে খেলাধূলো করেছি, মারামারি করেছি বিস্তর···কলেজেও পড়েছি একসঙ্গে। পাডুয়ার কথা মনে পড়ে তোমার, গিগিয়োন ? আমাদের হোষ্টেলের সেই প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা—কী ভয়ানকই ছিল আওয়াজটা তার। তুমি কিন্তু বেপরোয়া ঘুমুতে—যেমন ঘুমোয় শূয়োরছানাগুলো।···হ্যাঁ, একবার ঐ আওয়াজ তোমার কানে গিয়েছিল বটে—তুমি ধড়মড় করে উঠে বসে জিগ্যেস করেছিলে, আগুন লেগেছে নাকি ? তুমি ভেবেছিলে ও আওয়াজ বুঝি আগুন লাগার সঙ্কেত। কলেজের সেই দিনগুলো কী মজারই ছিল!···

যাক ওসব কথা, তোমার ভাই আছেন ভাল। আমরা দুজনে সামান্য একটা কারবার ফেঁদেছি, সেই উপলক্ষেই এখানে আসা।···কিন্তু তোমার হল কী? তুমি যেন কেমন মিইয়ে গিয়েছ—সে স্ফূর্তি আর নেই। বিয়ে করেছ তো?"

"না করিনি," গর্ব্বের সঙ্গে জবাব দিলেন গিগি মিয়ার।

"করবার মতলব আছে তো?"

"ক্ষেপেছ নাকি? চল্লিশের পর কি আর বিয়ে করা সাজে? ও কথা ভাবতেও আমি পারি না।"

"চল্লিশ! তোমার বয়স বোধ করি পঞ্চাশ হতে চলল, গিগিয়োন।···হ্যাঁ, একটা কথা আমি ভুলে যাচ্ছিলাম—ঘণ্টার আওয়াজের দিকে তোমার যেমন খেয়াল নেই, বয়সের সম্বন্ধেও তুমি চিরদিন তেমনি নির্ব্বিকার। এটা তোমার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য—যারা তোমায় চেনে তাদের এটা অজানা নেই। তবে বন্ধু, বয়স যে তোমার পঞ্চাশ এ সম্বন্ধে আমি এক রকম নিশ্চিত। তুমি জন্মেছিলে···দাঁড়াও একটু ভেবে বল্‌চি···১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে··· নয় কি? খুব সম্ভব ১২ই এপ্রিল।"

"এপ্রিল নয়—মে···আর বছরটাও ভুল···আঠারো শো বায়ান্ন সালে আমার জন্ম," একটু রাগতভাবে বললেন গিগি মিয়ার—"আমার জন্ম তারিখ আমার চাইতে ভাল জানো তুমি? আমি বল্‌ছি—১২ই মে, ১৮৫২। কাজেই আমার বয়স এখন ঊনপঞ্চাশ বছর কয়েক মাস মাত্র।"

"আর এই বয়সেও বিয়ে করে ঘর সংসার পাতো নি!···ভালই করেছ বন্ধু, বিয়ে করা যে কী ঝকমারি তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার বিয়ের ব্যাপার তুমি যদি শোন, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবে তোমার।···হ্যাঁ, কি বলছিলাম···আজ তাহলে আমি তোমার অতিথি···বুঝলে গিগি, লাঞ্চটা তোমার সঙ্গেই খাওয়া যাবে। আজকাল তুমি খাও কোথায় বল তো? বার্বায়, না আর কোথাও?"

"অ্যাঁ, বল কি!" বিস্ময়ের সুরে বললেন গিগি মিয়ার—"বার্বার কথাও তুমি জানো দেখছি! ওখানে তোমার যাতায়াত আছে বুঝি?"

"মোটেই নয়। আমি থাকি পাডুয়ায়, বার্বায় যাতায়াত করবো কি করে?

লোকের মুখে শুনেছি—ওখানে যারা যায় তাদেরই মুখে। ওখানে তোমাদের যেসব ষ্ফূর্ত্তি-টুর্ত্তি হয় তার খবর কিছু কিছু রাখি।"

"কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চাও তাহলে বাড়ী যেতে হয়—ঝিকে একবার খবর দেওয়া দরকার," মিয়ার বললেন।

"ঝি? যুবতী নাকি?"

"না হে না, বৃদ্ধা।…আজকাল আর বার্বায় যাই না আমি—বছর তিনেক আমোদ প্রমোদ ছেড়ে দিয়েছি। কি জান, একটা বয়স আছে…"

"চল্লিশের পর…"—ব্যঙ্গের সুরে বন্ধুটি বললে।

"হ্যাঁ, চল্লিশের পর…যখন তোমায় মোড় ফিরতেই হবে। বরাবর যে-পথে চলেছ সে-পথে চলা তখন আর নিরাপদ নয়।…হ্যাঁ, এবার ডানদিকে ফেরো…তাড়াতাড়ি করো না, রাস্তাটা ঢালু, হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যাও…এইবার এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসো…এই আমার বাড়ী…কেমন সাজিয়েছি দেখবে চল।"

"তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, গিগি," সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বন্ধুটি বললে, "বরাবরই তুমি ডান্‌পিটে, ভয় ভাবনা তোমার কোনদিনই দেখি নি আর আজ কিনা তুমি সাবধান হতে উপদেশ দিচ্ছ! হেঁটে চলেছি, তাতেও তোমার ভয় একটা কিছু বিপদ না ঘটে। তোমার এ হল কী, গিগি? কে তোমায় এমন শান্ত গোবেচারী বানালো বল দেখি? দেখে শুনে আমার তো চোখে জল আসছে।"

কথা বলতে বলতে দুজনে দরজার সামনে এসে উপস্থিত। মৃদু হেসে মিয়ার বললেন, "দেখো জীবনে ঝামেলার অন্ত নেই—এই বয়সে জীবনের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন যদি অনবরত বিদ্রোহ করো, তবে তোমার মানুষের মতো বেঁচে থাকা অসম্ভব—দিনে দিনে তুমি জানোয়ারের সামিল হয়ে যাবে।"

"তাহলে তুমি জানোয়ারের অবস্থার চেয়ে মানুষের অবস্থাটা ভাল বলে মনে কর?" বাধা দিয়ে বন্ধুটি বললে,—"তা যদি কর তাহলে তুমি ভুল করেছ জেনো। দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে আমার যে মাঝে মাঝে কী বেগই পেতে হয় তা আমিই জানি। বিশ্বাস করো বন্ধু, আমরা যদি প্রকৃতিকে

যথেচ্ছা কাজ করবার সুযোগ দিই তাহলে আমরা আর কেউই দ্বিপদ মানুষ থাকবো না, সবাই হয়ে যাবো চতুষ্পদ জন্তু! বাস্তবিক ওর চেয়ে আরামের অবস্থা আর কি হতে পারে আমি কল্পনাই করতে পারি না। অসাবধান হলে পড়ে যাবার আশঙ্কা নেই, ব্যালান্সটা সব সময়েই থাকে ঠিক। কবে যে আমরা জানোয়ারের মতো চার পায়ে চলবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করবো কে জানে! এই অভিশপ্ত সভ্যতাই আমাদের সর্ব্বনাশ করছে। আমি যদি চতুষ্পদ হতে পারতাম তাহলে পরমানন্দে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম। না থাকতো স্ত্রী, না থাকতো দেনা, না থাকতো কোন উদ্বেগ। তুমি কি চাও মানুষ হয়ে থেকে সারা জীবনই কষ্ট পাবো আমি?"

হঠাৎ আবির্ভূত এই বন্ধুর অদ্ভুত রহস্যালাপে মিয়ার হতভম্বের মতো তার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তার নামটা কী, কোথায় ও কবে আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে, বাল্যবয়সে কি পঠদ্দশায় কলেজে—কিছুই তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর যে সমস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল মনে মনে তাদের কথা বার বার চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু কারুরই চেহারা এই লোকটির সঙ্গে মেলে না। তবু ঐ সম্বন্ধে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না তাঁর—লোকটি যেরকম অন্তরঙ্গতা দেখাচ্ছে তাতে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাটা অভদ্রতা হবে—হয়তো বা সে চটেও যেতে পারে। কৌশলে তার পরিচয় জেনে নেবেন মনে মনে এই সঙ্কল্প করে আপাততঃ তিনি চুপ করে রইলেন।

পরিচারিকার আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। মনিব যে এত শীঘ্র ফিরে আসবেন তা সে ভাবতেই পারেনি। গিগি মিয়ার দ্বিতীয় বার ঘণ্টা বাজালেন। খানিক পরে পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলে।

"আফিস যাওয়া আজ আর হল না," পরিচারিকাকে উদ্দেশ করে মিয়ার বললেন, "এই বন্ধুটির সঙ্গে পথে হঠাৎ দেখা—সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলাম। আমাদের দুজনের জন্যে চট্‌পট খাবারের ব্যবস্থা করো। ···সাবধান কোন ত্রুটি হয় না যেন, আমার বন্ধুটি যে সে লোক নন, ওঁর বুদ্ধি যেমন অসাধারণ নামটাও তেমনি অদ্ভুত·········"

"এ্যানথ্রপোফ্যাগাসগোট্‌স্‌বীয়ার্ড হর্‌ন্‌ফুট," বন্ধুটি বললে রহস্য করে।

নামটা শুনে ঘাবড়ে গেল পরিচারিকা—সে হাসবে, না চুপ করে থাকবে কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না।

"আমার ঐ চমৎকার নামটি সম্বন্ধে কেউই কিছু জানতে চায় না কোনদিন," পরিচারিকাকে লক্ষ্য করে মিয়ারের বন্ধু বলে চলল, "নামটির এমনি মাহাত্ম্য যে ব্যাঙ্কের কর্তারা শুনলে মুখ বিকৃত করে আর মহাজনরা ভির্মি খেয়ে পড়ে যায়। আমার স্ত্রীই কেবল ব্যতিক্রম—একমাত্র সে-ই নামটা নিয়েছে খুশিমনে। তবে শুধু নামটাই দিয়েছি তাকে, আমার আর কিছুই দিইনি। আমার মতো একজন সুপুরুষ—বুঝেছ কিনা, যেমন তেমন একজন স্ত্রীলোককে ভাল বাসবে, তাই কি কখনও নয়?···এবার চলো, গিগি, বাড়ীর ভেতর—দেখিগে গৃহস্থালীর ব্যাপারে কতখানি পোক্ত হয়েছ তুমি।···আর তুমি, পরিচারিকা ঠাকরুণ, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। ক্ষিদেয় আমাদের পেট জ্বলছে—খাবারের বন্দোবস্তটা চট্‌পট্‌ করে ফেলো।"

কৌশলটা ব্যর্থ হওয়ায় মিয়ার একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কোন কাজেই হাল ছেড়ে দেওয়া তাঁর স্বভাব নয়। বন্ধুটিকে নিয়ে তিনি তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটটির চারিদিক দেখাতে লাগলেন। পাঁচটি ছোট ছোট ঘর—সবই সযত্নে সাজানো। একখানি বসবার ঘর, একটি শোবার ঘর, ছোট্ট একটি স্নানের ঘর, খাবার ঘর আর পড়বার ঘর।

বন্ধুটিকে সঙ্গে করে মিয়ার যখন বসবার ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর বিস্ময় ও বিরক্তি সীমা ছাড়িয়ে গেল। ম্যান্‌টেলপিসের ওপর সাজান ফোটোগ্রাফ-গুলি নিরীক্ষণ করতে করতে বন্ধুটি মিয়ার পরিবার সম্বন্ধে এমন সমস্ত ব্যাপারের গল্প করতে সুরু করল যা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া বড় একটা কেউ জানে না।

"গিগিয়োন, খাসা লোক তোমার ভগ্নীপতিটি—আমার যদি অমন একটি ভগ্নীপতি থাকতো!···আমার ভগ্নীপতিটি, বুঝেছ কিনা, বদমায়েসের সেরা!"

"কেন? তোমার বোনের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করেন নাকি?"

"না, তিনি খারাপ ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে। আমার এই দুঃসময়ে অনায়াসে তিনি সাহায্য করতে পারতেন—কিন্তু করবেন না কিছুতেই।"

"তোমার ভগ্নীপতির নামটা ঠিক মনে পড়ছে না," মিয়ার মাথা চুল্‌কোতে লাগলেন—"নামটা কি বলতো?"

"তার নাম তোমার মনে পড়বে কি করে ? তাকে তুমি মোটেই চেন না। পাড়ুয়াতে সে এসেছে মাত্র দু'বছর আগে। আমার সঙ্গে সে যে রকম ব্যবহার করেছে তা তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। তোমার ভাই আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন যদি ঐ হতভাগাটা আমার হুণ্ডী নিতে আপত্তি না করে। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম তাই—লোকটা কিছুতেই সই করলে না—কত করে তাকে মিনতি করলাম, কিছুতেই নরম হল না সে। তোমার ভাই—সত্যি বল্‌চি অমন লোক আজকালকার দিনে দুর্লভ, আমার সঙ্গে কীই বা তাঁর সম্পর্ক,—ব্যাপারটা শুনে এমনি তিনি চটে গেলেন আমার ভগ্নীপতির ওপর যে আর কারো তোয়াক্কা না করে নিজেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর সাহায্যেই এখন হয়তো আমি কতকটা দাঁড়াতে পারবো বলে ভরসা করছি।...হ্যাঁ, ভগ্নীপতি রাজী হল না কেন সে কথা বলা হয়নি তোমায়। আমার চেহারায় যে এখনও বেশ জৌলুস আছে এ তুমি অস্বীকার করতে পার না—দেখলেই সবাই আকৃষ্ট হয়।···আমার ভগ্নীপতির বোন—হঠাৎ কি জানি কেমন করে আমার প্রেমে পড়ে গেল···বেচারী।··· মেয়েটির রুচির প্রশংসা করি বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা একটু কাঁচা। আমি আর কি করতে পারি বল—বিয়ে তো আর করলেই হল না ! কিন্তু মেয়েটি এক কাণ্ড করে বসল—মনের দুঃখে বিষ খেলে সে !"

"বল কী ? মেয়েটি মারা গেল ?" শঙ্কিতমুখে প্রশ্ন করলেন মিয়ার।

"না—সে বমি করলে খানিকটা আর তাতেই সে আরাম হয়ে গেল। কিন্তু এ ঘটনার পর ভগ্নীপতির বাড়ী মাড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। ···আরে, খাবারের দেখা নেই যে ! ক্ষিদেয় যে চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি না··· পেট যে বাপান্ত করছে !"

খেতে বসে বন্ধুটি পরিহাসচ্ছলে যেসব কুৎসিত প্রসঙ্গের অবতারণা করলে তাতে মিয়ার মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কথার স্রোত ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য মিয়ার বন্ধুকে পাড়ুয়া সম্বন্ধে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে সুরু করলেন। মিয়ার মনে মনে এ আশাও পোষণ করছিলেন যে কথা বলতে বলতে বন্ধুটি হয়তো এক সময় নিজের নামটা প্রকাশ করে ফেলতে পারে।

"আচ্ছা ভালভার্ডের খবর কী···ব্যাঙ্ক অফ ইটালীর ডিরেক্টার···যার স্ত্রীটি খুব সুন্দরী আর বোনটি অসম্ভব মোটা আর ট্যারা? ওরা কি পাডুয়ায় আছে এখনও?"

মিয়ারের প্রশ্নে বন্ধুটি হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসির বেগ এমনি যে থামতেই চায় না।

"ব্যাপার কী?" কৌতূহলী চোখদুটি তুলে প্রশ্ন করলেন মিয়ার—"ভালভার্ডের বোন কি ট্যারা নয় তাহলে?"

"তুমি একটু চুপ করো ভাই—ভগবানের দোহাই, একটু চুপ করো," মিনতির সুরে বন্ধুটি বললে। হাসির ধমকে তখনও তার সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত হচ্ছিল।

"ট্যারা? হ্যাঁ, ট্যারা বৈকি। আর তার নাকের গর্ত্তটা এত চওড়া যে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত দেখা যায়। ওরই কথা তো বলছিলাম তোমায়।"

"কিরকম?"

"বুঝলে না? ঐটিই তো আমার স্ত্রী।"

"বল কী?" অপরাধীর মতো পিগি মিয়ার মাথা চুল্‌কোতে লাগলেন। ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু গুছিয়ে ঠিক বলতে পারলেন না। কিন্তু আগের চেয়েও প্রবলভাবে বন্ধুটি হাসতে সুরু করল। তারপর তার হাসির বেগটা কমে এল ক্রমশঃ, একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে সে বললে, "দেখো বন্ধু, আমাদের জানার বাইরে সৎসাহসের এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা কোন কবিও কোনদিন কল্পনা করতে পারবে না।"

"হুঁ···তুমি ঠিকই বলেছ," গম্ভীর মুখে সায় দিলেন গিগি মিয়ার—"তুমি যা বলতে চাও তা আমি বুঝেছি।"

"কিছুই তুমি বোঝনি," সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলে বন্ধু—"তুমি বুঝি ভাবছ আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি? মোটেই না।···সৎসাহস আমার নয়, আমার স্ত্রীর ভ্রাতৃবধূর—অর্থাৎ লুসিও ভালভার্ডের স্ত্রীর। আমার কথাটা দয়া করে শেষ পর্য্যন্ত শোন। মানুষ এমন নিরেট বোকাও হতে পারে!"

"কে—আমি?"

"না হে না আমি।···লুসিও ভালভার্ডের স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় ছিল আমার—

অবশ্য বিয়ের আগে থেকেই। মাঝে মাঝে তাই দেখা করতে যেতাম গোপনে। ভাবতাম ভালভার্ড টের পাবে না কিছুতেই। ভালভার্ড আপিসে যাবার পর তার স্ত্রী আমায় ভেতরে নিয়ে আসত—নিশ্চিন্ত আরামে আমরা গল্প করতাম। কিন্তু ব্যাটা যে তলে তলে খোঁজ রাখে তা কে জানত? একদিন কি হয়েছে জানো, দুজনে বসে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ ভালভার্ড বাড়ী এসে হাজির। ভালভার্ড এসেছে জানতে পেরেই তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমায় লুকিয়ে ফেললে তার ননদের ঘরের মধ্যে। ননদটি কে বুঝতে পেরেছ তো? সেই স্থূলকায় ট্যারা মহিলাটি। অকস্মাৎ আমার আবির্ভাবে ভদ্র মহিলা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে আমায় অভিবাদন করলেন একান্ত শুদ্ধচিত্তে— মনে হল ভায়ের শান্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে তিনি দৃঢ়-সঙ্কল্প। আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'কিন্তু লুসিও কি বিশ্বাস করতে চাইবে যে...' আমার কথা শেষ হবার আগেই লুসিও রাগে গর্জ্জন করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল—আর তারপর যা ঘটল তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারো।"

"তোমায় বুঝি সে বেদম্ প্রহার করলে?" শঙ্কিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন মিয়ার।

"শুধু কি তাই—আমার note of credit-ও সে দিলে খারিজ করে—অর্থাৎ আমায় একেবারে পথে বসিয়ে দিলে। এরকম হীনতা দেখেছ কোথাও? যাক, ও সম্বন্ধে আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না কিছু।...মোটের ওপর, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই, আমার হাতে এখন একটি কপর্দ্দক নেই, কোথাও যে কিছু পাবো তারও ভরসা দেখছি না। বিবাহ করবার মতলব কোনদিনই আমার নেই যদিচ..."

"অ্যাঁ! তুমি না বললে ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করেছ!" বাধা দিয়ে বললেন গিগি মিয়ার।

"বিশ্বাস করো আমায়, বিবাহ আমি করিনি। সে-ই আমায় বিবাহ করেছে—বিবাহ হয়েছে শুধু তারই। আমি গোড়াতেই আমার অক্ষমতা তাকে জানিয়েছিলাম। ঘোরপ্যাঁচ আমি ভালবাসি না, সোজাসুজি তাকে বললাম, হে সুন্দরি, আমার নামটি তুমি চাও—তোমার বাসনা আমি অপূর্ণ

রাখতে চাই না। সত্যি বলছি, নামটা নিয়ে কি যে করবো আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই না।”

“তাহলে ব্যাপারটার ঐখানেই সমাপ্তি হল,” মন্তব্য করলেন মিয়ার—“আগে ওর নাম ছিল ভালভার্ড, এখন নাম হল···”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই,” টেবিল থেকে উঠতে উঠতে বন্ধুটি সহাস্যে বললে।

“উঠলে চলবে না—শোন,” সাহসে ভর করে গিগি মিয়ার বললেন। মিয়ারের ধৈর্য্য শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে—এ রকম সংশয়ের মধ্যে কতক্ষণ আর থাকা যায়? “আজকের দিনটা তোমার সাহচর্য্যে বেশ আনন্দেই কেটেছে। তোমাকেও খুসি করবার জন্য আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি। এখন তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।”

“প্রার্থনা? আমার স্ত্রীকে ধার চাও বুঝি?”

“না, ধন্যবাদ। আমি তোমার নামটি জানতে চাই।”

“নাম? আমার?” বন্ধুটি অবাক হয়ে গেল।-- আমার নাম কি তুমি জানো না?”

“না,” লজ্জিতমুখে জবাব দিলেন মিয়ার—“আমায় ক্ষমা করো বন্ধু, ইচ্ছা হয় আমার স্মৃতিশক্তিকে দোষারোপ করো—কিন্তু একথা আমি একরকম হলপ্ করেই বলতে পারি যে তোমায় আমি আগে কোথাও দেখিনি।”

“ওঃ, তুমি তাহলে একেবারেই ভুলে গেছ দেখছি,” মৃদু হেসে বন্ধুটি বললে। তারপর একটু থেমে গিগির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, “তোমার হাতখানা দাও, গিগি—তোমার লাঞ্চের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাস্তবিক, এমন চমৎকার ভোজ অনেক কাল জোটেনি।···কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই আমার বিদায় নিতে হবে। এখন তবে আসি।”

“বলবে না? তোমায় বলতেই হবে!” উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন গিগি।—“সারাদিনটা আমি মাথা ঘামিয়েছি ঐ নিয়ে আর তুমি না বলে চলে যাবে! বলতেই হবে।”

“খুন করবে নাকি?” শান্তভাবে গিগির মুখের পানে তাকিয়ে বন্ধুটি বললে—“আমায় টুকরো টুকরো করে কাটলেও আমি বলবো না।”

"রাগ করো না—স্থির হয়ে বসো," সুরটা নরম করে গিগি মিয়ার বললেন, "এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে আমার কখনও হয়নি—এই স্মৃতির বিলোপ। এ যে কী যাতনার সৃষ্টি করে তা বলা যায় না। তোমার নামটা কেবলি স্মরণ করবার চেষ্টা করছি অথচ পারছি না—এ একেবারে অসহ্য। ভগবানের দোহাই, তোমার নামটা এবার বলো।"

"চেষ্টা করে দেখো—খুঁজে পাও যদি।"

"কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ বল দেখি? তোমায় আমি ভুলে গেছি সত্য, তবু তোমার এতটুকু অনাদর করিনি—ঘরে এনে যত্ন করে খাইয়েছি, আর—বিশ্বাস করো আমায়, তোমার সঙ্গে আমার পূর্ব্বপরিচয় না থাকলেও এই ঘণ্টা কয়েকের আলাপেই তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছ। তোমার ওপর আমার একটা ভালবাসা জন্মে গেছে, চমৎকার দিল্‌খোলা মেজাজ তোমার, সর্ব্বদা তোমার সাহচর্য্য পেলে খুবই খুশি হবো আমি।"

"ওসব বলা বাজে," বন্ধুটি নিরাসক্তভাবে বললে, "আমার অভাব কোনদিনই তুমি বোধ করোনি, করবেও না। বৃথা তুমি অনুরোধ করছ। তোমায় পরিচয় না দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করতে চাও? এ আনন্দ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত—তোমার এখানে আসবার আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি।...না, পরিচয় আমি দেবো না। তোমার অনুরোধ নিতান্ত অসঙ্গত...আমি বেশ বুঝতে পারছি আমায় তুমি একেবারে ভুলে গেছ। এতে অবশ্য আমার কষ্ট পাবার কথা, তবে তুমি যদি আমায় আর পীড়াপীড়ি না করো তাহলে ঐ কষ্টটুকু অনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পারবো। যাক, এখন তবে বিদায় হই।"

"হ্যাঁ, যত শীঘ্র পারো—ঐটেই যখন আমার প্রার্থনা," মিয়ার অসহিষ্ণুভাবে বললেন—"আর আমি তোমায় বরদাস্ত করতে পারছি না।"

"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তবে, গিগি যাবার আগে তোমার একটি চুমো চাই—কালই আবার আমায় ফিরতে হবে।"

"না, কিছুতেই না," গর্জ্জে উঠলেন মিয়ার—"যতক্ষণ না নামটা বলছ।"

"ও আশা বৃথা। আজ তবে এই পর্য্যন্ত...বিদায়।"

হাসতে হাসতে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সিঁড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে রহস্যভরে একটা চুম্বন ছুঁড়ে দিলে মিয়ারের দিকে।

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

---

* লুইগি পিরাণ্ডেলো হইতে

মধ্যবিত্ত পূজার ছুটি

চাষীরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য হাট, খামারে ইঁদুর
সোনালি সূর্য্যাস্ত শেষ, গোধূলির মধুর বিষাদ
পাহাড়ে জমাট আর নদীপথে গ্রামের বধূর
রোমান্টিক ছবি নেই, থেমে গেছে গানের নিখাদ,
পাহাড়ের দিকে ছোটে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়।
বাংলোয় বসে' আছি নামহীন প্রত্যাশাবিধুর।

সামনে ছড়ানো রাত্রি, মৃত্যুহীন, অন্ধকারে নীল
অস্পষ্ট আলোকসত্তা, অন্ধকারে মরমী মূর্চ্ছনা
আঘাতে আঘাতে প্রেমে প্রচ্ছন্ন বিলাস হানে মিল,
সংহত পুলকে হানে নক্ষত্রের কতই গুচ্ছ না।
সামনে রাত্রির নীলে ছেয়ে যায় বিরাট নিখিল,
এ বিরাট হৃদয়ের ডুবে যাওয়া বুঝিবা তুচ্ছ না।

নিঃসঙ্গ স্বার্থের রাত্রি মিশে' যায় বাহিরে বিরাট।
আকাশে আকাশে দেশে দেশান্তরে তাই শুনি বটে
দরিদ্র ব্যর্থের গ্লানি পৃথিবীর স্তিমিত আভায়।
পরিপূর্ণ জীবনের অস্তমিত বিচ্ছিন্ন নিশান,
স্বপ্নেরা মরীয়া তাই দীপাবলী পাহাড়ে নিভায়।
জেগে থাকে স্মিতদৃষ্টি নীলকণ্ঠ নির্মম ঈশান॥

বিষ্ণু দে

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

গৌড়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩)

পূর্ব্ব ভারতের গৌড়, মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি প্রদেশগুলিকে নবাবিষ্কৃত 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে 'গৌড়চক্র' বলা হইয়াছে। বস্তুত জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও কৃষ্টির দিক দিয়া এদেশগুলির সম্পর্ক অতি নিকট। বৈদিক সাহিত্যের ঐতেরেয় আরণ্যকে (২।১।১) 'বঙ্গবগধচের' জনপদের উল্লেখ আছে এবং ঐসকল স্থানের লোকদের প্রতি কটাক্ষপাতও করা হইয়াছে। পুনঃ অথর্ব্ববেদে অঙ্গ ও মগধের নামোল্লেখ আছে; এবং উপনিষদেও আমরা মিথিলার নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু কবে পূর্ব্বভারত আর্য্যীভূত হইল তাহা সঠিক বলা যায় না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালের বৌধায়ন স্মৃতিতে (১।২।১৪) এই সকল প্রদেশ সমূহে এক তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ব্যতীত গমন ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে বৈদিক মতের বিরুদ্ধবাদীগণ বাঙ্গলায় প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। জৈন ধর্ম্মপুস্তকে মগধ, অঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের লোকদিগকে উচ্চদরের ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১)। আবার এই সময়ে যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে কীকট (মগধ) দেশকে 'অনার্য্য নিবাস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)।

এতদ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে আর্য্য ও অনার্য্য শব্দদ্বয় ধর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য দলাদলির পরিচায়ক মাত্র। এতদ্বারা হালের প্যান-জার্ম্মানীয় অর্থ সূচিত

১। Sylvain Levy—Pre-Aryans & Pre-Dravidians in India (translated by Dr. P. C. Bagchi).

২। মগধ যে 'কীকট' তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

হয় না। পুনঃ পুরাণে বঙ্গকে 'ঐল' সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে। পার্জিটার 'ঐল' শব্দকে আর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৩)। উত্তর বাঙ্গলা ও কামরূপে রাজা নরক ও তদ্বংশজাত ভগদত্তের সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে। পাণিনি (৬।২।১০০) গৌরপুর নামক একটি জনপদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। জগদ্দল বিহারের ভগ্নাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একটি প্রস্তর ফলকে (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে বাঙ্গলা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই প্রস্তর লিপিতে ইহাও উল্লিখিত আছে যে উত্তরবঙ্গে 'সামবঙ্গীয়' নামে একটি জাতির বাস ছিল। পরলোকগত জয়সওয়াল বলেন যে ইহাঁরা লিচ্ছবীদের ন্যায় একটি ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতি ছিল (৪)। কৌটিল্যে গৌড়ের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পর বাৎসায়ণের (খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী) 'কামসূত্র' নামক পুস্তকেও আমরা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। বাৎসায়ণ গৌড়ীয়দের (গৌড়াণাম্) রীতির বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎসায়ণে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও কটাক্ষপাত আছে। পাহাড়পুরে নবাবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণদের (৫) নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন গুপ্তযুগে (৪৭৮-৪৭৯ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রফলক হইতে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাই যে আর্য্যসভ্যতা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা—৩৯ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বর্দ্ধমানে "লোক" রাজবংশের নাম উল্লেখ আছে। জয়সওয়াল এই বংশের তারিখ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলেন যে এই সময়ের কাছাকাছি 'বর্দ্ধন' নামে একটি রাজবংশ বাঙ্গলায় বর্ত্তমান ছিল (৬)। ইহার পর বাঙ্গলা গুপ্তসাম্রাজ্যের

৩। Pargiter—Ancient Indian Traditions, pp. 305-306.

৪। Jayaswal—Presidential Address in Oriental Conference, held at Indore. এই নাম বিষয়ে আলোচনা H. C. Rai Chaudhuri—Political History of Ancient India, Footnote to p 524. দ্রষ্টব্য।

৫। Epigraphica Indica,—Vol. XX, No 5, p 59.

৬। Jayaswal—An Imperial History of India, p 47.

অন্তর্গত হয়। উপরোক্ত তাম্রশাসনে আমরা তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছি। তৎপর সপ্তম শতাব্দীর প্রাক্কালে বাঙ্গলায় শশাঙ্কের উদয় হয়।

শশাঙ্কের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প অনুসারে শশাঙ্ক (সোম) ব্রাহ্মণ ছিলেন। শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক বিজিত হন। জয়সওয়ালের মতে তিনি বৌদ্ধ পতনশীল মহাযান ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী ছিলেন (৭)। আর্য্যমঞ্জুশ্রীকল্প হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে সবিশেষ নিষ্ঠাবান ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই আমরা শশাঙ্কের জৈন (৮) ও বৌদ্ধদলন ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। ইহা বাংলার একটি শ্রেণীসংগ্রামেরই পরিচায়ক।

শশাঙ্কের পর আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে বাংলায় একটা সাধারণতন্ত্র কিছুদিনের জন্য স্থাপিত হয়। ইহার পর একজন জনপ্রিয় শূদ্রবংশীয় বাঙ্গালী নেতা "ভ" বা "স্ব" নরপতিরূপে (৭৩৫ খৃঃ কিম্বা ৭৪০ খৃঃ) নির্ব্বাচিত হন। ইনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয়কে ভণ্ড বলিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ও অন্যান্যদের ধ্বংস করেন। তাঁহার বড় কড়া শাসন ছিল। ইহার মৃত্যুর পর "মাৎস-ন্যায়" আরম্ভ হয় *। তৎপর জনসাধারণ নীচ শূদ্রবংশীয় (দাসজীবিনঃ) গোপালকে (৭৪০—৭৫৭ খৃঃ) রাজপদে নির্ব্বাচিত ও অভিষিক্ত করেন। জয়সওয়াল উক্ত শূদ্ররাজা ও নির্ব্বাচনের তারিফ করিয়া বলিয়াছেন যে সেই সময়েই

৭। Jayaswal—An Imperial History of India, p 51.

৮। হিয়ান সাঙ্গের বর্ণনানুসারে বাঙ্গলায় জৈন মত সেই যুগে প্রবল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি অঙ্গ (মুঙ্গের, চম্পা) হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা দেবালয় ও জৈনদের (নিগ্রন্থ, দিগম্বর) ধর্ম্মালয়ের সংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কামরূপের লোকদের তিনি দেবোপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বৌদ্ধমঠ কখনও সে-দেশে ছিল না বলিয়াই তিনি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে দুই চারজন বৌদ্ধ তথায় থাকিত তাহারা লুক্কায়িতভাবেই থাকিত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (Watters—On Yuan Chuang, Vol. II দ্রষ্টব্য।

* কালিমপুর অনুশাসন দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলা জাতিভেদের বিধান ও জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বরূপ বৈদিক মত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। আর্যমঞ্জুশ্রীর মতানুসারে এই সময়ে গৌড়দেশ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সনাতনী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের (heretic)দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

গোপালের জাতি ও বংশপরিচয় লইয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে বহু বিতর্ক আছে। শিলালিপিতে তাহাকে 'ব্যপটের' বংশধর বলা হইয়াছে *। তিব্বতের লামা তারানাথ 'ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস' নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত বিবরণ দিতেছেন (৯) ঃ—

মধ্যদেশ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বদিকস্থ বন-মধ্যস্থিত কোনও একস্থানে এক সুন্দরী ক্ষত্রিয়া কুমারী এক বৃক্ষদেবতার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে এই বালক চুণ্ডাদেবীকে (চণ্ডী ?) আরাধনা করিবার জন্য জনৈক আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়। একবার এই দেবী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই বালক দেবী প্রদত্ত একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত গদা (কবচ স্বরূপ) লুক্কায়িতভাবে শরীরে ধারণ করে। অতঃপর বালক আর্য্য খাসার্পণ বিহারে আগমন পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা (উপাসনা) করে। তাহাকে পূর্ব্বদিকে যাইতে বলা হয়। সেই সময় বাঙ্গলাদেশে বহুদিন ব্যাপী অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। প্রজাবর্গ অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। সেখানে সর্দ্দারেরা সকলে সমবেত হইয়া তদ্দেশীয় আইনানুসারে দেশ শাসনের জন্য রাজা নির্ব্বাচন করিত। কিন্তু এই রাজা রাত্রিতে এক ভীষণাকৃতি 'নাগরমণী' কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত। এই নাগরমণী পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার রাণীর আকৃতি ধারণ করিত। কেহ কেহ বলেন— এই নাগকন্যা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রীর রূপ ধারণ করিত; আবার কেহ কেহ বলেন, রাজা ললিতচন্দ্রের স্ত্রীর রূপ ধারণ করিত। এইরূপে উক্ত 'নাগরমণী' সকল নির্ব্বাচিত রাজাদের ধ্বংস করিত। চুণ্ডাদেবীর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বালক তথায় আগমন করে। উক্ত বালক তথায় রাজপদের প্রার্থী হয়। মধ্য রাত্রিতে সেই নাগরমণী রাক্ষসীরূপে তথায় পুনরাগমন করে। এই বালক

---

* গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

৯। Taranatha—"Geschichtedes Buddhismus in Indien"—translated into German by A. Schiefner, pp 202-204.

তাঁহার ইষ্টদেবতার ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত গদারূপ কবচ দ্বারা তাহাকে আঘাত করে; এই আঘাতেই ঐ নাগরমণী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পর দিবস উক্ত বালককে জীবিত অবস্থায় দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়; এবং তাহাকে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ মনে করিয়া পর পর সাতবার রাজপদে নির্ব্বাচিত করা হয়। সকলে তাহার নামকরণ করেন 'গোপাল'। প্রথমে তিনি বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন; জীবনের শেষভাগে মগধ বিজয় করে এবং 'ওটন্ত পুরীর' * নিকট নালন্দা বিহার স্থাপন করেন। ইন্দ্রদত্ত বলেন, আচার্য্য মীমাংসকের মৃত্যুর এক বৎসর পর 'গোপাল' রাজা হয়। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র বলেন যে সে (গোপাল) সাত বৎসর পর নির্ব্বাচিত হয়।

পক্ষান্তরে আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে উল্লেখ আছে যে, শশাঙ্কের (সোম) মৃত্যুর পর গৌড়ে অশান্তি ও বিপ্লব উপস্থিত হয়—এক সপ্তাহকালের জন্য একজন রাজা হয়; পুনঃ এক মাসের জন্য অপর একজন রাজা হয়। অতঃপর একটি সাধারণ-তন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রকম ক্রমাগত একটা বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। এই সময় মঠ সমূহের ধ্বংসাবশেষ লইয়া গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে থাকে। আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে জয়সওয়াল মনে করেন যে, গুপ্তবংশের দ্বাদশাদিত্যের মৃত্যুর পর এই অরাজকতা সুরু হয়। আর্য্যমঞ্জুশ্রী ইহাও বলে যে রাজা 'দ্বদাস্থ'র (দ্বাদশাদিত্য) মৃত্যুর পর গুপ্তদের মধ্যে যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় তজ্জন্যই গৌড়ে একজনকে রাজপদে অভিষিক্ত করা প্রয়োজন হইয়াছিল (১০)। এই পুস্তকে আরও উক্ত হইয়াছে যে দাসজাতীয় 'গোপালেরা' (Gopalas) রাজা হইলে জনসাধারণ ব্রাহ্মণদের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়; বুদ্ধের ধর্ম্ম বিনষ্ট হওয়ায় ধর্ম্মবিহীন সময় উপস্থিত হয়ঃ The people will be miserable with Brahmins. The Buddha's doctrine having been lost, the time will be irreligious (১১)। কালিমপুর অনুশাসনে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাই আর্য্যমঞ্জুশ্রী ও তারানাথে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে

* তারানাথের পুস্তকসমূহে ও 'বু-ষ্টন' নামক তিব্বতী ভাষার এক পুস্তকে 'ওটণ্টপুরী' লিখিত আছে।

১০। Jayaswal—Imperial History of India, p 43.

১১। Jayaswal—Imperial History of India, p 74.

অরাজকতা সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ পাইতেছি তাহাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধারানুসারে অলৌকিক গল্পের আকারে তারানাথে পাইতেছি। কেহই গোপালের জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতেছেন না। তবে আমরা এইটুকু ধরিয়া লইতে পারি যে, তিনি তথাকথিত উচ্চকুলোদ্ভব ছিলেন না। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন অপ্রিয় সংবাদ ছিল যেজন্য তদ্বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছেনা। বরং তারানাথের অলৌকিক জন্মের সংবাদটি সহজ কথায় গ্রহণ করিলে তাঁহাকে জারজই বলিতে হইবে। গোপালের অভিষেকের সময় হইতে বাঙ্গলা ভারতের ইতিহাসে নিজের ব্যক্তিত্ব লইয়া স্বাধীন রাজনীতিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। পালবংশীয়েরা পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হয় বলিয়া ইতিহাসে সংবাদ পাওয়া যায়। দেবপাল দেবের সময় হইতে বাঙ্গলা সর্ব্বোচ্চ রাজনীতিক শিখরে আরোহণ করে। তারানাথের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে গোপালের পর দেবপাল রাজা হন। পরে তিনি বরেন্দ্রভূমি বিজয় করেন এবং সোমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময় উড়িষ্যা এবং অন্যান্য প্রদেশে যেখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল সেখানে তীর্থিকদের (ব্রাহ্মণ) ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হয়। সেইজন্য ইনি তীর্থিকদেয় যুদ্ধে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তারানাথ দেবপাল দেবের জন্ম সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অলৌকিক কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত গল্পটিকে তিনি জনরব বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। রাজা গোপালের মহিষী স্বামী বশ করিবার উদ্দেশ্যে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বশীকরণ মন্ত্র ভিক্ষা করে। ব্রাহ্মণ হিমাবন্ত গমনপূর্ব্বক ঔষধ আনায়ন করে; এই ঔষধ দাসীকে দিবার সময় জলে পড়িয়া গেলে নাগরাজ উহা খাইয়া ফেলে। উক্ত ঔষধের গুণে ঐ নাগ রাজার ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং রাণীর সহিত সহবাস করিতে থাকে। ফলে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে; এবং একটি অজগর এই শিশুর মাথার উপর ফণা বিস্তার করিয়া থাকে। এই শিশুই গোপালের মৃত্যুর পর রাজ্যাভিক্ত হয় (১২)। তারানাথের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে দেবপাল ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র রসপাল; তিনি দ্বাদশ

১২। Lama Taranath—pp 208—210.

বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তৎপর ধর্ম্মপাল রাজা হন—তিনি ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি কামরূপ, 'তীরহুতি', গৌড় প্রভৃতি জয় করেন। তাঁহার রাজত্ব বহু বিস্তৃত ছিল—পূর্ব্বে সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত, পশ্চিমে দিল্লী, উত্তরে জলন্ধর এবং দক্ষিণে বিন্ধপর্ব্বত। তিনি শ্রীবিক্রমশিলা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর রাজা হন রামপাল—তাহার রাজত্বকাল ৪৬ বৎসর। পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র যক্ষপাল নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি নিজে মাত্র একবৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মন্ত্রী লবসেন (লাউসেন ?) তাহার হস্ত হইতে রাজ্যশাসন কাড়িয়া নেন। লবসেনের পুত্র কসসেন, তাহার পুত্র মণিত সেন এবং তৎপুত্র রথিক সেন—ইঁহারা সমুদয়ে আশী বৎসর রাজত্ব করেন। তারানাথ পালবংশের অনেকের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে এই বংশের নয়জনই বিশিষ্টভাবে গণ্য ; কারণ তাহারা বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সেবা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্যেরা তদ্রূপ মাননীয় নহেন। এতদ্ব্যতীত রামপাল সম্বন্ধে আরও একটি সংবাদ দিতেছেন।

রাজা রামপালের সময় সিরো নামক জনৈক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। রামপালের হস্তী "ভনভদল" এই সিদ্ধপুরুষের পদধৌত জল পানান্তে যুদ্ধে গেলে রামপাল একশত ম্লেচ্ছের উপর বিজয়ী হন (১৩)।

অতঃপর তারানাথ বলেন যে পালেরা সূর্য্যবংশীয় ছিল—চন্দ্র এবং সেন-বংশদ্বয় চন্দ্রবংশীয় ছিল। চার সেন রাজাদের শাসন সময়ে মগধে 'তীর্থিকেরা' (ব্রাহ্মণ) ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল ; তৎসঙ্গে তাজিকদের ম্লেচ্ছ পদ্ধতির (মুসলমান ধর্ম্ম) অনেক ভক্ত আবির্ভূত হয়। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী অন্তর্ব্বেদী প্রদেশে তুরস্করাজ "চন্দ্র" আবির্ভূত হয়। সে বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বার্ত্তাবহ-রূপে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা এবং পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের ক্ষুদ্র তুরস্ক সর্দ্দার বা প্রিন্সদের (Fuerst) নিজের সহিত সম্মিলিত করিয়া সমুদয় মগধ প্রদেশ লুঠতরাজ করিতে থাকে ; ওটন্তপুরীর অনেক সাধুদের হত্যা করে, বিক্রমশিলা ধ্বংস করে (১৩ক)। ওটন্তপুরীর স্থানে তাজিকদের একটি কেল্লা

১৩। Taranatha's "Edelsteinmine" (মাণিকের খনি)—Albert Gruenwedel কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত, p 31.

১৩ক। সাধারণের ধারণা, এই ধ্বংসলীলার সঙ্গে নালন্দা বিধ্বংস হয়। তিব্বতীয় পুস্তক-

নির্ম্মিত হয়। ফলে বহু পণ্ডিত দক্ষিণে, পূর্ব্বে এবং তিব্বতে পলায়ন করে (১৪)।

তারানাথের বিবরণ বাঙ্গলার ইতিহাসগ্রাহ্য বিবরণের সহিত মিলে না। তিনি বলিয়াছেন—তাঁহার ইতিহাস ১৬০৮ খৃঃ তাঁহার ৩৪ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হয়। অনুবাদক তাঁহার মুখবন্ধে বলিতেছেন যে তারানাথের এই পুস্তককে একটি ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু ইহা একটি দলিল (data) স্বরূপ যাহা হইতে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অনুবাদক আরও বলেন—হিয়েন সাং হইতে আমরা এই তথ্য পাই যে ভারতবর্ষে ইতিহাস লেখা অজ্ঞাত ছিল না। তারানাথ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, তিনি ভারতে লিখিত তিনখানি ইতিহাস হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলি তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে হাতে পাইয়াছিলেন। এই পুস্তকগুলির প্রতিলিপি (copy) শুধু তিব্বতে নয়—নেপালেও আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া অনুবাদক আশা করিয়াছেন (১৫)। তারানাথ এই ঐতিহাসিকদের নাম তাঁহার 'মাণিকের খনি' নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেনঃ মগধের পণ্ডিত ইন্দ্রভদ্র, ইন্দ্রদত্ত এবং ভটঘদ্রি। শেষোক্ত নাম দুইটি তিনি তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিরাছেন; কেবল ইন্দ্র ভদ্রের পরিবর্ত্তে তথায় ক্ষেম ভদ্রের নাম করিয়াছেন (১৬)।

সমূহে তুর্কি কর্ত্তৃক নালন্দা ধ্বংসের কথা নাই। ওদন্তপুরী যদি বর্ত্তমানের বিহার সরিফ হয় তাহা নালন্দা হইতে দূরে। ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় বুঝা যায় ('বেনের মেয়ে' দ্রষ্টব্য) যে ওদন্তপুরী মগধের রাজধানী ছিল। অন্যপক্ষে P. al Jor-এর "History of the Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India, edited by S. K. Das, pp 92 বলা হইয়াছে যে নালন্দার লাইব্রেরী যাহাকে ধর্ম্মগঞ্জ বলা হইত তাহা তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) ভিক্ষুকদের দ্বারা অগ্নি সংযোগে বিধ্বংসীকৃত হয়। 'রত্নসাগর,' 'রত্নরঞ্জক', 'রত্নদধি' নামক তিনটি মন্দিরে লাইব্রেরী রক্ষিত হয়। এই তিনটি মন্দির লইয়া 'ধর্ম্মগঞ্জ' সংগঠিত হয়।

১৪। Taranath—"Geschichte des Buddhismus in Indien"—translated into German by A. Schiefner, pp 252—255.

১৫। Taranath—p. 17.

১৬। Gruenwedel's Preface—p 8

তারানাথ পালবংশের অনেকেরই নাম করিয়াছেন—কিন্তু কর্ণাটকাগত বল্লালসেনের বংশের নাম উল্লেখ করেন নাই। তৎপরিবর্তে লবসেনের নামোল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে লবসেনের প্রপৌত্রের মৃত্যুর পর তুরস্কেরা বাঙ্গলা বিজয় করেন। এখানে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি একটা মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন; কিন্তু লবসেন সম্বন্ধে তিনি এক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। বাঙ্গলার পুরাতন পঞ্জিকাসমূহে কলিযুগের রাজাদের নামের তালিকায় লবসেনের নামোল্লেখ হইত। কিন্তু তাঁহার নামে কোন অনুশাসন আজও পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেবল ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থেই তাহাকে ধর্ম্ম-ঠাকুরের ভক্ত এবং সম্রাট ধর্ম্মপালের সেনাপতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Social History of Kamrupa নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"Some of the Doma soldiers who went to Kamrupa with Lausena settled there. Their descendents still sing of the achievements of Kalu Doma, the general of Lausena." অর্থাৎ যেসব ডোম-সৈন্য লাউসেনের সহিত কামরূপ গমন করিয়াছিল তাহারা তথায় বাস করে। তাহাদের বংশধরগণ এখনও লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া থাকে। তিব্বতীয় P.al Jor-এর পুস্তকেও লবসেন ও তাহার বংশের কথা উল্লিখিত আছে (১৮)। তারানাথ লবসেনের বংশের নিম্নোক্ত তালিকা দিতেছেন: লবসেন, তাহার পুত্র বুদ্ধসেন, তাহার পুত্র হারিত সেন, তাহার পুত্র প্রতিত সেন প্রভৃতি। (উপরে দৃষ্ট হইয়াছে যে তিনি একটি পৃথক নামের তালিকা দিয়াছেন।) ইহারা ষাট বৎসরকাল রাজত্ব করে। তাহারা তুরস্কের হুকুম মানিয়া চলিত, তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির অনুপাতে বৌদ্ধ-

১৭। N. N. Vasu—The Social History of Kamrupa, Vol. I, p 211.

৺বসু মহাশয় লেখককে ব্যক্তিগতভাবেও এই কথা বলিয়াছিলেন। কামরূপস্থ ডোমদের ভিতর এই জনশ্রুতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

১৮। P.al Jor—Edited with a list of contexts and an analytical index in English, by S. C. Das, p 120.

ধর্ম্মের প্রতি খুবই সামান্য ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত (১৯)। তিনি আবার এই সংবাদ দিতেছেন যে প্রতিত সেনের মৃত্যুর একশত বৎসর পর বাঙ্গলায় একজন শক্তিশালী জঙ্গল রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত হেন্দু ও তুরস্কদের উপর শাসন করিতেন। (তারানাথ তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে হিন্দুর পরিবর্ত্তে 'হেন্দু' (Hendu) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।) প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, পরে তদীয় বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ও বিশ্বাসী স্ত্রী কর্ত্তৃক তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি বজ্রাসনে বড়পূজা প্রদান করেন; তিনি সমস্ত বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির পুনঃ সংস্কার ও নির্ম্মাণ করেন। তুরস্কদের দ্বারা বিনষ্ট গণ্ডোলার * চারিতলা পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পণ্ডিত সারীপুত্র এখানে বাস করিতেন বলিয়া তিনি একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দার মন্দির সমূহের প্রতি তিনি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি কেবল বড় বড় বিদ্যাপীঠ সমূহই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। তারানাথ বলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর মগধে আর এরূপ কোন রাজার কথা তিনি শোনেন নাই যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণকারী ছাত্র ও পিটকধারী লোকও যে তথায় অবস্থান করিয়াছিল তাহাও তিনি শ্রবণ করেন নাই (২০)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। Taranath—Geschichte des Buddhismus, pp. 255—257.

* গন্ধোলা—গন্ধালয়। বজ্রাসন বা বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের মন্দির; এবিষয়ে P.al Jor. পৃঃ ৭৭ দ্রষ্টব্য।

২০। Taranath—Geschichte des Buddhismus, pp 255—257.

স্বর্গ-রচনা

ভাবছ তুমি যা-কিছু ছিল দেবার
দিয়েছ সবই শূন্য করিয়া
নীরবে পূজা-দেউলে তব সেবার
অর্ঘ্য সবই দিয়েছ ধরিয়া,
একলা পথে ফিরেছ যবে ঘরে
এই পৃথিবীর কোনো মানুষের তরে
আপন হাতে রাখনি কিছু আর,
তা যদি হবে, তাহলে কার ডরে
বন্ধ মনের সব কটি দুয়ার।

মনের ঘরে সকলি যদি ফাঁকা,
দুয়ার খুলে ধর না দু'হাতে,
নিজেরে কেন লুকিয়ে তবে রাখা
নিজের মনে আঁধার গুহাতে?
সকল অলিগলি ত সেথা চিনি,
সাধ্য যদি হয় ত ল'ব জিনি
আমার যেই রতন পরে লোভ
সোনার দামে ধূলিও যদি কিনি
তা ল'য়ে মোর র'বে না মনে ক্ষোভ।

দিয়েছ বটে সকল খালি ক'রে,
এমনতর আরো ত কত হয়,
আবার ওঠে আপনা হতে ভ'রে,
এই পৃথিবী ফাঁকা ত নাহি সয়।
সকল গিয়ে তবু ত বাকী থাকে
দেয় যা সাড়া ডাকার মত ডাকে,
আমার লাগি থাক না খালি সে,
সাধ্য না হয়, পড়ি ফাঁকির ফাঁকে,
কান দিয়ো না তুমি সে নালিশে।

বন্ধু, মোরা ভুলেছি তাও বলি,
অসীম পথের আমরা পথিক যে,
ঘরের পাশে ঐ যে অন্ধ গলি,
মোদের গড়া জীবন-প্রতীক সে।
দিয়েছি কি বা দিইনি ভালবাসা,
জনম হতে মরণে চ'লে আসা
স্মরণে রেখে একটি পথের চিন্,
অচেনা পথে অজানা কাঁদাহাসা
ভাসিয়ে সবই নেবে ত একদিন?

ভেসে যে যাব, এই কথাটিই বড়,
নোঙর তোলা তাই ত তরীতে,
যাবার বেলা হলে নিকটতর
পড়বে না টান বাঁধন-দড়িতে।
হাসির সাথে মিলিয়ে দেব হাসি,
বাসব ভাল, বলব ভালবাসি,
কাঁদব ব'সে সবার কাঁদনে,
ফুলের মালা ক'রে গলার ফাঁসি
কি হবে বেঁধে অটুট বাঁধনে?

তোমারে নিয়ে চাই নি ত ঘর বাঁধা,
সবার মাঝে ঘরছাড়ারে চাই,
চলিতে পথে মেলানো হাসাকাঁদা,
ভালো যে লাগে সেই কেনাবেচাই।
ঘর যে খুঁজি, ঘর কোথা কি আছে?
ঝড়ের হাওয়া লাগল গাছে গাছে,
প্লাবন লাগে আকাশে পাতালে,
না হয় ডেকে নাই বসালে কাছে
এমন দিনে ঘরের চাতালে!

বাহির হয়ে হাতটি রাখো হাতে,
চাহিয়া দেখ সমুখ দিগন্তে,
কাছের ছায়া দূরের ছায়ার সাথে
এক হয়ে যায় কার মায়ামন্ত্রে।
তোমার সাথে আমার সাথে মিলে
একটি ছায়া পড়ছে এ নিখিলে,
সেইখানে আজ তাকাই দুজনে।
মিলাবে ছায়া ভোরের হাওয়া দিলে,
জাগলে আলো পাখীর কূজনে।

কার এ খেলা, ছায়াতে ছায়া ফেলা,
আমি ত জানি আমার হৃদয়ে,
মায়াবী যে সে, তাহার দেখা মেলা
কঠিন কি যে জানো না নিদয়ে!
কখন কবে দুখানি মুখ ভ'রে
এক হয়ে যে তাহার ছায়া পড়ে,
এক পলকে যায় সে মিলায়ে,
সুযোগ পাছে হারাই, ঘরে পরে
আপনারে তাই বেড়াই বিলায়ে!

পেয়েছি যারে তারেও ধ'রে রাখি,
পাইনি যারে, তারেও চাহি যে,
এসেছে যারা, আসিতে যারা বাকী,
সবারই ঘাটে তরণী বাহি যে।
হেরেছি কি বা হেরিনি তাঁর জ্যোতিঃ,
বেসেছি ভালো, বাসিনি একরতি,
ব'লো না তার হিসাব মেলাতে,
সকলি লাভ, সকলি মোর ক্ষতি
তোমারে ভালোবাসার বেলাতে।

হয়ত কভু কাহারও ভালোবাসা
ছেয়েছে আঁখি মায়ার কাজলে,
সেই যে আলো, সকল তমোনাশা,
তার চোখে কই উঠল না জ্ব'লে।
হেরিতে তারে বিশ্বভুবনময়
হেরিনু কারে, গাহিনু জয় জয়,
পেলাম যাহা পায় না সকলে,
হ'ল না তবু পরম পরিচয়,
ঘুচল না ভেদ আসল নকলে।

যেখানে আমি আসল সেইখানে যে
আমার সখা বরুণ পুরন্দর
আকাশ সেথায় উজল আমার তেজে,
সাগর নদী বন গিরি-কন্দর।
সেই মায়াবীর ছায়া যখন পড়ে,
মানুষ তখন দেবতা রূপ-ধরে,

দেবতা যদি দেখান দেখি তাই।
দেখল না কে, কেনই বা, তার তরে
দোষ কারো ত ধরব না বৃথাই।

তোমার চোখে জ্বলুক না সেই আলো
জ্বলল যা আজ আমার আঁখিতে,
বুঝবে তবে কারে যে বাসো ভালো,
কারে যে চাও হৃদয়ে রাখিতে।
আমার মাঝে গোপনে যার বাসা,
মেটাতে পারে সকল তব আশা,
কেবল তারে লও গো চিনিয়া,
কি হবে শুধু কুড়ায়ে ভালবাসা,
কি হবে শুধু হৃদয় জিনিয়া?

নিমেষ তরে তার যে আসা-যাওয়া
নিমেষে ফুটে ঝরে সে শুকিয়ে,
সবার চোখের আপন চোখের চাওয়া
যেই মায়াবী বেড়ায় লুকিয়ে।
অসীম পথের সেই যে মোদের সাথী,
তুলিয়া ধরি ভালবাসার বাতি
সবার মুখে খুঁজি ত তার মুখ?
মোর মুখে আজ জ্বলবে তারই ভাতি,
মোর হাতে তার কুসুম-কার্ম্মুক।

তোমার মাঝে কতক পাবে তাঁর,
আমাতে বাকী জাগায়ে তুলিও,
দেবতাতে মিল ঘটিলে দেবতার
স্বর্গ হবে ধরার ধূলিও।

আমার বুকে, আমার অনুরাগে,
তোমার তরে পরশ তাঁরই জাগে,
দেখার মত যদি গো দেখিতে!
এই মিনতি রইল তোমার আগে,
ঘুচাও বাধা সাঁচ্চা-মেকিতে।

দেবতা হয়ে এসো গো মোর কাছে,
আমারে তুমি কর গো দেবতা,
তাঁহারই হাতে দিয়ো যা দিতে আছে,
তাঁহারই মত করিয়া নেব তা।
অসীম পথে চলিব ফিরে যবে,
ভাবিছ দেখা হবে কি নাহি হবে,
কেনই মিছে বিপদ বাড়ানো;
আমি জানি অমর হ'য়ে রবে
হাতটি হাতে রাখিয়া দাঁড়ানো।

তোমাতে যাঁরে হেরেছি ক্ষণে ক্ষণে,
দেবতা তিনি মৃত্যু-রহিতা,
তোমার প্রেমে জাগে যে এ জীবনে
দেবতা সেও তোমারে কহি তা।
মৃত্যু যবে জিনিবে ফেলি পাশা,
এরা ত র'বে, র'বে ত সেই আশা,
না হয় মোরা র'ব না দু'জনে,
না হয় ম'রে ফুরাবে ভালবাসা,
মিলালে ছায়া পাখীর কূজনে।

সেই যে দুটি দেবতা বেঁচে র'বে,
ফিরিয়া দোঁহে পাবে যে হারায়ে,

প্রেমের পাঠ নূতন করি লবে
হাতটি হাতে রাখিয়া দাঁড়ায়ে।
আবার কভু দুখানি মুখ প'রে
মিলিয়া যদি একটি ছায়া পড়ে,
এমনি কোনো গোধূলি বেলাতে,
এমনি কোথা স্বর্গ ওঠে গ'ড়ে
দেবতা করে মানুষে মেলাতে।

সেখানে মোরা র'ব কি নাহি র'ব,
তা ভেবে আঁখি কেন গো আনত,
তোমার মাঝে দেবতা যিনি তব,
তোমা হতে যে বড় তা মানো ত ?
কি হবে ব'লে —'জীবনে নব নব
তোমারে ফিরে খুঁজিয়া আমি ল'ব
কঠোরতর তপের সাধনে ?'
জামোত কোটী মরণ হেসে স'ব
তোমারে পেতে বাহুর বাঁধনে।

বন্ধু আমার, কোনো জন্মান্তরে
তোমারে যদি পাই গো ফিরিয়া,
ঘর-ছাড়ানো এমনি ছায়া পড়ে
সেদিনও যদি দোঁহারে ঘিরিয়া,
মোর দেবতা তোমার দেবতারে
চিনিয়া ল'বে, চিনিব না ত তারে,
দোঁহারে দোঁহে চিনিতে পাব না,
র'ব কি মোরা র'ব না একেবারে
তা লয়ে তবে কেন এ ভাবনা !

কারে যে দেবে, কি তুমি দিতে পারো,
তাও ভেবে আজ ক'রো না শোচনা,
মনের দ্বার ক্ষণিক যদি ছাড়ো
শূন্যে হবে স্বর্গ-রচনা।
কিছুই বাকী নাই সে মনের ঘরে
এই পৃথিবীর কোনো মানুষের তরে,
না হয় তাও করিব স্বীকারই,
কেবল যেন বারেক মনে পড়ে
দেবতা তব দুয়ারে ভিখারী

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

পুস্তক-পরিচয়

দক্ষিণায়ন—বিমলচন্দ্র ঘোষ। কবিতা-ভবন।

পৌত্তলিক—হরপ্রসাদ মিত্র। পরিচয় প্রেস।

ভিহাং নদীর বাঁকে ও অন্যান্য কবিতা
রুদ্র বসন্ত—
অশোকবিজয় রাহা। বিষ্ণুপুর ভবন। শ্রীহট্ট।

কাব্যাদর্শ ও সেই সঙ্গে কাব্যপদ্ধতি গত কয়েক বৎসরে খানিকটা বদলেছে অস্বীকার করা আর যায় না। যা মতান্তর সেটা পরিবর্ত্তনের মান ও গুণ, তার সামাজিক ও রূপগত সার্থকতা সম্বন্ধে। মতান্তর যেকালে জনসাধারণ পাঠক পাঠিকার মধ্যে সচেতনার চিহ্ন, তখন ক্ষোভের প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ তর্ক আরো তুমুল হলেই খুশী হওয়া যেত। কবিতার পৃষ্ঠায় অতুল বাবুর সমালোচনা, নিরুক্ত পত্রিকায় এবং অন্যান্য দু'এক স্থানে মন্তব্য লিখেই যেন নতুন লেখকদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষের কথা শেষ হল! শুনেছি, বাঙালী সাহিত্য ভালবাসে, প্রমাণও পেয়েছি, তবু অনুরাগ এত ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্পায়ু কেন? বাধ্য হয়ে বলতে হয় অনুরাগ আছে কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি, গতি ও রীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে এখনও মনে আমাদের কোনো বিশ্বাস জন্মায় নি। প্রকৃত পক্ষে আর্ট, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, কোনো বিষয়েই বিশ্বাস স্বতঃপ্রসূত নয়। যদি ঐ বিষয়ের অদল-বদল সংক্রান্ত জ্ঞান জীবন-ধারার রক্ষা কিংবা ধ্বংসের স্বার্থজনিত হয়, তবেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই, বাঙালীর জীবনযাত্রার মূলসূত্র ঢিলে হলেও এখনও ছেঁড়ে নি, আমাদের স্বার্থে ঘা পড়ে নি, কেউ ভয়ও পায় নি, নতুনত্বের প্রয়োজন বোধ কারুর তীব্রও হয় নি, কেউ ভাবছেন এই ভাবেই বেশ কয়েক-দিন চলে যাবে, কেউ ভাবছেন সামান্য সংস্কারেই যথেষ্ট, এবং কেউ মনে করছেন থাকলেই বা কি গেলেই বা কি। এই প্রকার অবস্থায় বাঙলা সাহিত্যে একটা যথার্থ ও মূল্যবান পরিবর্ত্তন কল্পনাতীত; অতএব, মতামতের পার্থক্য বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ারই সামিল হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে পূর্ব্বেকার

মন্তব্যের রূঢ়তা এবং 'হের্ নানি' নাটক অভিনয়ের সংস্রবে প্যারিসের মারপিট আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে। হ্যুগো ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমাজের সংক্রান্তিকে রূপ দেন। রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে সনাতনী হিন্দুর ভাষার তুলনায় অতুল বাবুর প্রবন্ধের ভাষা গায়ে শুড়শুড়ি দেওয়া মাত্র।

তবে জীবজগতে ছোট খাট অদল-বদলের একত্রিত ফলে যেমন সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার উত্থান হয়, তেমনই মনোময় জগতে অকিঞ্চিৎকর পরিবর্ত্তনের সহযোগে আকস্মিক ঘটনার সাক্ষাৎ অভাবনীয় নয়। তবে গোটা কয়েক পূরণ চাই। যদি আপাত দৃষ্টিতে সামান্য সামাজিক বিচ্যুতি ও তুচ্ছ প্রকরণগুলির সংখ্যা অত্যধিক হয়, যদি তারা পৃথক কিংবা সমবেতভাবে অন্তরের জোরে ও পরস্পরের সহায়তায় অতিজীবনের পরিপন্থী হয়ে ওঠে, যদি তাদের উদ্ধবর্ত্তনের কাজে লাগাবার সক্রিয় বুদ্ধি সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবেই জীবধর্ম্মের প্রগতি মানস ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে বিপ্লব সাধনে সমর্থ হতে পারে। অর্থাৎ তখনই ডায়েলেক্‌টিক্‌স্ কার্য্যকরী হতে দেখি। কিন্তু তবু আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ আমাদের সমাজে পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের পূরণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কি? তবে অবশ্য কবিদের অনুভব তীব্র, তাঁদের স্নায়ু লজ্জাবতীর লতাতন্তুর মতন, তাঁদের ভাষা সহজবশ্য ও অধিকতর ফলদায়ক, অর্থাৎ শক্তি তাঁদের বেশী। জ্ঞানও তাঁদের সামাজিক, যদিও সেটি সামাজিক রীতি-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণে যখন এই প্রকার জ্ঞানের সার্থকতা স্বীকার করছে না, তখন কবিদের আমরা অতিমানব ভাবি আর না ভাবি, একটু বেশী রকমেরই শ্রদ্ধা করি। অতএব তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশারও শেষ নেই। তাই আমরা ইচ্ছা করি, যৎসামান্য অদল-বদলের সাহায্য নিয়ে বাঙালী কবি 'আধুনিক' হোন, বিদ্রোহী হোন; কিংবা সেগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে সমাজের ও সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যগুলিকে বজায় রাখুন।

কিন্তু তা হবার নয়। যা চারপাশে নেই তার অতিরিক্ত ব্যবস্থার দৃঢ় অনুভব তাঁদের দ্বারাও সম্ভব নয়। বাইরের বিবর্ত্তন কাব্যধর্ম্মের প্রকৃতি ও কাব্যপদ্ধতির স্থূল সীমা বেঁধে দেয়। সে প্রকৃতির ও সীমার ওপারে স্বপ্ন-বিলাস, যদি কবি ও অন্য সাহিত্যিক সমাজজীবনের রীতি-নীতি সম্বন্ধে

অত্যন্ত সচেতন না হন; সে-প্রকৃতিরও সীমার অন্তরে নিজের কৃতিত্ব, যদি সেটা থাকে। যে-শ্রেণী থেকে বাঙালী সাহিত্যিক ওঠেন সে-শ্রেণীর জীবনের ওপরকার সীমা মধ্যবিত্তের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এবং নীচেই যা কিছু অস্থিরতা। কিন্তু অস্থিরতা স্নায়ুগত, বুদ্ধিগত নয়। যে-বাড়ির ছাদের সিঁড়ি নেই, সে-বাড়ির মেয়েরা যেমন ভাঁড়ার ঘরে বসে নিজেদের বুদ্ধিই দেখায়, জা-ননদ পাড়া-পড়শীর কাছে নিজেদের ঐশ্বর্য্যের বড়াই করে কিংবা দুঃখই জানায়, দুধের হিসেব করতে করতে আনন্দ বাজারের বিজ্ঞাপনে গহনার নতুন প্যাটার্ণ ও শেষ পৃষ্ঠায় রুশিয়ান মেয়েদের স্বাধীন জীবন-যাত্রার বর্ণনা দেখে, পড়ে নয়, দেখে, দীর্ঘ নিঃশ্বাসই ফেলতে থাকে, ঠিক তেমনই আমাদের বাঙলা আধুনিক সাহিত্যের ও কবিতার হাল। জানে এই বাড়ির মেয়েরা যে অন্য বাড়ির ছাদ আছে, কিন্তু ওরা বড়লোক, অপরিচিত, তাই ওদের ওপর শ্রদ্ধা না হয় ঈর্ষাই তারা করে। ব্যাপারটা দোষও নয়, গুণও নয়, তথ্য মাত্র। কিন্তু এই মেয়েরাই রেঁধে-বেড়ে আমাদের খাওয়াচ্ছে, এই ছাদহীন বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে অনেক মজার কথা, সুখ-দুঃখ, লেন-দেন, আশা নিরাশার খেলা চলছে যে-গুলিও সাহিত্যের বস্তু। জানি, তাই আধুনিক কবিতা মন দিয়ে পড়ি, জানি, তাই জ্যোতির্ম্ময় রায়ের ছোট গল্প ভাল লাগে। জানি বলেই কিন্তু আবার আশা করি বড় জিনিষের, খোলা জায়গার সন্ধান পেতে। যখন পেলাম, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায়, তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'তে, তখন কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল, দোষ গুণ, বাধা বিপত্তির কথা সরে গেল। দুঃখ এই যে ইতিমধ্যের ব্যবস্থায় আবার আমাদের ফিরতে হয়—তখন রূঢ়ভাবেই মনে পড়ে যে বাড়িটার ছাদ নেই যেখানে গিয়ে মেয়েরা আধ ঘণ্টার জন্যও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বিকেল বেলার অলস আলো, পশ্চিমের সিঁদূরে আকাশ গোয়াল ঘরের মতন শোবার ঘরের জানলার খড়-খড়ি তুলেই দেখতে হবে, আর উনুনের ধোঁয়ার গন্ধে বালসূর্য্যের অস্তিত্ব অনুমান করতেই হবে—এই নিয়তি। তবে অনধিগম্য নয়, অনতিক্রম্যও নয়, যদিও সে কাজ আমরা যাদের কবি বলি সে-জাতের লোকদেরও নয়। কোনো দিন হয়ত নতুন লেখকের জন্ম হবে যাঁরা মুক্ত পথে আমাদের নিয়ে যাবেন। কিন্তু ততদিন এঁদের কবিতা পড়ব। যে ক'জন কবির লেখা

সমালোচনা করছি তাঁদের অসন্তোষ আছে, তাঁরা জানেন যে বাড়ির বাইরে রাজপথ চলেছে যা ধরে এমন স্থানে পৌঁছান যায় যেখানে মানুষের সমবেত প্রয়াসে সার্ব্বজনীন মুক্তি সম্ভব। অসন্তোষ এমন তীব্র ও সর্ব্বগ্রাসী নয় যে তাকে 'প্যাশন' বলা যায়, তবু আছে। কারুর অসন্তোষ বেশী, কারুর কম, তবু রয়েছে, এটাই আপাতত মনে রাখতে হবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবেশ আলোচিত গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্ষণিক অনুভূতি, ক্ষুদ্র ও মহানের সমাবেশ ও এককালীন প্রতিচ্ছায়া, দ্বৈতবোধের সম্মুখে হতাশা, যৎসামান্য কৃত্রিমতা, যাকে অভিনয় বলা যায়, একটু দায়িত্ব-হীনতা, এই সব ভাব সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। ভাষার ভঙ্গীও ঐ হিসাবে যথার্থ। অনুভূতি যদি স্থায়ী না হয় তবে তার ভাষা, সাধারণত, টাইপরাইটার ও টেলিগ্রাফের ভাষার মতন reportage, slapdash হওয়াই স্বাভাবিক। 'মায়াপুরী' 'আঁখি মোর ঘুম না জানে' প্রভৃতি অশোকবিজয়ের কবিতার চটুল ছন্দ ও খাপছাড়া ভাব সাম্বাদিকের উপযোগী। 'সাধারণত' আগে লিখেছি এইজন্যে যে ক্ষণিক হলেই যে ছন্দকে হালকা হতে হবে এমন কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। যদি কবির দর্শনটাই ক্ষণিকবাদ হয় তবে ছন্দে গাম্ভীর্য্য আসে, যেমন সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায় থাকে। তখন আমরা 'সীম্বলের'ও সাক্ষাৎ পাই। বর্ত্তমান কবিতা গ্রন্থে যে কোনো সীম্বলই পেলাম না তাই থেকে প্রমাণ হয় যে ক্ষণিক ভাবচ্ছবি এই কবিদের হাতে গ্রথিত হয় নি, 'দানা' বাঁধে নি। অবশ্য সেইজন্যই আবার কবিতাগুলি দ্রুত পটপরিবর্ত্তনের সাহায্যে সহজবোধ্য হয়েছে। কিন্তু যেকালে এই সারল্য প্রধানত পাঠক ও লেখকের মনোভাবের সাদৃশ্যেরই জন্য, তখন তাকে একটা মস্ত কৃতিত্ব ভাবতে পারি না। অর্থাৎ এই কবিদের ভাষার ও ছন্দের বাহাদুরী আংশিক।

হতাশা, অভিনয় ও দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি মনোভাবের যা কিছু সামান্য পরিচয় পেয়েছি সেগুলি একত্র করলে আধুনিক কবিতার একটি সাধারণ গুণ ধরা পড়ে। আমাদের আধুনিক কবিতা মোটামুটিভাবে যাকে শিক্ষিতরা রোম্যান্টিক ও লিরীক বলেন তাই। রোম্যান্টিসিজম্ বস্তুটি প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমের মনোভাব, তার তাগিদ হল মৃত্যু-ইচ্ছা এবং প্রকাশ 'প্যাশন' থেকে সুরু করে পলায়ন পর্য্যন্ত, স্বেচ্ছাকৃত বেদনার পথ দিয়ে। আমাদের সভ্যতায়

মৃত্যু-ইচ্ছা 'death-wish' কখনও বলবতী হয় নি। অমৃতের পুত্র, অবিনশ্বর আত্মা প্রভৃতি সংজ্ঞা, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাযুয্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ ও তান্ত্রিক সাধনা প্রভৃতি থেকে প্রমাণ পাই যে আমরা মৃত্যুকে কখনও জীবনের অবসান কিংবা ভয়ঙ্কর ভাবি নি। (রবীন্দ্রনাথ কখনও "রোম্যান্টিক" নন, 'ছিলেন না' কোনো বাঙালী যেন না লেখে, মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর কবিতা সমালোচনা করলেই এই ধারণা ঘুচে যায়। য়েটস এই হিসাবে পুরোপুরি রোমান্টিক।) কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশত উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী রোম্যান্টিসিজম আমাদের স্কন্ধে অশ্রয় করেছে, এবং আমরা য়ুরোপীয় রোম্যান্টিসিজমের মর্ম্ম না বুঝে, ইংরেজী সাহিত্যের আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিসর্ব্বস্বতাকেই রোম্যান্টি-সিজম বলে থাকি। বলা বাহুল্য, হতাশা, দায়িত্বহীনতা, অভিনয় প্রভৃতি যে-সব মনোভাবের উল্লেখ করেছি সেগুলি এই আত্মকেন্দ্রিকতারই নিদর্শন। তার সঙ্গে একধারে প্যাশনের ও অন্যধারে আত্মবিশ্বাস ও আত্মায় বিশ্বাসের প্রভেদ বিস্তর। আমরা দু'নৌকার মাঝে পড়ে গেছি, মনোভাবের দিক থেকে।

গোটা কয়েক প্রমাণ দিচ্ছি। বিমল ঘোষের রচনায় পূর্ব্বোক্ত মনোভাব এঁদের মধ্যে সব চেয়ে কম, তবু তাঁর জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এইটাই ফুটেছে। "স্বয়ম্ভূ" কবিতায় কবি নিজেকে স্বয়ম্ভূ বলেছেন। পরের পাতায় অভিব্যক্তি কবিতাতে 'চিরস্বয়ম্ভূ তুমি' হলেন। প্রথমটিতে ঔপনিষদিক উল্লেখ এবং দ্বিতীয়টিতে আধুনিক দর্শনের জীবন-শক্তি, life force, ও বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি-বাদের ব্যবহার কেবল মাত্র ঐতিহ্য ও বর্ত্তমানের পরীক্ষার দ্বন্দ্ব প্রকাশ করছে না, কবির মনের অনিশ্চিত আস্থা ও ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্বেরই পরিচয় দিচ্ছে। উপনিষদের উপমা ও বিজ্ঞান, দুইই তাই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ামাত্র মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে উপনিষদের আত্মার ও জীবনশক্তি, উভয়ের কোনটির সঙ্গেই ব্যক্তি-প্রধানতা খাপ খায় না। দু'পৃষ্ঠা পরের কবিতায় আবার 'মানব দানব নয় মান্ত্রিক, যান্ত্রিক, ক্রমোন্নত সভ্যতার স্বয়ম্ভূ বিধাতা'। কবির মানসিক অস্থিরতা কিন্তু শোভন হল 'মিশ্র রাগিনী'তে, সেখানে প্রাণ খুলে কবি স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নিয়েছেন। এই কবিতার তুলনায় 'জন গণেশায়' অসার্থক। সার্থকতার আপেক্ষিকতাই অজ্ঞাতসারের প্রমাণ। অশোক

বিজয়ের 'ছত্রচূড়', হরপ্রসাদের 'শতাব্দী', কবিতা হিসাবে উপভোগ্য নিশ্চয়, কিন্তু তাঁদের গ্রন্থ থেকেই একাধিক দৃষ্টান্ত পাচ্ছি যেখানে আড়ষ্টতার, অস্বস্থির চিহ্ন নেই, আছে সহজ সম্পূর্ণতা, স্থির দৃষ্টি, যার প্রসার ছোট হলেও সততা যার নিঃসন্দেহ। এই বক্তব্য কোনো ধ্রুবপদ্ধতির কবিতা সম্বন্ধে বলা চলত না।

পূর্ব্বে আমি এঁদের লিরীক বলেছি। লিরিসিজমের প্রাণবস্তু সুর। সুরপদ্ধতির অবশ্য দুই প্রকারের, যেমন ভারতীয় মেলডি, এবং পশ্চিমী হারমনি। তা ছাড়া, লঘু-গুরু একতারা-বীণা, যন্ত্র-বাঁশীর সুর রয়েছে। বাঙ্গালী কবির লিরিক সুর স্বভাবতই মেলডির মতন। রবীন্দ্রনাথ মাইকেল ছাড়া তাঁরা বরাবরই একতারারই সঙ্গে গেয়ে এসেছেন মনে হয়। এখন বাস্তবের পর্দ্দায় ঘা পড়েছে তাই শুনছি দুতারার বাজনা। তবু সেটা সেতারের কিংবা বীণার জোড় নয়, যেটা হওয়া উচিত ছিল আধুনিক দ্বৈত-বোধের ফলে। যতটুকু গুঞ্জন শুনি সেটা অনুরণন মাত্র, চিকারী নয়। এই হল আধুনিক কবিতার অসম্পূর্ণ লিরিসীজম্। গীতধর্ম্মী কবিতা লিখবেন অথচ আমাদের মতন অপেক্ষাকৃত কম ডিমেনশনের সঙ্গীতেরও প্রাচুর্য্য দেখাতে অক্ষম হবেন—এটা সত্যই প্রগতির চিহ্ন নয়। এখানে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না ঃ লিরিক কবিতার জন্য সঙ্গীতের জ্ঞান আবশ্যক। এমন আধুনিক কবি আছেন যিনি রাগিণীর নাম পর্য্যন্ত যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারেন না, রাগিণীর ধর্ম্ম জানা দূরের কথা! অথচ যত্রতত্র বিদেশী সঙ্গীতের উল্লেখ দেখি। অশোক-বিজয় লিখেছেন—'সৃজন বাঁশির ছন্দে তাহারা মৃদঙ্গ-সম বাজে'! বাঁশীর সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে না, অন্ততঃ উত্তর-ভারতে।

লিরীকের সাঙ্গীতিক অনুভূতির অসম্পূর্ণতা ঢাকতে চেয়েছেন অনেকে চিত্রের সাহায্যে। কি কারণে অন্য দেশের কবিদের সঙ্গীত থেকে চিত্রের দ্বারস্থ হতে হল তার ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়। কান থেকে চোখে আসা একটি বড় রকমের মানসিক পরিবর্ত্তনের নিদর্শন। আজকালকার কবিতায় কানের কাজ নেই বলছি না, ছন্দ-বৈচিত্র্যে, ইংরেজী sprung rythm, verse libre, free verse, বাঙলার 'বলাকা', 'পলাতকা' ও 'পুনশ্চে'র অনুকৃত ছন্দেও তার ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু সেগুলি প্রধানত speech-verse, অর্থাৎ কথোপ-কথনের সুর। Song-verse এজরা পাউণ্ড-এর কবিতায় আছে বটে, কিন্তু

মধ্যযুগের সাঙ্গীতিক ছন্দে অন্য কোনো ইংরেজ কবি রচনায় জীবন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আরেকটি বিষয়ে, ভাবগত ঐক্যের সঙ্গে সুরগত ঐক্যের তুলনা চলে। কিন্তু সেটি তুলনা মাত্র। এখানে আমি বলছি রাগিণীর প্রসার ও রূপের কথা। তার বদলে পাচ্ছি গোটা কয়েক ছবি, পাশাপাশি সাজান। পরবর্ত্তী স্বরের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যেমন একটি স্বর-গুচ্ছ রাগিণীর প্রতীক, কিংবা 'টুকরো,' কিংবা 'পকড়' সৃষ্টি করে তেমনটি কোনো আধুনিক কবিতায় বেশী পাচ্ছি না। সাজান একেবারে খাপছাড়া নয় নিশ্চয়, কিন্তু তবু অনুপ্রবেশের অভাব স্পষ্ট। এটা সত্যকারের দৈন্য। চিত্র-প্রাধান্য যে কবিতার পক্ষে দোষের—এ-কথাও বলি না। তবে, সাধারণত, চিত্রগুলি মাত্র পাশাপাশি সাজান থাকলে আন্তরিক অভিব্যক্তির স্ফুরণ হয় না। সঙ্গীতের বলগণিত অন্য ধরণেরই। আজকালকার যাঁরা বড় কবি তাঁরা পার্থক্যটুকু বোঝেন, তাই তাঁরা সীম্বল ও ইমেজ ব্যবহার করেন। চিত্রের সান্তরতাকে জয় ক'রে সাঙ্গীতিক সাতত্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যেই তাদের প্রয়োগ।

সঙ্গীতে যেমন একটি বিশেষ স্বরগুচ্ছ (পকড় কিংবা কর্ড) মূল সুরের প্রকৃতি ও 'রঙ' উদ্‌ঘাটন করে, তেমনই যথাযথ ইমেজ ও সীম্বল ব্যবহারের ফলে চিত্রপ্রধান কবিতার অসংলগ্নতা দূর হয়। চিত্রের দ্রুত-পারম্পর্য্য এ-কাজ করতে অক্ষম। জোর আধুনিক চিত্রের telescoping হয়। সিনেমার আঙ্গিকে সীম্বলের স্থান নিতান্ত কম এখনও। কবিতায় কিন্তু এই উপায়েই কবিতার রস ঘনীভূত হয়ে দানা বাঁধে। কিন্তু ইমেজ-সীম্বল প্রয়োগে যে সমগ্র কবিতাটি সুরের ঐক্য লাভ করবে এমনটি নাও করতে পারে। দানার চারপাশে খালি জায়গা পড়ে থাকে, তার প্রয়োজন আছে, নচেৎ দানার রূপ খোলে না। ইমেজ-সীম্বল সব স্থান জুড়ে থাকলে কবিতা হয়ে ওঠে ছন্দে লেখা উপমা, যেটা নীচু স্তরের অলঙ্কার। অতুল বাবু তাঁর সমালোচনায় এই বিশ্লেষণটি করেন নি, যেটা তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করা যেত। সে যাই হোক, অশোকবিজয়ের 'ছত্রচূড়' এমন কি হরপ্রসাদের 'পুতুলে'র মতন ভালো কবিতাও সীম্বল হয়ে ওঠেনি, কেবল একটা বিশেষ দৃষ্টির নমুনা হয়েই রইল। অশোক-বিজয় 'তৃতীয় নেত্র'-তে লিখছেন—"দীর্ঘ তাপে ব্রহ্ম-অণ্ডে ভূমানন্দে খোলস

ফাটিছে"। চার লাইন পরে দেখছি, "সাহারার শুষ্ক জিহ্বা চাটিতেছে পিরামিডগুলি"। যে-ইমেজ একটি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা 'মহাকাল,' এই কবিতাটির ও বইখানির নাম, 'রুদ্র বসন্তে'র সাহায্যে জন্ম নিচ্ছিল তার অকাল মৃত্যু ঘটল। 'চাটা'র ইমেজ অশোকবিজয় অন্ততঃ পাঁচবার প্রয়োগ করেছেন, তবুও 'ষাঁড়ে'র সীম্বল ফুটল না! অথচ তাঁরই 'পাহাড় কাটা পথ', 'কর্ম্মস্থলে' কবিতা চমৎকার। তাই সন্দেহ থেকে যায় যে কোথাও যেন কল্পনার ও প্যাশনের অভাব রয়েছে যার গতিতে টুকরো ছবি গোটা হয়, তুলনা-উপমা জমে সীম্বল হয়। এই অভাবের জন্য সমাজকে দোষী করা চলে না, যখন দেখছি একই প্রতিবেশে অন্য কবির রচনায় সেটি পূরণ হচ্ছে। হরপ্রসাদ ও বিমলচন্দ্রের কবিতাতেও অভাবটি রয়েছে, কিন্তু গোপনে, হরপ্রসাদের বেলা দ্রুত পট পরিবর্ত্তন ও বিমলের বেলা বিষয়ের ও ভঙ্গীর গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে।

মোদ্দা কথা এই: 'স্বয়ম্ভু আত্মা,' 'জীবনস্রোত,' 'মানব' প্রভৃতি ধারণার মধ্যে যতই অসঙ্গতি থাক না কেন, একটা বড় আদর্শ ও বাস্তবের টানা-পোড়েনে দক্ষিণায়নের জমিটা খাপি। বিষয়ের গাম্ভীর্য্য এখানে গুরুত্ব এনেছে। বিমলচন্দ্রের মন ক্ষণিক প্রতিচ্ছায়ার অতিরিক্ত একটা স্থায়ী ভাবের খোঁজে ব্যস্ত। এটা সত্যই মূল্যবান বস্তু। তাই দরবারী গাইতে কাফি-কানাড়া হলেও সহনীয় হয়। হরপ্রসাদের হাত দক্ষ, মিষ্টি। তবু তাঁর কল্পনা সঙ্কীর্ণ। পিলুর সন্তোষ ক্ষুদ্র,—কিন্তু একবার জমলে অনেক মজা। অশোক-বিজয় কোন্ রাগিণীতে সিদ্ধ হবেন এখনও স্থির করেন নি—গাইছেন দুপুর বেলার বাঙালী মিশ্র মূলতান—রাগ-প্রধান, অর্থাৎ জঙলা। কিন্তু সকলেই সুকণ্ঠ ও তালে নির্ভুল।

এই সমালোচনা লেখবার সময় কবির তিরোভাব হল। কিছুদিন পূর্ব্বে বলে পাঠিয়েছিলেন যে নতুন সাহিত্যকে ফুটিয়ে তোলবার আমার দায়িত্ব আছে। গুরুভারে আমি চিরকাল নত থাকব—

"সাহিত্যের ঐক্যতান সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও যেন সম্মান পায়।"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

SCORCHED EARTH : Edgar Snow (Gollancz. 1940. 12s. 6d.).

এডগার স্নোর লেখার খ্যাতি এর মধ্যেই অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর Red Star Over China যাঁরা পড়েছেন তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে তিনি শুধু একজন নামজাদা সাংবাদিক ন'ন, সাহিত্যের আসরেও তাঁর স্থান রয়েছে। চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস যাঁরা লিখবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের চেয়ে এডগার স্নোর দান কম মূল্যবান নয়। ভারতবর্ষের মত চীনের জাতীয় আন্দোলনের রূপ বিদেশী লেখকের কাছে সব সময় সুস্পষ্ট হয়নি, তার কারণ, আমাদের মত দাস দেশগুলির (colonial countries) গণ-বিপ্লবের ধারা ব্রিটেন কিম্বা আমেরিকার শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে হুবহু মেলে না। আমাদের সমস্যাগুলি বুঝতে হলে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন, বাহিরে থেকে দু'দিনের জন্য এসে, দু'চার দশ জনের সঙ্গে আলাপ করে বই লিখলে জন্ গান্থার বা হালিদা এদিবের দশা হবে—তাতে শুধু থাকবে শোনা-কথা, রূপ-কথা ও টুরিষ্টের দেখার খিচুড়ী—ইতিহাস তাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। কিন্তু এডগার স্নো প্রথম থেকেই চীনের আন্দোলনে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দুর্গম পাহাড় ও নদী পার হয়ে তিনি চীনের প্রায় সব অঞ্চলেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজকাল সুদূর প্রাচী সম্বন্ধে যাঁদের লেখা বে'র হয়েছে তাদের মধ্যে শুধু এডগার স্নো অ্যানা লুই ষ্ট্রং, অ্যাগ্নেস্ সেভেলি ও এপষ্টিন গণ-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত। ফ্রিডা আট্লী বা পার্ল বাকের লেখাতে অনেকে মুগ্ধ হতে পারে। কিন্তু চীনের জাতীয়তার আন্তরিক বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা চীনের মূল সমস্যাগুলি ধরতে পারেন নি।

Red Star Over China-তে স্নো যে অবস্থার কথা লিখেছিলেন সেটা আজকের চীন থেকে অনেক তফাৎ। তাই সেখানে তাঁর বক্তব্য ছিল অন্য : চীনের জাতীয়তার সত্যকার ভবিষ্যৎ যাদের মধ্যে নিহিত, তিনি সেই বইতে তাদেরই কথা বলেছিলেন। চীনের সাধারণ মানুষ, মজুর ও চাষীদের আন্দোলনের কথাই শুধু সেই বইতে আছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্টদের বিরাট অভিযানের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যতন্ত্রীদের

অবিশ্রাম ষড়যন্ত্র, জাপানীদের আক্রমণ, বিদেশী বণিকের স্বার্থের সঙ্গে এক-সূত্রে গাঁথা চীনা ধনিকের ঐক্য ও প্রগতি-বিরোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন ভূমি-খণ্ডের ফিউডাল সার্ব্বভৌম নেতাদের নির্ম্মমতা—এই পটভূমিতে নতুন চীনের অভ্যুদয় তিনি চমৎকারভাবে দেখিয়েছিলেন। যখন দুর্গম পথে, চিয়াংকাইসেকের নির্ম্মম শত্রুতার বিরুদ্ধে, নতুন চীনের অগ্রগতি, কম্যুনিষ্টদের লালফৌজের হাজার মাইল ব্যাপী যাত্রার বর্ণনা পড়ি, তখনই বুঝতে পারি যে চীনের জাতীয় ঐক্যের পিছনে জনগণের কতখানি সাধনা রয়েছে। এড্‌গার স্নো সেখানে দেখিয়েছেন যে কি ভাবে চিয়াঙের দল বিদেশী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই প্রথম কর্ত্তব্য বলে ধরেছিলেন। প্রদেশের পর প্রদেশ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর হস্তগত হচ্ছে তবু চিয়াঙের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঞ্চুরিয়া চলে গেল জাপানী কবলে, কিন্তু চীনের কুয়োমিনটঙের সামরিক দল কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়ে ব্যস্ত। তাই মাদাম-সুন বলেছিলেন যে সুন ইয়াট-সেনের উত্তরাধিকারী হিসেবে চিয়াং বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ করেছেন। এডগার স্নো দেখিয়েছিলেন যে ক্রমে ক্রমে এমন কি অনেক সামন্ত নেতারাও চিয়াঙের এই নির্দ্দেশ মানতে আপত্তি করল। ১৯৩৬ সালে সিয়ান্‌ফুতে চিয়াং কাইসেকের বন্দী হবার তাই কারণ। কম্যুনিষ্ট নেতারা বাধা না দিলে হয় ত চিয়াঙের প্রাণনাশ হয়ে যেত।

কম্যুনিষ্টদের এই আচার কি ভাবে সম্ভব হ'ল? জাতশত্রু চিয়াং তাদের কবলে পড়া সত্ত্বেও কেন তারা তাকে ছেড়ে দিল? এর উত্তর পাওয়া যায় তাদের 'সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট' নীতিতে। তারা শুধু চেয়েছিল যে কুয়েমিনটাং জাপানী-বিরোধের নীতি অবলম্বন করুক—এবং সমস্ত জাতির সঙ্গে একত্র হয়ে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে চীনের মুক্তির জন্য যুদ্ধে নামুক। যেদিন চিয়াং তাতে রাজী হলেন, সেদিন থেকেই চিয়াঙের সঙ্গে অন্য সব দল এক-জোট হয়ে কাজ করতে আরম্ভ করে। এই "সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট" শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নি, তার বিকাশ জাতীয় জীবনের সব রকম কর্ম্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আমেরিকান সাংবাদিক এপষ্টিন তাঁর People's War বইটিতে জাগ্রত চীনের গৌরবময় প্রতিরোধের একটা ছবি দেখিয়েছেন। গানে, চিত্রে, সাহিত্যে, নাট্যে জাতির নতুন জীবন ফুটে উঠেছে।

এডগার স্নো-র এই নতুন বইতে সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্টের আকার ও ব্যাখ্যা আমরা পাই। আমাদের অনেকের ধারণা যে চীনের জাতীয় যুদ্ধের প্রতীক হলেন চিয়াংকাইসেক্—কারণ তাঁর নেতৃত্বে চীনের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু জাতীয়তার আসল নেতৃত্ব জনগণের হাতে, তাদের অনুভূতির মধ্যে দিয়েই জাতীয় যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। তারাই বরং চিয়াংকে জোর করে জাপানী-বিরোধে নামিয়েছে। সম্মিলিত ফ্রন্টের শক্তি বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বে নয়, জনগণের ঐক্য ও বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে। সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্টের সাফল্য নির্ভর করে এই গণশক্তির উপর। আমাদের দেশেও ঠিক সেই কথা। গান্ধিকে অনেকে দেখে থাকেন ভারতীয় জাতীয়তার পুরোহিত হিসাবে। কিন্তু সাম্রাজ্য-বিরোধ জাতীয় যুদ্ধে জনগণের প্রভাবই গান্ধি ও তিনি যে-শ্রেণীর মুখপত্র তাঁদের ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। আজকে আমরা দেখতে পাই চাই যে মজুর-কৃষাণদের শ্রেণীগত পোলিটিক্যাল সংগঠনের অভাবে গান্ধি ও বুর্জ্জোয়া নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনকে অসাড় করে রেখেছে। চীনের চিয়াং ও বুর্জ্জোয়া দল সেইরকম অবস্থা সৃষ্টি করবার চেষ্টা প্রায়ই করেছে। কিন্তু, তা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ জনগণের সংগঠন কার্য্য চীনে অনেক দূরে এগিয়েছিল কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে।

সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে আমরা কম্যুনিষ্ট-কুয়োমিন্‌টাঙের আসন্ন বিচ্ছেদের খবর পাই। আসলে তা' এই শ্রেণীগত পার্থক্যের ফল। এডগার স্নো এই সমস্যার বেশ পরিষ্কার বিশ্লেষণ করেছেন। এইটে হ'ল মুক্তি সংগ্রামের বিপদের দিন। এর প্রতিকার হচ্ছে গণ-আন্দোলনকে আরও উদ্বুদ্ধ করা। বাইরে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ও ভিতরে গণতন্ত্রের বিস্তার—ঐ দুটো একসঙ্গে চলে। যদি কুয়োমিনটাঙের আমলাতান্ত্রিকতায় বাধা না দেওয়া হয় তাহলে ক্রমে কুয়োমিনটাঙের প্রভাবে বুর্জ্জোয়া নেতৃত্ব তাদের শ্রেণীস্বার্থের জন্য জনশক্তি খর্ব্ব করবে। 'বামপন্থী' কুয়োমিনটাঙ নেতা ওয়াং-চিং-উই-র অবস্থা থেকেই তা অনুমান করা যায়। জাতীয় যুদ্ধের একমাত্র সান্ত্রী গণশক্তি—এবং সেই শক্তির প্রসারের সঙ্গেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস চীনে সম্ভব হবে।

বুর্জ্জোয়া নেতৃত্ব শুধু জাতীয় ঐক্যে কুঠারাঘাত করে নি, যুদ্ধ-পরিচালনায়ও

অপটুতার পরিচয় দিয়েছে। অনেকে হয় ত' শুনে আশ্চর্য্য হবেন, কিন্তু ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যে আমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সমরনীতি বিভিন্ন। ফিউডাল সামন্ত-সৈন্য যে ভাবে যুদ্ধ করত, ফরাসী বিপ্লবের বুর্জ্জোয়া সৈন্য সে ভাবে লড়াই করেনি ঃ আজকেও তেমনি বুর্জ্জোয়া যুদ্ধনীতি জনগণের সব-সময় ঠিক লাগে না—তাদের পরিচালনার ভঙ্গী ও উদ্দেশ্য হ'ল অন্য রকম। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা মায়োৎ মে-তুঙ্ এই সম্পর্কে যুদ্ধের প্রথমেই বলেন যে চীনের এই জাতীয় যুদ্ধ তিনটি স্তরে প্রকাশ পাবে। প্রথম অধ্যায়ে প্রবল শত্রুর আক্রমণ ও প্রসার—তার অস্ত্র-শস্ত্রের প্রভাবে সে এগিয়ে চলবে, তাকে চীনের মত অস্ত্রহীন দেশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না, যদিও যুদ্ধ তার বিপক্ষে করতেই হবে। দ্বিতীয় স্তরে যুদ্ধের একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে—শত্রুর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, এমন কি বিজিত প্রদেশগুলিও শাসন করতে সে পারবে না, কারণ কৃষকদের মধ্যে গরিলা যুদ্ধের সুরু হবে। শত্রুর ক্রমশ হয়রান করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যে তখন তাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় করা সোজা হবে। ইতিমধ্যে গণ-জাগরণ ও সংহতির মধ্যে দিয়ে জাতীয় শক্তিও প্রবল হয়ে উঠবে। এইটেই হ'ল তৃতীয় বা শেষ স্তর—যখন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

এই বিশ্লেষণ অনুসারে কম্যুনিষ্ট যুদ্ধ-পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে লাগ্ল। প্রথম অবস্থায় তাদের রীতি অনুসারে জাপানীদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ না করে বরং নিজেদের বাঁচিয়ে হটে আসা উচিত ছিল। কিন্তু চিয়াং সে-কথা না শুনে জাপানীদের সঙ্গে তথাগত প্রথায় যুদ্ধ করলেন ঃ সে যুদ্ধে তাঁর হার নিশ্চিত ছিল—ফলে কত সৈন্য ও মাল পত্রাদির প্রচুর ক্ষতি হ'ল। এডগার স্নো আর একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ঃ সাংহাই-এর শ্রমিকদের যদি সঙ্ঘবদ্ধ হতে দেওয়া হত তাহলে সুদীর্ঘ প্রতিরোধের পক্ষে অপরিহার্য্য যে সব কলকারখানা তার অনেকটাই রক্ষা পাওয়ায় সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, চিয়াং ও তাঁর দল সেকথা বুঝতে পারে নি—এবং শ্রমিকদের প্রতি শ্রেণী-বিদ্বেষ বজায় রাখতে গিয়ে জাতীয় যুদ্ধের ক্ষতি করলেন।

সম্মিলিত জাতীয়-ফ্রণ্টের অন্তর্বিরোধেব চূড়ান্ত অবস্থা দেখা দেয় কম্যুনিষ্ট-দের গরিলা বাহিনীর উপর চিয়াঙের কড়া নজর। এই ব্যাপারটি স্নো তাঁর

বইতে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। দুই দলের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষের কথাও শুনতে পাওয়া যায়। জাপ শত্রু যে সব প্রদেশ অধিকার করে রয়েছে কম্যুনিষ্টরা সেখানে তাদের বিখ্যাত অষ্টম রুট্ বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের মধ্যে গরিলা দল গড়ে তোলে। যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরাই শত্রুকে কাবু করে ফেল্‌তে আরম্ভ করে এবং আজ চার বছর ধরে এই গরিলা যুদ্ধ চল্‌ছে। পরাক্রমশালী জাপানীদের বিপক্ষে গণ-তান্ত্রিক চীনের এই একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র তা' আজ সকলেই স্বীকার করবে। এডগার স্নো-র বইতে গরিলা বাহিনীর অক্ষয় কীর্ত্তির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

কিন্তু, গরিলা বাহিনীর পোলিটিক্যাল তাৎপর্য্য চিয়াং ও কুয়োমিনটাঙের বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের কাছে ভয়াবহ মনে হয়। গরিলা যুদ্ধের জন্য কৃষকের হাতে বন্দুক দিতে হবে—গণশক্তি আরো প্রবল হয়ে উঠবে। তাতে শুধু বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে পরাস্ত করা হবে না, ঘরের বুর্জ্জোয়া শ্রেণী-শত্রুও প্রমাদ গুণবে। সারা দেশময় গরিলা যুদ্ধ যদি অবাধে করতে দেওয়া হয় তাহলে তার ফলে যে স্বাধীন গণতন্ত্র গড়ে উঠবে তাতে বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেণী-গত স্বার্থ বজায় রাখা চলবে না। এই উভয়-সঙ্কট আজ প্রত্যেক দাসদেশের বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশেও তাই। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিকে গণ-জাগরণ—গণ-জাগরণের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা চলে বটে; কিন্তু ফলে গণশক্তির প্রভাব জাতীয় বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তাই গণশক্তিকে খর্ব্ব করা বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

বইটার শেষ অধ্যায়ে লেখক আন্তর্জাতির পরিস্থিতিতে চীনের অবস্থা বিচার করেছেন। চীনের জাতীয় যুদ্ধ যে একটা আলাদা ব্যাপার নয়, আরো দুনিয়া জুড়ে যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার জীবন-মরণ সংগ্রাম চলেছে তারই একটা ঘাঁটি চীনে রয়েছে এ'কথা আমরা ভারতবর্ষে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। এডগার স্নো তাই বারবার বলতে চেয়েছেন যে ব্রিটেন ও আমেরিকার চীনকে পুরো দমে সাহায্য করা উচিত। সেই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে এই দুই বৃহৎ শক্তির নেতৃত্বে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এই দুই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যে নিঃস্বার্থভাবে গণতন্ত্রের প্রসার অন্যদেশে করবে তা' দাসদেশের লোকেদের

বিশ্বাস করা কঠিন। আমেরিকার ও ইংলণ্ডের জনমতকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এডগার স্নো অবশ্য এ'কথা লিখে থাকতে পারেন ঃ কিন্তু, বস্তুত সেটা সম্ভব বলে যদি তিনি মনে করেন তবে বলতে হবে যে তিনি অত্যন্ত স্বপ্নদর্শী। চীনের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর সবদেশের গণশক্তির সহায় হ'য়ে এবং এই শক্তির পিছনে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে—তা' হচ্ছে সোভিয়েট য়ুনিয়ন। আজকে ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে জনগণের আশার প্রতীক সেই রাষ্ট্রই বীরদর্পে যুদ্ধ করছে—সেখানে বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে কৃষক ও মজুর তাদের নিজেদের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দিয়ে প্রতিক্রিয়ার পথ অবরোধ করছে। পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আজকে সোভিয়েটের উপর নির্ভর করছে। চীনের দুর্দ্দিনের একমাত্র বন্ধু হিসাবে সোভিয়েট জনরাষ্ট্র সাহায্য করেছে। দাসদেশগুলির মুক্তির জন্য, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের জন্য সোভিয়েটই এতদিন লড়ে করেছে। আজকে চীনের জাতীয় গণ-যুদ্ধ সোভিয়েটের যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে—একই শত্রুর বিপক্ষে এই দুই শক্তি আজ দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান সাম্রাজ্যতন্ত্র এদের সাহায্য করতে পারে। সে সাহায্য যাতে আরও বেশী করে হয় তা' দেখার কর্ত্তব্য ব্রিটেন ও আমেরিকার গণশক্তির। প্রগতির এই মহাযুদ্ধে যদি এই দুই গণশক্তি জয় লাভ করে, তাহলে দাসদেশগুলিও মুক্তির প্রতীক্ষায় আর বেশী দিন থাক্‌তে হবে না। চীনের যুদ্ধ তাই আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এক অভাবনীয় গুরুত্বলাভ করেছে।

নিখিল চক্রবর্ত্তী

সঞ্চারী—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কবিতাভবন। দাম এক টাকা।

কাগজের দুর্মূল্যতা, এমন কি দুর্লভ্যতা সত্ত্বেও সম্প্রতি যে ক'খানা ভালো কবিতার বই বেরিয়েছে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "সঞ্চারী" তার মধ্যে অধুনাতম। এতদিনে বিমলাপ্রসাদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হোলো,

তার উপর "সঞ্চারী"র আয়তনও পর্য্যাপ্ত নয় ; এ থেকে মনে হয় যে ওঁর কলম স্বভাবতঃ নিরলস হলেও কবিতা রচনা সম্বন্ধে যেন ওঁর একটু সঙ্কোচ আছে। অথচ বিমলাপ্রসাদ যত ভালো কবিতা লেখেন, তাতে ওঁর প্রচুর আত্মপ্রত্যয় থাকা উচিত। তিনি আরও বেশি লিখলে কাব্য-পাঠকরাই যে খুশি হবেন তা নয়, তাঁর কবিতাও আরো অনেক লোভনীয় হয়ে উঠবে।

গোড়াতেই বিমলাপ্রসাদের স্বল্পভাষিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি এইজন্য যে আঙ্গিক সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত অনবহিত। বেশি লিখলে বোধহয় এটা হোতো না। "সঞ্চারীর" পদ্য-কবিতার অংশে এমন ক' একটি জায়গা পেয়েছি যা আমার কাছে ছন্দের ত্রুটি বলেই মনে হয়েছে! অথচ এই সামান্য ত্রুটিগুলি বাদ দিলে "সঞ্চারী" একখানি প্রকৃত উৎকৃষ্ট উপভোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

সবসুদ্ধ "সঞ্চারীতে" ৪৩টি কবিতা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি গদ্য কবিতা, কয়েকটি অনুবাদ এবং দুটি সনেট্। বইখানি আগাগোড়া পড়ে' মনে হয় কবিতাগুলো লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো, অন্ততঃ আমার কাছে বইয়ের শেষের দিককার কবিতাগুলোই বেশি ভালো লেগেছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে "সঞ্চারী" আগাগোড়াই উপভোগ্য। আজকাল যখন মতবাদ ও ভঙ্গীর উপর কবিতার জনপ্রিয়তা নির্ভর করছে, তখনও সবশ্রেণীর পাঠকেরই বইখানা ভালো লাগবে, কেন না, এর প্রায় সবগুলেই খাঁটি কবিতা।

> জোনাকির আলো—তারি তরে মরে শর্ব্বরী।
> অন্ধকারের ভয়সঙ্কুল আর্ত্তনাদ
> বিষ বনানীর ক্ষীণ ভূয়িষ্ঠ প্রাণশিখা
> ক্ষণিক কিরণে জপিছে নীরব মুক্তি। (জোনাকি)
>
> মাৎস্যন্যায় মনেতে জগতে। ছোটো ছোটো ফাঁক দিয়ে
> ঢুকে পড়ে যত অশরীরী ছায়া সহসা হিসাব ভুলে'।
> প্রেক্ষাগৃহের জমাট কালোয় আলোর পুতুল নাচে,
> স্বপ্নশেষের সঙ্গ-পাথেয়, বন্ধু! জীবন-শেষে। (স্বপ্ন)

এ-সব কবিতা উপভোগ করবার জন্য কোনো টীকার প্রয়োজন হয় না। 'হিসাব' কবিতায়—

এই পৃথিবীর ক্ষণ বিলসিত বুক
লেখা-পড়া নেই ; যে দেখে সে রাখে
মিলিয়ে নেয় না খৎ।

পড়ে' বিশ্বাস হয় বিমলাপ্রসাদ যে কেবল কবির চোখে জীবনকে দেখতেই জানেন তা' নয়, সে দেখাকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করবার ইন্দ্রজালও তাঁর আয়ত্তে। "সঞ্চারী"তে আর একটা জিনিষ আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে, সেটা এর ঋজু সহজ ভঙ্গী। সহজবোধ্য হলেই কবিতা ভালো হয় না মানি, কিন্তু তবু প্রসাদগুণ একটা গুণই। কোনো কবিতাই অনেকবার পড়ে' বুঝতে হয়নি বলে' "সঞ্চারী"র উপভোগ আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে এ সারল্য প্রায় তরল হয়ে এসেছে—এখানেই বিমলাপ্রসাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। যেমন তাঁর সনেট দুটি। ভাব ও ভাষার দিক থেকে এ দু'টি নিখুঁত। কিন্তু সনেটে যেখানে অত্যন্ত সংহত জমাট রস আমরা আশা করি, সেখানে তার সহজ বলবার ভঙ্গীটি বিস্তার মতো গুণ হয়ে দোষ হয়েও দাঁড়িয়েছে।

"সঞ্চারী"তে আমি অত্যন্ত উপভোগ করেছি গদ্যকবিতাগুলি। গদ্য-কবিতায় যাঁর হাত এত পরিষ্কার, পদ্য রচনায় তিনি অবশ্যই অত্যন্ত দক্ষ, এ-ই আমার বিশ্বাস। সেইজন্যই বিমলাপ্রসাদের ছন্দের দু'একটি ত্রুটি সামান্য হলেও এত বিস্ময়কর মনে হয়েছে। গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে "সোণার সিঁড়ি"র মতো চমৎকার ব্যঙ্গ কবিতা ক্বচিৎ পড়া যায়। এবং বাকি সিরিয়স কবিতা ক'টির মধ্যে "সত্য" এবং "বিচিত্রা" খুব ভালো হলেও "সেরিনেড্"ই আমার মতে "সঞ্চারী"র শ্রেষ্ঠ কবিতা। অনেকটা উদ্ধৃত করবার লোভ সাম্‌লাতে পারছি না ;

তখন কিছুই বলিনি—বলি এখন।
অপেক্ষায় ছিলাম উচ্চকিত বিদ্যুতের প্রভা
আর কেঁপে কেঁপে ওঠা আসন্নমুকুলা বল্লরীর মতো।
এলো না সে লগ্ন।
তবু—তবু আমি তো দিতে পারতুম

আমার কামনা-স্বপনের পুষ্পিত অনুরাগ,
তারা-ভরা আকাশের আনত আসঙ্গ,
নীহারপুঞ্জের চূর্ণ চুম্বন
আর অন্ধকার সাগরের হাওয়ায় ভেসে আসা
সফেন উদ্বেলতা
জাগো—শোনো।

আশ্চর্য্য সুন্দর! কিন্তু বিমলাপ্রসাদ "স্বপ্ন" না লিখে "স্বপন" লিখলেন কেন?

অজিত দত্ত

ভারতবর্ষ—অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

এই পুস্তিকাটি Oxford Pamphlets on World Affairs নামক পুস্তিকা-মালার ১২নং পুস্তিকার অনুবাদ। অনুবাদ দক্ষ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং জ্ঞাতব্য তথ্যও এই পুস্তিকাটিতে যে একেবারে নাই তাহা বলা চলে না। কিন্তু যে ভাবে এই তথ্যগুলি উপস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সুবিচার হয় নাই। তবু পুস্তিকাটি মূল্যবান, কেননা ব্রিটিশ সরকারী কর্ম্মচারীর চক্ষে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার রূপ কি ভাবে দেখা দেয় ইহা পড়িয়া আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। এই বোধের প্রয়োজন আছে। সুতরাং ভারবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে যাঁহারা মাথা ঘামান তাঁহাদের মধ্যে এই পুস্তিকাটির প্রচার বাঞ্ছনীয়। অক্‌স্‌ফোর্ড পুস্তিকামালার আরও একাধিক পুস্তিকার এইরূপ তর্জমা হইলে যাঁহারা ইংরাজি জানেন না তাঁহাদের বিশেষ উপকার হয়।

হরিদাস হালদার

পাঠক-গোষ্ঠী

পরিচয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

পরিচয়ের গত শারদীয় সংখ্যায় শ্রীযুত লীলাময় রায় লিখিত 'আশার কথা' নামক একটি নিবন্ধিকা পড়িলাম এবং পড়িয়া আশান্বিত না হইলেও প্রভূত জ্ঞানলাভ করিলাম। প্রারম্ভেই তিনি লিখিতেছেন, "সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত কমরেড মেস্কি সম্প্রতি শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। কাগজে পড়লুম, May I express my profound grief at the passing of a great Indian writer whose name was so familiar in my country and whose works were so popular with the masses of the Soviet people? এই প্রথম শোনা গেল যে একজন বাঙ্গালী জমিদারের জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে লেখা কবিতা, পদ্মা নদীর বজরায় লেখা গল্প ও শান্তিনিকেতনের আশ্রমে লেখা নাটক ও গান সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের অতি প্রিয়। ...আজ শুনছি সোভিয়েট রাশিয়ার কিষাণ মজদুর তাঁকে ফিউডাল যুগের ব্যারণ বলে অপাংক্তেয় করে না, তাঁর বেহালা শুনতে ভালবাসে। হায়, এ খবরটা যদি তিনি বেঁচে থাকবার কালে পৌছাত !"

'কাগজে পড়িয়া' আজ অর্থাৎ ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি বাংলা দেশের প্রখ্যাত লেখক শ্রীযুত লীলাময় রায় যাহা জানিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, দেশের ও বিদেশের শিক্ষিত জনসাধারণ তাহা জানে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন এবং সরকারী ও বেসরকারী বহু ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান হইতে বিপুল ও ব্যাপকভাবে সম্বর্দ্ধিত হন, এমন কি মস্কো সহরে তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী পর্য্যন্ত খোলা হয়। ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সোভিয়েট শিক্ষামন্ত্রী লুনাচার্চের আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার পর রাশিয়ার চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, Golden Book of Tagore-এ মস্কোর অধ্যাপক কোগানের 'Tagore and Soviet Union' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে এবং তাহাতে সোভিয়েটে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ও তাঁহার সাহিত্যের উৎকৃষ্টতম অনুবাদের তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল অথচ আমাদের এই Rip-Van-Winkle কিছুই জানিলেন না, আজ হঠাৎ জানিয়া একেবারে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপারটিতে কৌতুক অনুভব করিতেছি।

The Indian P. E. N. পাঠ করিয়া লীলাময় বাবু জানিতে পারিয়াছেন, "The Soviet

Government has been publishing a really 'Academic Edition' of his (Tolstoy's) works which will comprise some one hundred volumes, thirty of which have already appeared."

এই সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি লিখিতেছেন: "একশোখানি কেতাবের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশখানি তো পারমার্থিক। ঐ পঞ্চাশ কৌটা আফিং পেটে পড়লে রাশিয়ার বিপ্লবীরা যে অধ্যাত্মবাদী হবে না তার স্থিরতা কই?"

লীলাময় বাবু নিশ্চিন্ত থাকুন। সোভিয়েট বিপ্লবীদের আফিং-পরিপাকের অসীম ক্ষমতা না থাকিলে রুশ বিপ্লব সম্ভবই হইত না।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া আরও একখানি কাগজ তিনি পড়েন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবাদ সংগ্রহে ও বিতরণে তাঁহার এই অপরিসীম আগ্রহ ও পরিশ্রমের জন্য সোভিয়েট-সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা উচিত।

মেস্কির শোকবাণীর শেষাংশে লিখিত 'soul of the great Indian people' বাক্যাংশটি লীলাময় বাবুর মনে এক সমূহ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই তিনি লিখিতেছেন "এখানে soul কথাটি বোধ হয়, ছাপার ভুল। হয়ত ওস্থলে 'matter' পড়তে হবে। সাহিত্যের যাঁরা মার্কসীয় ব্যাখ্যা করেন তাঁরা কি কখনো স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষের জনসমাজের আত্মা বলে কোন পদার্থ আছে?"

আত্মা পদার্থপদবাচ্য কিনা দর্শন বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ-ঘটিত এই জটিল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই। বিশেষত যখন লীলাময় বাবু স্বয়ং সমস্যার সমাধান করিয়া লিখিতেছেন, "আমরাও যদি রবীন্দ্রনাথের মতন সফল হই, তখনকার দিনের মেস্কিরা আমাদের মৃত্যুর পরে আত্মারই সন্ধান নেবেন, অবস্থার নয়।"

'আত্মার সন্ধান' কথাটি অস্পষ্ট হইলেও ইঙ্গিতময়। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান কালের যে মেস্কিকে উপলক্ষ্য করিয়া লীলাময় বাবু আমাদের "আশার কথা" শুনাইয়াছেন, যতদূর জানি তিনি Psychic Research Society-র সহিত সংশ্লিষ্ট নন। তবে লীলাময় বাবুর তিরোধানের অব্যবহিত পরে যে-মেস্কিরা থাকিবেন তাঁহারা যে ঐ জাতীয় কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষত যদি বিজয়ী হিটলার রাশিয়ার মাটিতে ধর্ম্মের বীজ রোপন করেন তাহা হইলে যে ঐ জাতীয় বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লীলাময় বাবুর আশার প্রেরণা যোগাইয়াছে কি এই সম্ভাবনা? না, সত্যই তিনি বিশ্বাস করেন যে একদা তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত সাফল্য অর্জন করিয়া ভারতীয় বা অ-ভারতীয় জনসাধারণের 'আত্মানামধেয় পদার্থ বিশেষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে' বিদেশী ও বিধর্ম্মী বা অধর্ম্মী রাষ্ট্রদূত কর্ত্তৃক আদৃত হইবেন? হইলে ভালো, কিন্তু আপাতত আমাদের আশঙ্কা হয় যে আত্মিক উপলব্ধির প্রাবল্যে যাঁহারা মৃত্যুর পূর্ব্বেই অ-পদার্থ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মৃত্যুর পরে তাঁহারা স-কীর্ত্তি পদার্থসার পার্থিব রজেই পরিণত হইবেন।

লীলাময়বাবু তাঁহার প্রবন্ধে একটি কাল্পনিক বা অকাল্পনিক 'অধ্যাপক শ্রেণীর বিদ্বানে'র মুখ দিয়া মার্কসীয় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন এবং যে-ব্যাখ্যাকে সঙ্গে সঙ্গেই সুচিসূক্ষ্ম যুক্তির খোঁচায় বিদীর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যায় যে পাণ্ডিত্য অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে বোঝা যায় ব্যাখ্যাকার লীলাময় বাবুরই সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এই বাঘে-মহিষের লড়ায়ে দূরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকা ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে? অবশ্য লড়ায়ের শেষে বিজয়ী লীলাময় বাবু পদানত প্রতিদ্বন্দ্বীকে জানাইয়া দিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তার পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তির তফসীল তৈরী করতে হ'বে না, বরং জেনে রাখতে হবে তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।" এই উপদেশ যেমন মূল্যবান তেমনই মৌলিক।

লীলাময় বাবুর এই অপূর্ব্ব নিবন্ধিকার চরম বাণী: "মেস্কিরা যা করবেন ঘোস্কি, বোস্কি, ব্যানারস্কি, মুখারস্কিরাও তাই করবেন।" এই শিশু-সুলভ রসিকতার রস-গ্রহণে বোধ হয় একমাত্র সেই সব সরল আত্মারাই সক্ষম স্বর্গরাজ্য যাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি।

শ্রীসরোজকুমার দত্ত

'পরিচয়ে'-র অগ্রহায়ণ-সংখ্যা রবীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যা
রূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিনুর সাক্ষ্য

বিনু তখনো জানত না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিম্বা জানলেও বুঝত না কেন। হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল ইণ্ডিয়ান প্রেসের "চয়নিকা"।

ইতিপূর্ব্বে তাঁর নাম শুনেছিল কি না স্মরণ নেই, সম্ভবতঃ শুনেছিল "মুকুট" নাটিকার অভিনয় উপলক্ষে, কিন্তু তার বন্ধুরা ভালো ভালো পার্টগুলি দখল করে তাকে ধুরন্ধর সাজতে দেওয়ায় তার আত্মাভিমানে এমন ঘা লেগেছিল যে সে কেবল ইন্দ্রকুমার আর ইশা খাঁর কথাই ভাবছিল, তাদের স্রষ্টার সমাচার নেয়নি।

বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠ মহলে তখন বঙ্কিম, গিরিশ ও দ্বিজু রায় বরেণ্য বলে কীর্ত্তিত। বিনুর নিজেরও তখন কাব্যের চেয়ে নাটকে উপন্যাসে, শান্ত রসের চেয়ে বীর রসে, অধিক অনুরাগ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোযোগের আবশ্যক ছিল না। যাঁরা "মুকুট" নির্ব্বাচন করেছিলেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে তার প্রণেতা কবিকুলমুকুট। বোধ হয় বালকদের অভিনয়-যোগ্য নাটিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে ঐ মনোনয়ন।

সহসা "চয়নিকা" আবিষ্কার। বয়স তখন এগারো কিম্বা বারো। বইখানি এক বার চোখে পড়েই অদৃশ্য হলো, মনে রইল শুধু ছবিগুলি, ছবির নীচের কবিতার টুকরোগুলি, অদর্শনের অতৃপ্তি ও পুনর্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা।

দু'তিন বছর পরে পুনরায় সে বই বিনুর হাতে আসে, কিছু দিন থাকে। তত দিনে সে মাসিকপত্রের কল্যাণে কবির সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তখন চলছে "বলাকা," "পলাতকা"র পর্য্যায়।

বন্ধুরা বলে, রবিবাবু কবি বটে, কিন্তু দ্বিজু রায়ের সঙ্গে তুলনা হয় না। কোন এক সাহেব নাকি তাঁকে ইংরাজীতে লিখতে সাহায্য করেছেন, ধরতে গেলে সেই সাহেবেরই লেখা। তাতে নাকি বিদেশে তাঁর সুনাম হয়েছে, কিন্তু ওটা সেই সাহেবেরই পাওনা।

মাষ্টার মশাই বলেন, মানছি রবি ঠাকুর অসামান্য লেখক, কিন্তু তা শুধু গদ্যে। পদ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি এখনো সকলের শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ করেই রবিবাবুর কবিযশ।

অকালপক্ক বালক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়েছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তখনো মজেনি। "রসে অনুমগন" হতে হলে "বিদগ্ধ জন" হওয়া চাই, কিন্তু বিনুর রাধারা তখনো বিদ্যাপতির রাধা হয়ে ওঠেননি, চণ্ডীদাসের রাধা হয়ে ওঠা ত আরো বয়ঃসাপেক্ষ। মহাজনদের মধ্যে নরোত্তম দাসকেই তার উপাদেয় লাগত, কীর্ত্তনকালে তাঁর পদগুলি চোখে জল আনত—এবং কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ।

বিনু ছিল তার বন্ধুদের মতো দ্বিজু রায়ের ভক্ত। বলা যেতে পারে দ্বিজু রায়ের পাঠশালায় লালিত। যেমন নরোত্তমের কীর্ত্তন তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত বিনুকে দিত অপর দশজনের সঙ্গে কণ্ঠসংযোগের সুযোগ। আর বীর রসের প্রতি তার একটা অহেতুক আকর্ষণ ছিল। সেই বয়সে সেও এক রাশ নাটক লিখেছিল, সে সব নাটকের প্রথম অঙ্কে "ধর অস্ত্র, কর যুদ্ধ," শেষ অঙ্কে "পতন ও মৃত্যু"।

বিনুর জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ যেমন আকস্মিক তেমনি বিলম্বিত। কিন্তু বিলম্বে এসেও তিনি সকলের সম্মুখের আসনখানি অধিকার করে বসলেন। বন্ধুদের পরিহাস, মাষ্টার মহাশয়ের উপহাস, আত্মীয়দের উপেক্ষা তাকে বিচলিত করল না, সে তার অবিকশিত বুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত রুচি দিয়ে আপন করে নিল তাঁকে—তিনি এশিয়ার পোয়েট লরিয়েট বলে নয়, তিনি বিনুর মতো অবোধ জনের সমবয়সী বলে।

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

বিনু যে তাঁর রচনার বিশেষ কিছু বুঝত তা নয়। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, "কিছু বুঝলে ?" বিনু অমনি উত্তর দিত, "এসব ত বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।" কেউ যদি বলত, "বুঝেছি," বিনু ক্ষুব্ধ হতো। কারণ, বুঝলে কি উপভোগ করা যায় ? সব যে স্পষ্ট হয়ে গেল, একটুও রহস্য রইল না।

বিনুকে মুগ্ধ করত তাঁর আলো আঁধারি, তাঁর কিছু খোলা কিছু ঢাকা, তাঁর হাত খালি করে হাতে রাখা। অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত বেশী, ব্যক্ততার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশী, ধরাছোঁয়ার চেয়ে লুকোচুরি বেশী, সেই জন্যেই বিনু তাঁর কবিতা বার বার পড়ত, বার বার ভোগ করত। যদি সব বুঝে ফেলত তবে আর পড়ত না, ভুলে যেত। কিন্তু সব কেন, একটুও বুঝত কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও সে খুশি হতো, মনে রাখত, গুন গুন করত। দুর্ব্বোধ বলে অভিযোগ করতো না, অভিযোগ শুনত না। বরং দুর্ব্বোধ্য বলেই, রহস্যময় বলেই, রাহুর মতো গ্রাস করত, পরিপাক না করেই আত্মসাৎ করত।

এমনি করে অন্ধ ভক্তের উদ্‌ভব হয়। বিনুও ছিল কবির একজন অন্ধ ভক্ত। তার সেই অন্ধ ভক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, যৌবনোদ্‌গমের পরেও। এখন অবশ্য ভক্তি আছে, কিন্তু অন্ধতা নেই। তাতে হয়েছে বিপদ। কেননা এই পঁচিশ বছরে অন্ধ ভক্তি সংক্রামক হয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই এখন এক বয়সী—একই ভাবের ভাবুক।

সম্ভবতঃ আরো পঁচিশ বছর পরে উল্টো বিপদ হবে। তখন হয়ত বিনুর মতো জন কয়েক ভক্ত থাকবে, কিন্তু অন্ধ ভক্তেরা অন্ধ শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। অন্ধ শত্রু তবু ভাল, সম্পূর্ণ উদাসীন তার চেয়ে খারাপ। কবিদের পক্ষে জীবদ্দশায় সর্ব্বত্র পূজিত হওয়া ঠিক সৌভাগ্য নয়। সকলেই যাকে গ্রহণ করে সকলেই তাকে ঠেলে। রাজনীতির এই নিয়ম সাহিত্যেও প্রযোজ্য।

সেই জন্য কবিদের জীবিতকালে খ্যাতি যেমন বাঞ্ছিত অপখ্যাতিও সেই পরিমাণে প্রয়োজন। এক দল অভক্ত থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে মৃত্যুর পরে অন্ধদের রুচিবদলের ফলে খ্যাতিলোপ হবে না, অপখ্যাতিই খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখবে, অভক্তেরাই ভক্তদের জাগিয়ে রাখবে।

বিনু যখন বড় হয়ে কবিকে দর্শন করতে গেল তখন নিজেকে প্রশ্ন করল, "তুমি ত তাঁকে দর্শন করবে, তিনি তোমাকে দর্শন করবেন কেন?"

অর্থাৎ তোমার মধ্যে এমন কী আছে যা তিনি দেখবেন? তুমি কি তোমার অন্তরের রূপটিকে আকৃতি দিতে পেরেছ তোমার বাইরের রূপে, কিম্বা তোমার রচনার রূপে, কিম্বা তোমার মনীষার রূপে? তুমি কি সুপুরুষ, অথবা সুলেখক, অথবা সদালাপী? কী হাতে করে তুমি তাঁর দরবারে দাঁড়াবে? অন্ধ ভক্তি?

বিনুকে সুপারিশ করবার কেউ ছিলেন না, ইনট্রোডিউস করবার মতো কিছু ছিল না। তখনো সে আত্ম আবিষ্কার করেনি, লিখেছে অতি সামান্য ও সে সব লেখা ক্বচিৎ ছাপা হলেও প্রতিশ্রুতিবিহীন। বিনু গিয়ে একাকী তাঁকে পাকড়াও করল, ছাত্র বলে পরিচয় দিল ও সুযোগ বুঝে পেশ করল একটি জিজ্ঞাসা। কবি তার মুখ রেখেছিলেন, তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বিনু সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল না।

জিজ্ঞাসার কীট প্রবেশ করেছিল রম্যাঁ রলাঁর বই পড়তে পড়তে। টলষ্টয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আর্ট কি সকলের পাতে পৌঁছানোর উপযোগী হবে? না নিজের অন্তর্নিহিত নিয়ম মেনে স্বকীয় নিয়তি পূর্ণ করবে? অবশ্য এই জিজ্ঞাসার মীমাংসার উপর তৎক্ষণাৎ কিছু নির্ভর করছিল না। বিনু তার আপনাকে পায়নি, লেখক হতে মনঃস্থ করলেও তা ঠিক সাহিত্যিক অর্থে নয়। আত্মোপলব্ধির পর তার জিজ্ঞাসার নিরসন আপনি হলো। সকলের গ্রহণযোগ্য হওয়াটা গৌণ। মুখ্য হচ্ছে প্রেরণার বাঁশি শোনা। শিল্পী হচ্ছে ব্রজগোপী। সমাজের সঙ্গে ঘর করবে, কিন্তু কান পাতবে কানুর বেণু শুনতে। শিল্পী যদি তার প্রেরণার মর্য্যাদা রাখে, প্রেরণার যোগ্য হয়, তবে তার শিল্প স্বয়ং বিধাতার গ্রহণোপযোগী হবে, সুতরাং মহাকালের, সুতরাং চিরন্তন সমাজেরও।

তার যে সৃষ্টি তা বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গীভূত হবে, অতএব অবিনশ্বর, অতএব লোকহিতকর।

বিনু যখন আত্মনির্ভর হওয়ার পর কবির কাছে যায় তখন সে প্রেমের কবিতা লিখছে। সে সব তাঁকে দেখাবার মতো নয়। আর জিজ্ঞাসাও ততদিনে মীমাংসা পেয়েছে, তাঁকে বিরক্ত করবার বিশেষ কোনো কারণও নেই। বিনু দূরে দূরেই থাকল এবং দূর থেকেই ফিরল।

এর পরে আবার যখন গেল তখন কৃতী রূপেই গেল, তিনি তাঁর লেখা পড়েছিলেন। সে ধন্য হলো।

কিন্তু তার লেখা কি তার লেখা! বিনুর প্রশংসা করে একজন বিশিষ্ট কবি লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করে যাঁরা সার্থক হয়েছেন আপনি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

প্রশংসাটা বিনুর কাছে নিন্দার চেয়েও নিদারুণ লাগল। সে কি তা হলে বিনু নয়, সে কি স্বয়ংসিদ্ধ নয়? সে তবে রবীন্দ্রনাথের অনুসারক? স্বনামা নয়, রবিনামা?

অনুসরণ ও অনুকরণ অবশ্য অভিন্ন নয়। কিন্তু অনেক সময় দ্বিতীয়টা কটু হবে বিবেচনা করে প্রথমটা প্রয়োগ করা হয়। বিনু কি তবে অনুকারক? তাই যদি হয় তবে শ্রেষ্ঠ হওয়াটা সুখের কথা নয়। সেরা জালিয়াৎ যে সব চেয়ে সাজা পায়।

কবির অনুমোদন লাভ করে কোথায় বিনু আনন্দ করবে, না চোরের মতো মুখ ঢেকে রইল। তখন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। না, সে তাঁর প্রভাব স্বীকার করবে না। সে তাঁর প্রভাবের বাইরে ছিটকে পড়বে। সে তাঁর সৌর মণ্ডলের বৃহস্পতি হবে না। সে উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে যাবে।

এই অদ্ভুত চিত্তপীড়া বিনুকে এমন একান্তভাবে অপ্রকৃতিস্থ করল যে সে রবীন্দ্রনাথের রচনায় চোখ বুলিয়ে যাওয়ার সময় পেল না। সাহস পেল না। পাছে তাঁর প্রভাব পড়ে।

বলা বাহুল্য, কবির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বরাবর সহৃদয় ছিল, সেখানে

কোনো তিক্ততার সংস্পর্শ ঘটেনি। কিন্তু শিল্পকার্য্যে সেই যে গুরুশিষ্য সম্পর্ক সেই সম্পর্ক বিনু ছেদন করতে সচেষ্ট হলো।

ফল হলো এই যে সে কবির প্রভাব এড়াতে গিয়ে কাব্যের প্রভাব এড়ালো। কাব্য পড়তে স্পৃহা রইল না, সাহিত্যেও অরুচি ধরল। সে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান পড়ে। ইতিহাস ত তার পুরাতন বন্ধু। তার কথাবার্ত্তা শুনে আলাপীরা মন্তব্য করেন, "কই, সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যের কথা নেই কেন?" বিনু বলে, "সাহিত্যচর্চ্চা এখন শিকেয় তোলা। আমি ভুতপূর্ব্ব সাহিত্যিক।"

একটি লাইনও লিখতে তার হাত ওঠে না। যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কী লিখবে? কেন লিখবে? লিখতে বসলেই মনে পড়ে নানা অসংবদ্ধ পংক্তি তাঁর কবিতার, তাঁর গদ্যের। তাঁরই ভাব, তাঁরই ভাষা। তাঁকে অস্বীকার করে তাঁকে অতিক্রম করা অসম্ভব। হয় তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে স্বীয় সাধনার দ্বারা অতিক্রম করতে হবে, নয় তাঁকে অস্বীকার করে সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে অপসরণ করতে হবে। গোটা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে না হোক, কাব্যক্ষেত্র থেকে বিনু অপসরণ করল। পড়ল গিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মরুভূমিতে। বহুকাল সেই বালুশয্যায় শয়ন করে সে স্বপ্ন দেখল নতুন জীবনের। সামাজিক আবর্ত্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ জড়িত, এই বিশ্বাস তাকে জাগ্রত রাখল শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বৈজ্ঞানিক চেতনায়।

ভাষা সম্বন্ধেও সে কিছু দিন থেকে ভাবছিল। বাংলা কবিতার ভাষা যেখানে পৌঁছেছে সেখানে একটা ঘূর্ণী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই ঘূর্ণীতে ঘুরছেন, সেখান থেকে তাঁর মতো সর্ব্বশক্তিমানেরও নিষ্কৃতি নেই। তা দেখে সুধীন্দ্রনাথ উড়ে গেছেন আকাশে। সংস্কৃত অভিধানের আকাশ। বুদ্ধদেব দেশী নৌকায় বিলিতী এঞ্জিন জুড়ে আধুনিকতার ষ্টীম ভরছেন, বিষ্ণু দে মধ্যস্থতা করছেন। কিন্তু গতি যেটুকু দেখা যাচ্ছে অগ্রগতি নয়, চক্রগতি। সুতরাং বিনু যদি নিষ্ক্রিয় বসে থাকে তা হলে কেউ যে তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন তা নয়। বিনুর বদ্ধমূল ধারণা যে বাংলা কবিতাকে গতি দিতে পারে—চক্রগতি নয়, অগ্রগতি—লোকসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। লোকসাহিত্যে অবশ্য হাল-ফ্যাশনের গণসাহিত্য নয়, সেকালের Folk সাহিত্য। ছড়া তার সামিল।[?]

অবশেষে বিনুর কাণ্ডজ্ঞান ফিরল। পূর্ব্বপুরুষের রক্তের প্রভাব যেমন তার রক্তের মধ্যে রয়েছে পূর্ব্ব কবিদের ভাবের প্রভাব তেমনি তার ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করতে যাওয়া মূঢ়তা। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই সিদ্ধির সর্ত্ত। হাঁ, পড়েছে তাঁর প্রভাব আমার রচনায়। হাঁ, আমি অনুসরণই করেছি তাঁকে। অনুকরণও করেছি। তা সত্ত্বেও আমি বিনু, আমি নিজের কক্ষায় ধাবমান জ্যোতিষ্ক। আমি তাঁকে স্বীকার করলেই তাঁকে অতিক্রম করবার ছাড়পত্র পাব। পূর্ব্বগামীদের কাছে ঋণী হতে যার সাহস নেই সে তার সামান্য মূলধনে কতটুকু লাভ করবে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বড় বড় খাতক। কর্জ করতে তাদের লজ্জা নেই।

এর পরে সে যখন কবিসন্দর্শনে গেল তখন মাথা হেঁট করে পায়ের ধুলো নিল—যা সে আগে কখনো করেনি, ছাত্র অবস্থায়ও না। "গুরুদেব" বলে উল্লেখ করল—যা সে আগে কোনো দিন করেনি, প্রশংসার প্রত্যুত্তরেও না। তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবের নিকট নতজানু হয়েই সে পীড়ামুক্ত হলো। ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে তবেই সাহিত্যিকের শান্তি। যারা প্রবর্ত্তক হবে তারা অনুবর্ত্তক হবে তার পূর্ব্বে। সাহিত্য একটা প্রবাহ। প্রভাব এড়াতে গেলে প্রবাহ থেকে সরে গিয়ে চরে বন্দী হতে হয়। সেই সকরুণ বিচ্ছেদ মৌলিকতার দ্বারা ভরে না, তার ক্ষতিপূরণ নেই। যারা ঐতিহ্যভ্রষ্ট তারা পিতৃধনবঞ্চিত অনাথ নাবালক। তেমন স্বনামা হয়ে পৌরুষ থাকতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণতার অভাব। বরং প্রভাবের ভয় কাটালেই প্রভাব ক্রমে ক্রমে কেটে যায়।

ওদিকে বিনুর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বস্তুবাদের মরীচিকা অপসৃত হয়েছিল। যা কিছু দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগোচর তাই একমাত্র সত্য বা অখণ্ড সত্য, এ ধারণা বিলীন হলে পরে রিয়ালিটির প্রকৃত রূপ বিভাসিত হলো। এতদিন সে রবীন্দ্রনাথকে রিয়ালিষ্ট বলে আমল দেয়নি, এখন আসন দিল। ধ্যানীরাই রিয়ালিষ্ট হয়ে থাকেন। তিনি ধ্যানী। প্রাণের মতো পদার্থবিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার অতীত পদার্থ ধ্যানেই ধরা দিতে পারে, যন্ত্রে কিম্বা গণিতে কিম্বা ইন্দ্রিয়ে নয়।

প্রাণের বর্ণে গন্ধে স্বাদে ও লাবণ্যে যে রচনা ভরপুর সে যদি অবাস্তব হয়

তবে দ্যুলোকভূলোকব্যাপী প্রাণ নিজেই অবাস্তব। বাস্তবের একটা কৃত্রিম সংজ্ঞা নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে সেই সংজ্ঞার মধ্যে পুরতে না পারার বিড়ম্বনা বিন্নু লক্ষ্য করেছে। তেমন অভিরুচি বিন্নুরও যে হয়নি তা নয়। বিজ্ঞানের মতো সাহিত্য যাতে objective হয় সে বিষয়ে সেও জল্পনাকল্পনা করেছে। পরিণামে সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। হতে পারত অনাসৃষ্টি, কিন্তু বিন্নুর রসবোধ তাকে তেমন পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে।

বিন্নু কদাপি কবুল করেনি যে সামাজিক আবর্ত্তন হচ্ছে end, সাহিত্য হচ্ছে means। বরং তার জীবনের বস্তুবাদী অধ্যায়েও সে ধরে নিয়েছে যে সামাজিক ওলটপালট হচ্ছে means, সমৃদ্ধতর শিল্প সাহিত্য প্রেম হচ্ছে end, অর্থাৎ বর্ত্তমান ব্যবস্থার ধ্বংসের উপর যে নতুন ব্যবস্থার পত্তন হবে তাতে কবিরা হবে নিরঙ্কুশ, প্রেমিকরা নির্বন্ধন, বাউলরা নির্দ্বন্দ্ব। সবাইকে খেটে খেতে হবে, এই নির্দয় নীতি যদি রাষ্ট্রের মূল নীতি হয় তবে নতুন ব্যবস্থা হবে এই তিন শ্রেণীর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথকে যদি খোরাকের জন্যে খাটতে হতো তিনি আর যাই হোন রবীন্দ্রনাথ হতেন না।

আর্টই যে end বিন্নুর এই মজ্জাগত প্রত্যয় তাকে শিল্পীর অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরিয়ে এনেছে। যেমন করে ফিরে এসেছিল বাইবেলের সেই অমিতব্যয়ী তনয়।

তা বলে তার অন্ধ ভক্তি নেই। সাত আট বছরের ব্যবধানে সে ক্রিটিকাল হতে শিখেছে। কবিকে মেনে নিলেও কবিতাকে মেনে নেয় না। উপরে যে ঘূর্ণীর উল্লেখ করা হয়েছে কবিতা তাতে ঘুরপাক খেয়েছে কবির শেষ বয়সে। বিশেষ কোথাও উপনীত হয়নি। আধুনিক বাংলা কবিতার আসল সমস্যার সমাধানে আমরা তাঁর কাছে যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছিনে। ভাব ও ভাষার অসামঞ্জস্য দিন দিন বাড়ছে।

বিন্নুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদপাত ঘটেছিল। সেই থেকে চণ্ডীদাসের প্রতি তার একপ্রকার পক্ষপাত। বঙ্গের জ্যেষ্ঠ কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করতে সে সম্মত হয়নি, রবীন্দ্রনাথই তার বিচারে শ্রেষ্ঠ। তথাপি চণ্ডীদাসের সঙ্গেই তার affinity, চণ্ডীদাসের মতোই সে প্রথমে প্রেমিক, তারপরে কবি, বোধ হয় পরিশেষে বাউল।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমে কবি, তার পরে কবি, পরিশেষেও কবি। সেইজন্যে কবিহিসাবে শ্রেষ্ঠ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। রবীন্দ্রনাথের সাধনা কবিভাবের। চণ্ডীদাসের সাধনা প্রেমীভাবের।

এ ত গেল পক্ষপাতের একটা কারণ। আর একটা কারণ আর একটু জটিল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন বিন্নুর জীবনের উপর এমন ছাপ রেখে গেছে যে সে ছাপ ইউরোপের মানসসরোবরস্নানে ধুয়ে মুছে যায়নি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মানসিক প্রক্ষালনেও সে দাগ ওঠেনি। অসহযোগ আন্দোলনের যে অংশটা তাকে চঞ্চল করেছিল সেটা ইংরাজ কিম্বা ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধতাবাচক নয়। বিন্নু বুঝতে পেরেছিল যে ইংরাজীতে যাকে বলে people তারই মধ্যে রয়েছে বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, তাজা ভাষা ও তাজা ভাব। ইংরাজের সঙ্গে মান অভিমানের খেলা বিন্নুকে চিরকাল হাসিয়েছে, কিন্তু peopleএর কাছে বল সন্ধান করা সত্যিই sublime.

পরবর্ত্তীকালে peopleকে অপমান করা হয়েছে mass আখ্যা দিয়ে। মানুষকে অপমান করা হয়েছে গণেশ বলে অভিহিত করে। যাক, সে কথা অবান্তর। কথা হচ্ছিল, people-এর অন্তরে যে বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য আছে এটা সেই ১৯২০-২১ সাল থেকে বিন্নুর মনে বিঁধে রয়েছে। প্রেমের কণ্টক যেমন দিনের পর দিন দৃঢ়প্রবিষ্ট হয় এই কণ্টকও তেমনি। রমঁ্যা রলঁার "People's Theatre" ও টলষ্টয়সংক্রান্ত পুঁথিপত্র পড়ে বিন্নুর ধারণা কায়েমী হয়। তা বলে সে রলঁা কিম্বা টলষ্টয়ের সঙ্গে একমত হয়নি সাহিত্যকে জনমনের উপযোগী করা নিয়ে। সেখানে সে রবীন্দ্রশিষ্য। কবি হবে জনগণমন অধিনায়ক। নেতা নিজেকে নীয়মানদের উপযোগী করেন না, করতে গেলে হন অভিনেতা। নীয়মানদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নেতা করবেন তাঁর inner voice-এর প্রতি কর্ণপাত। কবির কাছে তার inner voice হচ্ছে ধ্রুবতারা। কম্পাস যেমন সর্ব্বদা উত্তরমুখী তেমনি কবির লেখনীও প্রতিনিয়ত প্রেরণামুখী!

বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য, তাজা ভাব ও তাজা ভাষা সংগ্রহ করতে হবে people-এর কাছে। বিন্নুর এই ধারণার উন্মেষ অসহযোগ আন্দোলনের সময়। টলষ্টয়ের মতো গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে চাষী বনবার মতলব ছিল

তার। উপরন্তু চাষাণী বিয়ে করবার। বিন্নুটা কোনো কাজের নয়, কাজের বেলা পিছু হটাই তার স্বভাব। তার প্রিয়তম বন্ধু এবিষয়ে বিন্নুর চেয়ে সাহসী। তিনি চাষীদের সঙ্গে চাষী হয়েছেন, চাষাণী বিয়ে না করলেও স্ত্রীকে চাষাণী করেছেন। তিনি যদি কবি হতেন তবে বিন্নুকে অনায়াসে হারিয়ে দিতেন, এক দিনেই ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁর স্বরাজ সাধনা সাঙ্গ হলে হয়ত তিনি সাহিত্যে নামবেন। তখন কি বিন্নু তাঁর সঙ্গে পারবে ?

এদিক থেকে চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার এক জায়গায় একটা দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি সেকথা জানতেন। সেই জন্যে স্বদেশী যুগে ভার নিয়েছিলেন সর্ব্বতোমুখ কর্মের। তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন কার্য্যতঃ যে আকারই ধারণ করে থাকুক, জনসমূহের প্রতি প্রাণের টান থেকেই তাদের সূচনা। তাঁর "গল্পগুচ্ছ" এর আরেক প্রমাণ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রজাদের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে। পারেননি বলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। টলষ্টয়ও সত্যিকার "মুজিক" হতে পারেননি। চণ্ডীদাসের কালে যা একান্ত সহজ ছিল এ কালে তা কল্পনাতীত কঠিন। বিন্নু তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

তা হলেও বিন্নুকে ও তার পরবর্ত্তীদেরকে এই চেষ্টাই করতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই। বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। যাঁরা অধ্যবসায় করছেন তাঁরা ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করবেন এর তাৎপর্য্য।

এমন কথা বিন্নু বলছে না যে রবীন্দ্রনাথের সাথেই বাংলা কবিতার সহমরণ ঘটেছে বা সব সম্ভাব্যতা নিঃশেষিত হয়েছে। তার বক্তব্য শুধু এই যে বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় জীবনব্যাপী অভিনিবেশ যদি রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধির সঙ্কেত হয়ে থাকে তবে তাদৃশী সিদ্ধি আমাদের কারো কপালে জুটলেও আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা হয়নি, হলে সামান্যই হয়েছে। প্রাণ-পণ পরিশ্রমেও যেটুকু ফল লাভ হবে সেটুকু অকিঞ্চিৎকর। আমাদের কর্ত্তব্য বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় অন্ততঃ কিয়ৎকাল ক্ষান্তি দিয়ে উপরে যে পন্থার আভাস দেওয়া হয়েছে সেই পন্থার পদক্ষেপ। অথবা অন্য কোনো পন্থা আবিষ্কার।

ইংরাজী সাহিত্যের অনুরূপ সন্ধিক্ষণে এক দল লেখক ও চিত্রকর নিজেদের নাম রেখেছিলেন Pre-Raphaelites। এই নামকরণটা বিন্নুর ভারী ভালো

লাগে। রবীন্দ্রনাথকে যদি রাফেলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে বিনু যে পন্থার উল্লেখ করেছে সেই পন্থার পান্থদের বলতে পারা যায় Pre-Tagorites। রবীন্দ্র প্রভাবকে অস্বীকার করা অনাবশ্যক, কিন্তু চণ্ডীদাসের কালে ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে একালে ফিরে আসা অত্যাবশ্যক। নন্দলাল বসু যেমন অজন্তার যুগে ফিরে গিয়ে বর্ত্তমান যুগে ফিরে আসছেন। যামিনী রায়ের উদাহরণ বোধহয় আরো যুৎসই হবে। তিনি বাংলার Folk Art-এ ফিরে গেছেন ও মাঝে মাঝে আধুনিক ইউরোপীয় আর্টে যাতায়াত করলেও তাঁর আধুনিকতা বাংলার Folk-Artএরই আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত যদি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে না থাকে তবে আমরা সহজেই দেখতে পাব কবিরা অন্যান্য শিল্পীদের মতো কারিকর বা craftsmen। যারা চরকা কাটে, তাঁত বোনে, কাঠের কাজ করে, মাটির ঘর বানায়, প্রতিমা গড়ে ও বাসন তৈরি করে কবিরা তাদেরই দলের লোক। ঘটনাচক্রে দলচ্যুত হয়ে ভদ্রসমাজে ভিড়েছে। এ সমাজে শ্রম আছে, সৃষ্টি নেই। সৌজন্য আছে, দরদ নেই। বিনয় আছে, আন্তরিকতা নেই। সামাজিকতা আছে, স্বাভাবিকতা নেই। হৈ চৈ আছে, প্রাণ নেই। রসাভাস আছে, রস নেই। এ সমাজে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সুখী হতে পারেননি, কখনো বজরায় কখনো আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন, অন্যথা আপনার মধ্যে আত্মগোপন করেছেন। ভদ্র ও ভদ্রাদের সঙ্গে বাস করে ভদ্র হয়ে ওঠা কবির পক্ষে মর্মান্তিক। নীট্শে বলতেন, "A married philosopher is ridiculous"। বিনু বলে, "A respectable poet is absurd"। কবিমাত্রেই ভদ্র সমাজের বাহির, যদি সত্যিকার কবি হয়। রবীন্দ্রনাথও পারতপক্ষে ভদ্রসমাজের বাহির ছিলেন, কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডী হচ্ছে এই যে তিনি কারিকরদের সমাজে কল্কে পাননি। অর্থাৎ কুমোর কামার তাঁতী ছুতোর স্যাকরা শাঁখারী রাজমিস্ত্রীরা তাঁকে সমান ভেবে আপন করে নেয়নি, চণ্ডীদাস বা কাশীদাসকে যেমন করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যদি মনে করি যে বছরে চারখানা বই লেখাই পুরুষার্থ এবং ইউরোপ আমেরিকায় সম্বর্দ্ধনাই মোক্ষ তা হলে আমরা কিছুই শিখিনি বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডী যাকে বলেছি আমাদেরও সেটা ট্র্যাজেডী, কেননা যেসমাজে আমাদের কাব্যকলার প্রচার সে সমাজ

আমাদের সমাজ নয়, যদিও ঘটনাচক্রে আমরা তার অন্তর্ভুক্ত। আর যে সমাজে আমাদের প্রকৃত স্থান সে সমাজে আমাদের হুঁকো বন্ধ। আমরা কারিকর, কিন্তু অন্যান্য কারিকরদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। সেইজন্যে যারা অন্যান্য কারিকরদের ঘিরে দাঁড়ায় তারা আমাদের ছায়া মাড়ায় না। কাশীদাসী মহাভারত ঘরে ঘরে, আলাওলের পুঁথি অন্তত একটি জেলার গ্রামে গ্রামে, চণ্ডীদাসের পদ মুখে মুখে, রামপ্রসাদী গান যেখানে সেখানে। দেশ শিক্ষিত হলে রবীন্দ্রনাথেরও দিন আসবে, কিন্তু ভয় হয় শিক্ষার সম্যক বিস্তার সম্প্রতি হবে না, হলেও তা ভদ্রশিক্ষা হবে। ভদ্রশিক্ষা শিল্পের শত্রু। রসবোধের বৈরী। দেশশুদ্ধ লোক যদি ভদ্রলোক হয় তবে ছবির চোখ, গানের কান, গঠনের হাত, নৃত্যের চরণ দেশছাড়া হবে।

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বিনুর একটি থিওরী আছে। যে সময় তাঁর ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" লণ্ডনে প্রকাশিত হয় সে সময় ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্য এমন একজন কবির প্রতীক্ষা করছিল যিনি সর্ব্বতোভাবে সহজ, অথচ আর্টের সারেগামায় সিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" এত সহজ যে বারো বছরের বালকও তার ভাষা বুঝতে পারে। টলষ্টয় এই চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এত দুরূহ যে বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়ও সে ভাষা লিখতে পারেন না। ছন্দের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মালে, ধ্বনির উপর অধিকার মৌরসী হলে, একে একে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করলে, বাহুল্যের লেশ না রাখলে সে ভাষা পোষ মানে, বোল শোনে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ঘোড়সওয়ারী করে ভাষা জিনিষটার প্রাণরহস্য আয়ত্ত করেছিলেন। সেইজন্যে ইংরাজী ভাষাও তাঁর শাসন মেনে সহজ চালে চলল।

সাহিত্যকে সহজ করার জন্যে টলষ্টয়ের ব্যাকুলতা কেবল তাঁর একার ছিল না, ছিল ইউরোপের তৎকালীন আবহাওয়ায়। কেবল সহজ কথায় লিখলে কি সাহিত্য সহজ হয়? তা যদি হতো তবে শিশুপাঠ্য উপন্যাসগুলোর চেয়ে সহজ আর কী আছে! কথার সঙ্গে ছন্দ, ছন্দের সঙ্গে ধ্বনি, ধ্বনির সঙ্গে অর্থ, অর্থের সঙ্গে ব্যঞ্জনা একাধারে সব মিলে জীবনের সৌন্দর্য্যে সহজ হলে তবেই সাহিত্য সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলার পরে ইংলণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, দশ বছর আগে গেলে ও

ইংরাজীতে "চিত্রা" কি "চিত্রাঙ্গদা"র তর্জমা করলে তেমন সাফল্য লাভ করতেন না। তাঁর জীবনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স শোকে তাপে ভরা। সেই শোকতাপ তাঁর জীবনকে ও জীবনের সঙ্গী সাহিত্যকে নিরলঙ্কার ও নিরহঙ্কার করেছিল। প্রিয়বিরহের বেদনায় তিনি প্রিয়তমকে চিনেছিলেন, মৃতের মধ্যে অবলোকন করেছিলেন অমৃতময়কে। রিয়ালিটি যে অতি নিষ্ঠুর অথচ অতি মধুর, পরম ব্যথা অথচ পরম আনন্দ, সর্ব্বব্যাপী শূন্যতা, অথচ অন্তঃস্থলে পূর্ণতা, এই সহজ কঠোর উপলব্ধি তাঁকে ও তাঁর বাণীকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল যে স্তরে সাধারণ কবিদের ও সাধারণ কবিতার উত্তরণ নেই। তিনি স্বর্গ স্পর্শ করে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছিলেন ওই দশটি বছরে। সেইজন্যে স্বর্গের মতো সহজ হয়েছিল, সুন্দর হয়েছিল, তাঁর তখনকার কবিতা।

ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"তে স্বর্গের আমেজ ছিল। ইউরোপ তখন এক ঝুটা রিয়ালিটির আবর্ত্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। রিয়ালিটি যে প্রত্যেকের অন্তরে, এই সহজবোধটুকু হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাকে দিলেন সেই সহজবোধ। তাঁর নিজের জীবনের কাঁটাবনের গোলাপ। ইউরোপ বহুকাল একজন মিষ্টিক দেখেনি। ঠাওরাল তিনি একজন মিষ্টিক। তুলনা করল মধ্যযুগের মিষ্টিকদের সঙ্গে। কিন্তু মিষ্টিকরা ত শিল্পের স্বরগ্রামে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পী। বাক্‌সাধনার দ্বারা বাণীকে বশ করেছেন। তাঁর মিষ্টিক খ্যাতি যদিও অযথা নয়, তবু বিভ্রান্তকারী। ইউরোপ কতকটা বিভ্রান্ত হলো। সেই বিভ্রমের প্রতিক্রিয়া ওখানকার সাহিত্যিক মহলে এখনো চলছে। ওঁরা তাঁকে মধ্যযুগের কোটায় ফেলছেন, আধুনিক যুগের এলাকায় না। বস্তুতঃ গ্যয়েটে, ব্রাউনিং, হুইটম্যান, টলষ্টয়ের পাশেই তাঁর আসন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার দিগ্বিজয় এইবার আরম্ভ হবে। তিনি পূর্ণ শিল্পী, জীবনশিল্পী। তাঁর কাব্যসাধনাকে স্বরূপে দেখলে নিছক আর্টের দিক থেকে তাঁর কবিতার চূড়ান্ত সমাদর হবে, যেমন রাফেলের। পশ্চিমের ওরা যেমন তাঁর মিষ্টিক প্রসিদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত আমরাও তেমনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা। আমরাও ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করব যে বহুমুখিতার দ্বারা কারো দর বাড়ে না। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বই তাঁর সর্ব্ববিধ রচনায় অনুপ্রবিষ্ট, কবিপ্রসিদ্ধিই তাঁর চরম প্রসিদ্ধি। কবিরূপেই তিনি অজর, অমর।

বাঙ্গালার সংস্কৃতি-ধারায় রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজী ১৯১১ সালে স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে কবির পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তরণ উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাদেশে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান হয়—ইহাকেই আমরা বাঙ্গালার সংস্কৃতি-গঠনে রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রথম সূচনা বলিয়া মনে করিতে পারি। ১৯১১ সালের অন্তত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার চিন্তা ও সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে আপনাকে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু সংবর্দ্ধনার পূর্ব্ব-কালীন পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার ঢেলা-মাটিতে রবীন্দ্র-বীজের ফসল তেমনভাবে নবান্ন-উৎসব সৃষ্টি করিতে পারে নাই--ঐতিহাসিকের চক্ষু লইয়া আজ এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল।

রবীন্দ্র-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে যাইয়া আজ আমাদের এ কথা মনে করিলেই যথেষ্ট হইবে না যে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কিংবা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিক। সাহিত্য বা কাব্যের যা আনন্দ তাহা সাহিত্যামোদীরই উপভোগ্য এবং বাঙ্গালাদেশের অধিক সংখ্যক নর-নারী এমন নন যাঁহাদের বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা সাহিত্যানুরাগী কিংবা রবীন্দ্র-সাহিত্যে যথেষ্টভাবে অধীত। রবীন্দ্রনাথ যদি শুদ্ধ বাঙ্গালাদেশের Shakespeare কিংবা Hugo কিংবা Goethe হইতেন তবে তাঁহার তিরোধান অত স্ত্রী-পুরুষের আসন্ন ব্যক্তিগত শোকের কারণ হইত না, জনসাধারণের তাঁহার প্রতি প্রথাগত প্রয়াণান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেই যথেষ্ট হইত। কেহ কেহ মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক বিশ্ব মনীষি-সভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, তিনিই আধুনিক বিশ্ব-চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন, কাজেই আজিকার এই দেশময় বিয়োগোত্তর প্রশস্তি যথার্থই তাঁহার প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথই বিশিষ্টভাবে বিশ্ব-চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের মুখপাত্র ছিলেন কিনা এ কথা বিচার-সাপেক্ষ, অন্তত এ আলোচনা এখানে উত্থাপন করিবার কোন

কারণ নাই—কেননা আজ বাঙ্গালার সহর-পল্লীর আকাশ ভেদ করিয়া যে শোক-উৎসবের রোল উঠিয়াছে তাহার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্বজনীনতার কোন যোগ আছে তাহা মনে করা সম্পূর্ণই অমূলক। আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালার সংস্কৃতি-ধারার তাৎপর্য্য-গত মহত্ত্ব ; ইহা নিশ্চিত যে এই তাৎপর্য্যের সম্যক উপলব্ধি এখনও দেশময় রবীন্দ্র-ভক্ত-মণ্ডলীর চিন্তার ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। চিন্তার ক্ষেত্রে যাহা অ-পরিস্ফুট, বিচারদ্বারা তাহাকেই মূর্ত্ত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কবি-প্রয়াণে বাঙ্গালার অগণিত শিক্ষিত নরনারীর পক্ষ হইতে আজ রবীন্দ্রনাথকে শুদ্ধ কবি, শুদ্ধ সুরকার, শুদ্ধ রূপস্রষ্টা কিংবা অতুলনীয় সাহিত্যক বা জ্ঞানী মনে করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলে তাঁহার মনীষার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দান করা হইবে না—ইহা দান করিতে হইবে রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালার সংস্কৃতির ইতিহাসে বিগত চারিশত বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত একমাত্র ভগীরথ বলিয়া গণ্য করিয়া। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার যে ভগীরথ-প্রতিভা পুরীর সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহার পর সেই ভগীরথ-প্রতিভার একমাত্র পুনরুদ্ধার হইয়াছিল কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের পর রবীন্দ্র-সাহিত্যের মত আর কিছুই বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সংস্কৃতি-ধারাকে অত প্রবল ভাবে, অত বৈপ্লবিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মান্দোলনের যে-ব্যাপকতা সাহিত্যের প্রভাব তাহার তুলনায় সঙ্কীর্ণ, এ কথা আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই নাই—আমরা এখানে শুদ্ধ প্রভাবের তীব্রতা লইয়াই আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণই পণ্ডিতম্মন্য। বৌদ্ধ যুগের তমিস্রা-রজনীর তৃতীয় প্রহর হইতে তান্ত্রিক সাধনার রুদ্রালোকসম্পাতে কেমন করিয়া পূর্ব্ব-ভারতের ভাগীরথীকূলে এক অ-বৈদিক পৌত্তলিক এবং মানবিক ধর্ম্মসাধনার উপপত্তি ফলে বাঙ্গালী-জাতির এক নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা এখনও ধীমান সমাজতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসার বিষয়-বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেও আমরা একথা জানি যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাক্কালীন যে বাঙ্গালার সাধনা তাহাতে বাঙ্গালীর মেধা ন্যায় ও স্মৃতির বেড়া-জালে কণ্টকিত হইয়া নিজেকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। গঙ্গার কূলে উপকূলে

বাঙ্গালার যে পলি-মাটি এতদিন ভাব-বীজের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ভ্রষ্ট লগ্নকে গণনা করিয়া কাটাইতেছিল, নিত্যানন্দ-প্রচারিত শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্ম-শিক্ষার ফলেই তাহা শস্য শ্যামলতায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রাচুর্য্যের রূপধারণ করিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অনুন্নত সমাজের ভাব-গঙ্গার ফেনিল উত্তেজনায় বর্ণাশ্রম-প্রতিষ্ঠ উন্নত হিন্দু সমাজের টনক্ নড়িল। ফলে বাঙ্গালীর ধর্ম্মসাধনায় কানু-গীতের সঙ্গে সঙ্গে মা বুলি স্থান পাইল, মাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য-রসের অবতারণা হইল, রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে শালগ্রাম-শিলা গৃহ-বিগ্রহরূপে বাঙ্গালীর ঘরে স্থান পাইল। তান্ত্রিক কালী, কাপালিকের কালী রামপ্রসাদ সেনের 'নিমকহারাম নই শঙ্করী'তে পরিণত হইল। আজ যদি বাঙ্গালার গোস্বামী-সমাজ নির্ম্মূল হইয়া যায়, নবদ্বীপ যদি গঙ্গা-বক্ষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাব বাঙ্গালীর সংস্কৃতি-রূপ এমন কি ধর্ম্ম-সাধনা হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও মোটামুটি ঐরূপ একটী কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মশিক্ষা বাংলার সংস্কৃতি-ধারায় যে ভাব-গঙ্গা বহাইয়াছিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মোশ্লেম বুরোক্রেসীর শাসনাধীনে তাহা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তাহা হইলেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে শ্রীচৈতন্যোত্তর বাঙ্গালী-সাধনা ভাব-দরিদ্র ছিল না—যদি তাহাই হইবে তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিংবা মুকুন্দলালের চণ্ডী কাব্যের এরূপ ব্যাপক প্রসার বাঙ্গালায় পল্লীতে পল্লীতে সম্ভবপর হইত না। নদী-মাতৃকা পূর্ব্ব-বঙ্গের সহস্র সহস্র গৃহ-প্রাঙ্গণেও তাহা হইলে এমনি করিয়া মনসার উপাখ্যান অশ্রু-বিধুর শ্রোতা-শ্রোত্রীর কাছে রাত্রির পর রাত্রি পঠিত হইত না। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার মাটীতে ভাব-ভগীরথ নহেন তিনি বাঙ্গালার কল্পনা-ভগীরথ। কথাটাকে নীচে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় যে "চিত্তহীন, অর্থহীন, অভ্যস্ত" আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে রামমোহন বাঙ্গালীর হিন্দু-সাধনার যে তাত্ত্বিক রূপ তাহাকেই কুসংস্কার-মুক্ত করিয়া সাধারণের ধরিবার ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালা সংস্কৃতি-ধারা সংস্কারের অনুপ্রাণনাই ছিল, কোন নবীন রূপ দিবার চেষ্টা

ছিল না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে রাজার পৌত্তলিকতা-বিরুদ্ধতা বাংলার সনাতন সংস্কৃতির পক্ষে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের আয়োজন সূচনা করে, তাহা হইলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে রাজা-প্রচারিত এই ধর্ম্ম-সাধনার অতি-তাত্ত্বিকতা ভারতীয় ও বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে অভিনব ছিল না। সন্ন্যাসীর যে শিক্ষা প্রাপ্য রামমোহন রায় বাঙ্গালী গৃহস্থকে কুসংস্কার-মুক্ত করিবার জন্য সেই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। তারপর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি যে "তত্ত্ববোধিনী সভায়" বিচার-বিতর্কের কাহিনী শুনিতে পাই, তাহাতেও দেখি যে সনাতন অনুশাসনকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহাকে বিচার-বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করিবারই চেষ্টা ছিল। বৎসরের চিহ্নিত দিনে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পুরোহিতের সাহায্যে দেবপূজার সঙ্গে বিগ্রহহীন ধর্ম্মমন্দিরে সাঙ্ঘিক উপাসনার আনুষ্ঠানিক আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে স্বীকার করি, এমন কি ধর্ম্মসাধনার আঙ্গিক হিসাবে এই নিরাকার মণ্ডলী-উপাসনার ব্যাপক প্রসার বাঙ্গালার সনাতন সংস্কৃতি-ধারার পরিণতিকে এক নূতন পথে চালিত করিতে পারিত, ইহাও স্বীকার করিতে কোন দ্বিধা বোধ করি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলন বাঙ্গালার সনাতন বৃহত্তর সংস্কৃতির আদর্শকে কোন নূতন রূপ দান করে নাই কিংবা দান করিবার চেষ্টাও করে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি দেখিতে পাই যে বাঙ্গালার মাটিতে মানবিক প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) নিয়া খানিকটা আবেশ-বিহ্বল আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম্ম ও শ্রীরাধাহীন কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রচার বাঙ্গালার মাটীতে দূরে থাক তাঁহার নিজের কাছেও বেশী দিন স্থায়ী উপলব্ধির স্থান করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের পৌরোহিত্য করিয়াই বাঙ্গালার সংস্কৃতি-গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবুদ্ধ বাঙ্গালার একমাত্র অ-সনাতনী ও নবীন সংস্কৃতি-রূপ—যাহা বর্ত্তমান শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মননকে প্রবল ও ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—তাহা স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম্মের রাজসিক রূপ, কর্ম্মযোগীর অবশ্য পালনীয় সেবা-ধর্ম্ম। বেলুড় উৎসারিত এই সেবা-ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ক্যাথলিক সমাজের অনুকরণে প্রচারিত কর্ম্মবাদ নহে—ইহা একান্তভাবে বৈদান্তিকের অধিকার বিবেচনায় রাজসিক ধর্ম্মরীতি।

এমনি সময় বাঙ্গালার সাহিত্য-মঞ্চে আবির্ভাব হইল রবীন্দ্রনাথের—"দূরদেশী এক রাখাল ছেলের" মত বাঙ্গালার "বাটের বটের ছায়ার তলে" সারা বেলা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে। বাঙ্গালার সংস্কৃতি-সভায় সত্যই ইহা এক আবির্ভাব—কেননা বাঙ্গালী এতদিন নির্ঝরকে নির্ঝর বলিয়াই জানিয়াছিল, ইহার স্বপ্নভঙ্গের রূপ দেখে নাই; বরষার দিনে নিতান্ত প্রিয়জনের প্রতীক্ষা-বেদনাই জানিয়াছিল কিন্তু তাহার "মেঘময় বেণীর" সন্ধান পায় নাই; শস্য-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বরষার ভরা নদীতে দ্রুত-বহমান তরীই দেখিয়াছিল, ইহার সঙ্গে কল্পনা-মিশ্রিত "সোনার তরী"র ছবি দেখিতে পায় নাই; দেবত্বকে দূর হইতে বিস্মিত নেত্রে পূজা করিয়াই আসিয়াছিল, "ধরাতলে দীনতম ঘরে" যৌবন-অভিষেকের দেবোত্তম মানবিক মহত্তের উল্লাস অনুভব করিতে পারে নাই; যে অনুশাসনকে এতদিন বরণীয় বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছিল তাহা যে "খুঁজে খুঁজে মরা পরশ পাথরের" সামিল ক্ষ্যাপামি তাহা জানিতে পারে নাই; বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালী এতদিন শরতের আবহাওয়া কাটাইয়া উঠিয়াছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চক্ষু দিয়াই বাঙ্গালী প্রথম দেখিল শিউলি বুকের বুক আন্দোলিয়া উঠে প্রভাত-আলোর অঞ্জলি, প্রথম দেখিল ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা, শুনিল কেমন করিয়া বর্ষার দিনে "পূব সাগরের" ওপার হইতে সাপ খেলাবার শন-শনি বাঁশী বাজে, কেমন করিয়া বহুযুগের ওপার হইতে বিরহিণী মালবিকার ব্যথা লইয়া আষাঢ় মানুষের মনে নিবিড় হইয়া নামে। কেহ কেহ বলিবেন এই সব উদ্ধৃতি হইতে ত' শুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাদের সহিত বাঙ্গালীর সংস্কৃতিরূপের সম্বন্ধ কোথায়! আমাদের বক্তব্য এই যে রবীন্দ্র-কাব্যের একটা সংস্কৃতিগত মর্ম্ম আছে—রবীন্দ্রনাথ জীবনে কল্পনাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন এবং এই কল্পনার সত্যতাকে প্রচার করিয়াছেন। এই কল্পনা-সর্ব্বস্ব দৃষ্টিই বাংলার মাটীতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টিতে এ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় বলিলে সমগ্র সত্যটী স্বীকার করিয়া লওয়া হইল না, কেননা রবীন্দ্র-কাব্য বা রচনা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-দৃষ্টির সাক্ষ্য নয়, তাহার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্র-কাব্যের মত উৎকৃষ্ট কল্পনা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহার

একমাত্র না হোক সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে প্রাক-রাবীন্দ্রিক বাঙ্গালীর সংস্কৃতিরূপের মধ্যে কল্পনার স্থান অপরিসর। বাঙ্গালীর কল্পনা রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর রাজকন্যার মত অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথই প্রথম সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া বাঙ্গালীর কল্পনাকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা-সর্ব্বস্বতাকে যুগ-লব্ধ প্রতিভা বলিয়া খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করা বৃথা, কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সংস্কৃতি-সভায় নিতান্ত একক।

দুঃখের ব্যাপার এই যে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য অনেকের কাছেই ধরা পড়ে না। এই ধরা না পড়িবার সর্ব্বপ্রধান কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈচিত্র্য। কবির সর্ব্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীও এই রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যের উপর অনেকখানি জোর দিয়াছেন। কবি নিজেও বলিয়াছেন যে তাহার কাব্যজীবন যেন এক "নিরুদ্দেশ যাত্রা", সবিস্ময়ে কবি স্বীকারোক্তি করিয়াছেন—

পরপারে উত্তরিতে পা' দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান।

কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-চিন্তার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে একটী প্রগাঢ় ঐক্য রহিয়াছে। "ক্ষণিকা"র কবি, "সোনার তরী"র কবি, "নৈবেদ্যে"র কবি, "খেয়া"র কবি, উপনিষদের "ধর্ম্ম" ব্যাখাতা, Personality গ্রন্থের লেখক—এই সমস্তই রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই কিন্তু এই সব বৈচিত্র্যেরই অনুপ্রেরণা এক—কবির কল্পনা ও উপলব্ধির উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে "সবুজপত্রে" কবি যে যৌবনের রাজটীকা পড়াইয়া ছিলেন, "স্ত্রীর পত্র" "বোষ্টমী" প্রভৃতি গল্পে যে ব্যক্তি-শুচিতা প্রচার করিয়াছিলেন, "ঘরে বাইরে"র নিখিলের চরিত্রে যে দাম্পত্যের অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা বুঝি কবির সাগর পারের ধার-করা Ibsenism, তাহার সঙ্গে "নৈবেদ্যে"র কবির কোন অচ্ছিন্ন যোগসূত্র নাই। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ আকৈশোর কল্পনাবাদী, তাই তিনি ষোল আনা ব্যক্তি-কেন্দ্রগ, তাই "সবুজ পত্রে"র

আদর্শ ছিল "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-বাদ ইয়ুরোপীয় Ibsenism ছিল না, কেননা প্রাণহীন চিরাচরিতকে তিনি ততটা নির্ম্মমভাবে আঘাত করেন নাই যতটা তাহাকে অসুন্দর ও ব্যর্থ বলিয়া জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যের Oscar Wilde-এর aestheticism-র সঙ্গে তুলনা করিতে পারা গেলেও তাহার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা নিতান্ত ভ্রম হইবে। রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতি Oxford লেখকদের ছিল না—"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এ দৃষ্টি ওয়াইল্ড-প্যটারের চক্ষু-সীমার ছিল বাহিরে। তাই ব্যক্তি-কেন্দ্রগ হইলেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় একটা বিশ্বমানবকতার সুর বরাবরই ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, তাই তিনি মানবকতার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পতাকা হস্তে জীবনের শেষার্দ্ধ কাটাইয়াছিলেন। তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথের মানবকতা কল্পনা-লব্ধ এবং তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সংস্কার-বিহীন। ইহাই কবির বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এত অভাবনীয়রূপে বৈপ্লবিক। ধরা যাক্ কবির নিম্নেকার বাণী—

সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ
কে রেখেছে মত আঁটিয়া।

কল্পনা-সর্ব্বস্ব রবীন্দ্রনাথ বাংলার মাটীতে দাঁড়াইয়া এ বাণী উচ্চারণ করিবার যে সাহস পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির সামর্থ্যে। কবি প্রচার করিয়াছিলেন যে ভিতর হইতে যে ধর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল না তাহা ধর্ম্মই নয়, তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে বৈরাগ্য সাধনে তিনি মুক্তি কামনা করেন না—

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেমরূপে ভক্তিরূপে উঠিবে ফুটিয়া।

ইহা সনাতন বাংলার সংস্কৃতি-আদর্শের বিচারে সম্পূর্ণই বৈপ্লবিক। তাই সহস্র তিরস্কার, সহস্র গঞ্জনার ভিতর দিয়া তবে তাঁহার কল্পনাদর্শের মূর্ত্তিটী বাঙ্গালীর চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হয়ত আজ রবীন্দ্র-প্রতিভার অত বৃহৎ দান আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না, কেননা

রবীন্দ্র-সংস্কৃতি আজ আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রবীন্দ্র-চেতনায় আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের চক্ষু দিয়া চক্ষুষ্মান হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়িতে বাধ্য। আজ যে বাঙ্গালী আর্থিক ও রাজনীতিক সঙ্কটের মধ্যে বিহ্বল হইয়াও জীবনের রসাদর্শকে আবাহন করিয়া বলিতে পারিতেছে—

> রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার······
> রঙ যেন মোর মর্ম্মে লাগে
> আমার সকল কর্ম্মে লাগে
> সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে
> গভীর রাতের জাগায় লাগে।

—তাহার একমাত্র অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ। এই কল্পনা-সর্ব্বস্বতার মূল্য কি, পৃথিবীময় আজ এই ভূমিকম্পের দিনে এই কল্পনা-রঞ্জিত জীবনের দৃষ্টি, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনন-লীলা টিঁকিয়া যাইবে কিনা কিংবা টেঁকা উচিত কি না সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। ধূর্জ্জটীর জটালি হইতে ভগীরথ যেদিন ঘণ্টা-নিনাদে ভারতের সমতল ভাসাইয়া গঙ্গাবতরণ করাইয়াছিলেন সেদিন কে জানিত ভাগীরথীর বক্ষে শুদ্ধ স্নানার্থীর গ্লানি স্থান পাইবে না, পাইবে তাহাতে মুক্তি বহু কল-প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জীভূত পুরীষ-জঞ্জাল। বাঙ্গালীর সনাতন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমনি রবীন্দ্র-ভগীরথ যে কল্পনার স্রোত বহাইয়াছেন তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া লাভ নাই, বাঙ্গালী আজ শুদ্ধ রবীন্দ্র-সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলিপুটে অস্তমিত ভাস্বরের উদ্দেশে সমস্বরে বলিয়া উঠুক—"ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরঃ।"

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি

সমসাময়িক বাঙ্গালীর মানসিক বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কতখানি স্থান পূর্ণ করেছিলেন তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় দেশব্যাপী এই অনুভূতিতে যে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অবসানও অকালমৃত্যুর মতন অসহনীয়। বাস্তব জীবনে অথবা তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাঁদের তাঁকে নিতান্ত কাছে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, আজ রবীন্দ্রনাথের অভাব তাঁদের পক্ষে অতি আপন জনকে হারাবার দুঃখের সমতুল্য। কিন্তু সে-গণ্ডির বাইরের বিরাট বাঙ্গালী জনসাধারণও এই শোকের অংশীদার। ৭ই অগাষ্টের সুবিশাল জনতা এর সাক্ষ্য দিয়েছিল—সে-জনসমুদ্রের বিশৃঙ্খল ব্যবহার আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, কিন্তু আন্তরিক আবেগই যে তার মূল প্রেরণা ছিল, এ-কথা অস্বীকার করা অন্যায় হবে।

বাংলা বা ভারতের জীবনে রবীন্দ্রনাথের সার্থক প্রভাব সম্বন্ধে বিচার এখন সম্ভব নয়, কিন্তু সে-স্বীকারোক্তির পরও আমরা এ-সম্বন্ধে না ভেবে এবং আলোচনা না ক'রে থাকতে পারি না। অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাই এই বিষয়ে চিন্তা ও চিন্তাকে রূপদান চারদিকে দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন জটিল ব'লেই এখানে উত্তরের খসড়া প্রয়োজনীয় হ'তে পারে—tentative আলোচনাও সেইজন্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং সে-চেষ্টায় নিজেদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হওয়াই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত প্রবন্ধের বন্যার এই বোধ হয় যথেষ্ট কৈফিয়ৎ।

আজকের দিনে প্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কতখানি, সম্প্রতি অনেকের মনেই এ-প্রশ্ন উঠেছে। দশ বা পনের বছর আগে বাংলাদেশ তাঁকে হারালে নিশ্চয়ই এ কথাটা এতখানি মনকে নাড়া দিত না। ইতিমধ্যে এক নতুন হাওয়া, নূতন এক চিন্তাধারা দেশে বইতে আরম্ভ করেছে। প্রগতি কথাটা অনির্দ্দিষ্ট, তার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিপুল পরিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই বোধ হয় প্রগতির সব চেয়ে নিরপেক্ষ ও নির্ব্বিশেষ প্রতি-শব্দ। কিন্তু ঘটনাচক্রে সারা জগতে আজ এর একটা বিশিষ্ট আধুনিক রূপ

ফুটে বেরিয়েছে। আজকের দিনে অগ্রগতির যথার্থ বাস্তব রূপ হচ্ছে সাম্য-বাদের আকর্ষণ, সাম্যতন্ত্রের প্রস্তুতি। শ্রেণীবর্জ্জিত নূতন সমাজ গঠন আমাদের দেশেও বহু নরনারীর কাম্য হ'য়ে উঠেছে, তাই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরাণো ধারণাগুলি অনেকাংশে ম্লান হ'য়ে আসতে বাধ্য। এটা ঐতিহাসিক পর্য্যবেক্ষণের কথা, এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞার মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের দেশে প্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নির্ণয় করতে হ'লে তাই আজ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। ভুল বোঝার সম্ভাবনা যাতে ক'মে আসে সেইজন্য প্রথমেই এই ভাবে অগ্রগতির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করা লেখকের প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পস্থষ্টির উৎকর্ষ এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, দেখতে হবে দেশে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর পরিবর্ত্তন-ধারা এবং আগামী কালের উপর তাঁর প্রভাব কতখানি, এবং আমার বিশ্বাস সেই দেখাতে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নেওয়া অনিবার্য্য। শুধু রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণ এখানে উদ্দেশ্য নয়, কারণ একথা বোঝা সহজ যে বিরাট প্রতিভাও যুগধর্ম্মের বিরোধী হ'তে পারে।

আমার সাম্যভাবাপন্ন বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ দেখ্‌তে পাই। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রামাণিক আচার্য্যদের লেখায় সাহিত্য বা শিল্পের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতিই তাঁদের প্রধান আলোচ্যবস্তু ছিল। আজ তাই একদিকে শুনি রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিতের কবি ছিলেন, জনসাধারণ এমন কি প্রলেটেরিয়াটের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় যোগ ছিল। অন্যদিকে একথাও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াধর্ম্মী আভিজাত্যের প্রতীক, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বল্লেও বিশেষ অন্যায় হয় না।

উপরোক্ত উভয় মতের মধ্যেই কিছু সত্য রয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। সুতরাং সমস্যা এই যে আংশিক সত্যগুলিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ায়। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে এই পদ্ধতিই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের স্বরূপ। সাম্প্রতিক সাম্যভাবের প্রাণ-বস্তু যে-মার্ক্স্‌বাদ, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সে-সম্বন্ধে উদাসীন

ছিলেন। এমন কি রাশিয়া-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বিস্ময় অবধি তাঁকে সেদিকে টানতে পারে নি। কিন্তু এই সর্ব্বস্বীকৃত সত্যটি আমাদের প্রশ্নের উত্তর নয়। সামাজিক চেতনার যে-স্তর থেকে মার্ক্স্‌পন্থার উদ্ভব, তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হ'লেও কোনো চিন্তা বা কর্ম্মধারা যে পরিবর্ত্তন অথবা প্রগতির সহায় হ'তে পারে, এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে বিরল নয়। মার্ক্স্‌-নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটা একটা খুব বড় কথা। অতীতে প্রগতির রূপ নির্দ্দেশের সময় এই সূত্রটি বিশেষ কার্য্যকরী হ'তে বাধ্য; আর মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেকখানিই সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তের চাইতে অতীত কাহিনীরই পর্য্যায়ে পড়ে। সমসাময়িক ইতিহাসেও অবশ্য তাঁর স্থান রয়েছে, কিন্তু এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থাৎ সমগ্র দেশের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা কোন স্তরে পৌঁছেছে তা' স্মরণ রাখতে হবে। লেনিনের ভাষায় ডায়ালেক্‌টিক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বহুমুখী বিচার। এর অভাবে অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একদেশদর্শী হ'য়ে পড়বে। আলোচ্য প্রশ্নের এক কথায় কাটাছাঁটা উত্তর তাই অসম্ভব ব'লেই মনে হচ্ছে।

আমি নিজে মনে করি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে প্রগতি-বিরোধী ধারণার অসদ্ভাব নেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে তাঁকে অগ্রগতির সহায়ক-রূপেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কিছুদিন আগে যখন ভারতীয় সাম্যবাদী দল তাঁর উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল তখন তার পিছনে সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভ্রান্ত যুক্তি ছিল ব'লে মনে হয় না। যে-বিশ্লেষণের উপর আমার এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তার কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়াই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই মনে পড়ে যে প্রগতিবাদী মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে progressive মনোভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকে বিশেষ কয়েকটি রচনার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বহুকাল আগেকার 'এবার ফিরাও মোরে' ও অতি-আধুনিক 'আরোগ্যে'র দশ নম্বর কবিতার উল্লেখ চলে। প্রথম কবিতাটির গোড়ায় মূঢ় ম্লান জনগণের মুখে ভাষা দেবার সংকল্প আছে, কিন্তু তার পরিণতিতে যে-বিশ্বাসের ছবি দেখতে পাই তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে

অজানা বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতাকে বলিদান দেওয়া। তেমনি 'আরোগ্যে'র কবিতাটির সারমর্ম্মও এক অতি পুরাতন সত্য—শত শত সাম্রাজ্য ওঠে, আবার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, কিন্তু যারা কাজ করে সেই জনসাধারণ চিরকালের। মনে রাখতে হবে যে এই জাতীয় সমস্ত লেখা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ত্ব খর্ব্ব হয় না, এমন কি এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনার মধ্যে গণ্য নাও হ'তে পারে। সকল মহাকবির মতন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা কল্পনা মূর্ত্তি পেয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ কোনও একটি moodএর দিকে অতি-মনোযোগ সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদের কথাও আসে। এখানেও আমরা শিল্পীর ঈপ্সিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই মাত্র, প্রগতি বা যুগান্তরের কোনও কথা এখানে ওঠে না। * নিছক সামাজিক অত্যাচার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্য-রচনায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এই প্রবন্ধে প্রগতির সাম্প্রতিক নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাটুকুই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনও লেখার নিবিড় যোগ দাবী করা চলে না।

মুখ্যতঃ কবি হ'য়েও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনও নিজেকে সাহিত্যরচনায় আবদ্ধ রাখেন নি। স্বদেশী যুগে, এবং তার আগে বা পরেও, দেশের নানা আন্দোলন থেকে তিনি আপনাকে আর্টের খাতিরে বিচ্ছিন্ন রাখবার সাধনায় মগ্ন হ'তে পারেন নি। তাঁর মতন মহাকবির পক্ষে কর্ম্মী হিসাবে নিজের মনের পূর্ণতা-সন্ধান নিশ্চয়ই বিস্ময়জনক। স্বদেশী-আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। তাঁর তখনকার লেখা রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির দৃপ্ত তেজ ও সরল ভঙ্গী বরাবরই

---

* শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্ত্তী 'পরিচয়ে' লিখেছেন যে তিনি রবীন্দ্ররচনায় শ্রমিকের স্বীকৃতি দেখতে পান নি। 'স্বীকৃতি' কথাটি এখানে নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সমাজগঠনে শ্রমিকের দাবী স্বীকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 'কেরাণী রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায় কিন্তু শ্রীযুক্ত অমল হোম বসুধা বাবুর লেখার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের চিত্রে পরিপূর্ণ। পরবর্ত্তী লাইনেই বসুধা বাবু লিখছেন—'দেখলুম শুধু উদার অনুকম্পা।' এই অনুভূতি ও স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্যটুকু অমল বাবু বুঝতে চাননি।

পাঠকের মন মুগ্ধ করবে। কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা বিশেষ ছাপ রেখে যায় নি, কাজেই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সার্থকতা লাভের দাবী এ-ক্ষেত্রে বোধহয় অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মতামতের অনেকখানি প্রগতিবাদীদের তৃপ্তি দিতে পারে না, একথা স্বীকার করাও নিশ্চয় দোষের নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করব, যদিও এসব ধারণা শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনে অচল ছিল কি না সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে।

স্বদেশী আমলে রবীন্দ্রনাথ 'সরকার' বা ষ্টেট্ থেকে সমাজ অর্থাৎ সোসাইটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাববার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমটি ঊর্দ্ধে স্থিত শাসকসম্প্রদায়ের শক্তি, ভারতের ইতিহাসে বার বার তার পারবর্ত্তন হয়েছে; দ্বিতীয়টি সঙ্ঘবদ্ধ আত্মশাসিত জনসমষ্টি, যুগ যুগান্তে তার প্রকৃতি অবিকল থেকেছে। ইংরাজ শাসনে নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় যে এই ভেদরেখা লুপ্ত হ'তে বাধ্য, মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ম্যানরের মতন ভারতীয় Village Communityর দিনও যে ফুরিয়ে গেছে—এই চিন্তা তখন তাঁর মনে স্থান পায় নি। ,রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশী সমাজকে পুনর্জীবিত করবার প্রস্তাব করলেন, এখন বোঝা সহজ তাঁর এ-ধারণা কতখানি ইউটোপীয় অর্থাৎ অবাস্তব। ইংরাজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ হ'ল তার যান্ত্রিক স্বভাব, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক লুপ্তপ্রায়। কিন্তু বিদেশী শাসনের আর্থিক চাপের তুলনায় তার নৈর্ব্যক্তিক রূপটা নিশ্চয়ই অবান্তর। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারার এক স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য আছে, বৈচিত্র্য নষ্ট না ক'রে বহুর মধ্যে ঐক্যস্থাপন হ'ল তার বৈশিষ্ট্য। তাঁর এ-কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে অন্য সভ্যতার মধ্যেও কি এর অনুরূপ ঐক্যসন্ধান নেই? তাছাড়া বিবিধকে ধ্বংস না ক'রে এক করবার ভারতীয় প্রণালী কি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল? আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তনের অভাবই হয়ত প্রাচীন বা মধ্যযুগের সামাজিক স্থিতির মূল কারণ। দেশীয় রাজা ও জমিদারদের সম্বন্ধে যে-মতামত তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাকে পেট্রিয়ার্কাল্ আখ্যা দেওয়া চলে। সেকালের আদর্শে তপোবনাশ্রিত যে-শিক্ষাপদ্ধতি তিনি একদা সমর্থন করেছিলেন,

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। তেমনি পল্লীসংস্কার ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মণ্ডলীবদ্ধ কয়েকটি কর্ম্মীর উদ্যমে এবং আদর্শ গ্রাম-সংগঠনের দৃষ্টান্তে দেশব্যাপী এমন প্রেরণা আনা সম্ভব যাতে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আসতে পারে। তের বছরে রাশিয়ার পল্লীসমাজে রাষ্ট্রশক্তি যে-যুগান্তর এনেছে তার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে তাঁর পূর্ব্বমত পরিহার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক চিন্তা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকে নি; সারা জগতের সমস্যা তাঁকে পীড়া দেওয়ায় এক বিশিষ্ট বিশ্বদর্শন তাঁর নানা লেখায় মূর্ত্তিগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমের ভাষায় উদার হিউম্যানিষ্ট্ হিসাবে তাঁর পরিচয় সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু আজকের দিনের প্রগতিবাদে হিউম্যানিজ্ম্ মূল্যবান হ'লেও যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য ন্যাশন্যালিজ্মকে দেশাত্মবোধ থেকে পৃথক গণ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন, সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হওয়া তাঁর বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। কিন্তু ন্যাশনালিজ্মকে বিকৃতি বা ব্যাধি আখ্যা দিলেই সমস্যা সমাধান হয় না, কেন না যুগ বা অবস্থাবিশেষে এই জাতীয়তাবোধ লোকের কাছে স্বাভাবিক ব'লেই গণ্য হয়, আমাদের দেশেও গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ন্যাশনালিজ্মের পরিণতি ইম্পিরিয়ালিজ্মে। সেই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তার মূল খুঁজেছেন লোভের মধ্যে। কিন্তু মানুষের এক সনাতনী প্রবৃত্তি হঠাৎ এ-যুগে এত প্রবল হ'য়ে উঠ্ল কেন এ-প্রশ্নকে তিনি আমল দেন নি। সাম্রাজ্য-বাদের ভিত্তিস্থলে তিনি আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অভিব্যক্তিকে গ্রাহ্য না ক'রে রিপুর তাড়নার উপর জোর দিয়েছিলেন—প্রতিকারের আলোচনায় তাই তাঁকে চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মনুষ্যধর্ম্মে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কোনও কর্ম্মপ্রণালী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাযন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঠিকই লিখেছিলেন যে কল্পান্তের বিক্ষোভ পর্য্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির যথেষ্ট প্রেরণা যোগায় নি। জীবনের উপান্তে এসেও তাই 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর স্বভাবজাত মানবধর্ম্মে বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশ্বাস প্রগতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেক পৃথক। পূর্ব্বদিগন্তে পরিত্রাণকর্ত্তা মহামানবের

সম্ভাবনাকে অবশ্য কবির আন্তরিক আবেগ হিসাবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে রুষদেশে নূতন সমাজের জন্মকে যখন তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ ক'রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখনও কেন এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'ল, এর মূল প্রেরণা কোথায়, সে-সমস্যাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বিশ্বাসকেও প্রগতির অনুকূল বলা চলে না। এখানে শুধু মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌-বিরোধী আদর্শবাদই বড় কথা নয়, পার্সোনালিটিই রবীন্দ্রদর্শনের মূলবস্তু। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সাধনা শুধু কবির জীবনাদর্শ ছিল না, religion of man-রূপে এই সাধনাকে তিনি ধর্ম্মের উৎস ভাবে দেখেছিলেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সভ্যতার মর্ম্মকথা, আধুনিক যান্ত্রিকতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, অথচ সেই যন্ত্রবিলাসিতার আড়ালে রয়েছে পুঞ্জীভূত অবসাদ আর গ্লানি—'রক্তকরবী' রূপকের বিষয়টি সম্ভবত এই। কবি পার্সোনালিটির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বন্দনা করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের সাধনা এখন অল্পলোকের পক্ষেই সম্ভব, কাজেই তাতে সমাজের সমস্যা মিটতে পারে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সমষ্টির পক্ষে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ আনতে হ'লে প্রথমে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হবে; সেক্ষেত্রে কাজেই আবার সেই মূল ভাবনা সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি মতামতের সঙ্গে প্রগতিবাদীদের পার্থক্য উপরে একটু ব্যাপকভাবেই আলোচিত হ'ল। কিন্তু তবুও আমাদের অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস যে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য ব'লেই গণ্য হবে। বিশিষ্ট কতকগুলি মতের চাইতে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় ছিলেন; মহাকবি এবং মহৎ শিল্পী তাঁর প্রকৃত পরিচয় ব'লেই তাঁর স্বকীয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বাংলার জীবনে তাই মনে হয় তিনি মুক্তির সহায়ক রূপেই স্মরণীয় থাকবেন। তাঁর কয়েকটি বিশ্বাসের সম্বন্ধে মনে যে-সংশয় ও তর্কের উৎপত্তি হয়, শেষ পর্য্যন্ত তার প্রয়োগ চলে সেই ভক্তদের বিরুদ্ধেই যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই মতামত আঁকড়ে ধ'রে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মতসমষ্টির কতগুলি অপরের মধ্যে কতখানি সঞ্চারিত হয়েছে, সে-বিষয়ে প্রবল সন্দেহ অযৌক্তিক নয়। পক্ষান্তরে অন্য

অনেকদিকে তাঁর প্রভাব অবিসম্বাদিত সত্য। সেই প্রভাবই ভবিষ্যতে অধিকতর কার্য্যকরী হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে তার শুধু আংশিক পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথমেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্প সাধনার কথা মনে আসে। ভাষা আঙ্গিক ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি সম্বন্ধে আজ মতভেদ অসম্ভব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান উৎস তিনি—পৃথিবীতে অনুরূপ অন্য কোনও সাহিত্যে একজনের সৃষ্টি এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তাঁর সৃজন-প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। প্রাক্-রাবীন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য তাই আজ আর বাঙ্গালীকে তৃপ্তি দেয় না, ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। আগামী কালে বাঙ্গালীর আশা ভরসা প্রকাশ পাবে যে-ভাষাতে, সে-ভাষাই ত' তাঁর হাতের গড়া। আঙ্গিকের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাফল্য অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর লেখায় বাংলা ছন্দের রাজ্যে বিপ্লব-সাধনের উল্লেখ অপরিহার্য্য। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন যে তিনি যোগ্য কথার সঙ্গে যোগ্য সুরের মিলন ঘটিয়ে একটি বিশেষ আনন্দরসের সৃষ্টি করেছেন ; নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দানও অবিস্মরণীয়; বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রকলাও ভারতশিল্পের একদিককার দৈন্য ঘোচাতে সহায় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বর্জ্জন করলে আজকের দিনের বাংলা সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না, তার প্রাণ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে।

অবশ্য এ সব ত' সর্ব্বস্বীকৃত, কিন্তু বাংলা কাল্‌চারের সঙ্গে প্রগতির সংস্রব কতটুকু? অনেকের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের সংস্কৃতি পুরাতনকে একেবারে বাদ দিয়ে গ'ড়ে উঠবে। এ-বিশ্বাস ডায়ালেক্‌টিকাল অগ্রগতির রূপের সঙ্গে খাপ খায় না। ডায়ালেক্‌টিক্সে ক্রমবিকাশ সরল রেখা ধ'রে অগ্রসরণ হিসাবে কল্পিত হয় না বটে, কিন্তু ক্রমোন্নতির পথে পূর্ব্বগামী লাইনের সম্পূর্ণ লুপ্তিও এখানে স্বীকৃত হয় নি। পুরাতন সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটবে, তাকে নতুন ভাবে দেখবার চোখ খুলে যাবে, অনেক প্রাচীন আবর্জ্জনা লোপ পেতে পারে,—আর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু শ্রেণীবিহীন সমাজের সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া কাল্‌চারের সমস্ত কীর্ত্তির উচ্ছেদ হবে, এ-বিশ্বাসের ডায়ালেক্‌টিকাল্ সমর্থন কোথায়? সোভিয়েট্ রাশিয়ার

অভিজ্ঞতাও উক্ত বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত। সেখানে একদিকে প্রাক্‌বুর্জোয়া লোকসংস্কৃতির, অন্যদিকে শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে রুষ সাহিত্যস্রষ্টাদের সকলেরই, অর্থাৎ বুর্জোয়া কাল্‌চারের প্রধান প্রতিনিধিদের, যোগ্য সমাদরের অভাব হয় নি। *

বুর্জোয়া-সংস্কৃতির আলোচনায় দুটি বড় কথা আছে। প্রথমত, যুগান্তরের মুখে এর মধ্যে একটা স্বভাবজাত ভয় ফুটে বের হয় ভবিষ্যতের সম্বন্ধে। ফলে স্থবিরত্ব এর উৎস রুদ্ধ ক'রে ফেলে, সমস্ত সংস্কৃতি হ'য়ে পড়ে পঙ্গু ও বিপন্ন। বুর্জোয়া প্রতিবেশ রবীন্দ্রপ্রতিভাকে খর্ব্ব করেছিল কিনা এ-আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন নানা সংস্কার তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি নির্ভীক ছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র তৃতীয় সংখ্যায় সেই বিখ্যাত 'ভয় কিসের' তাঁর অন্তরের কথা, এবং সে-বাণী তাঁর দেশবাসীর কানে বাজা উচিত। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া-সংস্কৃতি স্বভাবতই ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ম্যাক্সিম্‌ গোর্কির শ্রাদ্ধবাসরে আঁদ্রে জীদ্‌ বলেছিলেন যে আজকের দিনের সংস্কৃতি ছোট উদ্যানের মতন, সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। শ্রেণীবিহীন সমাজ গ'ড়ে উঠলে সে-প্রাচীর অবশ্য ভেঙ্গে যাবে। আমাদের দেশে তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্য্যাদা নিশ্চয় বাড়বে বই কমবে না, কারণ ভাষা, আঙ্গিক ও সৌন্দর্য্যবোধের রাজ্যে তাঁর কীর্ত্তি অনবদ্য! ভবিষ্যতের বাংলা কাল্‌চার তাঁকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে উঠতে পারে।

ভবিষ্যৎ সমাজে পুরাতন সংস্কৃতি পুরাণো ব'লেই পরিত্যক্ত হবে না, তাকে

---

* 'আশার কথা' নিবন্ধিকায় শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে টল্‌ষ্টয়ের ধর্ম্মপ্রবণ রচনাগুলির প্রচার সোভিয়েট্‌ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হ'ল কি ক'রে। প্রাচীন লেখকদের নিয়তি, সমাজধর্ম্ম ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস আগেকার পাঠকদের মন নিশ্চয়ই অভিভূত করত; স্বতন্ত্র পরিবেশে বাস করি ব'লে আমাদের আর সে-সব ধারণা সে-ভাবে স্পর্শ করে না, অথচ প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যরসে আমরা বঞ্চিত নই। রুষদেশে বিশাল পরিবর্ত্তনের পর টল্‌ষ্টয়ের বিশিষ্ট কয়েকটি মতামতে বিশ্বাসী না হ'য়েও পাঠকদের পক্ষে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগ কেন অসম্ভব হবে বোঝা শক্ত। তবে লীলাময় বাবুর বোধহয় পারিপার্শ্বিকে পরিবর্ত্তনের ফলে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

নতুন ক'রে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় সমৃদ্ধি বাড়বারই সম্ভাবনা। অথচ বলা চলে না যে সকল রচনাই কালোত্তীর্ণ হয়। তা' হ'লে এস্‌থেটিক্স্‌ বা নন্দন-তত্ত্বই কি শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করবে কোনটা টিকবে আর কতখানি লোপ পাবে? কতকটা তাই বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এস্‌থেটিক্স্‌ ও সাহিত্যের মূল্যবিচার কোনও স্থির যান্ত্রিক অচলা বিদ্যা নয়। তারও বিবর্ত্তন আছে, এবং যুগে যুগে নূতন standard-এর উদ্ভাবন হয়; অর্থাৎ দেখবার ভঙ্গীটাই নির্ভর করে অনেকখানি সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর। সুতরাং বুর্জোয়া সংস্কৃতির ঠিক কতখানি ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হবে, একথা কেউ জোর ক'রে বল্‌তে পারে না। কিন্তু ভাষা, আঙ্গিক ও সৌন্দর্য্যবোধে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এত বেশী যে যতদূর পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায় তাতে মনে হয় না যে তাঁকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলার পরিশীলন-সম্পদ গ'ড়ে উঠতে পারবে।

Others abide our question. Thou out free.

অগ্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলাতে আবদ্ধ নয়। কথাটা আশ্চর্য্য শোনালেও মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের মধ্যেও সে-গতির সমর্থন পাওয়া যাবে। আধুনিক ইতিহাসে ধর্ম্মব্যবস্থা বল্‌তে যা' বোঝায় সেই সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্মাচার (organised religion) নিশ্চয়ই প্রগতির বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনায় ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকখানি কবিত্বময় আবেগে রূপান্তরিত হওয়ায় সে-বিরোধ বড় হ'য়ে ওঠে নি। সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে তাই মনে হয় যে ধর্ম্মের প্রচলিত ঐতিহাসিক রূপের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকখানি অগ্রগমনের পরিচায়ক, যদিও দার্শনিক আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, আত্মার অস্তিত্ব ও ভগবানের ব্যক্তিত্বে একটা মজ্জাগত বিশ্বাস নিয়ে তাঁর যাত্রা সুরু হয়েছিল। প্রগতিবাদীর চোখে, এ-সত্ত্বেও তাঁর অগ্রসরণ মহত্ত্বের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্ম্মের যে-সংগঠিত মূর্ত্তি সামাজিক রক্ষণশীলতার অঙ্গ, তাতে তিনি বরাবর পীড়া অনুভব করেছিলেন। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, সম্প্রদায় তাঁকে টানতে পারে নি, সুনির্দ্দিষ্ট মতবাদ অর্থাৎ ক্রীড্‌কে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না, এমন কি আচারবিধির প্রতিও তাঁর বিশেষ আস্থা দেখা যায় নি; অথচ ধর্ম্ম মাত্রেই এর কোনও না কোনটিকে আশ্রয় করে। ইতিহাসে পুরাতন ধর্ম্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য

বার বার বিদ্রোহ দেখা গেছে, কিন্তু স্বভাবতই সে-বিদ্রোহ নূতন কোনও ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সে-পর্য্যায়ে পড়ে না—তার প্রকৃতি প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ধর্ম্মের পুনর্গঠনের অভিযান নয়। রামমোহন রায় হয়ত পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করতে চান নি, তবুও ব্রাহ্মসমাজ তাঁর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আচারবিধির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোনও নূতন ধর্ম্মের উৎসরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে মিষ্টিসিজ্‌ম্‌এর একটা ধারা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু মিষ্টিকের চাইতে হিউম্যানিষ্ট্‌ই কি তাঁর সত্যতর পরিচয় নয়? ইতিহাসে দেখি হিউম্যানিজ্‌ম্‌ পুরাণো ধর্ম্মের অবসান সূচনা ক'রেও সাধারণত ধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রেরণা জোগায় না। সংগঠিত ধর্ম্মের ক্ষয়প্রাপ্তি, তার withering away অগ্রগতির কাম্য ব'লে, পরিবর্ত্তনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এদিক দিয়েও একটা নিগূঢ় যোগ আছে মনে হয়। অনেকে বল্‌বেন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ব্যক্তিগত, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়; আসলে শিল্পীর আন্তরিক আবেগ ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধিই তার প্রাণ ছিল। সমাজসংশ্লিষ্ট ধর্ম্মবোধ আর চরম সত্যে আশ্রয়ের চাইতে রূপকার ও কবি-মানসের অনুভূতিই এখানে অনেক বড় হ'য়ে উঠেছে। উপনিষদ তাঁকে বরাবর তৃপ্তি দিয়েছে, কিন্তু উপনিষদের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ত' সর্ব্বজনবিদিত; তার দার্শনিক বিশ্বাস ও মূল তত্ত্বকথার চাইতে এদিকটাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করত। সকলে কখনই এখানে একমত হবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি ভেবে দেখার কথা। ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সব রচনায় তিনি বারবার যে-মূল সুর ধ্বনিত করেছেন, আমি মনে করি যে organised religion, এমন কি সাধারণ personal religion থেকে তা' স্বতন্ত্র। সেইজন্য সম্প্রতি কেউ কেউ যে তাঁর মধ্যে secular ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ বোধগম্য। এই বন্ধনমুক্তি ও ধর্ম্মভাবের রূপান্তরকে অগ্রগতির সহায়ক রূপে মানা উচিত।

সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এমন অনেক কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন যার স্মৃতি সহজে ম্লান হবে না। সে-সব দিকেও তাঁর শক্তি জাতীয় জীবনে বিশাল পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রিক

আন্দোলনে প্রথম থেকে ভিক্ষাবৃত্তির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন; যে-আত্মশক্তির উদ্বোধন তাঁর অবিচল লক্ষ্য ছিল, পলিটিক্সে তার মূল্য অসীম। সেকালের পোলিটিকাল্ প্রচেষ্টার প্রধান দুর্ব্বলতা তিনি ধরতে পেরেছিলেন—জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যথার্থ সংযোগের অভাব তাঁকে ক্রমাগত পীড়া দিত। বয়কটের উন্মাদনার মধ্যেও তাই তিনি 'সদুপায়' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে স্বদেশী কর্ম্মীরা সাধারণ লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না ক'রেও আত্মীয়তার দাবী আন্‌ছে। চাষীদের অর্থকষ্ট যে দেশের এক গুরুতর সমস্যা, এ-কথা তিনি কখনও ভোলেন নি; গ্রামসংস্কারের উদ্যম তাই তাঁকে টেনেছিল প্রথম থেকেই। বাংলা দেশে মেলার মধ্য দিয়ে সহজে কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, 'স্বদেশী সমাজ'-এ কর্ম্মীদের প্রতি তাঁর সেই উপদেশে বুঝতে পারি যে প্র্যাক্‌টিকাল্ ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু যে শিক্ষার প্রকৃত বাহন হ'তে পারে না, পঞ্চাশ বছর আগে তিনি একথা সজোরে প্রচার ক'রে গেছেন। একদিকে হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ববাদকে তিনি বিদ্রুপের কষাঘাতে জর্জ্জরিত করেছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমের গুণমুগ্ধ হ'য়েও তিনি তার রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব চিত্তবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেছিলেন; সেই ঝোঁকই অবশ্য পরবর্ত্তী ফাশিজ্‌মের অন্যতম উপাদান।

রবীন্দ্রনাথে প্রগতির সমর্থক অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রেই প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁর রচনায় বারবার গতির বন্দনারূপে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে পরিবর্ত্তনের প্রবহমান স্রোতে তাঁর অন্তর সর্ব্বদাই একটা সাড়া দিত। ভবিষ্যৎ সমাজের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁর মন ছিল গতিশীল, আর পথের সীমানির্দ্দেশ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। মনের অসাধারণ সৌকুমার্য্য আর শিক্ষায় প্রাচীন সংস্কারের বোঝা নিয়েও, রাশিয়ার প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার আবর্ত্তের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে মুগ্ধ হবার মতন মনের বলিষ্ঠতা ও ঔদার্য্য তিনি দেখিয়েছিলেন। ভয়শূন্য চিত্তের আদর্শ সহজে ভুলবার নয়; বলা যেতে পারে যে শুধু লেখায় নয়, কাজেও তিনি সে-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'ন নি। গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। সেদিকে ভারতের

রাষ্ট্রনেতা মহাত্মাজীর চাইতে তাঁকে অনেক বেশী অগ্রসর মনে হয়। বার্দ্ধক্যের ছায়ায় এসে পশ্চাদ্‌গমন সাধারণ নিয়মের সামিল—রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখি তার আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। অগ্রগতির টান শেষের দিকে প্রবলতর হ'য়ে উঠ ছিলই ব'লে মনে হয়। যে-সভ্যতাকে তিনি মন থেকে বিশ্বাস করেছিলেন, জীবনের প্রান্তে এসে 'সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল' এই স্বীকারোক্তি অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ পর্য্যায়ের সাহিত্যিক মূল্য হয়ত বেশী না, কিন্তু তার মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও জনসংযোগের আকাঙ্খা দেখা যায়, অন্তত তাই নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্বের ও সংশয়ের উদয় হয়েছিল। জগৎ-জোড়া দুঃখীর মিলন সম্বন্ধে কোরীয় যুবকের আস্থার যে-কথা তিনি একদিন শুনেছিলেন, তার ঝঙ্কারও তিনি ভুলতে পারলেন না।

মিউনিসিপাল্ গেজেটে ভ্যান্‌গার্ডের লেখা প্রবন্ধে পড়লাম এক বামপন্থী স্পানিশ্ যোদ্ধা প্রশ্ন করছেন, টেগোর কি সেইজাতীয় লোক যাঁরা সাক্ষাৎ-ভাবে নূতন সমাজ গ'ড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে না পারলেও আগামী কালকে বুঝবার ও অভিনন্দন করবার মতন মনের জোর ও স্বাধীনতা রাখেন? নাৎসি-অভ্যুত্থানের পর রলাঁ যেমন লিখেছিলেন—'Working men, here are our hands. We are yours. Humanity is in danger'—জানি না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কোনও কথা বলা সম্ভব ছিল কিনা। কিন্তু অশেষ সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও চিরজীবন যিনি নূতন নূতন পথে এগিয়ে চল্‌বার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথেও সহায়ক হিসাবে ভাববার যথেষ্ট হেতু আছে।

শ্রীঅমিত সেন

তমসো মা জ্যোতির্গময়

সেদিন শেষরাত্রে রবীন্দ্রনাথের অন্তিমশয্যার পাশে বসে প্রথম এই মন্ত্রের মানে বুঝতে পারলাম। এর আগে এই প্রার্থনামন্ত্র এত সত্য করে আর উচ্চারণ করিনি। সেদিন থেকে ঘুরে ফিরে মন কেবলই বল্‌ছে কী করে এই অন্ধকার পার হব। এত কেবল প্রিয়জনের মৃত্যু নয়, এ যে সমস্ত জীবনের আলো নিভে যাওয়া।

জীবনে অজস্র স্নেহ তাঁর কাছে পেয়েছি, অত্যন্ত কাছের থেকে তাঁকে দেখেছি, আঠারো বৎসর ধরে তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো দিন কোন মানুষকে ছোটো করতে দেখিনি। হয়তো কখনো কারো সম্বন্ধে অনিবার্য কারণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেজন্যে বেদনা অনুভব করেছেন। কতদিন আমাকে বলেছেন, "জানো, কারো উপর রাগ করতে কেন আমি লজ্জা পাই? তখনি মনে হয় নিজেকে যে ছোট করলাম। মনকে প্রতিদিন বলি শান্ত হও, সমস্ত অন্যায় সমস্ত বিক্ষোভের মধ্যে তোমাকে শান্ত থাকতে হবে, নইলে তোমার হার হল। এই পরাজয় যাতে না ঘটে সেইজন্যেই প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠে আমার শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্র স্মরণ করি। এরই ভিতরে আমার মন আশ্রয় পায়।" কোনোদিন ঘটা করে উপাসনা করতে তাঁকে দেখিনি। কিন্তু সমস্তদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিনিয়তই মনকে কোলাহল থেকে ফিরিয়ে আনবার সাধনা দেখেছি। আগে বরাবর প্রত্যেক বুধবারে সকালে শান্তিনিকেতন মন্দিরে উনি আচার্যের কাজ করিতেন। মাঝে শারীরিক দুর্বলতাবশত মন্দিরের সাপ্তাহিক কাজের ভার উনি ছেড়ে দিয়ে শুধু বিশেষ বিশেষ দিনেরটা রেখেছিলেন। তারপরে আবার কি মনে হ'ল, বল্‌লেন, "না, এটাকে উপেক্ষা করা উচিত না; আমিই আবার প্রতি সপ্তাহের ভার নেব।"

গতবছর ৭ই অগস্ট যেদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডিগ্রি দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে আয়োজন করেন, সেদিন সকালে মন্দিরে আচার্যের

কাজ কবি নিজেই করেছিলেন। তখন ওঁর স্বাস্থ্য ভালো না, রোজ অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে। ওঁর ক্লান্তি হবে আশঙ্কা করে আগের দিন বিকেলে অনেকেই বোঝাতে এলেন যে এ-কাজটা বরং আর কেউ করুন, কারণ দুপুরে আবার সমাবর্তন উৎসব আছে। বারবার যাতায়াতে শরীর ক্লিষ্ট হ'তে পারে। কারো কোন কথাই কবি কানে নিলেন না; শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন, "মন্দিরের কাজটাও আমিই করব। এ-কাজটা আমার সমস্ত বিদ্যালয়ের অন্তরের জিনিষ। এখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। বিদেশী অতিথি যাঁরা এসেছেন তাঁরা এ জিনিষটা দেখে না গেলে এখানকার সত্য-রূপটিই দেখতে পাবেন না। আমাকে তোমরা সব সময়ে 'কষ্ট হবে' 'ক্লান্তি হবে' বলে ছোটো করে দেখোনা। কাল আমি আর সব কাজই করতে পারব, শুধু এই কাজটাতেই আমার ক্লান্তি হবে?" এর পরে আর কথা চলে না। পরদিন প্রাতঃকালে সময় হবার বহুপূর্বেই দেখি উনি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। সেই ভোর থেকে রাত পর্যন্ত যা যা কর্তব্য ছিলো খুব ভালো করেই সমাধা করলেন। রাত্রে আমাকে বল্লেন, "দেখলে? আমার তো কিছু হল না? আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো না কেন?" মনের জোরে উনি শরীরের বাধা কতবার অতিক্রম করেছেন—দেখে বিস্মিত হয়েছি। সেই গত বছরের ৭ই অগষ্টই বোধ হয় ওঁর শেষ কাজ মন্দিরে। এ বছর ১১ই মাঘের দিন শান্তিনিকেতন মন্দিরে এই প্রথম ওঁর আসন শূন্য দেখলাম; মনে হল মন্দিরের চমৎকার আলপনা, অসংখ্য প্রদীপের আলো, সবই যেন ম্লান হয়ে গেছে মাঝখানে একটি শুভ্রসুন্দর জ্যোতির্ময় মূর্তির অভাবে। মনে পড়ল এর পর থেকে বরাবর এইটেইতো মেনে নিতে হবে। আজ উনি আশ্রমে থেকেও সকলের মাঝখানে এসে বসতে পারলেন না, এটাতে যে ওঁকে কতোখানি বেজেছে তা যারা ওঁকে ভালো করে জানে তারাই শুধু বুঝবে। শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উপাসনা সন্ধেবেলা হয় কবি তা' ভুলে গিয়েছিলেন। ভোরে গিয়ে আমি যখন প্রণাম করেছি, বল্লেন, "মন্দিরে যাবে না? আমি তো আর যেতে পারলাম না, তাই ১১ই মাঘের কাজ এখানে বসেই করছি।" এই প্রথম শরীরের কাছে ওঁকে হার মানতে হল। সেদিন প্রায় সমস্তটা দিনই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সন্ধেবেলা

উপাসনায় যাবার আগে ওঁকে প্রণাম করে গেলাম। বল্‌লেন, "ফিরে এসে সব বোলো আমাকে।" ফিরে যখন এলাম দেখি একটা খাতা ও কলম সামনে নিয়ে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই বল্‌লেন "মন্দির থেকে এলে? আমি তো আর যেতে পারলাম না তাই এখানে বসেই আমার আজকের দিনের কাজ আমি করলাম।" ব'লে পড়ে শোনালেন :

> সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
> দেখি ক্ষণে ক্ষণে
> তমসার পরপার,
> যেথা মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।

সেই দিনই রামমোহন রায়কে স্মরণ করে আরও একটা কবিতা লিখেছিলেন যার মধ্যে আছে

> মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
> সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
> তাহাদের মাঝে যেন হয়
> তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।

এই দুইটি কবিতাই 'জন্মদিনে' ছাপা হয়েছে।

মন্দিরে সেদিন শ্রদ্ধেয় গুরুদয়াল মল্লিক উপাসনা করেছিলেন। প্রথমে পড়া হ'ল রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কবির লেখা, যেটি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। পড়লেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। তারপর মল্লিকজির উপাসনা। মল্লিকজি ভক্ত লোক, তার উপর কবির শূন্য আসনের দিকে চেয়ে সকলেরই মন ব্যথিত হয়েছিল—সেদিনকার উপাসনা বোধহয় সকলেরই মনকে স্পর্শ করেছিল। ফিরে এসে সব খুঁটিয়ে কবির কাছে বর্ণনা করলাম—সাজানো, উপাসনা, গান সবই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। শুনে খুশিতে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

এবারকার পয়লা বৈশাখেও শরীর অপটু, কিন্তু সকালবেলা ওঁর স্তব্ধমূর্তি দেখে বুঝতে পারলাম উৎসব বাদ যায়নি। সেদিন সন্ধেবেলা আশ্রমের

অধিবাসী ও অভ্যাগত অতিথি সকলে কবিকে নিয়ে উদয়নের প্রাঙ্গনে সভা করলেন। নাচে গানে কবির বক্তৃতায় আনন্দোজ্জ্বল সেই সন্ধ্যা। কবি শেষ পর্যন্ত রইলেন। জ্বর নিয়েও অতক্ষণ বসে থাকা দেখে আমরা অবাক। সভার শেষে ঘরে ফিরে গিয়েও কতক্ষণ সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা গল্প চল্‌ল। বল্‌লেন, "দেখলে তো? আমি কতটা পারি? ঐ 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটাও আমি অনায়াসেই পড়তে পারতাম, ক্ষিতিবাবুর চেয়ে খারাপও পড়তাম না, কিন্তু কেউ আমাকে তা দিল না। আচ্ছা, লেখাটা তো আমারই, কাজেই পড়ার অধিকারও তো আমারই থাকা উচিত ছিল; পড়তে দিলে না, কাজেই ইচ্ছে করেই মুখে অতক্ষণ বললাম, কই কিছু তো হ'ল না। এ কি তোমাদের শরীর পেয়েছ?" বল্‌লাম, "মনের জোরে আপনি কী না করতে পারেন?"

নববর্ষ, ৭ই পৌষ, ১১ই মাঘ, বর্ষশেষ—এই রকম এক একটি উৎসবের দিনগুলির কত মূল্য ছিল ওঁর কাছে সে ওঁকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। কিন্তু বাইরের সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে ওঁর খুব সঙ্কোচ ছিল। ধর্মসাধনা সম্বন্ধে হঠাৎ প্রশ্ন করলে অনেক সময় চুপ করে থাকতেন, কোনো জবাব দিতেন না। অথচ যাদের কাছে ওঁর এই দিকটার মূল্য ছিল তাদের সঙ্গে অবাধে মন খুলে কথা বলতে শুনেছি। তাই ওঁর সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ প্রমাণ এত সংগ্রহ করা যায় যে আসল মানুষটি তার আড়ালে চাপা পড়ে। সেই জন্যেই উনি বরাবর বলতেন, "আমার জীবনচরিত সত্যি করে কেউ কখনও লিখতে পারবে না।" ওঁর কীরকম যে সঙ্কোচ ছিলো তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার কাছে অনেক সময়ে চিঠিতে সেদিন মন্দিরে কি বলেছেন তার সূত্র ধরে আরো অনেক কথা বলে গিয়েছেন। পরে এই চিঠিগুলি "পত্রধারা" নামে বেরোবে বলে আমি কপি করে ওঁকে দিই। একবার শান্তিনিকেতন গিয়ে দেখি ছাপতে দেবার আগে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার সময় সে সব চিঠির ভালো ভালো জায়গা, যাতে ওঁর অন্তরের গভীরতম রূপটি ফুটে উঠেছে, তার উপর পরশুরামের মতো নীল পেন্সিলের কুঠার চালিয়েছেন। আমি অত্যন্ত অনুযোগ করে বল্‌লাম, "এ আপনার কিন্তু ভারি অন্যায়—আমার অমন সুন্দর চিঠিগুলো এমন নষ্ট করা। এত ভালো জিনিষগুলো লোকে পাবে না কেন?" কবি বললেন, "আজকালকার

লোকের এগুলো ভাল লাগে না; ভাববে বাড়াবাড়ি। কী হবে এ সব ছাপিয়ে? তোমার কিসের দুঃখ? তোমার কাছে তো সব চিঠিই রইল, যখন ইচ্ছে হবে প'ড়।"

কবির মন জীবনরসে পরিপূর্ণ নিমজ্জিত হয়েও কী রকম নিরাসক্ত ছিল তা দেখে অবাক হয়েছি। আচার অনুষ্ঠানকে উনি কখনই বড় করে দেখেননি কিন্তু জীবনের সব কিছুর ভিতরেই একটা বড় অর্থ দেখবার সাধনা ছিল। অনেক সময় মুখে মুখে এ সব কথা আমাদের কাছে বলেছেন। গত বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি আমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন......"যদি দ্বিধা থাকে তবে সেদিন আমার তপস্যার দিন আসবে, উপনিষদ হবে আমার সখা। তার সঙ্গে আমার নিরাসক্ত সম্বন্ধ প্রত্যহ নিবিড় হয়ে আসচে।" আর এই সেদিন কলকাতায় আসবার কয়েকদিন আগে শান্তিনিকেতনে সকালবেলা জানলার ধারে ওঁর আরামচৌকিটাতে বসে আছেন, প্রত্যহের মতো সকাল-বেলা গিয়ে প্রণাম করতেই ইসারা করে বসতে বল্‌লেন। মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম কিছু নিয়ে মন ভরে রয়েছে। চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমার কী দশা হোলো? বুদ্ধি কি একেবারে চলে গেল? 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি'র গোড়াকার কথাটা কি?" আমি যেই বলেছি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অমনি বলে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক। সকাল থেকে ঐটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না? আচ্ছা, আমার প্রতিদিনকার ধ্যানের মন্ত্র কী করে এ রকম ভুলে যাওয়া সম্ভব হ'ল?" এই রকমের কতদিনের কত ছোটখাটো ঘটনায় বুঝেছি উপনিষদ্ ওঁর জীবনকে ওতঃপ্রোত ভাবে ঘিরে রয়েছে।

য়ুরোপের সর্ব্বত্র উনি যে রাজার মতো সম্মান পেয়েছিলেন তার সত্যকার রূপটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আমাদের সৌভাগ্য ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করবার। কিন্তু সমস্ত সম্মানের চেয়েও ওঁকে বেশি স্পর্শ করেছিল ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলের ভালবাসা। একদিন বুডাপেষ্টে কিংবা ভিয়েনাতে আমার ঠিক মনে নেই আমাকে বলেছিলেন, "এরা আমার মধ্যে কী দেখেছে, কেন এত ভালোবেসেছে বুঝতে পারি না। কিন্তু যখন পুত্রশোকাতুরা মা, কি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে আমাকে এসে বলে যায়

যে আমি তাদের জীবনে শান্তি দিয়েছি তাই তারা আমাকে এত ভালবাসে, তখন বুঝি আমার গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়ে আমি আমার বড় 'আমি' কে প্রকাশ করেছি, যার সঙ্গে এই প্রতিদিনের 'আমি'টার অনেক তফাৎ। গীতাঞ্জলি শুধুই যদি কবিতা হ'ত তাহলে জনসাধারণের মনে এমন করে স্থান পেতাম না, কারণ ক'জনই বা কবিতা বোঝে? এই বড় জায়গায় মনকে পৌঁছে দিতে উপনিষদ্ আমাকে সাহায্য করেছে। যুদ্ধের পরে সমস্ত য়ুরোপ এই মনের আশ্রয়কে পেতে চাচ্ছে, তাই এরা আমাকে এত ভালবাসে।"

রবীন্দ্রনাথের সদর-অন্দর আলাদা ছিল না সকলেরই জন্যে তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। ঠিকমত ঘা দিতে পারলে—যতো তুচ্ছ লোকই হোক্ না কেন—তার জন্য অন্তরের দরজা খুলে দিতেন। মনে পড়ে ১৩৩২ সালে চৈত্র মাসে আলিপুরে আমাদের বাড়িতে একদিন একটি ছেলে সকালে কবির সঙ্গে দেখা করতে এল। কী একটা লেখা নিয়ে তখন খুব ব্যস্ত কিন্তু কাজ থামিয়ে রেখে তাকে ডেকে পাঠালেন। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আমি গিয়েছি স্নানের জন্য তাগিদ দিতে, দেখি মুখখানা অত্যন্ত বিষণ্ণ। আমাকে বললেন, "জান, সেই ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বিদায় করব ভেবেছিলুম কিন্তু সে এত হতভাগ্য যে কিছুতেই বল্‌তে পারলুম না আমার কাজ আছে। এক কবিতার খাতা নিয়ে এসেছিল, দেড়ঘণ্টা ধরে পড়ে শোনালে আর আমি বসে বসে ভাবলুম, বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর খেলা।" আমার চোখে প্রশ্নের চাহনি দেখে বললেন, "ছেলেটা পাগল। অথচ সত্যিই কবিত্বশক্তি আছে। পাঁচ ছয় লাইন হয়তো খুব ভালো লিখতে লিখতে হঠাৎ ধারাটা হারিয়ে যায় আর যা তা লিখে ফেলে। বুঝতে পারে হচ্ছে না, কিন্তু কেন হচ্ছে না তা বোঝে না অর্থাৎ জানে না যে ও পাগল। বেচারা এসেছিল আমার কাছে যদি আমি এ বিষয়ে ওকে সাহায্য করতে পারি।" সমস্ত দিন এই পাগলের জন্য অত্যন্ত বেদনাবোধ জেগে রইল, কারণ ভুলতে পারছিলেন না যে মাথা ঠিক থাকলে ও সত্যি একজন ভালো কবি হতে পারত। এই ছেলেটি ওঁর মনকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে খানিকক্ষণ পরে চমৎকার একটা গান রচিত হল। তার প্রথম লাইনটি হচ্ছে—

"তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি কখনো ভুলি কখনো শুনিনা যে।"

যাঁর সময়ের উপর সমস্ত জগতের দাবি তিনি একজন পাগলকে নিয়ে এত সময় দিতে পারেন এ চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না। এই রকম ছোটখাটো ঘটনা অসংখ্য দেখেছি আর ভেবেছি কত বড় বিরাট পুরুষ, কত অসীম করুণা-ভরা প্রাণ, তাতো এরকম কাছের থেকে না দেখলে শুধু বই পড়ে বুঝতে পারতাম না।

বেশীর ভাগ সময়ে কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোকের পর লোক, বিশ্রামের সময় ছিল না। বছর চারেক আগে ওঁর প্রথম অসুখের পর থেকে সকলেই দুপুরে একটু বিশ্রাম করতে বলতেন। কখনো বিছানায় শুতে রাজী করান যেত না, আরাম চৌকিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতেন। সেই সময়টা কেউ দেখা করতে এলে চেষ্টা করতাম তাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখতে। কখন অনুনয় করে কখন বিরক্ত হয়ে বলেছেন "ডেকে আনো, চুকিয়ে ফেলি।" শরীরের যুক্তি তুললে বলতেন, "যাঁরা মানী লোক তাঁদের ফিরিয়ে দিতে আমার দ্বিধা হয় না, কিন্তু যারা অতি অভাজন, যাদের সকলেই অনায়াসে অবজ্ঞা করতে পারে তাদেরকে দেখা হবে না বলতে আমি পারি না। আমি জানি এতে আমার সময় নষ্ট হয় কিন্তু উপায় কি বল ?"

এই সেদিনও শান্তিনিকেতন থেকে ওঁকে নিয়ে আসবার কয়েকদিন আগে সকালে একটি ছেলে আমকে ধরল, "একবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন। আমি মৈমনসিং থেকে এসে তিন দিন ধরে বসে আছি, শুধু একবার ওঁকে চোখে দেখে ফিরে যাব। আজ আমার শেষদিন, কাজেই আপনি দয়া করে দূর থেকেও একবার দেখিয়ে দিন।" কবির অত্যন্ত ক্লান্ত দুর্বল শরীর, সদাসর্বদা ওঁর কাছে লোকজন নিয়ে যাওয়া বারণ কাজেই গোড়াতেই সাহস করলাম না নিয়ে যেতে। উপরে গিয়ে সুধাকান্তবাবুকে বলতে তিনি বললেন, "অসম্ভব, একজন আসলেন এর পর অন্যদের ঠেকান শক্ত হবে।" ছেলেটির কাতর মুখ কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না ; সুধাকান্তবাবুকে অনুনয়

করে নীচে পাঠিয়ে দিলাম যে যদি নিতান্ত ফিরিয়েই দিতে হয় তাহলে অন্তত ছুটো মিষ্টি কথা বলে বিদায় করে আস্থন। স্থধাকান্তবাবু নেমে যেতে কবির কাছে ঘটনাটা বলবামাত্র বললেন, "আহা ডেকে আনো না একবার। আমি কথা না বললেই তো আর ক্লান্ত হ'ব না। দেখো, আমি এত বড়লোক নই যে একবারটি দেখা দিতেই ক্ষয়ে যাব।" ইতিমধ্যে স্থধাকান্তবাবুও তার কাতরোক্তি এড়াতে না পেরে নিয়ে এসে দূরে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। সে সেখান থেকেই ফিরে যেত কিন্তু শ্রীমতী নন্দিতা তাকে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে যেতে বলায় একেবারে যেন কৃতার্থ হ'ল। সামনে এসে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে প্রণাম করে চলে গেল। আমি নিশ্চয়ই জানি শরীর অস্থস্থ না থাকলে অন্তত দু'একটি কথাও তার সঙ্গে বলতেন। এবারে তাও পারলেন না। এ কয়দিন অনেকবার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়েছে। সেদিনকার সকালের রবীন্দ্র-দর্শন তার জীবনে দুর্লভ সম্পদের মতো জমা রইল।

কয়েক বছর আগে কবির একমাত্র দৌহিত্র শ্রীমতী মীরা দেবীর পুত্র নিতুর যখন জার্মানিতে মৃত্যু হোলো তখন তিনি আমাদের বরানগরের বাড়িতে ছিলেন। সেদিন ভোরবেলা কেন জানি না নিজের থেকেই আমাকে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেলেন। অথচ তখনও উনি কোন খবর জানতেন না। মৃত্যুকে বাদ দিয়ে যে জীবনের কোনই মূল্য থাকে না সেই কথাটাই আমার কাছে চমৎকার করে বললেন। তারপর নিতু সম্বন্ধেও অনেক কথা হ'ল। কারণ তার অস্থখের জন্যে মনে সর্বদাই খুবই উদ্বেগ ছিল। বললেন, এ্যাণ্ড্রুস্ লিখেছেন সম্ভবত নিতুকে শিগ্গিরই দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে, তাহ'লে ভাবছি তাকে একটা কোন ভাল জায়গায় অনেকদিন ধরে রেখে দেব। ভাওয়ালি কি কোন ভাল পাহাড়ে বেশ কিছুদিন থাকলেই ও সেরে উঠবে" ইত্যাদি। (এইখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে নিতুও ৭ই অগষ্ট মারা গিয়েছে।)

ওঁর ঘর থেকে সকালবেলা বেরিয়ে এসেই খবরের কাগজে টেলিগ্রাম দেখে আমরা পরামর্শ করলাম যে খড়দা থেকে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে আনিয়ে নিয়ে তারপর সবাই একসঙ্গে গিয়ে খবরটা জানাব। রথীবাবুরাও

আমাদের কাছ থেকেই প্রথম খবর পেলেন কারণ তখনও খবরের কাগজ দেখেন নি। আমাদের মনে কত ভয় ছিল না জানি কবি কী রকম অস্থির হবেন। খানিকক্ষণ পরে প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হ'ল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নিতুর খবর পেয়েছিস? সে একটু ভাল আছে, না?" রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভাল না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভাল? কাল এণ্ড্রুজ্ও আমাকে লিখেছেন যে নিতু অনেকটা ভাল আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।" রথীবাবু এবার চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভাল নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত্ত, চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। তার একটু পরেই শান্ত ভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান, সেখানে বুড়ী (নিতুর বোন নন্দিতা) একা রয়েছে। আমি আজ না গিয়ে কাল যাব, তুই আমার সঙ্গে যাস্।"

রথীবাবুরা চলে যাবার পর ঘণ্টা দুই একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দুপুরে যখন খাবার দিতে গেলাম দেখি একেবারে সহজ মানুষ। মুখের ভাবে কথায় বার্তায় কোন পরিবর্তন বোঝা যায় না। অথচ আমরা সকলেই জানি নিতু ওঁর কতখানি ছিল। খাবার পরে খাতা নিয়ে লিখতে বসলেন। একটা ছোট গদ্য কবিতা লেখা হল—"পুকুরের ধারে" নাম দিয়ে সেটা "পুনশ্চ"তে বেরিয়েছে। কবিতাটাতে মৃত্যুর কোন আভাষই নেই তবু অন্তরের একটা বেদনা ধরা পড়েছে। আমাকে ডেকে শোনালেন আর বললেন, "জীবনের গভীর দুঃখের সময়েই দেখি লেখা আপনি সহজে আসে। মন বোধ হয় নিজের রচনাশক্তির ভিতর ছুটি পেতে চায়।" অবাক হয়ে গেলাম ওঁকে দেখে। "শেষ সপ্তক" এবং "পুনশ্চ" এই দুখানা বইই নিতুর অসুখ ও মৃত্যুর গভীর বেদনার মধ্যে লেখা। *

* এই সঙ্গে একটা কথা মনে পড়েছে। নিতুর মৃত্যুর পরে কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন তার কয়েকদিন পরেই 'বর্ষামঙ্গল' হবার কথা। আশ্রমে কথা উঠল যে এবারে কবির এই গভীর শোকের সময় উৎসব বন্ধ থাকুক কিন্তু কবি তা হ'তে দিলেন না। উৎসব

রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সমস্ত সময়ে হাসিতে ঠাট্টায়, গল্পে কবিতায় সকলকে সজীব করে রেখেছিলেন। মনে মনে আশ্চর্য লাগত ভাবতে যে এত শারীরিক কষ্টও ওঁর হাসির উৎস শুকিয়ে দিতে পারে নি। শান্তিনিকেতন থেকে আসবার দিন ট্রেণে গরম এবং পথের ক্লান্তিতে শরীর একেবারে অবসন্ন। তা সত্ত্বেও ট্রেণে কতোবার এটা সেটা নিয়ে আমাকে পরিহাস করেছেন। যখন হাওড়া ষ্টেশনে নাবান হ'ল তখন মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জোড়াসাঁকোতে এসে একটুক্ষণ বিশ্রামের পর একটু খেয়ে দেয়ে যেই অল্প তাজা হয়েছেন অমনি সকলের সঙ্গে সেই স্বাভাবিক হাসিতামাসা। মনে হ'ল কি অফুরান প্রাণশক্তি ও মনের জোর!

২৭শে জুলাই সকালবেলা একটা কবিতা লিখেছেন—মন খুব খুশী। আমি যেতেই বললেন, "দেখো, আজও একটা কবিতা হোলো। এ লোকটাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো? এ পাগলামি কি কোনদিনই থামবে না? ডাক্তাররা দেখে হতাশ হয়ে যান। হার্ট দেখে, লাংস দেখে বলে গেল সবই ভাল; কী দুঃখ।" আমি যেই বলেছি, "দুঃখ কেন হবে? এতে তো ওদের খুশীই হবার কথা," অম্‌নি বলে উঠলেন, "আঃ, তুমি কিছু বোঝনা। রোগী আছে রোগ নেই, ওরা চিকিৎসা করবে কাকে? এতে ওদের মন খারাপ হয় না?" ওঁর কথা এবং ভঙ্গীতে আমরা সবাই হেসে অস্থির।

অস্ত্রোপচারের একদিন পরে যখন যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন ভয়ে ভয়ে গম্ভীর মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ চোখ খুলেই আমার দিকে তাকিয়ে বড় বড় চোখ করে এমন মুখভঙ্গী করলেন যে না হেসে পারলাম না। বল্‌লেন, "এই তো? তা' না গম্ভীর মুখ করে এসে দাঁড়ালেন। এত গম্ভীর কেন? একটু হাসো?" চোখে জল এল ভাবতে যে এত যন্ত্রণার মধ্যেও যারা কাছে আছে তাদের উনিই হাসাচ্ছেন।

প্রিয়জনের মৃত্যু বেদনা কী রকম শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে হয় তাও যেমন

যেমন বরাবর হয় তেমনি হ'ল আর কবি নিজে তাতে পুরো অংশ গ্রহণ করলেন। সেই সময় লেখা একটা কবিতা 'পুনশ্চ'তে বেরিয়েছে যার আরম্ভ, "দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—লজ্জা দিয়োনা।" এই কবিতাটাতেই শোক সম্বন্ধে ওঁর মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। মৃত্যুকে উনি সত্যিই জীবনের মতোই সহজে বরাবর গ্রহণ করেছেন।

দেখেছি নিজের মৃত্যুযন্ত্রণা কী রকম ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে হয় তাও দেখলাম।

সেই শুভ্র জ্যোতির্ময় অপরূপ মূর্তির তুলনা নেই, তার চেয়েও অতুলনীয় তাঁর উদার মহান ব্যক্তিস্বরূপ। *

রানী মহলানবিশ

* ২৪শে অগস্ট (১৯৪১) তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে নিখিল-ভারত মহিলা-সমিতি কর্তৃক আহূত স্মরণ-সভায় পঠিত।

রবি-সূক্ত

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যান্॥

ঋগ্বেদ—১।৩৫।২

(উত্তরায়ণ)

হে সূর্য্য, হে রূপের দেবতা,
জ্যোতির্ম্ময় দেব দিবাকর,
নিত্য নব জন্মের বারতা
প্রত্যূষে শুনাও নিরন্তর,
হৈমরথে দেবকান্তি আহা
কে দেখেছে অনিন্দ্য সুন্দর!

পূর্ব্বাশার হিরণ্য কপাট
মুক্ত করি সপ্তাশ্বের রথে,
তেজঃপুঞ্জে উদ্ভাসি ললাট,
আনো বহি' কোন্ স্বর্গ হ'তে
জৈবপ্রাণ রুক্মরশ্মি-জালে
চেতনার সূক্ষ্মব্যোম পথে।

তুঙ্গশৃঙ্গ উদয়পর্ব্বতে
মহনীয় তব আবির্ভাব,
রূপৈশ্বর্য্য ছড়াও জগতে,
বিশ্বে তব অলঙ্ঘ্য প্রভাব,
বন্দি' তোমা' বৈদিক বিস্ময়ে
হে পুরাণ, প্রবুদ্ধ স্বভাব।

দিগ্বালার নগ্নকান্তি দেহে
বিচ্ছুরিছে তব বরাভয়,
প্রাণবন্ত কী বিপুল স্নেহে
অন্বেষিছ সারা বিশ্বময়
অগ্নিরিক্ত নির্জীবের হিয়া
রশ্মিরাগে করিতে দুর্জ্জয়।

ব্যোম্ জুড়ে নীহারিকা-মরু,
ছায়াপথ উদয়াস্ত নাই,
ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ তরু,
গ্রহপুষ্প ফুটিছে সদাই,
জ্যোতিরুৎস অভীজিতে ঘেরি
আশ্রিত জগৎ বাঁচে তাই।

জীবমাতা ধায় কক্ষপথে—
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সুন্দরী,
সুরভিত শ্যামাঞ্চল হ'তে
শস্যশীর্ষ শোভিছে মুঞ্জরি',
তব স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাতে
মক্ষিপ্রাণ উঠিছে গুঞ্জরি'।

রূঢ় রুক্ষ মরুবালুকণা
শিহরিছে আগ্নেয় শৃঙ্গারে,
হে মরীচি, একী উন্মাদনা
বিতরিছ সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে,
যে বলে বলুক মরীচিকা
পুষ্করের ছায়াছবি তারে।

অব্যাহত বিহঙ্গ-কিরণ
শূন্যে মেলি হিরণ্ময় পাখা,
মহাদ্যুতি করে বিকিরণ,
বিরাটের আদি অঙ্গরাখা
পৃথিবীর ছন্দ উঠে জাগি,
চন্দ্রমায় জাগে মুগ্ধ রাকা।

জানি জানি, ওগো চিত্রভানু,
অত্যদ্ভুত তব চিত্রকলা,
জ্যোতির্দীপ্ত প্রতি পরমাণু
প্রকৃতিরে করেছে চঞ্চলা,
তাইতো সে অসীমের বুকে
বিচিত্রিতা মদির অঞ্চলা।

অর্দ্ধবৃত্ত নভো-তেপান্তরে
বহুবর্ণ পক্ষীরাজ তব,
ঘননীল প্রাচী দিগন্তরে
প্রতিবিম্ব ফেলে নিত্য নব,
ভর্গদেব সবিতৃ-মণ্ডলে
ধ্যানভঙ্গে জাগে অভিনব ·

প্রাবৃটের জলদর্চ্চিচ্ছটা
সুগম্ভীর গগনে গগনে
কী উজ্জ্বল পাংশুঘনঘটা
জ্বলে তব বিরহ লগনে,
কারে স্মরি' কহ, বিরোচন,
স্তিমিত বেদনা জাগে মনে !

সৌরসরে মহাপদ্ম তুমি
কোথা তব অদৃশ্য মৃণাল ?
বহ্নিভৃঙ্গ তব রেণু চুমি'
মধুমত্ত অনাদ্যন্ত কাল,
প্রদীপ্ত বিশাল মর্ম্মকোষে
পুঞ্জীভূত কী রহস্যজাল !

(দক্ষিণায়ন)

মেঘবর্ণ সন্ধ্যার আকাশে
রক্তশয্যা করি বিরচন,
দ্রবীভূত সোনালী উচ্ছ্বাসে
বিদায়ের প্রিয়-সম্ভাষণ
নৈঃশব্দ্যের শান্ত সুরে গাহি,
কোন কূলে কর নিষ্ক্রমণ ?

মর্ম্মরিত দেবদারু বনে
স্বপনের ঢেউ খেলে যায়,
চন্দ্রিকার রজত প্লাবনে
ধরণীর অঙ্গ শিহরায়,
কাব্যময়ী কাঁদে মহাশ্বেতা
মৃগাঙ্কের মলিন জ্যোৎস্নায়।

কদম্বের সুরভি কেশরে
সন্ধ্যালোকে কাঁপে স্বর্ণছায়া,
বনপথে গন্ধবেণু ঝরে,
মনে হয় একী স্বপ্নমায়া!
দূরশ্রুত সঙ্গীতে তোমার
রিক্তমনে কাঁদে পৃথ্বীজায়া।

জাগে তব রোমাঞ্চ-কম্পন
পল্লবিত অশ্বত্থের ডালে,
সপ্তবর্ণ জাগে আলিম্পন
ইন্দ্রধনু দিগন্তের ভালে,
বৈশাখী সন্ধ্যার সমারোহে
মত্তশিখী নাচে তালে তালে।

মৃদুমন্দ বহে সমীরণ
প্রদোষের বিষণ্ণ লগনে,
মুগ্ধকবি সজল নয়ন
কত কথা ভাবে আনমনে।
কিশলয়ে কাঁপে রশ্মিরেখা
বিদায়বিধুর আলিঙ্গনে।

আঁধারে নীলাভ ছায়াময়ী
কল্লোলিনী কুলু কুলু গানে,
হে সুন্দর, হে ভুবনজয়ী,
তোলে সুর ক্ষুব্ধ অভিমানে,
তোমারি বিরহগীতি সে যে
ঝঙ্কারিছে নিখিলের কানে।

রজনীর উড়ে মুক্তবেণী,
হে তপন, তোমারি বিরহে,
নিশাচর রাজহংসশ্রেণী
তোমারি প্রেমের লিপি বহে,
আকাশের অরুন্ধতী তারা
কালে কালে কত কথা কহে,

জোনাকির ক্ষীণ পক্ষশিখা
বেদনার নৈশ অন্ধকারে,
লতাগুল্মে জ্বালে দীপালিকা
তব স্মৃতি অর্ঘ্য উপচারে,
দেখিতে কি পাও, বিবস্বান,
গহন অস্তের সিন্ধুপারে ?

তব প্রেমে ভক্ত-উপাসিকা
তমস্বিনী নিভৃত শয়নে
উদয়ের স্বপন গীতিকা
গাহে নিত্য ব্যথিত নয়নে,
তুন্দ্রায় অতন্দ্রদীপ জ্বালি
মেরুবালা কাঁদে রিক্তমনে।

সুমেরুর স্বর্ণচূড়া বাহি,
মহাযাত্রী হে চির অর্হৎ,
রোদসীর মর্ম্মগান গাহি,
অগণিত অঙ্কুর জগৎ
অলৌকিক জ্যোতির স্পন্দনে
বিকীর্ণ করেছ কক্ষপথ।

চেতনার মহাসিন্ধুনীরে
হংসাসনে, হে বরেণ্য কবি,
প্রাণপুষ্প রক্তকরবীরে
রশ্মিরাগে কর মূর্ত্ত ছবি,
ধূলি ধূম বাষ্প উড়ে যাক,
ভস্ম হোক হিংস্র মহাটবী।

নখিলের মির্ম্মমেরুলোকে,
হে সূর্য্য, হে দিবাকর,
জীবনের অতন্দ্র আলোকে
জ্বালো দীপ অনন্ত ভাস্বর,
বন্দি' তোমা' বৈদিক বিস্ময়ে
নমো নমো অনিন্দ্যসুন্দর।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ

দেয়ালচিত্রের শীর্ষে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য্য প্রাসাদে
একটি গভীর ছবি মানুষ দেখেছে চিরকাল।
কেউ তাকে সূর্য্য বলে মনে ক'রেছিল ;
কেউ তাকে ভেবেছিল গরুড়ের উড্ডীন কপাল ঃ
যখন সে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে
উদয় ও অস্তকে এক ক'রে দিতে ভালবাসে ;
শাদা রাজবিহঙ্গের প্রতিভায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়,
হয়তো বা আমাদের মর্ত্ত্য পৃথিবীতে ফিরে আসে।
তাকাতে তাকাতে সেই প্রাসাদের মেধাবী দেয়াল
আমাদের ইহলোক ব'লে মনে হয়—তবু সৃষ্টির অনন্ত পরকাল।

তোমার বিভূতি, বাক বেদনার থেকে উঠে নীলিমাসঙ্গীতী,
আপনার গরিমার বিকীরণে ডুবে, গ'ড়ে গেছে সব মানুষের প্রাণ ঃ
কি ক'রে কল্যাণকৃৎ অর্থের তরঙ্গে জেগে (মোম নিভে গেলে)
স্বাতী, শুক্র তারকার মতন ধীমান
মহা অবয়বদের থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে আভা দিতে পারে
শেয়াল শকুন শনি বানরের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরে ;
সৃজনের আদি অন্তিমের রাঙা আগুনের মত গোলাকার
ব্যাপ্ত এক সঙ্গীতের বৃত্তের ভিতরে
পেয়ে যেতে পারে তার তিমি তিলে বিস্মিত ব্রহ্মাণ্ডের মানে ;
সে সুর নিমীল হয়ে, লেলিহান হয়ে, নিমীলিত হতে জানে,

মহান, তোমার গানে ; এই সব বলয়িত ক'রে চিরদিন—
অথবা যখন তুমি আমাদের দেশে সৃষ্টি শেষ ক'রে ফেলে
প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে উঠে একদিন

নিঃস্বার্থ আগুনে ফিরে গেলে,
পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমরের মত
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি একটি পৃথিবী ভাঙা-গড়া-শেষ ক'রে দিয়ে, কবি,
দানবীয় চিত্রদের অন্তরালে আপনার ভাস্বরতা নিয়ে ;
নিকটে দাঁড়ায়ে আছে নিবিড় দানবী।
অথবা ছবির মত মনে হয় আমার অন্নপানদোষে ম্লান চোখে ঃ
অল্প আলোকের থেকে যেই পুরাণ-পুরুষ সব চ'লে যায় অনুমেয়,
অজ্ঞেয় আলোকে।

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

কবির মৃত্যু

জানাশোনা ছিল দুটি পৃথিবীর সাথে,
দুটি পৃথিবীর অজস্র দানে দেহ মন ছিল ভরা,
একটি তাহার গড়া বিধাতার হাতে,
আর একটি ছিল তোমার সৃষ্টি করা।

আজ তুমি নেই, তোমার সৃষ্টি সেই পৃথিবীতে আছি,
তাহারই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি।
বিধাতার গড়া ধরার বাতাসে বাঁচি নিঃশ্বাস নিয়ে,
রয়েছেন তিনি, মনে মনে ভাবি তাই ;
তোমারই মতন তাঁহারও মৃত্যু হয় যদি, তখনি এ
পৃথিবী সে-কথা ক'বে না ত কারে', শুধাব সে কা'র ঠাঁই,
কেমনে তা জানা যাবে ?
তুমি নেই, তব সৃষ্টি সে-কথা বলে না ত কোনোভাবে।

তোমার সৃষ্টি পৃথিবীর ’পরে জ্বলে স্বর্গের আলো ;
তোমার নয়ন বারেবারে যে ভুলালো,
বিধাতার গড়া রয়েছে সে পৃথিবীও ;
নেই কি গো সেই পরম-দেবতা, তোমার পরাণ-প্রিয়,
যাঁর বিভূতির শুধু এক কণা দুদিনের তরে লভি’
আমাদের মাঝে এসেছিলে তুমি কবি ?

তোমারে হারায়ে নিজেদের লাগি অনেক করেছি শোক,
ক্ষণিকের তরে ঝেড়ে ফেলি আজ স্বার্থের নির্ম্মোক।
কে জানে হয়ত দেবতা আছেন বেঁচে,
হয়ত বা কোনো নূতন পৃথিবী মন তব ভুলায়েছে।
এবার তোমার লাগি’
শোক করি এই বিনিদ্র রাতে একটি প্রহর জাগি’।
পৃথিবীতে এসে মিটিল না কোন আশা ;
প্রাণপণে ভালোবেসে ফিরে কা’র পাও নাই ভালোবাসা।
কি বলা হ’ল না, পাও নাই অবসর ;
কোন্ প্রিয় কাজ শেষ নাহি হতে এল মৃত্যুর চর।

কাজ-শেষে ফিরে গেছে মৃত্যুর দূত,
এত প্রিয় তব পৃথিবীতে তুমি নেই, কি যে অদ্ভুত !
তবু ভাবি, হায়, এমন ত’ দিন রয়েছে সমুখে কত ;
তুমি ছিলে এই পৃথিবীতে মনে হবে স্বপ্নের মত !
মানুষের এই জগতে তুমিও ছিলে একদিন কবে,
অদ্ভুত মনে হবে।

হে গুরু, হে প্রিয় বন্ধু, একদা ছিলে আমাদের মাঝে,
বুঝিব কি কভু সেটি কত বড় অঘটন-ঘটনা যে ?

কতটুকু তব দেখেছি বা, আর জেনেছি বা কতখানি,
কতটুকু শোনা গেল বুকে বয়ে এনেছিলে যেই বাণী,
তবু তারই মাঝে এ-কথা নিয়েছি শিখে,
মানুষের ব'লে জানি যেই ধরণীকে,
কতখানি সে যে দেবতার অধিকারে ;
সাথে ক'রে এনে আমাদের মাঝে রেখে গেলে তুমি তাঁরে।
আজ তুমি পরলোকে,
অন্ধ নয়ন অশ্রু-আকুল শোকে ;
তবু মনে জানি, যেই স্বর্গেরে দেবতার ব'লে ভাবি,
তুমি সেথা আছ, তাই তার প'রে মানুষেরও আছে দাবী।
তুমি আছ ব'লে স্বর্গ সে বরণীয়,
তুমি ছিলে তাই ধন্য এ ধরণীও,
তুমি গেছ বলে মৃত্যুর পথ ধরি'
জানি সে-পথেও গানের আবেগে আলো কাঁপে থরথরি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের গানের তাল

আধুনিক বাংলা গানের ছন্দের প্রতি নজর দিতে গিয়ে আমার কাছে কাছে এই কথা স্পষ্ট হ'ল যে হিন্দি গানে ও আগেকার দিনের বাংলা গানে যেমন নানা তালের প্রকাশ দেখা দিয়েছিল, বাংলার আধুনিক রচয়িতাদের মধ্যে তার অভাব দেখা যায়। একমাত্র তিন মাত্রা বা চার মাত্রার চলতি ছন্দের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বেশী। দুরূহ ছন্দের বা বিষম মাত্রার গানের স্বল্পতা দেখে মনে হয় এই ছন্দে গান বাঁধতে তাঁরা বোধহয় কোন উৎসাহই পান না।

গত শতাব্দীতে যখন হিন্দি গানের অনুকরণে বাংলা ভাষায় নানা প্রকার গান রচনা সুরু হয় তখনো দেখেছি হিন্দি গানের নানা প্রকার ছন্দকে নিয়ে রচয়িতারা গান রচনা করেছেন। কিন্তু সুরে ও তালে হিন্দি অনুকরণের ঊর্দ্ধে যতই বাঙ্গালী উঠ্‌তে লাগল ততই দেখা গেল একমাত্র রবীন্দ্রনাথই গানের তালের বৈচিত্র্যের দিকে আর সকলের চেয়ে অগ্রণী। অন্যদের উৎসাহ তাঁর বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। অন্যরা হিন্দি গানের বিষম মাত্রার ছন্দে গান রচনায় বিশেষ উৎসাহ পেলনা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সব ছন্দকেই সমান ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

আজ বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিয়েছি। আমরা তাঁর গান নিয়ে যখন আলোচনা করি তখন কেবলমাত্র ভাষা ও সুরের অপূর্ব্ব মিলনের উপরেই জোর দিয়েছি। তাতে মনে হয় কেবলমাত্র এই দিক থেকেই যেন তাঁর রচনা ভারতীয় সঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে, তালের দিকে দৃষ্টি দেবার বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু গানের ছন্দ বা তালের দিক্ থেকেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আলোচনা করবার অনেক আছে। সেদিক থেকেও ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি অনেক বৈচিত্র্য এনেছেন।

এতদিন পর্য্যন্ত তাঁর তাল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা না হবার কিছু কারণও আছে। যাঁরা আনন্দের জন্যে তাঁর গান করেন, তাঁদের কাছে সুরের সঙ্গে কথার মিলনই হোলো প্রধান। তবলার তালের

গূঢ়তত্ত্বের কোনো খোঁজ রাখা তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেনা। তাঁরা গানের সঙ্গে বাইরে থেকে ছন্দের যে রূপ দেখেছেন তাতেই খুশী, গান থেকে তাকে আলাদা করে বিচার করবার দরকার তাঁদের নেই, প্রয়োজনও বোধ করেননা। নিজ অভিজ্ঞতায় থেকে জেনেছি যে এমনও বহুলোক আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের অত্যন্ত ভক্ত এবং নিজেরা গান গেয়েও আনন্দ দেন ও আনন্দ পান। কিন্তু তাঁরা একেবারেই জানেনা, সে গানটি যে-ছন্দে বা তালে গাইছেন সে তালটি কি। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বেতালা গাইলেও তাঁদের কাছে সে কথা ধরা পড়েনা। অনেকে আছেন যাঁদের কাছে গানের কাব্য-রসই প্রধান হয়ে ওঠে, সুর বা ছন্দের ধারও ধারেন না। আবার ওস্তাদ মহলে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের কিছু চর্চ্চা করেন তাঁরা পছন্দ করেন কেবল রবীন্দ্রনাথের হিন্দি-ভাঙ্গা বাংলা গান; সে গানে তাঁরা তাঁদের সংস্কারগত তালের পরিচয় পেয়ে খুশী হন, তাই অন্য ছন্দের প্রতি উৎসাহ তাদের জাগেনা কারণ সে তালের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে, অর্থাৎ যতদিন, বিষ্ণু, যদু ভট্ট, এবং তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত সঙ্গীতজ্ঞদের আওতায় ছিলেন, ততদিন তবলা পাখোয়াজের তালের নিয়মকে অবহেলা করতে পারেননি। সেই কারণে তখনকার গানগুলিকে নানাপ্রকার তালের নাম দ্বারা চিহ্নিত করবার প্রয়াস দেখি। এমন কি সে প্রভাব শান্তিনিকেতনের জীবনে এসে "শারদোৎসব" নাটকের গান রচনা কালেও আমরা দেখলাম। তখনো পর্য্যন্ত গানের মাথায় রাগরাগিনী ও তালের নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরে এভাবে তবলার তালের নাম দেওয়া তিনি যে কারণেই হোক পছন্দ করেননি, তাই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বাকী গানে তাল লিখতে দেখিনা। তাতে অনুমান করে নিতে পারি যে এই সময় থেকেই তাঁর মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল যে তাঁর গান তবলার তালের এত অনুগত হয়ে চল্‌বে কেন এবং তার প্রয়োজনও কিছু আছে কিনা।

এরই বছর দশেক পরে, "সঙ্গীতের মূর্ত্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের তালে নাম না দেওয়ার কারণ স্পষ্ট করেই বুঝিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "অনেকদিন থেকেই কবিতা লিখছি,—ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি।

সেই ছন্দের বোধ নিয়ে গান লিখ্‌তে বসলাম", কারণ, "কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানের তালেরও সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলবে।" অন্যত্র বলেছেন, "কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেটাই লয়। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তাদের সঙ্গে বিবাদ ঘটলেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই।"

এই কারণেই তাঁর "শারদোৎসব"-এর গানের পরবর্ত্তী রচনায় আর তবলার তালের নিয়ম দেখলামনা। অর্থাৎ তেতালার ছন্দের গান হলেই যে ১৬ মাত্রা পূর্ণ করে প্রথম মাত্রায় ঝোঁক দেখাতে হবে এ রকম নিয়মের আর কোন বাঁধন থাক্‌লনা। একতালা ছন্দে ও ঝাঁপতালে তাই ঘটেছে। তাঁর গানে সর্ব্বত্রই যে তালের সম দেখাবার প্রয়োজন আছে তাও নয়। এবং সে দিকেও তিনি শেষ জীবনের গানে একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করেননি। যদিও আট মাত্রা বা ছয় মাত্রায় পূর্ণতালে তাঁর শেষদিককার গানের স্বরলিপি করা হয় কিন্তু তাতেও অনেক সময় মাত্রা ঠিক রাখ্‌তে গিয়ে বহু গানের সুরকে জায়গায় জায়গায় টেনে বা ছোট করে তবলার নিয়মে মেলানো হয়েছে।

একথা আমরা মেনে নিতে পারি যে ছন্দের নিজস্ব ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন ছন্দের দোলা যে মনে বিভিন্ন রস সঞ্চার করে একথাও সত্য। তাই শান্ত ও গম্ভীর রসের কবিতায় ধীর লয়ের ছন্দের পক্ষপাতী হবেন তাঁরা যাঁরা প্রকৃত রসিক। উদ্দামতায় ও চঞ্চলতায় দেখা দেবে দ্রুত বা চঞ্চল ছন্দের প্রকাশ। ভালো কবিতায় ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছন্দ ব্যবহৃত হয়। কবিতার রস আমাদের কাছে আরো সুন্দর ফুটে ওঠে ছন্দের সাহায্যে। কিন্তু গানের বেলা আমরা পাচ্ছি কথার সঙ্গে সুর ও তাল। সুর গানের তালকে অনেকখানি সাহায্য করে ব'লে ছন্দের দায়িত্ব সে দিক থেকে অনেক ক'মে যায়। তখন সে সুরের ও কথার অনুসরণ করে।

কোনো কবিতা যখন গানে পরিণত হোলো তখন কবিতার ছন্দটিকে সুর সব ক্ষেত্রেই অনুসরণ করে না। গানের সুরের সাহায্যে অন্য তালের ভিতর দিয়েও সেই ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। কথাটা পরিষ্কার করবার জন্য একটি উদাহরণ দিই।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার কবিতা, "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে," তিনমাত্রার ছন্দে রচিত, অনেক বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু গানের সুরে ও তালে এই ভাবটি বজায় রাখতে গিয়ে চার মাত্রার তালের সাহায্য নিতে হয়েছে।

দেখেছি, গান রচনায় অনেক সময় কবিতার ছন্দ বদলের প্রয়োজন হ'লে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে সেই গানের কথাকে নতুন ছন্দে কয়েকবার আবৃত্তি করে কথার এক মেঠো রূপ খাড়া করতেন; পরে সেই কথার উপর ভর করে সুর যোজনা করেছেন। এই ভাবে কথাকে সাজিয়ে নেবার সুবিধা হোলো, সুর-যোজনার সময় কথার বৈশিষ্ট্য তাতে ঠিক থাকে। সুরের তাড়ণায় যে-গানের কথার সহজ গতিটি নষ্ট হয় তাকে বাংলার রীতি অনুযায়ী ভালো গান বলব না। কথার রসকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলাই হোলো সুরের কাজ। এই কথা মনে রেখে সুর যোজনা করলে গানের কথা, সুর ও ছন্দের সহযোগে মিলনের একটি সুন্দর রূপ আমরা দেখতে পাব। রবীন্দ্রনাথের গানে কথা সুর ও ছন্দের মিলনের এটি হোলো একটি বড় কারণ।

হুবহু কবিতার ছন্দকে বজায় রেখে গান রচনা ক'রেও বাংলা সঙ্গীতের জগতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ও তাতে বৈচিত্র্য এনেছেন। এই রকমের বিভিন্ন ছন্দের একটি ক'রে গান নিয়ে এখানে আলোচনা করব। "খর বায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে" গানটি চার মাত্রা ছন্দের গান। এটিকে সুর ছাড়া কবিতার ছন্দে আবৃত্তি করলে দেখতে পাব গানের সময় অবিকল সেই ছন্দটিই গ্রহণ করা হয়েছে। সাত মাত্রার তালকে তিনে চারে ভাগ করলে যে ছন্দ হয়, সেই ছন্দের গান "হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু-গুরু" আবৃত্তি করলে দেখব গানের ছন্দের সঙ্গে একেবারে এক। তিন মাত্রার ছন্দ আছে "নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর" গানটিতে। আবৃত্তি কালে দেখতে পাব অবিকল গানের ছন্দ এসে পড়েছে তাতে। "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে" গানটির ছন্দ হোলো দুই চারের মাত্রার অর্থাৎ "মম" শব্দের উপর দুই মাত্রা ও "চিত্তে" কথাটির উপর চার মাত্রা। এটিকে সুর ছাড়া পাঠ করলে গানের ঝোঁক ও ছন্দটিই দেখতে পাব। এই ভাবের কবিতার ছন্দ গানের বেলায় বদল না করবার কতকগুলি কারণও আছে।

সাধারণত গীত-রচয়িতারা আগে গানের কথাগুলিকে লিখে ছন্দে সাজিয়ে

নেন তার পরে সুর যোজনা করেন। অনেক গানে কথার বাঁধুনি ও ছন্দের গতি এমনভাবে মিশে থাকে যে তাকে সুর যোজনার সময় কোনো রকমে বদলানো সম্ভব হয়না। তা করতে গেলে গানের কথার ভিতর দিয়ে শব্দ-ঝঙ্কারে বা ছন্দে যে রস প্রকাশ পায় সেটিকে খর্ব্ব করতে হয়। আধুনিক বাংলা গানে কথা বা গানের ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই হোলো গান-রচয়িতার একমাত্র লক্ষ্য। সেখানে ছন্দের যে মস্ত বড় স্থান আছে গান রচনার বেলায় সে কথাটিও আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমাদের সেই পথেই বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। এবং এই গানকে ছন্দের দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা এই সত্যে উপনীত হব যে কবিতার ভাবপ্রকাশে ছন্দ যেমন অতি আবশ্যক, বাংলা গানেও কথা ও সুর ছাড়া ছন্দেরও মস্ত বড় স্থান আছে। পূর্ব্বেই বলেছি সে ছন্দ তবলার তালের নিয়মে বাঁধা ছন্দ নয়। সে ছন্দ গানের ভাবকে ফুটিয়ে তুল্‌তে সাহায্য করবে, হিন্দুস্থানী গানের মত কেবল রাগরাগিনীর মাধুর্য্য বিস্তারে সহায়ক হয়ে থাক্‌বেনা। এ বিষয়ে আলাদা ক'রে উদাহরণের প্রয়োজন হয়না, কারণ যে-কোনো গান নিয়ে আলোচনা করলেই এ কথার তাৎপর্য্য বোঝা যাবে।

প্রাচীন বা বর্ত্তমান হিন্দি গানে যত তাল আছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপা, ইত্যাদি কোন চালের গানের তাল তাঁর সঙ্গীতে বাদ পড়ে নি। তা ছাড়া বাংলার কীর্ত্তনের কিছু ও লোক-গীতির তালও স্থান পেয়েছে তাঁর গানে। এ বিষয়েও আলাদা ক'রে বলবার কোনই প্রয়োজন নেই এখানে।

১৩০৩ সাল পর্য্যন্ত গানে রবীন্দ্রনাথকে ছন্দ বা তাল নিয়ে কোনো পরীক্ষা করতে দেখিনা। তার পরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত পুস্তকে তিনটি গান পেলাম যে-খানে সেই গান তিনটির তাল রবীন্দ্রনাথের নিজের নতুন সৃষ্টি বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাতে ধরে নেওয়া যায় ১৩০৩ সাল থেকে ১৩১০ সালের মধ্যেই এই নতুন তালগুলি তিনি রচনা করেছেন। গান তিনটি হোলো, "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে", "নিবিড় ঘন আঁধারে" ও "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া।" এই গানগুলির তালের বিষয়ে পরে যথা স্থানে আলোচনা করব।

কাব্য-সমালোচকেরা একমত যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা রচনায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু পরে ছন্দ ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যের আকাঙ্খায় তাঁকে নানাপ্রকার যুক্তাক্ষর শব্দ কবিতায় বসাতে হয়েছে। তার দ্বারা বাংলা কাব্যের ছন্দে যে অনেক উন্নতি হয়েছে তাও আমরা জানি। সঙ্গীতেও আমরা একই অবস্থা দেখি। চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যত গান রচনা করেছেন তার মধ্যে সংখ্যায় অতি অল্প কয়েকটি যুক্তাক্ষরযুক্ত গান আছে। ঠিক লিরিক্যাল বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে কোন যুক্তাক্ষরবহুল গান আমার চোখে পড়েনি। পরজীবনে যুক্তাক্ষরবহুল গান আগের জীবনের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশী দেখিতে পাই। দেখা গেছে এই গানগুলি সাধারণত গম্ভীর প্রকৃতির অথবা জোরালো ভাবে পূর্ণ। "প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল একি দুর্দ্দিন," "আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু," "নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়," "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" ও "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন" প্রভৃতি গান ক'টি পড়লে কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে লয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় প্রথম জীবনে দ্রুত ছন্দের গানের বিশেষ পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কারণ ১২৯১ সালে অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স ২৩ বৎসর মাত্র, তখন, "বাল্মিকী-প্রতিভা"র গান বাদ দিলে দেখতে পাব তিনি গান রচনা করেছেন ১৯০টির উপর। কিন্তু তাতে দ্রুত ছন্দের বা চঞ্চল ছন্দের গান আছে মাত্র ১২টী এবং এই ১২টী গানই খেমটা তালের। ১২৯৯ সাল পর্য্যন্ত আরো ৫টী মাত্র গান রচিত হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে এই চঞ্চল নাচুনে ছন্দে তিনি এ পর্য্যন্ত একটিও ধর্ম্ম-সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, রচনা করেন নি। তার একমাত্র কারণ হোলো ছোট কাল থেকে তাঁর মন ভারতীয় সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। ঠুংরী বা কাওয়ালী তালে গান পাই, কিন্তু সে সব গানের লয়কে চঞ্চল বলা চলেনা, তাদের গতি অনেক ধীর।

পরবর্ত্তী জীবনে দেখি, ছন্দবহুল গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশী, সেই অনুপাতে ঢিমে লয়ের গানের অংখ্যা অনেক কম। এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ বাউল সঙ্গীতের প্রভাব। বাউল সঙ্গীতে চঞ্চল ছন্দের প্রকাশ আছে কিন্তু সে ছন্দ হিন্দি গানের খেমটার তালের মত আবহাওয়া তৈরী করে না।

যদিও ব্যাকরণ-গত মিলে উভয় তালই সমান, কিন্তু খেমটাতে আমরা যে লঘু চপলতার ভাব দেখি বাউলে তা দেখি না। উভয় প্রকৃতির গানের গঠনেই এমন কোথায় তফাৎ আছে যার ফলে এদের চঞ্চলতার মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। বাউলের ছন্দে জাতীয় সঙ্গীত রচনাকালে তিনি যে মুক্তির আস্বাদ পান সেই প্রেরণা তাঁর সমস্ত বাকী জীবনের গানে প্রভাব বিস্তার করেছে। তখন থেকে বাউলের ভাবে বহু ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করেছেন, ঋতু-সঙ্গীতও করেছেন নানা রকমের, অন্যান্য গানও আছে অনেক।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো দ্রুত লয়ে গান গাইতেন না। বাংলা গানই হোক আর অল্প বয়সের শেখা হিন্দি গানই হোক আপন মনে গান গাইবার সময়ে আগের জীবনের গানই গাইতেন বেশী, শেষ জীবনে গানের চেয়ে সেগুলি তাঁর মনে থাকত। যৌবনের গানগুলির সঙ্গে তখনকার দিনের নানা প্রকার আনন্দের বা বেদনার স্মৃতি তাঁর মনে যেমন জাগত শেষ জীবনের গানে তা হোতোনা। এদিককার বহু গান কখন রচনা করেছেন, অনেক সময় তাও তাঁর মনে পড়েনি। কিন্তু যৌবনের প্রায় প্রত্যেকটি গান তাঁর মনে ছিল এবং গেয়েও শোনাতে পারতেন। লক্ষ্য করে দেখেছি যে তিনি সে সব গান গাইবার সময় প্রায়ই বাঁধা তালে বা ছন্দে গাইতেন না, দ্রুত লয়ের গান ছাড়া। অনেক নাটকের অভিনয়েও তাঁকে গান গাইতে শুনেছি, তখনো দেখেছি ঢিমে লয়ের গানে বাঁধা ছন্দের নিয়ম একেবারে রাখেন নি; গান গাইতেন স্বাভাবিক কথা বলার ছন্দে, যেন গানেই কথা বলছেন। এই প্রকার গায়কী পদ্ধতিটি আমার কাছে খুবই মনোহর বলে মনে হয়। তাতে গানের ভিতর দিয়ে ভাবটি খুবই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেতো। তবে এ বিষয়ে একটু বলবার আছে, এই বাঁধা ছন্দকে ভেঙ্গে কথার ছন্দে গান গাওয়ার রীতি খুব সহজ ব্যাপার নয়, এর জন্যে চাই সঙ্গীতে ও কাব্যে অতি গভীর রসবোধ, কারণ গানের সময় কোথায় সুরের টান ছোট বড় হবে, লয় দ্রুত ও ঢিমে হবে, গানের কথা একটা আর একটার গায়ে লেগে চলবে বা ছেড়ে ছেড়ে চলবে, এ সবই ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। তা' না হ'লে সুর ও কথা সবই ছাড়া ছাড়া শোনাবে, জোট বাঁধবে না।

তালওয়ালা অনেক গান এই রকমে কথার ছন্দে তিনি গেয়েছেন, কিন্তু এই ছন্দে গানও অনেকে রচনা ক'রে গেছেন যা কোন দিন ছন্দে গাওয়া হয়নি, যদিও তাঁর অনেক গানকে স্বরলিপিতে বাঁধতে গিয়ে সমান তালের মাত্রায় ভাগ করতে হয়েছে। কিন্তু সেই সব গানের স্বরলিপিকে দেখব আমরা সুরের কাঠামো হিসাবে। সুতরাং যাঁরা কেবলমাত্র স্বরলিপির উপর আনুগত্য স্বীকার ক'রে এ ধরণের গান গাইবেন, তাঁরা সে সব গানের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত করবেন। এ রকম ক্ষেত্রে সে সব গানের গায়কী পদ্ধতিটিকে না শুনে শিখলে সব মাটি।

ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিকে। এই নাটকের গানগুলি বিভিন্ন স্বরলিপিকার অভিনয়কালে লিখে গেছেন, পুস্তকাকারে ছাপাও হয়েছে। কিন্তু অভিনয়কালে কোনোদিন সে সব গান স্বরলিপির নিয়মে গাওয়া হয়নি। অভিনয়ের মত করেই গাইতে হয়েছে। আজ যদি সে ঢংটিকে অবজ্ঞা ক'রে হুবহু পুস্তক অনুযায়ী সেই সব গীতিনাট্যের গান গেয়ে অভিনয় করতে হয় তবে সে অভিনয়ের কি পরিণতি হবে তা ভাবলেও দুঃখ হয়।

যে-সব গীতিকবিতাকে রবীন্দ্রনাথ সুরে বসিয়ে গানে পরিণত করেছেন, সে সব গান সুর ছাড়া কবিতার মত ছন্দে পড়ে তার রস গ্রহণ করার কোন ব্যাঘাত হয় না। বহু পাঠক সে ভাবেও রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা পাঠ করে তৃপ্ত হন। কিন্তু বহু নিছক গান আছে গীতিকবিতার মত পড়লে ছন্দের দিক থেকে যাদের ত্রুটি পাওয়া যাবে না। "প্রবাহিনী" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করে বলেছেন যে, "যে-সমস্ত গান প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই।" গানে চিরকালই এ অবস্থা সব দেশেই ঘটেছে। সুতরাং এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত কবি ও গীত-রচয়িতার পক্ষে কেন তা হোলো আমি নিজে যা বুঝেছি তাই আলোচনা করব। কিছু হিন্দি জ্ঞান, বা হিন্দি গৎ-ভাঙ্গা বাংলা গানের বেলায়, শিথিল ছন্দের চেহারা ফুটে উঠেছে। কারণ সব হিন্দি গানে বা গতে কথা বা শব্দের কবিতার মত বাঁধন সব সময় থাকে না। আবার গানের আবেগে রবীন্দ্রনাথের মনে অনেক সময় গানের সুর ও কথা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে, সেই সব গানের কথাকে সাধারণত তিনি

আলাদা ক'রে ছন্দের বাঁধনে বাঁধতে ইচ্ছা করতেন না, ছন্দের গোলমাল থাকলেও। যেমন আছে সেই ভাবে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাই এ-রকম গানের পদে গোড়া থেকেই ছন্দের বাঁধনের প্রতি কড়াকড়ি করবার প্রয়োজন হয়নি ব'লে সেখানে শিথিলতা দেখা গেছে। কিন্তু সে অভাব গানের সুরে ও তালে মিশে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

এইবার আমরা দেখব গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তালের কত রকমের পরীক্ষা করেছেন।

আট মাত্রা ছন্দকে চারে চারে সমান ভাবে ভাগ ক'রে গাইবার চলন আছে সর্ব্বত্রই, কিন্তু একে বিষম মাত্রায় ভাগ করে ৩।২।৩ মাত্রায় যদি আমরা গান করি তাহলে তার চেহারা কি দাঁড়ায়? এই তালের "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে", 'ঐ রে তরী দিল খুলে," জীবনে যত পূজা হোলো না সারা", "কত অজানারে জানাইলে তুমি" ও "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" গান ক'টি শুনলে কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই গানের তালকে এক মাত্রায় কমিয়ে যদি তেওড়া তালের ছন্দে ফেলতে যাই তাহলে গানের চেহারা অনেক বদলিয়ে যাবে। এবং এ তালটিতে যে কটি গানের নাম উল্লেখ করেছি সব কটিই ঢিমে লয়ের গান। আদি সমাজের অন্যতম গায়ক, ৺কাঙ্গালীচরণ সেন, এই তালটি রবীন্দ্রনাথ রচিত নতুন তালরূপেই ১২১১ সালের ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপিতে উল্লেখ করেছেন; তাতে এর নামকরণ করা হয়েছে 'রূপকড়া"। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে তালটি সম্পূর্ণ নূতন কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটি সঙ্গীতে এ তালটি প্রচলিত, এর নাম তারা দিয়েছে "সারতাল"।

নয় মাত্রার তালকে তিন চার রকমে ভাগ করে রবীন্দ্রনাথ কতগুলি গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা" ধর্ম্মসঙ্গীতটিতে নয় মাত্রাকে ৩।২।২।২ ভাগে বসানো হয়েছে। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি পুস্তকে ৺কাঙ্গালী বাবু লিখেছেন, এর নাম "নবতাল"—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নতুন তাল। "ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে" গানটি নয়মাত্রা ছন্দে রচিত, স্বরলিপিতে এর ছন্দ ৺দিনেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ৫।৪ মাত্রায়, কিন্তু "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তার ভাগ তিনে ছয়ে। "যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে" গানটিও নয় মাত্রার। এ গৎটি

৺দিনেন্দ্রনাথ মাত্রায় ভাগ করে যে ছন্দ দেখিয়েছেন তাতে ৩।৩।৩ মাত্রা সমান ভাগে বসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে বলছেন এর ভাগ হবে ৬।৩ মাত্রায়। "দুয়ার মোর পথ পাশে" গানটিও নয় মাত্রার তালের। এর তালের ঝোঁক আসছে পূর্ণ নয় মাত্রার শেষে, প্রথম মাত্রায়। বাংলা সঙ্গীতে বা উত্তর-ভারতীয় কোনো সঙ্গীতে নয় মাত্রার চলন একেবারেই নেই। কিন্তু কর্ণাটি সঙ্গীতেও এ তাল নতুন নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রাকে যে ভাগ করেছেন সর্ব্বত্রই কর্ণাটি সঙ্গীতের সঙ্গে তা মিল্‌বে না। তাদের আছে ৫।২।২ মাত্রার "দুষ্কর তাল", ২।৭ মাত্রার "ফুলতাল"। রবীন্দ্রনাথের গানে এ রকমের কোনো নয় মাত্রার তাল নেই, কিন্তু "দুয়ার মোর পথপাশে" গানটির সঙ্গে কর্ণাটি সঙ্গীতের "বস্তুতাল"-এর হুবহু মিল আছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপিতে, ৺কাঙ্গালী বাবু, রবীন্দ্রনাথ রচিত "একাদশী" নামে একটি তালের উল্লেখ করেছেন, তার গানটি হোলো "দুয়ারে দাও মোরে" রাখিয়া। এই তালের মাত্রা হোলো ৩।২।২।৪। দিনেন্দ্রনাথ "কাঁপিছে দেহ-লতা থরো থরো" গানটিকে এগার মাত্রার তালে লিখেছেন। তার মাত্রা ভাগ করা হয়েছে ৩।৪।৪ মাত্রায়। কিন্তু কোন নাম দেওয়া হয়নি। কর্ণাটি সঙ্গীতে ১১ মাত্রার তাল আছে, তাদের নাম হোলো "মণিতাল", "বিন্দুতাল" ও "নীলতাল"।

দুই চার মাত্রার তালের গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অনেক। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে এর চলন নেই কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতে অতিপ্রচলিত। তারা এর নাম দিয়েছে "পত্তিতাল"। আমাদের দেশে এর কোন নাম পাইনা, রবীন্দ্রনাথও এ তালের কোনো নামকরণ করে যান নি। পূর্ব্বে উল্লেখিত "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে" গানটি এই তালের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ তালটির সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মধ্য-জীবনে।

২।৪ মাত্রার ছন্দকে উল্টো ক'রে রবীন্দ্রনাথ "হৃদয় আমার প্রকাশ হোলো" গানটিতে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এ গানের ঝোঁক দাঁড়াচ্ছে গিয়ে চারে দুইয়ে। এরও কোন নাম পাই না।

৫ মাত্রা তালের মধ্যে ঝাঁপতাল প্রসিদ্ধ; সেখানে আমরা মাত্রার ঝোঁক পাই দুই তিনে, কিন্তু এই দুই তিন মাত্রাকে পুরিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক গানেই

ব্যবহার করেছেন। এর নাম হোলো "ঝম্পক"। এটি একটি অপ্রচলিত তাল। হিন্দি গানে এর চলন দেখা যায় না। এর প্রথম পদে তিন মাত্রা, দ্বিতীয় পদে দুই মাত্রা। এই তালের গান ক'টি হোলো, "যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি," "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে," "ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার," দুখের বেশে এসেছো বলে," "শুভ্র নব শঙ্খ তব" ও "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর"। এতক্ষণ যে-সব তালের বিষয়ে আলোচনা করলাম তার সঙ্গে অনেক তালে কর্ণাটী সঙ্গীতের মিল থাকাতে হয়তো সহজেই মনে হতে পারে, তবে কি সে দেশীয় সঙ্গীতের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল? তার প্রমাণ পাওয়া যায়না, তবে তিনি যে দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে কোনো দিনই পরিচিত ছিলেন না একথাও বলা চলে না। কারণ কর্ণাটী রাগিণীর অনুকরণে তাঁর অনেকগুলি গান আছে। সে গানগুলি কর্ণাটী সঙ্গীত ভেঙ্গেই রচিত, কিন্তু অনেকগুলি গানের ছন্দ তিনি পেয়েছেন কবিতার ছন্দের সাহায্যে।

"পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে" গানটি ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য গান বলে আমি মনে করি। এর মজা হোলো প্রতি কথার দ্বিতীয় অক্ষরে এর তালের ঝোঁক পড়ে। আমরা গানে সাধারণত শব্দের প্রথম অক্ষরের উপরেই তালের ঝোঁক দেখাতে অভ্যস্ত। ছন্দের বৈচিত্র্যহেতু কখনো কখনো অন্য মাত্রাতেও তালের ঝোঁক এসেছে। কিন্তু এ গানটিতে শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরের উপর ঝোঁক প্রায় বরাবরই আছে। আমূল পরিবর্ত্তন না করে, প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিয়ে গাইলে গানটির রূপ সম্পূর্ণ বদ্‌লে অন্য আকার ধারণ করে। এই গানটিও ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি। গানটির ছন্দের ভাগ হোলো ঃ—

+ + + + + +
পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার

+ +
পথ ভোলে।

\+ \+ \+ \+ \+ \+ \+
যেন সিন্ধু পারের পাখি তারা যায় যায়

\+ \+
যায় চলে ॥

রবীন্দ্রনাথের গানের তাল বা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করবার অনেক কিছু আছে। খুঁটিয়ে দেখলে এদিক থেকেই একটি বিরাট বই তৈরী হতে পারে। এই লেখার দ্বারা আমার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই প্রকাশ করেছি, এদিকে যে অনেক কিছু আলোচনা করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ নিয়ে আরো ব্যাপক আলোচনার পথে অনেকেই অগ্রসর হন, এই কথা ভেবে।

শান্তিদেব ঘোষ

মন্তব্য

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ উপরের প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "চল্লিশ বছরের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যত গান রচনা করেছেন তার মধ্যে সংখ্যায় অতি অল্প কয়েকটি যুক্তাক্ষরযুক্ত গান আছে। ঠিক লিরিক্যাল বলতে যা বুঝায় তাঁর মধ্যে কোনো যুক্তাক্ষরবহুল গান আমার চোখে পড়ে নি।"

এই উক্তি মোটামুটি ঠিক হ'লেও এর কতকগুলি বিশেষ ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র একাধিক গানে হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের সঙ্গে দ্বিমাত্রিক যুক্ত অক্ষরের সুনিপুণ প্রয়োগ দেখা যায়। এগুলির প্রত্যেকটিই লিরিক ও কবির কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। এর পর পাই ১২৯৫ সালে প্রকাশিত "মায়ার খেলা"র "এস এস বসন্ত ধরাতলে" গানে ঃ

এস থরথর-কম্পিত মর্মর-মুখরিত
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল-মালতী-বল্লী-বিতানে···

১৩০২ সালে প্রকাশিত "চিত্রা"র "সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার" গানটির প্রত্যেক পংক্তির প্রায় প্রতি পর্বে দ্বিমাত্রিক যুক্তাক্ষর ব্যবহারের যে-সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায় পরবর্তী কালের রচনাতেও তা' বিরল।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কবির চল্লিশ বছর বয়সের পর রচিত যুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট গানগুলির গাম্ভীর্যের ও জোরালো ভাবের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে" গানটি অদ্বিতীয়ঃ

অতি গম্ভীর নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে······
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বর-তলে।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত "কাব্য গ্রন্থাবলী"র "গান" অংশে এই গানটি মুদ্রিত হয়। ঐ অংশের "আহা জাগিল পোহাইল বিভাবরী" গানটিও যুক্তাক্ষরবহুলতার জন্যে বিশিষ্ট।

ঐ কাব্য-গ্রন্থাবলীর "ব্রহ্মসঙ্গীত" অংশেও একাধিক গান আছে যুক্তাক্ষর প্রয়োগের ফলে যেগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। যেমনঃ "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" বা "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে"। অবশ্য এগুলিকে ঠিক "লিরিক"-এর পর্যায়ে ফেলা চলে কিনা তা' তর্কসাপেক্ষ। তবে ১৩০৭ সালে প্রকাশিত "কল্পনা"-র অন্তর্গত যুক্তাক্ষরবহুল "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর" ও "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" গান দুটি যে বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা তাতে সন্দেহ নাই। এর মধ্যে প্রথম গানটি পূর্বে রচিত "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা" গানের পরিবর্তিত আকার।

—সম্পাদক, পরিচয়

অশীতি বর্ষের রবীন্দ্রনাথ

গত পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে বহু সভা সমিতি ও উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কবিগুরুর প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদনের সেই শুভানুষ্ঠানগুলি শেষ হবার পূর্বেই তিনি আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন। তবু তাঁর মৃত্যুতিথি বাঙালীর জীবনে বড় লগ্ন কখনই হ'তে পারে না যদি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের বাণীটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের অন্তরে গ্রহণ করতে না পারি।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগুরুর অশীতিতম বৎসর সকল দিক দিয়ে চির-স্মরণীয় হবার দাবী রাখে। রবীন্দ্র-কাব্যে ঋতু পরিবর্তনের আভাষ দিয়ে বৈশাখ, ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হ'ল 'নবজাতক'। সেই বৈশাখ থেকে ১৩৪৮ সালের বৈশাখে 'জন্মদিনে' ও 'গল্পসল্প' প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত কবিগুরু তাঁর জীবনের নতুন ফসল—তাঁর ভাষায় "বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল"—গ্রন্থের পর গ্রন্থে থরে থরে নিবেদন করেছেন :—নবজাতক (কবিতা)—বৈশাখ, সানাই (কবিতা)—আষাঢ়, ছেলেবেলা (বাল্যস্মৃতি : গদ্য)—ভাদ্র, চিত্রলিপি (চিত্র ও কবিতা)—আশ্বিন, তিন সঙ্গী (গল্প)—পৌষ, রোগশয্যায় (কবিতা)—পৌষ, আরোগ্য (কবিতা)—ফাল্গুন, জন্মদিনে (কবিতা)—বৈশাখ, ১৩৪৮, গল্প-সল্প (ছোট গল্প ও ছড়া)—বৈশাখ, ১৩৪৮। পাঁচখানি কবিতার বই, তিনখানি গদ্যগ্রন্থ এবং চিত্রলিপি একখানি—মোট নয়খানি গ্রন্থ। এ ছাড়া এই বৎসরের নানা সময়ে প্রদত্ত অভিভাষণের সংখ্যাও কিছু কম নয়—বিশেষ করে ৭ই পৌষে 'আরোগ্য'ও গত নব বর্ষের দিনে 'সভ্যতার সঙ্কট' অভিভাষণ দুটি দেশবাসীর প্রাণে গভীর সাড়া জাগিয়েছে। অপ্রকাশিত বহু রচনার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে না হয় নাই করলাম।

রবীন্দ্রনাথের বয়স এবং শরীরের তৎকালীন অবস্থা স্মরণ করলে হিসাবের এই ফলাফলে স্তম্ভিত হতে হয়। অন্তরের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে জরাগ্রস্ত,

দুর্বল দেহের ছদ্ম আবরণে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী না হ'লেও 'চিরযুবা' ত বটেই। বাঙলার তথা ভারতের তিনি হৃদয়-জয়-করা নিত্য নবীন কবি।

আলোকের বিচিত্র বর্ণসমারোহে একদিন ভারতের পূর্বগগনে যে গ্রহ-রাজের উদয় হয়েছিল সুদীর্ঘ অশীতি বৎসর পরে সেই দীপ্ত সূর্য যখন পাটে বসলেন নির্বাক বিস্ময়ে দু'চোখ ভ'রে দেখলাম সূর্যাস্তের মহিমময় শোভা!

গোধূলির রাঙা আকাশ ক্রমে হয়ে এল গৈরিকবর্ণ; শান্ত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ধারণ করল যেন ভৈরবী-বেশ। প্রাণের অন্তহীন আনন্দ এখন সমাহিত, সংহত। অন্তরের উপলব্ধির সুগভীরতম ব্যঞ্জনায় তাই স্বতঃস্পন্দিত কবির শেষ রাগিণীর সুরগুলি।

'নবজাতকে' কবির কণ্ঠে শুনি 'শেষ কথা' ঃ—

"এ ঘরে ফুরালো খেলা
এল দ্বার রুধিবার বেলা।
বিদায় বিলীন দিন শেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপন চর
জীবনের অন্তরতর।
ক্ষণিক মুহূর্ত তরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্ন ভাঙা চোখে।"

'সানাই' কাব্যগ্রন্থে 'সাহানার রাগিণীতে' কবির বৈরাগী মন যেন সহসা একবার জেগে ওঠে; ছোট ছোট দশ পনেরোটি কবিতায় গানের সুরে চকিতে অনুরণিত হয়ে ওঠে ক্ষণকালের জন্যে; আবার সে 'চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে'। সেখানেও শুনি কবির কণ্ঠে জেগেছে 'দূরের গান' ঃ—

"সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থ পথগামী
যেথায় হঠাৎ নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।"

মন যখন নিরুদ্দেশে পাখা মেলে, তখন নিকটের জগৎ, বস্তুর জগৎ গোধূলি আলোয় স্বপ্নের মত লঘুপদক্ষেপে অন্তর্ধান হয় ঃ—

"দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলি লগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।"

'সোনার তরী'র চিররহস্যময় সুদূর নিরুদ্দেশ যাত্রা'র এ কোন রহস্যনিবিড় চরম পরিণতি ! এই অচিন্ত্য অসীম অন্ধকারের মুখোমুখী হয়েছিলেন কবি ইতিপূর্বে একবার কয়েক বৎসর আগে, যার ফলে আমরা লাভ করেছিলাম 'প্রান্তিক'। সেই অনির্বচনীয় লোকের দেহলীদ্বারে তিনি আর একবার দাঁড়িয়েছিলেন গত বৎসর আশ্বিন মাসে। সুকঠিন সেই অসুস্থতার পর যখন তাঁর জ্ঞান হল, সর্বপ্রথম আমরা পেলাম 'জপের মালা' কবিতাটি ঃ—

"একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা বিহান বেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্যনাটে,
সাঁজের বেলায় ছায়ায় তা'রা
মিলায় ধীরে।

* * *

প্রহর পরে প্রহর যে যায়
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে ॥" (রোগশয্যায়—৩)

কবির কাব্যজীবনে যথার্থই দেখা দিল প্রৌঢ়ঋতুর সার্থক ফসল ; বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের পরম ঔদাসিন্য। নাতিদীর্ঘ এই কবিতাগুলির মধ্যে মূর্ত হয়েছে কবির পরিণত জীবনের নিগূঢ় প্রেরণা। সঙ্কীর্ণ সীমার সুকঠিন বন্ধনের অন্তরালে সীমাতীতের সার্থক স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রকাশ পাঠকের মনকে মন্ত্রের মতো আবিষ্ট করে।

'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কবির নিভৃততম অন্তরের অন্তর্মুখী মালাজপের এক একটি যেন জপমন্ত্র। খ্যাতি-

মুক্ত নিঃসক্ত চিত্তের এই বাণীগুলি একটির পর একটি কবি নিবেদন করেছেন তাঁর জীবনের অন্তরতমের চরণে। তাই এতে কাব্যকলার লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র নেই। গভীরতম উপলব্ধির কথাগুলিকে অতি সহজ অলঙ্কারবর্জিত ভাষায় (রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে যে পরিমাণ অলঙ্কারবর্জন সম্ভব) সোজাসুজি বলার আগ্রহই হ'ল এই কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। ঝঙ্কারের ধ্বনিতরঙ্গ অপেক্ষা সুরের একাগ্রতায় এদের পরিচয়ের বিশিষ্টতা। অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্তিগত বেদনার সুর বিশ্ববেদনার অঙ্গীভূত হয়ে এক গভীর রহস্যময় অনির্বচনীয়তা লাভ করেছে; তবু কয়েকটি কবিতার ব্যক্তিগত সুর বড় তীব্র, বড় করুণ হয়ে পাঠকের হৃদয়কে ব্যথিত ক'রে তোলে, মনে করিয়ে দেয় সেই সব দিনের কথা যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের মাঝখানে থেকে আমাদের জীবনকে রসের নিত্য নূতন ধারায় সঞ্জীবিত করে নানা দিক থেকে সার্থক করেছেন। কবির দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে ঃ—

"অজস্র দিনের আলো
জানি এক দিন
দু-চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেলো ছায়াখানি।"

আলোকোজ্জ্বল এই বিপুল বিশ্বে মানবের দাবি অতিথির দাবির মতই অসম্পূর্ণ অনিত্য, কবির মন নতশিরে এই নির্মম সত্যকে স্বীকার করেছে। স্রষ্টার বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন টুকরো যা তাঁর ভ্রুক্ষেপহীন রথযাত্রার পথে ধূলায় অবশিষ্ট পড়ে থাকে জীবনের প্রদোষলগ্নে কবি তাঁর বেদনার জগত, মায়ার জগত, কাব্যের জগতটিকে তারি সাহায্যে রচনা করতে চেয়েছেন।

শরীর ও মনের এই গভীরতম বেদনার পথেই কবি এ জীবনে আর একবার অতি নিবিড় ক'রে যেন পৃথিবীর মাটির কোলে ফিরেছেন বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' মুখর নাট্যছন্দে এবারের

ফেরা একেবারেই নয়। আলোকের আনন্দময় অমৃত-উৎসস্রোতের নীলিম বাণী নব নব ছন্দে নিত্যকাল ধরে বিম্বিত রূপায়িত হয়ে উঠছে, ধরিত্রীর স্নিগ্ধ 'শ্যামল আহ্বানে'। 'রোগশয্যা' ত্যাগ ক'রে কবি তাঁর 'আরোগ্যের' শুভলগ্নে 'জন্মদিনে'র ধ্যানাসনটি এবার পেতেছেন স্বর্গ ও মর্তের সেই ধূলিধন্য পুণ্যমিলন কেন্দ্রে। তাঁর জীবন চরিতার্থ হয়েছে অন্তরে এই মহামন্ত্রটিকে গ্রহণ ক'রে :—'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—এই মধুলোক থেকে বিদায়ের আগে তাই :—

"শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
ব'লে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি ॥" (আরোগ্য—১)

রোগমুক্ত কবির দৃষ্টিতে আজ রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্নতা। স্বর্গে মর্তে আনন্দের ঐক্য দেখার মত উদারতা জেগেছে তাঁর নিষ্কলুষ দুই চোখে। শুভ্র আলোকের স্নানপুণ্য প্রভাতে তাই কবি দেখেছেন পৃথিবীর বুক জুড়ে :—

"অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চির নূতনের অভিষেক
চির পুরাতন বেদী তলে।"

এই মাটির পৃথিবীর মুখের পানে চেয়ে বিপুল জনতার কর্মব্যস্ত অনাড়ম্বর জীবনের চিত্র কবি দেখেছেন নগরে প্রান্তরে। সর্বযুগের সাম্রাজ্যলোভীর শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ নিশ্চিহ্ন ক'রে চিরজীবী হয়েছে এ সংসারে গণসাধারণের নিত্য প্রয়োজনের জীবনপ্রবাহ। তাদের সেই শান্ত জীবনের প্রশান্ত কলকলরবে কবি শুনেছেন "জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি"—(আরোগ্য—১০)।

অশীতিবর্ষের কূলে এসে কবির দৃষ্টি যুগপৎ গভীর এবং উদার হয়েছে অন্তরের এবং বাহিরের ব্যাপকতর অভিজ্ঞতায়। সৃষ্টির ভঙ্গুরতা নিত্য-

পরিবর্তনশীলতা তাই যতই কবির চেতনায় প্রকট হয়েছে, অন্তরে ফুটে উঠেছে বিশ্বসৃষ্টির গভীরের নিত্যনন্দিত ছন্দ।

আপন সত্তাকে এইভাবে ক্রমাগত ব্যাপকতর বিস্তৃততর পটভূমিকায় উপলব্ধি করার বাণীই হল 'জন্মদিনে' গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতার অন্তর্নিহিত বাণী। বিশ্বসৃষ্টির ছন্দের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ছন্দের ঐক্যবোধ নিহিত আছে মানবের চেতনার গভীরতম তলদেশে। ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে যে অনাদি প্রাণশক্তি লক্ষকোটি জন্মদিনের মালা গেঁথে জীবলোকের বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেচে এবং রূপে রূপান্তরে আপনার আশ্চর্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে, এই ঐক্যের বোধ তার চেতনায় লুপ্তপ্রায়। (জন্মদিনে—২,৫) ইহজীবনের চরমতম লগ্নে যখন কবির ব্যক্তিজীবনের আবরণ উন্মোচিতপ্রায় তখন সেই অনাদি অনন্ত ঐক্যের বোধ কবির অন্তরে স্ফুটতর হয়ে উঠছে। দেশে বিদেশে ভ্রমণকালে নানা মানবের প্রীতিসংস্পর্শ যখন কবি লাভ করেছেন তখনও এই গভীরতম অনুভূতির পথেই কবি ধীরপদে অগ্রসর হয়েছেন :—

"যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।" (জন্মদিনে—৩)

তাঁর কাব্যে যেখানে নিম্নতম স্তরের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা বিস্তৃতি লাভ করেনি আজ সেই সব অসম্পূর্ণতার নিবিড় বেদনায় কবি আহ্বান জানিয়েছেন ভাবী কালের কবিকে উদাত্ত কণ্ঠে :—

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

*　　*　　*

এসো কবি, অখ্যাতজনের নির্বাক মনের।" (জন্মদিনে—২০)

এই গ্রন্থে কোথাও কোথাও পাই কবির বালক বয়সের স্নিগ্ধ সরল স্মৃতি-চিত্র (১৯ নং), যেন তাঁর 'ছেলেবেলা'র কয়েকটি পৃষ্ঠা ছন্দের স্বেচ্ছাবন্ধন

স্বীকার করেছে 'জন্মদিনে'র পাতায়। এ যেন মুহূর্তকালের জন্য স্থষ্টিকর্তার ছেলেমানুষির আসরে কবির লুকিয়ে যোগ দেবার আয়োজন। মৃত্যুর বিকৃতির আবরণ মোচন ক'রে চিরজীবনের পায়ে প্রণাম নিবেদনের সাধনাই কিন্তু জন্মদিনের কবির মর্মগত সাধনা। পূর্বেও বলেছি, আবার বলি, কবির সদ্যঃপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতার পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় কারণ এগুলি কবির জীবনের চরমতম লগ্নের ধ্যানের সম্পদ। উপনিষদের বহু মন্ত্রের সঙ্গে এদের গোত্রগত মিল আবিষ্কার করা অনেক ক্ষেত্রেই মোটেও কঠিন হয় না। পাঠকের অন্তরে উপলব্ধির গভীরতম স্তরে এদের আবেদন। সে আবেদন শেষ হয়েও যেন শেষ হবার নয়। ভাষা ছন্দ ও গঠনের দিক থেকেও এদের অনেকগুলিতেই যেন পাই ভাবী যুগের কবিতার আভাস; কল্পনার অপেক্ষা মননজাত জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতার রসে অধিকাংশ কবিতাই পুষ্ট। এগুলির তুলনা করতে ইচ্ছা হয় ব্রাউনিঙ-এর শেষ বয়সের কবিতার সঙ্গে। প্রভেদ যেটুকু নজরে পড়ে তার জন্যে প্রধানত দায়ী এঁদের পরস্পরের ভিন্ন ধরণের ভৌগলিক ও আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিক।

রবীন্দ্রনাথের নূতনতম গদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ছেলেবেলা' এবং 'তিন সঙ্গী'র প্রচার নানা কারণে পাঠকসমাজে সহজে হবার সম্ভাবনা। ছেলেবেলা' কতকাংশে মেটাবে 'জীবন স্মৃতি' পাঠের পর পাঠকদের এতদিনের অসম্পূর্ণ তৃপ্ত ক্ষুধা; কবির বালক বয়সের সম্পূর্ণতর চিত্র আমরা লাভ করলাম 'ছেলেবেলা'তে। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির পথে যাঁরা পথিক এই গ্রন্থটিতে তাঁদের লাভ অপরিমেয়। ভাষার এ সরল স্বচ্ছ রূপ যা তর্ তর্ বেগে গল্প ব'লে চলে, অথচ মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতির সোজাসুজি প্রকাশও যে-ভাষাতে প্রয়োজনমত অসম্ভব হয় না রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনব্যাপী সাধনার ফলে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এতদিনে দেখা দিল সেই ভাষা। কথ্য ভাষায় বহু শব্দের ব্যঞ্জনাময় যে প্রাণবন্ত প্রয়োগ তিনি সাবলীল ভঙ্গীতে করেছেন তারো তুলনা হয় না।

ছেলেবেলার ভাষার এক টুকরো শোনা যাক্ ঃ—

"হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল দেখা নজর, এ যে ঘাড়ে গর্দানে একটা

একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে সেই রৌদ্রঢালা হল্‌দে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।"

(ছেলেবেলা : পৃঃ ৬৬)

ছবি আঁকার উপযুক্ত ভাষা বটে। যোগ্য লেখকের হাতে পড়লে ভবিষ্যৎ-কালে ছেলেদের সাহিত্যে অপরিসীম শক্তির পরিচয় দেবে এই ভাষা।

'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলিতে আখ্যানের চেয়ে নায়ক নায়িকার কথোপকথনের ভাষা আমাদের অধিক চমৎকৃত করে। বুদ্ধির বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে উজ্জ্বল প্রত্যেকটি উক্তি। গভীরতর উপলব্ধির বাণীগুলিও কবির হৃদয়ের বাণীরই প্রতিধ্বনি—নায়ক নায়িকার চিন্তার সংঘাতের ফাঁকে ফাঁকে উৎসারিত হয়েছে। পুরুষের জীবনের চরম সার্থকতা কর্মের ও জ্ঞানের তপস্যায়। সেই তপের আসনে তাকে অবিচলিত নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব হ'ল নারীর। সহধর্মিনীর জীবনের এই হ'ল সাধনা,—এ সাধনাই স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাকে অনুপ্রাণিত করে স্বামীর অসম্পূর্ণ ব্রতকে উপযুক্ত আয়োজনে উদ্‌যাপন করতে। গল্পের ভিতরেও রবীন্দ্রনাথ নবযুগের যে আদর্শ চিত্র কল্পনা করেছেন তা 'নবজাতকে'র কবিরই উপযুক্ত :—

অচিরা ডাক দিলে, "দাদু।"

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেখে কাছে এসে মধুর স্নেহে বললেন. "কী দিদি।"

"তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে ?—তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।"

"হাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলতা বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

(তিনসঙ্গী—শেষ কথা)

'গল্পসল্পে'র রবীন্দ্রনাথ 'সে,' 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি'র রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। জীবন-সায়াহ্নের কূলে এসে ক্ষণিকের জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণ

যেন চির শ্যামল শিশুতীর্থের মুক্ত প্রাঙ্গণে লীলা-বিলাসে মগ্ন হয়েছে। সুপরিণত গল্পে ব্যবহারের উপযুক্ত রূপ দেখি 'গল্প সল্পে'। রোগশয্যায় শুয়ে কী পরিমাণ কষ্ট স্বীকার ক'রে শব্দের পর যথাযথ শব্দ প্রয়োগ ক'রে মুখে মুখে গল্পগুলি কবিকে গেঁথে তুলতে হয়েছে তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর। যে পরিমাণ সহজ এদের বাইরের রূপ তার সহস্রগুণ কঠিন সাধনা গোপন আছে গল্পগুলির ভাষার অন্তরালে। শব্দের লীলার 'এ একরকম জাদুবিদ্যা বললেই হয়।' ছেলে বুড়ো সকলের মনের উপযোগী খোরাক জোটে এর গল্পগুলিতে, কবির কল্পনারও এমনি জাদু; উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে 'বড়ো খবর,' 'বাচস্পতি', আরো অনেক গল্প। পরিপাকের শক্তি অনুসারে বালক যুবা এবং বৃদ্ধের খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা অনায়াসে করা চলবে এই অতি আশ্চর্য্য গ্রন্থটিতে।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে 'গল্প সল্পে' কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কতকগুলি সদ্যো-রচিত ছড়া। এদের সম্বন্ধে নিজের চেষ্টায় বিশদ ব্যাখ্যা কিছু না দিয়ে পাঠকদের পড়ে দেখতে বলি 'গল্পসল্পে'র সূচনার কবিতাটি এবং 'জন্মদিনে'র ২০নং কবিতাটি ('মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি' ইত্যাদি)। সেখানে কবির কণ্ঠে ছড়াগুলিই যেন কথা বলেছে।

জীবনের অশীতিতম বর্ষে দেহ যখন কঠিন রোগে কাতর, জীর্ণ জরা নিঃশেষে ঝরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন আপনার অফুরন্ত প্রাণের বিচিত্র পুষ্প বিকাশে স্বদেশবাসীদের চিত্ত আমোদিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কোনো পত্রে পড়েছিলাম তিনি লিখেছেন, "বিধাতা আমাকে বর দিয়েছেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না।" জরাজয়ী প্রচণ্ড এই আত্ম-প্রত্যয়ের বলেই কবি পলে পলে সার্থক ক'রে তুলেছেন তাঁর নিজের জীবন এবং তারি সঙ্গে বিধাতার এই বরটিকে জয়যুক্ত করার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন ত্রিশকোটী দীর্ণ প্রাণ ভারতবাসীর জীবনে।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

(১)

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়। নেমে দেখি আন্তর্জ্জাতিক আনন্দ মেলা লেগে গেছে যেন। নানা জাতির লোকের সমাগম হয়েছে। গরমের ছুটি শেষ হতে একদল সিন্ধি ছাত্রী শান্তিনিকেতনে ফিরছে, তাদের সঙ্গে বাঙ্গালীও রয়েছে কতকগুলি। দু'জনকে মনে হলো পাঞ্জাবী। ওরা সকলে ছোট ছোট দল ক'রে কলগুঞ্জনে ভরিয়ে দিয়েছে ওদিককার প্ল্যাটফর্ম। তখন বৃষ্টি সবে থেমেছে। চারিদিক স্নিগ্ধ আর পরিচ্ছন্ন। সূর্য্যের ওপর রঙিণ মেঘের আবরণ, লাল কাঁকর, সবুজ ঘাস, চঞ্চল মেয়েদের হাসির ছটা আর শাড়ীর রঙ অদ্ভুত ভাবে আনন্দ বিস্তার করেছে।

যাত্রার প্রথম ভাগটি কেটেছিল একটি নূতন কবিতার বইয়ের পাতায় পাতায়। তখনও অনেকগুলি পাতা কাটা হয়নি কিন্তু খোলা হাওয়ায় সেই আনন্দের স্পর্শ পেয়ে মন আর ছন্দের মধ্যে ঢুকতে চাইল না।

একজন ইউরোপীয়কে দূরে পায়চারি করতে দেখলাম। কৌতুহল হলো জানবার হাতের বইখানি কি। উঠে কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক অতিকায় কাফরীকে দেখতে পেলাম। তার অঙ্গে মূল্যবান পোষাক আর পায়ে ভারি গামবুট। বাংলা দেশের অভ্যন্তরে সে দৃশ্য একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার বলে মনে হলো। ভুলে গিয়েছিলাম যে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে দেশান্তরে চলে যাবার গাড়ি। ইংরাজি কেতায় ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে প্রশ্ন করলাম—"আপনি কি আফ্রিকা থেকে আসছেন?" লোকটি এমনিতে আমার চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা, তার ওপর আরও হাতখানেক ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললে, "আমার পূর্ব্ব পুরুষ আফ্রিকাতে বাস করতেন বটে তবে আমি আসছি আর এক দেশ থেকে।" কথা বলার ধরণে উচ্চ শিক্ষিত বলে মনে হ'ল। বললাম—"আমার কৌতূহলের কারণ আমি সেই দেশ হতে এসেছি।" শুনে সে আর বাক্যব্যয় না করে সটাং গাড়ীতে উঠে বসলো। ভাবে বুঝলাম আমারই মত বিস্মিত হয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ দাস ব্যবসায়ীদের কল্যাণে নিগ্রো চিত্তে যে আতঙ্ক ও গ্লানি পুঞ্জিত হয়েছিল তা আজও নিঃশেষ হয়নি তাই বোধ হয় সে দুর্ভাগা দেশের শিক্ষিত লোক বিদেশীর কাছে মাতৃভূমির আলোচনা করতে চায় না।

যাই হোক অযাচিত ভাবে আলাপ করবার ইচ্ছা নিশ্চয় সংক্রামক রোগের মত সকলকেই প্রগল্‌ভ করে তুলেছিল তাই জনৈক অপরিচিত দক্ষিণী যুবক বললে, "শান্তিনিকেতন যাবেন ত এইবেলা লাইন পার হই চলুন, গাড়ি দেখা যাচ্ছে।"

ছেলে মেয়েরা বহু দূরে আত্মীয় স্বজনকে ফেলে যাচ্ছে বিদ্যালয়ে ফিরে কিন্তু আনন্দ ও উত্তেজনা দেখে মনে হলো ছুটি পেয়েছে বুঝি।

ছোট দেখে একটি কামরা বেছে নিয়ে উঠে পড়লাম এবং গাড়ি ছেড়ে যেতে আপশোষের পরিসীমা রইল না। পাশের কামরাটি মেয়েদের কণ্ঠ-সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠল। তখন বদল করবার উপায় নেই তবে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামতে জানলা তুলে দিয়ে সেই অস্বস্তিকর ধ্বনিকে অস্পষ্ট করা গেল।

আমার সহযাত্রী মেয়ে তিনটি নেহাৎ বাচ্ছা কিন্তু প্রজাপতির মত প্রফুল্ল। কোন সঙ্কোচ নেই। সব চেয়ে ছোটটি তার অভিভাবককে প্রশ্ন করে বসলো "আচ্ছা ছোট মামা, আমরা পেটের ভেতর এক একটা অপারেসন করলেই ছেলে হয়ে যেতে পারি ত?" সরল মন কলকাতা থেকে যে প্রশ্ন বহন ক'রে এনেছে তার কি উত্তর পায় জানবার জন্যে কান খাড়া রাখলাম। মামাটি বোধ করি শান্তিনিকেতনেরই ছাত্র। একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল, "কাটা-কুটি করলে ভালকে খারাপ করা যায় কিন্তু ভালকে আরও ভাল করা যায় না।" তাদের মধ্যে বড় মেয়েটি খিল খিল করে হেসে বললে—"ইস্ তার মানে বলতে চাও ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে ভাল—কখনই না।" কথা এত সহজে মোড় ফিরলো দেখে আশ্বস্ত হলাম।

মেয়েরা জলখাবারের কৌটা বার ক'রে পরিপাটি ক'রে খেয়ে সব গুছিয়ে রেখে গল্প সুরু করল শান্তিনিকেতনের—কলকাতাকে ওরা পেছনে ফেলে এসেছে।

বোলপুর ষ্টেশনে দেখলাম লোকারণ্য। সিন্ধি মেয়েরা ভীড় ক'রে আমারই আসে পাশে উঠে বসল মোটর বাসের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে

উচ্চৈঃস্বরে গান সুরু করে দিল। একটি ছোট মেয়ে স্থানাভাব দেখে উঠে বসল আমার কোলে। কারও কোন সঙ্কোচ দেখলাম না। পথে জল কাদার জন্যে গাড়ি চলেছিল মন্থর গতিতে। গানের মাঝে মাঝে আনন্দধ্বনি উঠল—“এই যে চীন-ভবন,” “এই যে কলা-ভবন,” ইত্যাদি। আমার কোলের মেয়েটি যেই বলে উঠেছে “এই যে কিচেন” অমনি হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। এতক্ষণে আমি আমার বয়সের মর্য্যাদা ভুলে ওদের দলে ভিড়ে গেছি। আমিও হাসলাম। ছাত্রী নিবাসের সামনে থামতে কতকগুলি মেয়ে ছুটে এসে আনন্দ চিৎকারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল জানালার ভেতর দিয়েই। আমি নামলাম সব চেয়ে শেষে, রতন-কুঠিতে।

পাশের ঘরে একটি পার্সী মহিলা বাংলা গান গাইছিলেন মৃদু স্বরে। বেসুরো হলেও মন্দ লাগছিল না। একটু পরে আশ্রয়-দাতা বন্ধু এসে অনুপস্থিতির জন্যে যে জবাবদিহি দিলেন তার পর আর কিছু বলবার রইলো না। বললেন কতকগুলি সদ্য রচিত কবিতা শোনবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কবির কাছ থেকে।

রাত্রে আহারের পর বারান্দায় বিছানা বিছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সামনেই ‘উত্তরায়ণ’ বহু সংখ্যক অনুজ্জ্বল বিজলি বাতি ধারণ ক’রে রূপ-কথার অলঙ্কারখচিত অতিকায় বাক্সের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকদিন পরে যাওয়ায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখলাম। শুনলাম কবি নাকি ‘শ্যামলী’ ছেড়ে ‘পুনশ্চ’তে উঠে গেছেন। মেঘ চোঁয়ানো রঙিন চন্দ্রালোকে বঙ্কিম দিগন্ত-রেখা, খোয়াই আর নিঃসঙ্গ নিথর তালগাছগুলি ক্রমশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। মনে হল দিগন্তরেখার অন্তরালে রয়েছে মহাশূন্য।

কিছুদূর গিয়ে এক বিরাট জলাশয়ে এসে পড়লাম। অবিশ্রান্ত মণ্ডুক-গীতি আর ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত জলের কলোচ্ছ্বাস এতক্ষণে নৈসর্গিক পরিবেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। বর্ষাতি পেতে ব’সে পড়লাম রাস্তার ধারে। পূর্ব্বাকাশে মেঘের রাশ বাতাসের আঘাতে শতখণ্ড হয়ে ভেসে যেতে জ্যোৎস্নালোক উজ্জ্বলতর হলো কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ভাঙলো না। প্রকৃতিকে মনে হচ্ছিল অলৌকিক ভাবে নির্ভার, অবয়ব-শূন্য—সমস্ত যেন কল্পনার কচি ডালের উপর ন্যস্ত।

বন্ধুবর বললেন, "মানছি খুব সুন্দর কিন্তু বসন্তের সময় এলে দেখবে আর এক সৌন্দর্য্য। চাঁদের আলোতে তখন আনন্দ ঝরে।"

তিনি সম্প্রতি এসেছেন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে, কিন্তু কবি ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওঁর পরিচয় বহুদিনের। নূতনত্বের মোহ না থাকলেও উত্তেজনায় ভরপুর। বললেন,—"প্রথম যখন কাজ নিলাম কবি বললেন যে পিঠ চাপড়ে প্রকাশ করতে না পারলেও ভালবাসতে আর কৃতজ্ঞবোধ করতে জানেন তিনি। আরও বললেন, 'এ জায়গাকে ভালবাস তা জানি, এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে নাও। ছোট ছোট সাহিত্যমণ্ডলী গঠন কর।"

ফেরবার সময় দেখলাম আশ্রমের বাতি তখনও জ্বলছে। শুনলাম কোন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তির আসবার কথা আছে। গ্রীক ম্যারাথন রানার-এর বুকের আওয়াজের মত ইঞ্জিন চলছিল ধক্ ধক্ করে।

কবির গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে আমরা মশারির মধ্যে প্রবেশ করলাম। মেঘের রাজ্যে তখনও চাঞ্চল্যের অবসান হয় নি। এলোমেলো বাতাস মাঝে মাঝে নেমে এসে মশারিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলছিল। উজ্জ্বল চাঁদের আলোর নীচে বিজলি বাতিগুলিকে দেখাচ্ছিল নিষ্প্রভ অলঙ্কারের মত।

ঘুম ভাঙলো পাখীর ডাকে। অন্ধকার তখন কেটে গেছে। চোখ খুলে দেখলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুগ্ধফেননিভ আবরণের পূর্ব্বভাগটি শুধু রক্তাভ। ব্যাঙগুলো ঘুমিয়েছে। ইঞ্জিন শান্ত। পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। অতিথিশালার কাছে ন্যুব্জ চলনভঙ্গী আর স্ফীত শাড়ী দেখে বুঝলাম বাইরে বাতাসের বেগ প্রখর। ঘণ্টা বাজল মধুর ধ্বনিতে। পাকঘর থেকে হালুয়া আনিয়ে খেয়ে যখন পাঠাগারে গেলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে কিন্তু বাতাসের বেগ খরতর।

পাঠাগারের সুদর্শন ও সুরসিক অধ্যক্ষের হেপাজতে আমাকে রেখে বন্ধুবর হলেন উধাও, কিন্তু আলাপ জমাবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিটি পরিদর্শনে প্রবেশ করলেন। বাইরে এসে দেখি গাছের ছায়ায় ছায়ায় অধ্যাপনা চলেছে। ছাত্র ছাত্রীরা বসেছে বৃত্তার্দ্ধ আকৃতির সারি ক'রে আর

জনৈক আচার্য্য তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মাথাটি নেড়ে নেড়ে কিসের ব্যাখ্যা করে চলেছেন। বন্ধুবর দেখলাম খোলা আকাশের নীচে স্থাপিত একটি কাষ্ঠাসনে বসে বোঝাচ্ছেন চাষীর ব্যক্তিগত স্বত্বের কথা। বৃষ্টি নামতে বিচিত্র চিত্র-লিখনে রঞ্জিত দেওয়ালের কাছে বহু লোকের সমাগম হ'ল পলকের মধ্যে। চীনা, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের লোককে দেখলাম সেখানে। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি পরিস্ফুট। সকলের মুখই সস্মিত, সকলে আলাপ করবার জন্যে উন্মুখ। গণ্যমান্য ব্যক্তিটির তক্‌মাধারী আরদালিকে অসহায়ের মত ভিজতে দেখে খুব আনন্দ পেলাম কেন জানিনা। একজন সুন্দরমূর্ত্তি যুবক বন্ধুবরকে বললেন, "মৌলানার মৃত্যুর আঘাত কাটিয়ে উঠতে আমরা এখনও পারিনি।"

বৃষ্টি কমতে সমবায়-বিপনির দিকে যেতে যেতে জিয়াউদ্দীন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। বিদেশী যুবকটি নিজের চরিত্রের মাধুর্য্যে শুধু যে সকলের হৃদয় জয় করেছিল তা নয়, সে অল্পদিনের মধ্যে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল শান্তিনিকেতনে, যার কল্যাণ কবিকেও স্পর্শ করেছিল। যুবকটির অকাল মৃত্যুতে কবি নাকি বড় শোক পেয়েছেন।

কতকগুলি ছেলেমেয়েকে ইচ্ছা ক'রে ভিজতে দেখলাম। তারা রাস্তার কাঁকর ছেড়ে ছোট ছোট পা গুলিকে চালনা করছিল জলের মধ্যে দিয়ে। কেউ তাড়া দেবার নেই তাই আনন্দ ওদের ধরে না।

আমাদের খাবার ঘরে যেতে একটু বিলম্ব হ'ল। একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে কোলে নিয়ে একজন প্রসন্নচিত্ত বিধবা মহিলা এলেন আমাদের খাওয়ার তদারক করতে। বিনীত ভাবে বললেন যে মাছের ভাগ হয়ত' অপ্রতুল হতে পারে কারণ কোন এক প্রতিষ্ঠান হ'তে বিশ জন মেয়ে এসেছে কোন সংবাদ না দিয়ে। শুনলাম এ রকম অপ্রত্যাশিত অতিথিদের আগমন ওখানে প্রায়ই ঘটে।

আমরা ফিরে গিয়ে রতন-কুঠির বারান্দায় শুয়ে গল্প করলাম অনেকক্ষণ। পার্সী মহিলাটি অনেকবার পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করলেন কিন্তু তাকিয়ে দেখলেন না। পাশাপাশি সবই চক্ষুর গোচরে ঘটলেও পরস্পরের স্বাধীনতা মান্য করে চলা হচ্ছে এখানকার প্রচলিত ভব্যতা।

দুপুরের দিকে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উপর্য্যুপরি বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও মাটি নরম হয়নি কিন্তু খোয়াইয়ের মধ্যে বারিধারা অনুসরণ ক'রে যেতে পা বসে যেতে লাগলো। আমরা দু'জনে বয়সের কথা ভুলে ছোট ছোট বালকদের মত ছুটোছুটি সুরু করে দিলাম। অকারণে ফাটলের মধ্যে ছাতার চাড় দিয়ে বড় বড় লাল মাটির চাঙড় দ্রুত প্রবাহিত জলের মধ্যে ফেললাম। ছোট ছোট অজস্র জলপ্রপাতের হ্রস্ব প্রতিরূপ সৃষ্টি হ'য়েছিল বিচিত্র ভাবে। অনেক জায়গায় ক্ষীণ জলের গতি হয়েছিল বিস্ময়করভাবে প্রখর। হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। একটি সাদা পাখী তার শীর্ণ পা দুটিকে পেটের নরম পালকের মধ্যে লুকিয়ে ঝপ করে নেমে এসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক ছাড়ল। মাটি স্পর্শ করবার আগে সে একটি ছোট জলাশয়কে চক্রাকারে ঘুরে নিল কেন বুঝলাম না। দূরে গাছের ওপর থেকে সাড়া আসতে পাখীটির সঙ্গীকে দেখতে পেলাম। দিনুবাবুর সাবেকী বাড়ীর পিছন দিকটা বন্ধুবরকে এতখানি আকৃষ্ট করে কেন প্রশ্ন ক'রে কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না। কোন বিস্মৃত স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত আছে নিশ্চয়। আমার কিন্তু সমস্ত পরিবেশকে অখণ্ড ভাবেই ভাল লাগে। সে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব হচ্ছে যে আলো-অন্ধকারের সামান্য তারতম্য আর ঋতুর ঈষৎ পরিবর্ত্তনও বৈচিত্র্যের প্রলেপ বুলোয়। কিন্তু এত নিরাভরণ আর এত সরল যে ভাষায় তা' উজ্জীবিত করা অসম্ভব।

বিকেলে সাধারণ পাকঘরে দুধ জলখাবার খেলাম, ছোট ছোট ছেলেরা (শিখ, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী ইত্যাদি অনেক জাতির বালক দেখলাম) চড়াই পাখীর মত কিচির মিচির ক'রে গল্প করতে করতে নিঃশেষ করে ফেললে তাদের বরাদ্দ অংশ। পরিমাণে আমাদেরই সমান কিন্তু খেলার তাড়া ছিল বোধ করি। দুধ দেখলাম খাঁটি।

সেখান থেকে গেলাম চীন ভবনে। একজন হলুদ বস্ত্র-পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক যুবক আমাদের দেখিয়ে নিয়ে এল প্রাচীন তিব্বতী পাণ্ডুলিপির রাশি আর চিয়াং কাইশেক প্রদত্ত গ্রন্থসমূহ। বিরাট কাঁচের আলমারীতে সেগুলিকে সুসজ্জিত রাখা হয়েছে। বাড়ীটির নির্ম্মাণ কৌশল ভাল লাগল। একটি অতিকায় পাখী যেন বহু দূরে উড়ে যাবার জন্যে পাখা মেলেছে। এক

নিভৃত অংশে ব'সে একজন লামা আর একটি ভিন্ন দেশীয় সন্ন্যাসীকে ভাষা শেখাচ্ছে।

শুনলাম কালিম্পঙ থেকে ফিরে পর্য্যন্ত কবি সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিকে যথাসাধ্য ছেঁটে ফেলেছেন এবং সাধারণের পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করা দুরূহ। আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রণাম ক'রে আসা কিন্তু ব্যস্ত আছেন দেখে আর বিরক্ত করলাম না। "পুনশ্চ"র মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখে এলাম তাঁর থাকবার আর ছবি আঁকবার ব্যবস্থা। বন্ধুবর বললেন, 'উনি সব সময়েই ছোট জায়গায় থাকতে ভালবাসেন।" আর একবার আসবো মনে করে গান শুনতে গেলাম এক অধ্যাপকের বাড়ী। সেখানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলো। কবির গানকে শুদ্ধ রেখে কেমন করে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সে সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান অল্প-আয়াসে সম্ভবপর নয় সে কথা সকলেই স্বীকার করলেন কিন্তু উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। সকলেই ক্ষোভ করলেন যে দিনুবাবু যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুর অন্তর্হিত হয়েছে চিরকালের মত, কবি স্বয়ং বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন নিজের রচনা। কথা ও সুরের সমন্বয়ে সঙ্গীত কতখানি নিবিড় ভাবে সৌন্দর্য্য রচনা করতে পারে তার উদাহরণস্বরূপ অনেকগুলি গান গাওয়া হ'ল। যখন বেরিয়ে এলাম তখন আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে রয়েছি, বিশেষভাবে বন্ধুবর, তিনি আক্ষেপ ক'রে বলছিলেন বার বার যে অন্তরের গভীরতম অনুভূতি হ'তে যে-কথা ও সুর উৎসারিত হয়েছে সাধারণে সেগুলিকে হৃদয়হীন বৈঠকী আমোদ প্রমোদের অঙ্গীভূত ক'রে শোচনীয় অনুকৃতিতে পরিণত করছে।

সন্ধ্যাবেলায় আর একবার গেলাম কবির কাছে। তিনি একজন প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের একটি পদের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আমরা অনাহূত ভাবে ঢুকে প্রণাম করলাম। একটি আরাম কেদারায় কবি ছিলেন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়। সে চেহারা দেখে ভক্তির উদ্রেক স্বতঃই হয়। আমি আফ্রিকা থেকে এসেছি শুনে বললেন, "ভাষা কোথায় পেলে?" বললাম—"খুব যখন ছোট তখন মা কালী সিংহের মহাভারত আর রামায়ণ পড়তেন শুনতাম আর মাঝে মাঝে বোনদের ব্রতকথা শোনাতেন, তারপর বহুকাল বাংলা ভাষার চর্চ্চা বন্ধ থাকলেও অন্তরের মধ্যে বীজ ছিল বোধ

হয়।” কবি খুশি হলেন বলে মনে হ'ল কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই পূর্ব্বোক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিটি সদলবলে এসে পড়তে প্রণাম ক'রে উঠে গেলাম। কবির মিষ্টি হাসি মনের মধ্যে লেগে রইল।

গানের ভূত তখনও ছাড়েনি বন্ধুবরকে। মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়বার পর অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আবেষ্টনী যখন অলৌকিক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হ'ল তখনও তাঁর অনভ্যস্ত কণ্ঠ হতে একটির পর একটি ক'রে কথা ও সুর নিঃসৃত হ'ল অনেকক্ষণ। তারপর তিনি তাঁর স্মৃতিমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত ক'রে আমাকে নিয়ে গেলেন আদিযুগের শান্তিনিকেতনে—“লম্বা হল ঘরে যেমন তেমন গোছের মঞ্চ আর কবি অভ্যাগতদের বললেন যে দৃশ্যপটগুলি হয়েছে সামান্য ও অনুপযুক্ত, এমন কি স্মারককেও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কথা ও সুর যে মায়া রচনা করবে সেই হবে নাটকের পরিবেশ। তারপর দু'জন দড়ির দোলনায় ঝুলতে ঝুলতে গান গাইল, ‘ওগো দখিন হাওয়া—’। পরে এ গান শুনেছি অনেক বার অনেক কণ্ঠে কিন্তু এত আনন্দ আর কখনও পাইনি। প্রথম যখন কবির সঙ্গে আলাপ হ'ল তখন আমি ছোট। তাঁর কবিতা আমাকে আবিষ্ট করেছিল পাগলের মত। আমি তাঁকে দূর থেকে দেখে ধন্য হব বলে গিছলাম কিন্তু তিনি অযাচিত ভাবে কাছে ডেকে নিলেন। শুনেছি কবি তখন সহকারীদের বাড়ী অপ্রত্যাশিত ভাবে গিয়ে উঠতেন। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপও তাঁকে কাতর করতে পারতো না—”

আমিই বোধ হয় আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের উঠতে হ'ল এক সঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে। মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে আর বায়ু দিক পরিবর্ত্তন ক'রে ভিজিয়ে দিয়েছে মশারি আর বিছানা। সব টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। ভোরের গাড়িতে ফেরবার কথা ব'লে বাকি রাতটা গল্প ক'রে কাটিয়ে দিলাম।

ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম হেঁটে। তখন বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু অন্ধকার যায় নি। ক্রমে পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে রঙ ফুটে উঠলো। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি হাতি আর বট গাছের নীচে এক সার্কাসের তাঁবু। দু'পাশে জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির স্বচ্ছ জলের ওপর আকাশের ছায়া পড়েছিল সাদা আর নীল। শেষের দিকে তাতে ধরলো কমলানেবুর রঙ।

ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি গণ্যমাণ্য ব্যক্তিটি মোটরের মধ্যে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন আর তাঁর আরদালিবৃন্দ এমন জাঁক ক'রে জিনিষপত্র আগলাচ্ছে যে ভাবে মনে হয় তারাই যেন প্রদেশটির শাসনকর্ত্তা। প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে দেখলাম যে একটি অস্থিসার রোগজীর্ণ বালক পায়ের পচা ঘা নিয়ে কাতরাচ্ছে আর তার অভিভাবক সেই স্ফীত ক্ষতের ওপর খড়ের সুড়সুড়ি দিয়ে প্রাণপণে যন্ত্রণা লাঘব করবার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার দেখিয়েছে কিনা। বললে, "বাবু বড় ডর লাগে।"

(২)

এবার শান্তিনিকেতনে এলাম বর্ষামঙ্গলের উৎসবে যোগ দিতে। আসবার সময় কর্ম্মস্থানের এক ইংরেজ বন্ধু বলেছিলেন, "বর্ষার দেবতার কাছে দরবার করবার সময় স্মরণ করিয়ে দিও যে ছ' ইঞ্চি বৃষ্টি এখনও বাকি।" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "এ দেশে বরুণ দেবের একাউন্টেন্ট-এর ঠিকে ভুল হয় বলেই কবি করেন অভিনন্দনের ব্যবস্থা।" তাড়াতাড়িতে কথাটা বিশদ ক'রে বলা হয়নি। বলতে চেয়েছিলাম যে বাংলা দেশে ঋতু কায়েমী হবার আগেই পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়ে যায় আর অনিশ্চয়তা থেকে যায় শেষ পর্য্যন্ত, তাই জনসাধারণের মনে আতঙ্ক ও আনন্দ; মাঙ্গলিকের ব্যবস্থাও সেই কারণেই। এই এখন যেমন ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়েই শরতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আকাশে মেঘগুলি নির্ভার আর চঞ্চল হয়েছে এরি মধ্যে। বাতাসে মৃদুমন্দ হিল্লোল লেগেছে। মাঝে মাঝে গুমোট হয় কিন্তু আজ সব অর্গলগুলো খুলে গেছে তাই বাতাস রীতিমত উতলা; আবার কোথা থেকে রঙ মেখে এসেছে।

গাড়িতে ছেলে মেয়েদের চেয়ে কলকাতার হুজুকপ্রিয় বয়স্কদের সংখ্যা বেশী আর অনেকে চেনা তাই একটু আড়ষ্ট হয়ে আসতে হ'ল, কিন্তু বোলপুর ষ্টেশনে পদার্পণ ক'রে আর কে কার তোয়াক্কা করে?

অতিথিশালা, রতন-কুঠি সব ভর্ত্তি। অনেকে উত্তরায়ণে উঠেছেন এবং আরও অনেকে উঠেছেন স্থানীয় বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে। কবি ব্যস্ত রইলেন

সারাদিন। উৎসব ও নাটক দেখে হৈ হৈ ক'রে সময় কাটিয়ে তার পর দিন গেলাম প্রণাম করতে, অনুষ্ঠানের পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখলাম।

কবি জানতে চাইলেন পরিশোধ কেমন লাগল। নাটকের প্রভাব তখনও আমাদের অভিভূত করেছিল। বললাম, "খুব ভাল, আগা গোড়া সবই ভাল লাগল।" খুশী হয়ে কবি বললেন তার মানে এ দেশের হাওয়া এখনও ভাল ক'রে আমার গায়ে লাগেনি। আরও বছর কতক থাকলে নাকি তখন খুঁৎ ধরতে শিখব, আমার ভাষাই তখন যাবে বদলে। তখন বলব, এই এখানটায় ছন্দ পতন হয়েছে, এখানটা হয়ত' বদলে ঐ রকম করলে ভাল হ'ত—ইত্যাদি।

আমার সঙ্গী বললেন—'এই নাটকের মধ্যে কথক নাচের প্রবর্ত্তন অদ্ভুতভাবে লাগসই হয়েছে। এতে গান আর নাচের নির্ব্বাচন কি আপনার উপদেশ মত হয়েছে?" কবি বললেন, "দেখ, প্রথম যখন কথক নাচিয়েটি এল আমাদের এখানে তখন আমরা কেউ তার নাচ বরদাস্ত করতে পারিনি। উৎকট অঙ্গভঙ্গী হাস্যোদ্দীপক মনে হয়েছিল আমাদের। তারপর ও আমাদের মধ্যে থেকে ক্রমশঃ সঙ্গীতের অন্তরে প্রবেশ করতে শিখলো। নিজেই বুঝতে পারলো বাহুল্য কোথায়। আশা ওঝা মেয়েটি নেচে এসেছে খুব শৈশব থেকে লক্ষ্ণৌ-এর সাবেকি ঢঙে। গালে আঙ্গুল রেখে সে নাচ দেখে আমরা প্রথম প্রথম মজা পেতাম। ছোটরা ত খোলাখুলি ভাবেই হেসে ফেলত কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে পায়ের ছন্দে কোন আড়ষ্টতা নেই। ওকে শেখবার সুযোগ দেওয়া হ'ল আর শেষ পর্য্যন্ত সেও পরিবেশের প্রভাবের মধ্যে এলো। আমার নাৎনি হচ্ছে 'জিনিয়াস'। কেমন করে সে নাটকটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে তা ত দেখলে। তবে সাফল্যের জন্যে সত্যিকার কৃতিত্ব হচ্ছে বউমার। আমি যেমন ক'রে ছবি আঁকি অনেকটা তেমনি ক'রে আমরা দু'জনে মিলে গড়ে তুললাম। জানতো, ছবি আঁকবার শিক্ষা আমি কোনদিন পাইনি, বিশেষ ক'রে রং প্রয়োগের। কিন্তু আমার ভেতরকার মন আমাকে বলে দেয় কোথায় থামতে হবে আর কোথায় নিতে হবে মোড়। ঐ রকম ক'রে আমি গানে সুর সংযোগ করলাম আর বৌমা অঙ্গবিক্ষেপের মধ্যে আতিশয্য ও দোষ ত্রুটি সংশোধন করলেন। বেশভূষার পরিকল্পনাও হলো তাঁরি। সাফল্যের জন্যে মুখ্যত তিনিই দায়ী।'

আমার সঙ্গী বললেন যে তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে কথার ঝঙ্কারের সঙ্গে নাচের ছন্দের সমতা রক্ষা করবার সমস্যা। আলোচ্য নাটকে অনেক জায়গায় অঙ্গ সঞ্চালনের ছন্দোময় ইঙ্গিত গানের কথা ও সুরকে করেছে পরিপূর্ণ ভাবে আবিষ্ট, আবার অনেক জায়গায় সঙ্গীতের প্রভাব নৃত্যকে ছাড়িয়ে উঠেছে অনেক উর্দ্ধে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এ দুয়ের মধ্যে বিসংবাদ কোথাও ঘটেনি। সমতাল বজায় থেকেছে অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্যে।

এই কথা বলে বন্ধুবর প্রশ্ন করলেন, "গানে সুর দেবার সময় আপনি কি বিশেষ কোন নাচের ছন্দের কথা ভেবে নিয়েছিলেন ?"

কবি হেসে বললেন, কেউ কেউ মনে করে তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রের সব রাগরাগিণী আয়ত্ত করেছেন। সে কথা ভুল। আসলে কোনদিন তিনি সে-রকম ক'রে কিছুই শেখেননি। কোনো কোনো গানকে সাবেকি শাস্ত্রসঙ্গত সুরের অনুগত বলে মনে হয় তার কারণ বোধহয় ছেলেবেলায় কোন শোনা গানের সুর তাঁর মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু তারপর কথা এসেছে অনেক বৎসর পরে। আরো বললেন, যখন তিনি দশ বছরের ছেলে তখন একদিন দাদার ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনছিলেন কেননা তখনকার দিনে বড়রা ছোটদের সঙ্গ সইতে পারতেন না ; তিনি বারান্দায় লুকিয়ে একা একা অনেকক্ষণ গান শুনছিলেন। সে সময়ে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি এসে যখন নীচের উঠানে পুরু গালিচা বিছিয়ে দিল তখন তাঁর মন এমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল যে কখন তা ভুলতে পারেননি। কবি বললেন, সে আনন্দ পরে তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয় প্রকাশ পেয়েছে। ইউরোপে গিয়ে মন খারাপ হয়ে যেত যখন নিরানন্দময় কুয়াসা এসে দিনকে রাত ক'রে দিত, তখন তিনি গান দিয়ে দেশের আনন্দময় ঝলমলে রৌদ্রের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে তারই মধ্যে থাকতেন। সে সব দিনে সুর রচনায় তাঁকে সাহায্য করত ছেলেবেলার স্মৃতি। ছেলেবেলায় শোনা সে সুর কখনও তিনি ভুলতে পারেননি।

কবি পর পর দু'টি গান গাইলেন। আমরা মুগ্ধ হলাম তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে। একবার হঠাৎ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে হাত তুলতে আশ্চর্য্য হলাম সুঠাম সবল গঠন দেখে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে

হয় নি যে অবসন্নচিত্ত রোগজীর্ণ বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কইছি। কবি সন্দর্শন পূর্ব্বে একাধিকবার হয়ে থাকলেও সানন্দ বিস্ময়ে নত হয়ে রইলাম।

কবি বললেন তাঁর কোন গান একটি বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। তিনি যখন কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছল ভরে গানটি রচনা করেন তখন প্রত্যক্ষ কোন মানুষকে দেখেননি। দেখা সম্ভবও নয়, কেন না আমাদের দেশের যে মেয়েরা কলসী নিয়ে জল আনতে যায় তাদের সোনার কলসী বইবার মত অবস্থা নয় আর অবস্থা থাকলেও হাত এমন অসুন্দর হয় যে কাছাকাছি এলে আবেগ অন্তর্দ্ধান করে। বললেন, আসল কথা তাঁর ভিতরকার মানুষটি সৌন্দর্য্যের এমনি একটি মিল চাইছিল আর তার সেই দুর্নিবার চাওয়া থেকে গানের সৃষ্টি হলো।

আমরা নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বন্ধুবর বললেন যে আমরা সবচেয়ে খুশি হয়েছি এইতে যে শেষের গানটিতে প্রথাগত অভ্যাস মত করুণ সুর দেওয়া হয় নি।

কবি বললেন, আগেকার গীতিনাট্যগুলি বেশীর ভাগ হতো ফরমায়েসের জোড়াতাড়া। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শ গ্রাহ্য ক'রে নিয়ে যেখানে সেখানে গান জুড়ে দেওয়া হতো। 'চণ্ডালিকা' হচ্ছে প্রথম গীতিনাট্য যার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাটিকে একটি অখণ্ড রূপ দেওয়া সার্থক হয়েছে। এই নাটকে ভিন্নমুখী উপাদান হয়েছে একসঙ্গে গাঁথা আর ভিন্নধর্ম্মী ভাবগুলোকে আত্মপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েও সমাহিত করা হয়েছে অখণ্ড পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসাধনে। 'পরিশোধ' লেখা আর মহড়া দেওয়া হয়েছিল আরও আগে আর 'চণ্ডালিকা'র উদ্ভব হয় তাই থেকে। 'চণ্ডালিকা'তে স্বর-মাধুর্য্য আর গতি একেবারে নির্দ্দোষভাবে মিশেছে। এখানি তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য।

বন্ধুবর বললেন—'চণ্ডালিকা' দেখে অনেকে আশ্চর্য্য হয়ে গিছলো, বার বার ক'রে দেখেছে। কবি শুনে খুশি হলেন বলে মনে হলো। তিনি আপন মনে বলে গেলেন, "এখন যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ করছ যে আমার নতুন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আর নাই, এমন কি বলেছ যে 'ক্ষণিকা'র পর থেকে আমার শক্তি স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমি ভাবছিলাম অন্তত

আমার গানের সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকবে না কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখছি অনুকরণের ঠেলায় আমার সৃষ্টির অকালমৃত্যু ঘটবার উপক্রম হয়েছে।”

স্বজাতীয় সমালোচকবর্গের ঔদাসীন্যের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গ বেদনার আভাষ মাত্র দিয়ে কবি ইউরোপ ভ্রমণের কথা স্মরণ করলেন—“আমার ছবি সঙ্গে ছিল কিন্তু প্রদর্শনীতে দেবার কল্পনাও করিনি। সেগুলোকে কাছে রেখেছিলাম শুধু ব্যক্তিগত খেয়ালের নজির হিসেবে। সে সময়ই প্যারিসে ছিলেন আমার দক্ষিণ আমেরিকার বন্ধু ভিক্টোরিয়া। সেগুলোকে তিনি একরকম জোর করে দেখলেন আর তারপর কোন আপত্তি না মেনে সেখানকার বড় বড় সমালোচকদের নিয়ে এসে দেখালেন। প্রথমে এসেছিলেন পল ভালেরি ও আর একজন বিখ্যাত সমালোচক। ভালেরি বললেন, ‘আমরা বহুদিন থেকে এই সকল রঙের মিল ঘটাবার চেষ্টা ক’রেও পারি নি কিন্তু তুমি পেরেছ, তোমাকে এ ছবি প্রদর্শনীতে দিতেই হবে।’ ভিক্টোরিয়া করলেন টাকার ব্যবস্থা আর প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা ভাড়া করা হ’ল। আমার ভয় ছিল যে লোকে হাসবে। ইংলণ্ড হলে সে ভয় করতাম না কেন না ইংরেজরা স্বভাবতঃই স্থূল বুদ্ধির লোক। এখানে লোকেরা মনোভাব গোপন করবে না জানতাম। শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম ওরা প্রশংসা করতে করতেই ফিরে গেল। ‘ল তাঁ’ আর আর-একটা বড় কাগজ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা ক’রে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা জানালো। বার্লিনও খুব সমারোহ ক’রে অভ্যর্থনা করলে। সেখানকার একাডেমি তিনটি ছবি কিনে নিলে। হিটলার যদি এতদিনে সেগুলো ছিঁড়ে না ফেলে থাকে তাহলে এখনও সেগুলো তোমরা দেখতে পাবে। বাংলা কবিতা শোনবার জন্যে তাদের আগ্রহ আর উত্তেজনা দেখে আশ্চর্য্য হলাম। এক একটি কবিতা বার বার ক’রে আবৃত্তি করতে হ’ল। উন্মাদনার মত পেয়ে বসেছিল সকলকে। ব্যাভেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যেখানে গেছি একই ভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছি। ওদের আমি একটা ধাক্কা দিয়েছিলাম।”

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কবি ক্ষোভ ক’রে বললেন, “এখন আর সে সব কথা কার মনে পড়ে?”

আমাদের ম্রিয়মাণ দেখে কবি মধুরভাবে হেসে পাশে উপবিষ্ট এক

শিক্ষয়িত্রীকে বললেন—"স্কুলের মেয়েদের বশে আনতে পেরেছ?" শিক্ষয়িত্রী জানালেন যে কলকাতার সহরের মেয়েরা বশে আসতে চায় না। কবি এবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ক্লান্তভাবে বললেন—"চেষ্টা কর, অভিজ্ঞতা যত বাড়বে, শিখবে।"

কবির ওঠবার সময় হতে আমরা প্রণাম করে আনন্দময় সূর্য্যালোকে বেরিয়ে এলাম।

আগেরদিন এই সময় বৃক্ষরোপণ উৎসব থেকে ফিরছিলাম, তখন অনুষ্ঠানের বহর আর অভ্যাগতদের ভীড় দেখে ভেবেছিলাম কবির সান্নিধ্যে আসা সম্ভবপর হবে না। তাঁকে দেখেছিলাম বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের নৈর্ব্যক্তিক প্রতীকের মত।

ভোর হতে না হতেই আশ্রমের সর্ব্বত্র আনন্দ ও উত্তেজনার আবেশ লেগেছিল। রতন কুঠির পেছন থেকে সূর্য্যোদয় দেখে কোলরিজের দুটি লাইন মনে পড়েছিল—

Nor dim nor red, like God's own head,
The glorious Sun uprist—

প্রাতরাশ শেষ হতে বাইরে গিয়ে দেখলাম পথের ওপর অনেকগুলি রঙিন শাড়ী ও সাদা ধুতি সমবেত হয়ে চঞ্চলভাবে বিচরণ করছে। প্রতিবেশিনীদের প্রসাধন শেষ হয়েছে। যানবাহনের ছুটোছুটি সুরু হয়ে গেছে। সকলেই যাবার জন্যে ব্যস্ত। আমাদের বাহন এলো দেরি করে কিন্তু রৌদ্র তখনও নিস্তেজ ও সোনালী। লোকালয় পেরিয়ে মাঠে পড়তে বিলম্ব হলো না। উভয় পাশে ফেলে চললাম পাদচারীদের দল। পরস্পরকে ভৎর্সনা করলাম পদব্রজে এলেই হতো ভাল। প্রান্তরের খানিকটা তরঙ্গায়িত তারপর এক মস্ত দীঘি। দেখতে দেখতে শ্রীনিকেতনে পৌঁছে গেলাম। সাবেকি বাড়ীর সবুজ প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটানো হয়েছিল আর ইতিমধ্যে দেখলাম দড়ির বেড়ার আসে পাশে বেশ ভীড় জমে গেছে। অনুষ্ঠানের জায়গাটা দেখলাম আল্পনায়, ফুলে আর গাছের ডালপালায় সুসজ্জিত। নন্দলাল বাবু আয়োজনের শিল্প-ব্যবস্থাতে শেষ স্পর্শ দিয়ে অনবদ্য ক'রে তুললেন। তারপর

রেখাঙ্কিত কলসীগুলিকে যথাস্থানে রেখে ধূপ ও ধুনা জ্বালিয়ে দিলেন। শুনলাম আলপনাগুলি তাঁরই কন্যার রচিত। নক্সা ক'রে নেওয়া রীতি বিরুদ্ধ বলে ক্ষিপ্রহাতে রেখা টানতে হয়েছে কিন্তু কোথাও খুঁৎ দেখলাম না। সূর্য্যের তাপ ক্রমে প্রখর হয়ে উঠতে গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম। কতকগুলি ভারতীয় বেশী ইউরোপীয় মহিলা ও আমাদের প্রতিবেশিনী পার্সী মেয়েটি রেশমী ভূষণে গলদ্ঘর্ম হয়ে একটি অর্দ্ধ-গোলাকৃতি সিমেণ্টের আসনে বসে ঘন ঘন বাতাস করছিলেন নিজেদের। পাঞ্জাবী, সিন্ধি, দক্ষিণী ইত্যাদি প্রায় সকল ভারতীয় প্রদেশের লোক দেখলাম। শাস্ত্রী মহাশয় এসে একটি উঁচু আসনের এক কোণায় বসলেন। দ্বিতীয় আসনটি কবির জন্যে খালি রইল। কতকগুলি গ্রামের লোক হাল্কা হলুদ রঙের ধুতি আর কমলানেবু রঙের চাদর পরে এসে একটি বিশিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। শুনলাম এঁরা হচ্ছেন এ অঞ্চলের ভূস্বামিবৃন্দ। কবির গাড়ী আসতে শঙ্খধ্বনিতে স্বাগত করা হলো তাঁকে। দু'সারি সাঁওতাল তীরন্দাজের ভেতর দিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। মেয়েরা বৃক্ষরোপণের স্থানটিকে ঘিরে ঘিরে গান গেয়ে নৃত্য করল। শাস্ত্রী মহাশয় বেদমন্ত্র পাঠ করলেন, আর একজন অনুবাদ করলেন, তারপর কবি কিছু বললেন। মহিলাদের প্রাদুর্ভাবে স্থানভ্রষ্ট হতে হতে এতখানি পেছিয়ে পড়েছিলাম যে ভাল করে শুনতে পেলাম না। গানের পর হলকর্ষণ পর্ব্ব শেষ হতে আমরা উঠে গেলাম কুঠি বাড়ীর বারান্দায়। নীচের দৃশ্য চমৎকার। ছেলে মেয়েরা জটলা ক'রে গল্প করছে, দূর থেকে হাত নেড়ে এ ওর কাছে বিদায় নিচ্ছে, উচ্চৈঃস্বরে প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছে, যাচ্ছে, আসছে। আশ্রম বালিকাদের পরণে হলুদ-রঙা শাড়ী, অনেকের মাথায় ফুল গোঁজা। নেমে এসে কাশী হতে অভ্যাগত একদল মহিলা ও কংগ্রেস-কর্ম্মীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। সকলে একসঙ্গে মোটরবাসে উঠলাম। দু'টি আলমোড়ার দুরন্ত মেয়ে গাড়ির ছাদের ওপর চেপে বসে নামতে চাইছিল না। তাদের অনুনয় বিনয় করে নামিয়ে রওনা হতে একটু দেরি হ'ল। আনন্দের উত্তেজনায় সকলেই সরস রহস্যালাপে মেতে গেল। অপরিচয়ের বা প্রাদেশিকতার কোন বাধা রইলো না। ভারতবর্ষের বাইরে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন প্রদেশের ভারতবাসী একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত বলে

মনে হয় কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ঐক্য অভূতপূর্ব্ব বলে মনে হলো, অন্ততঃ আমার কাছে।

সারাদিন এক রকম হৈ হৈ করে কাটলো। রতন কুঠিতে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে জমায়েৎ হয়েছিল এবং তাদের মনোরঞ্জন করতে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকতে হলো অনেকগুলি।

রেলের লাইন যেখানে কাঁকরের উঁচু নীচু টিবির মধ্যে আত্মগোপন করেছে সেখানে বেড়াতে গেলাম গোধূলির সময়ে। আকাশের ফিকে নীলে জৌলুস খুলেছিল আশ্চর্য্য সুন্দর। এক সারি গেরুয়া মেঘ দেখতে দেখতে বেগুন রঙ ধরলো আর সেই সঙ্গে বাতাসে লাগল শীতের ছোঁয়া। এসব মামুলী ব্যাপার সহরেও ঘটে থাকে কিন্তু একা একটি নিঃসঙ্গ তাল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে অফুরন্ত প্রান্তর এক সঙ্গে দেখলে বিস্ময় জাগে আর সেই সঙ্গে প্রতীয়মান হয় সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে এত জায়গা থাকতে মহর্ষি এই নির্জ্জলা, নিষ্ফলা, নিরাভরণ অঞ্চলে ধ্যানস্থ কেন হলেন আর কবি তাঁর সমাজসেবার সাধনাকে ফলবতী করতে প্রকৃষ্টতর স্থানে যেতে পারলেন না কেন।

সায়ংকালের সেই অপরূপ মাহেন্দ্রক্ষণকে হৃদয়ে গ্রহণ ক'রে যখন ফিরলাম তখন বারান্দার একটি নিভৃত অংশে অনুচ্চ মহিলা কণ্ঠে ইউরোপীয় ফোক্ সঙ্গীত হচ্ছিল, সঙ্গে গীটার। আহ্বানের অপেক্ষা না ক'রে বসে পড়লাম পাশে—কবির বড় আহ্বান যেখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে ড্রইং রুমের নিয়মকে তুচ্ছ করা যায় বেপরোয়া ভাবে। লাভ হ'ল বন্ধুত্ব। আসর অবশ্য জমল না। একটু পরে অভিনয় দেখতে যাওয়ার ঘণ্টা পড়লো।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্ররচনাবলী—বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথের আশি বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষে বাংলা দেশের নানা স্থানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন ও বহু পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানি নীহাররঞ্জনের "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা" ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা যাতে আছে এমন আর কোনো বই এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়নি। শুধু এই কারণেই এই বইখানি রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞতার দাবি করতে পারে। কেননা, শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর সাহিত্য অধ্যয়ন ও প্রচার। এই অধ্যয়ন ও প্রচারের জন্যে নীহাররঞ্জন যে প্রয়াস করেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

এই একই কারণ, বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-বিভাগ কিছুদিন থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থাবলী খণ্ডে খণ্ডে ছাপাবার যে ব্যবস্থা করেছেন তাও স্মরণীয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা এক সঙ্গে এ ভাবে কখনো ছাপা হয় নি—যদিও গদ্য ও পদ্য আলাদা আলাদা ভাবে একাধিকবার হয়েছে। বিশ্বভারতী প্রতি খণ্ডে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই ছাপাচ্ছেন এবং সেগুলি সাজানো হচ্ছে কাল-ক্রম অনুসারে, ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বোঝবার পক্ষে পাঠকদের বিশেষ সাহায্য হচ্ছে।

নীহারবাবুর বইও এই ক্রমবিকাশ বুঝতে সাহায্য করবে; তিনি শুধু সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নি, তাঁর সাহিত্যের আলোচনা করেছেন ক্রমিক পর্যায়ে—অবশ্য গদ্য ও পদ্য রচনার প্রতি বিভাগ আলাদা আলাদা ক'রে। তাঁর বইর বিভিন্ন পরিচ্ছদগুলির নাম উল্লেখ করলেই একথা স্পষ্ট হবে—'কাব্যপ্রবাহ', 'ছোট গল্প', 'নাটক ও নাটিকা', ও 'উপন্যাস'। বাদ পড়েছে প্রবন্ধ ও প্রহসন। এর মধ্যে প্রবন্ধ বাদ পড়া আক্ষেপের বিষয়, কেননা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা তাঁর প্রবন্ধ বাদ দিয়ে হতে পারে না।

এগুলি ছাড়া নীহাররঞ্জনের বইতে একেবারে প্রথম দিকেই আরো দুটি অংশ আছে: 'কবি রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন'। প্রথম প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। কবির স্থান যে কত উঁচুতে নীহাররঞ্জন তা প্রমাণ করেছেন অথর্ববেদের একটি শ্লোক উদ্ধার করে। শ্লোকটি সত্যি উদ্ধারের যোগ্য, এর জন্যে উদ্ধারকর্তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কবি যতই উঁচু দরের মানুষ হন না কেন, নীহাররঞ্জনের মতে ও রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, তিনি 'চঞ্চলের লীলা-সহচর'। এই কারণে মাঝে মাঝে আচমকা খেয়ালে তিনি এমন কাজ করে বসেন যাতে সাধারণ অ-কবি মানুষদের হয়তো ধাঁধাঁ লাগে। তাই কবি ব'লে যাকে আমরা মান্‌ব তাঁর কাছে একমত ও একপথ আশা করা অন্যায়। কেননা, আজকের কবি ও কালকের কবি হয়তো এক নয়। যথা, নীহাররঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি, স্বদেশী-যুগের রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথ ঠিক এক মানুষ নন—একেবারে আলাদা।

এইখানে স্বভাবত একটু খটকা লাগে। মনে হয় দুই যুগের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে বৈষম্য দেখা যায় তার অন্য কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে নীহাররঞ্জন এই রকম অদ্ভুত যুক্তি বা অযুক্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে আরো একটু গভীর ভাবে বোঝবার চেষ্টা করলে তাঁকে হয়তো এরকম ফাঁপরে পড়তে হত না। এই বিরোধ বোঝাবার জন্যে দুই ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের অবতারণা একটু হাস্যকর। যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ দেশব্যাপী উগ্র স্বাদেশিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তার পরিচয় ওঁর খুব ছেলে বয়সের রচনা হতেই পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জন আর একজন বড় কবির দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারতেন। যে-ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ফরাসী বিপ্লবের উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে সে সময়ে "to be young was very heaven", ঐ বিপ্লবের রক্তাক্ত পরিণতি দেখে তিনিও দূরে সরে গিয়েছিলেন। কেননা, রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ যে-স্বদেশী আন্দোলন বা যে-ফরাসী বিপ্লবকে অতখানি আগ্রহের সঙ্গে বরণ করেছিলেন তা' বহুলত তাঁদের মন-গড়া জিনিষ—বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের সংস্রব ছিল অল্প। তাই বাস্তবের (তাঁদের মতে) শোচনীয় পরিণতিতে তাঁরা দূরে না গিয়ে পারেন নি—তাঁরা ভিন্ন

মানুষ হয়েছিলেন বলে নয়, ঠিক উলটো কারণে। রবীন্দ্রনাথ যে ভিন্ন মানুষ হন নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর শেষ জীবনেরও একাধিক রচনায়, যার মধ্যে 'সভ্যতার সঙ্কট' সব থেকে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে যাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তিনি যে প্রথমত ও মুখ্যত কবি নীহাররঞ্জনের এই মত মানি বলেই স্বদেশী ও পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখার প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলাম না। কী ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি ও কবির দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে নীহাররঞ্জন বারবার তার অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও নাটক, বিশেষ করে 'বিসর্জন' সম্বন্ধে তাঁর মত। এই মত নীহাররঞ্জন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনার অত্যন্ত বিশদ বিশ্লেষণ করে। নীহাররঞ্জনের বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় আরো পাই যখন পড়ি রবীন্দ্রনাথের নাটক ও উপন্যাস প্রসঙ্গে সামাজিক প্রভাব ও পরিবেশের আলোচনা। আমার মতে নীহাররঞ্জন তাঁর বই-র যে-অংশে এই আলোচনা করেছেন তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেই অংশ। এই অংশটি তাঁর সর্বশেষ রচনা। এই কথা জানতে পারা যায় তাঁর বইর প্রতি বিভাগের শেষে রচনাকালের যে-তারিখ দেওয়া আছে তার থেকে।

যে-পরিণত বিচার ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের জন্যে "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা"র শেষের দিককার রচনাগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার একটি উদাহরণ "উপন্যাস"-প্রবন্ধে "চতুরঙ্গ" সম্বন্ধে আলোচনা। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'চতুরঙ্গ' সর্বাপেক্ষা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary)।" এই মত নীহাররঞ্জন খণ্ডন করেছেন আট পাতা ধরে যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে। কিন্তু "চতুরঙ্গ" সম্বন্ধে তাঁর চরম সিদ্ধান্ত ঃ

"তবু 'চতুরঙ্গ'কে আমি মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি বলি না। ইহার বস্তুভূমির গভীরতা আছে কিন্তু প্রসার নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই। কিন্তু, 'চতুরঙ্গ' সুন্দর ও সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি।"

সাহিত্য-বিচারে বস্তুভূমির গভীরতার চাইতে প্রসারের মূল্য যাঁর কাছে বেশী পৃথিবীর অধিকাংশ "মহৎ সাহিত্য" তাঁর কাছে বাতিল হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেওয়ার ফলে "চতুরঙ্গ" বইটির সাহিত্যিক মূল্য বিচারে নীহারবাবুর যে-অদ্ভুত স্খলন ঘটেছে, তার অনুরূপ স্খলনের পরিচয় একাধিকবার আমরা পাই "কাব্য-প্রবাহ" অংশে। এই অংশটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা প্রসঙ্গসর্বস্ব। কবিতার পর কবিতার অংশ উদ্ধৃত হয়েছে—বিশেষ এক একটি ভাবসূত্রের নিদর্শনস্বরূপ। সাহিত্যিক মূল্য-বিচার মনে হয় যেন নীহাররঞ্জনের কাছে গৌণ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে যাদের পরিচয় নাই তাদের পক্ষে এই জাতীয় আলোচনা শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই, আরো শিক্ষাপ্রদ তাদের পক্ষে যারা এই পরিচয় কোনাদিনই পাবে না। নীহাররঞ্জন বাবু তাঁর উদ্ধৃতিগুলির যে-ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পড়ে অন্বয়ের পর্যায়ে—রবীন্দ্র-কাব্যের স্কুল-পাঠ্য টীকার পক্ষে এই জাতীর ব্যাখ্যা হয়তো উপযোগী, কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যে তা' অচল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁরা আগেই পড়েছেন তাঁদের কাছে এই জাতীর ব্যাখ্যা পুনরাবৃত্তি মাত্র, আর পুনরাবৃত্তি হিসাবে মূল কবিতাগুলির চাইতে অনেক নিকৃষ্ট। অথচ নীহাররঞ্জন একটির পর একটি কবিতার বইর আলোচনা করেছেন এই রীতিতে। অজ্ঞ পাঠক "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা"য় রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ ক'রে বিজ্ঞ হবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদগ্ধ পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে নিবিড় রস পান, নীহাররঞ্জনের আলোচনা পড়বার পর তা' নিবিড়তর হবে না।

আমি একথা মনে করিনা যে নীহাররঞ্জন নিজে রবীন্দ্র-কাব্যের বিদগ্ধ পাঠক নন। তাঁর বৈদগ্ধ্যের একাধিক পরিচয় 'কাব্য প্রবাহ' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। আমার আপত্তি তাঁর আলোচনা-রীতি সম্বন্ধে। নাটক বা উপন্যাসে প্রসঙ্গের প্রাধান্য অবশ্য স্বীকার্য—কিন্তু কবিতায় নয়।

প্রসঙ্গের প্রতি অসঙ্গত ঝোঁক কবিতার বিচারের পক্ষে কী রকম মারাত্মক তার পরিচয় পাওয়া যায় 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে নীহাররঞ্জনের এই উক্তিতে—

"গীতাঞ্জলির" গানগুলিতে······পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দের বার্তা অত্যন্ত কম; সাধনার যে পরিপূর্ণ ফল তাহা "গীতাঞ্জলি"তে নাই বলিলেই চলে। সেই জন্যই "গীতাঞ্জলির"

গান ও কবিতা রসসমৃদ্ধ হইতে পারে নাই, সহজ আনন্দরসের আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

এখানে নীহাররঞ্জন শুধু রসবোধ জলাঞ্জলি দেন নাই, প্রসঙ্গ বিচারেও করেছেন ভুল। "গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর," "তাই তোমার আনন্দ আমার পর," "নিশার স্বপন ছুটলরে" প্রভৃতি গানে যদি একসঙ্গে কাব্য-রস ও আনন্দ-রসের আভাস না পাওয়া যায় তবে রবীন্দ্রনাথের আর কোন্ কবিতায় বা গানে পাওয়া যায় জানিনা। "গীতাঞ্জলি"র প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই গান কিন্তু তবু নিছক কবিতা হিসাবে এগুলির জুড়ি অন্য কোনো গীত-সংগ্রহে খুঁজে পাওয়া শক্ত। "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"-র মতন সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা রবীন্দ্রনাথও কম লিখেছেন। ঠিক এর সমকক্ষ না হ'লেও এর কাছাকাছি যায় এমন কবিতা "গীতাঞ্জলি"তে পাওয়া যায় একটি দুটি নয়। তা'ছাড়া জিজ্ঞাস্য আরো এই যে "সাধনার পরিপূর্ণ ফল" ছাড়া কি রসসমৃদ্ধ কবিতা হয় না? অবশ্য সার্থক কবিতামাত্রেই কম-বেশি সাধনার পরিপূর্ণ ফল সন্দেহ নাই কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা ও যে-জাতীর সাধনার কথা নীহারঞ্জন উল্লেখ করেছেন তা' ঠিক এক জিনিষ নয়।

এই কথা না বললে নীহাররঞ্জনের প্রতি অবিচার করা হবে যে "কাব্য-প্রবাহ" নিবন্ধের গোড়াতেই তিনি বলেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য "রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া নয়, স্থূল পথরেখার নির্দেশ মাত্র।" এই উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই স্থূলকায় বইটির স্থূলতম অংশ জুড়ে তিনি যে-পথরেখার নির্দেশ করেছেন তা' আর একটু কম স্থূল হ'লে বইটির মূল্য অনেক বেশি বাড়ত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর আট খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে—তা ছাড়া এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে অচলিত, সংগ্রহ। এই খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কয়েকটি কবিতার বইর নীহারঞ্জন "কাব্য-প্রবাহ" নিবন্ধের গোড়াতেই যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ মূল্যবান এই কারণে যে এখন অনেকেই এগুলির কথা একেবারেই জানেন না। নীহারঞ্জনের কাব্য-প্রবাহ "পূরবী"তে এসে থেমেছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত 'নৈবেদ্য' ও 'স্মরণ' প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩০৮ ও ১৩১০ সনে—সুতরাং

নীহাররঞ্জনের কাব্য-প্রবাহ এখনও অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়েছে গদ্য সম্বন্ধে তা' হয়নি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত "সাহিত্য" রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন দুই কারণে। প্রথমত, এই প্রবন্ধ-সমষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা যে-সমৃদ্ধি লাভ করেছে আগেকার রচনায় তা দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত এর আগে বা পরে এত ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রকাশ করেন নি। এই বইটির বিশেষ আলোচনা যাতে হয় রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চল্‌তিভাষায় লেখা উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'ও অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত হ'য়েছে। *

---

* রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম তিন খণ্ড ও অচলিত সংগ্রহ এই পত্রিকাতে ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—নদী, চিত্রা; প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ, চারিত্র পূজা; নাটক ও প্রহসন—বিদায় অভিশাপ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ। পঞ্চম খণ্ডে: কবিতা ও গান—চৈতালি; নাটক—কাহিনী; উপন্যাস—নৌকাডুবি; প্রবন্ধ—বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য। ষষ্ঠ খণ্ডে: কবিতা ও গান—কণিকা; নাটক ও প্রহসন—হাস্যকৌতুক; উপন্যাস ও গল্প—গোরা; প্রবন্ধ—লোকসাহিত্য। সপ্তম খণ্ডে: কবিতা ও গান—কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা; নাটক—ব্যঙ্গকৌতুক, শারদোৎসব; উপন্যাস—চতুরঙ্গ; প্রবন্ধ—ব্যঙ্গকৌতুক। অষ্টম খণ্ডে: কবিতা ও গান—নৈবেদ্য, স্মরণ; নাটক ও প্রহসন—মুকুট; উপন্যাস ও গল্প—ঘরে বাইরে; প্রবন্ধ—সাহিত্য। এই রচনাবলী প্রতি খণ্ডের মূল্য আগে ছিল ৪॥০, ৫॥০, ৬॥০ ও ১০৲ (বিশেষ সংস্করণ); এখন হয়েছে—৪॥০, ৫৸০, ৬৸০ ও ৮॥০।

সব-পেয়েছির দেশ—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-ভবন, কলিকাতা।
দাম দেড় টাকা।

"সব-পেয়েছির দেশ" দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ "শান্তিনিকেতন", দ্বিতীয় ভাগ "রবীন্দ্রনাথ"। অর্থাৎ প্রথমে আছে "সব-পেয়েছির দেশ"-এর ও দ্বিতীয় ভাগে তার স্রষ্টার কথা। কিন্তু যে-রূপকথার দেশের পরিচয় আমরা শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর রচনায় পাই তার স্রষ্টা কতখানি রবীন্দ্রনাথ ও কতখানি লেখক স্বয়ং তা' বলা কঠিন। যে-শান্তিনিকেতনকে আমি অন্তরঙ্গ ভাবে জানি তার পরিচয় এর মধ্যে খুব বেশী পাই না—কিন্তু যে-টুকু পাই লেখকের সজীব কল্পনা ও মনোহারী ভাষার ফলে তা' অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। লেখকের এই কল্পনাশক্তি ও ভাষার সৌষ্ঠবের জন্যে শান্তিনিকেতনের বর্ণনা হিসাবে বইটির যতটুকু মূল্য তার চাইতে এর সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেশী। আরো বেশী হত যদি না মাঝে মাঝে তাঁর অমার্জনীয় ছন্দ-পতন ঘটত। এই ত্রুটি ঘটেছে এখানে ওখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে লেখকের অশোভন দুর্বলতার ফলে। ভাষাতেও মাঝে মাঝে এই মাত্রাদোষের পরিচয় পাওয়া যায় অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে, যেমন শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে ঝড়ের এই সুন্দর বর্ণনাতে: "নিচে ধূলোর ঘূর্ণি, কিছু উপরে শাদাটে ধোঁয়াটে পাৎলা মেঘ, আরো উপরে কালো গম্ভীর মস্ত মেঘের দল—এই তিন স্তরে বর্ষা ছুটে চললো উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূবে। আকাশে, হাওয়ায়, আনন্দিত গাছগুলির ডালেপাতায় একটা হৈ হৈ হুলুস্থুল।"—এর পরেই তিনি লিখছেন একেবারে শিশুসুলভ অধীরতার সঙ্গে, "সে আসে, সে আসে।" Poetry is emotion remembered in tranquillity—ওয়ার্ড্স্-ওয়ার্থ-এর গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ বাণীতে বুদ্ধদেব বাবুর বোধহয় আস্থা নেই।

বইটির দ্বিতীয় অংশে আছে রবীন্দ্রনাথের কথা। বুদ্ধদেব বাবুর অত্যন্ত সৌভাগ্য যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অন্তিম সময়ের অল্পদিন আগে অন্তরঙ্গ-ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময়ে তাঁর যে-সব আলোচনা হয়েছে, যা কিছু তিনি নিজে চোখে দেখে বা অন্যের কাছে শুনে জানতে পেরেছেন, বুদ্ধদেব বাবু সব কিছু অত্যন্ত খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন।

এই কারণে বইর এই অংশটী অমূল্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু নিজের মতামত যা প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো জায়গায় তা' প'ড়ে মনে পড়ে অন্ধের হস্তি-দর্শনের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই অন্ধতা অল্পবিস্তর পৃথিবীশুদ্ধ লোকের আছে, তার কারণ আমাদের সকলের-দৃষ্টির প্রসারের চাইতে তাঁ'র ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী বিরাট।

হিরণকুমার সান্যাল

ছড়া
শেষ লেখা } রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কথা যখন দানা বাঁধে নাই, তখনকার সৃষ্টি ছড়া। মানুষ তখন সবেমাত্র শব্দের সহিত শব্দ মিলাইয়া এক নূতন খেলা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ভাব অস্পষ্ট, ভাষা অস্ফুট, 'নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়' তাহাকে কোথা হইতে কোথায় লইয়া চলিয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না, এক কথা হইতে অন্য কথায়, এক ভাব হইবে অন্য ভাবে কেবল সুরের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে।

ছন্দের স্রোতে মানুষের সেই প্রথম নৌকা ভাসানো। সেদিনের ইতিহাস জানি না, কিন্তু ছবিটি কল্পনা করিতে পারি। যুক্তিবিচারের শুক্‌নো ডাঙা তখন ভালো করিয়া দেখা দেয় নাই, ছোট ছোট দ্বীপের মত দু'একটি অসংলগ্ন চিন্তা এখানে ওখানে মাথা তুলিয়াছে মাত্র। এলোমেলো ছত্রগুলি ঢেউয়ের মত এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, কাহারও সহিত কাহারও সুদৃঢ় বন্ধন নাই, তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়া যেন একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতরী নানাপথ বাহিয়া শেষ যাত্রাপথে একবার ছড়ার সাগরে ঢেউদোলা খাইয়াছে। এখানেও কবি নিপুণভাবে হাল ধরিয়াছেন।

ভাষার এই অরাজক রাজ্যে কোন্ ভাব হইতে কোন্ ভাব আসে, কোন্ ছবি কখন ওঠে ও ডোবে, কিছুরই স্থিরতা নাই।

"খেয়াল স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে
ওরা কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।"

ইহা 'স্পষ্ট আলোর' দেশ নয়, অদ্ভুত আলো-আঁধারী জগৎ। দিনের আলো কবির চোখে যখন নিবিয়া আসিতেছিল, তখন তিনি ক্ষণিক খেয়ালে একবার এই দিক্‌চিহ্নহীন ছায়ারাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ছড়ার মাধুর্য্যরস তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। "ছেলে-ভুলানো ছড়া" তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বে তিনি ছড়া রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু প্রচলিত ছড়াগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেদিনের অনুসন্ধিৎসা পরবর্ত্তী সৃষ্টিকর্ম্মে তাঁহার সহায় হইয়াছে। পুরাতন ভঙ্গিমায় তিনি নূতন কথা সাজাইয়াছেন। এই কবিতাগুলি 'ছড়া' হইলেও নূতন যুগের ছড়া। অতীত যুগের চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গী ছিল ভিন্ন রকমের। আজিকার শিক্ষিত মার্জ্জিত মনে সত্যযুগের ভাব ও ঘটনার আলোড়ন নূতনতর অনুভূতি জাগায়। সেকালের 'ছড়া'য় ছিল প্রাচীন কবিদের কল্পনাছায়া, আজিকার 'ছড়া'য় আধুনিক কবির স্বপ্নমেঘেরা ছাড়া পাইয়াছে। সেখানে এক অর্দ্ধস্ফুট কাব্যলোক ভাঙিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে

দেশের সমসাময়িক অবস্থা কবিকে বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য হারান নাই, বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়িয়া আমাদের চেতনা জাগাইতে চাহিয়াছেন। পোড়াদহয় 'ঘুড়ি কাটাকাটি নিয়ে মাথা ফাটাফাটি', সম্পাদকদের জল্পনাকল্পনা, সব্‌জি বাজারে দাঙ্গাকারীরা লাউ ছুঁড়িয়াছিল না বেল ছুঁড়িয়াছিল তাহা লইয়া এডিটরদের তুমুল তর্কবিতর্ক, কলেজের ছেলেদের দু'ভাগ হইয়া যাওয়া, সভাস্থলে মারপিট, এবং দুই বিরুদ্ধপক্ষীয় সম্পাদকের রেল-ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র 'বাছা বাছা ইংরেজী কটুতা' বর্ষণ—ইহা কি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অবিকল চিত্র নহে?

কোথাও কোথাও ভাবের অসঙ্গতি হাস্যের খোরাক জোগাইয়াছে। "লাউ কেটে দিতে ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে" ছিঁড়িয়া যাওয়া, "ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর কাকাতুয়ার চঞ্চু হানা", "গরানহাটায় পুলিশ-সার্জনের" সজনে ডাঁটা কেনা,—অসংলগ্ন এবং অযৌক্তিক; আর বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কথাগুলি পড়িয়া হাসি পায়।

এই অসঙ্গতির বর্ণনায় অনুপ্রাসের আঘাতে ছন্দ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। "পাকড়াশিদের কাঁকড়া-ডোবায় মাকড়শাদের হরতাল", "কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায় অন্ধ কলুর গিন্নি", "মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে, ঢোলে কুল্লুক ভট্ট", এ সবের অর্থ মিলিবে না, অথচ এই আপাতশিথিল রচনার আভ্যন্তরিক সৌষ্ঠব ছড়া-কারের লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে।

কবির মৃত্যুর পর ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁহার প্রতিভা যে কত অনায়াসে ধূলিমুঠিকেও সোনামুঠিতে পরিণত করিতে পারিত, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। অতি তুচ্ছ বস্তুও অপূর্ব্ব বাগ্‌ভঙ্গিমায় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে; অর্দ্ধসচেতন মনের ছায়া মনোরম ছবির মালা গাঁথিয়া গিয়াছে। বিনিসূতার মালা, বাঁধন থাকিয়াও নাই,—কিন্তু তা' বলিয়া কারিগরির অভাব চোখে পড়িবে না। অনেকগুলি আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন নয়; উহাদের মধ্যে অর্থের আভাস আছে।

কবিগুরুর বিচিত্র রচনার মধ্যে 'ছড়া' একটি স্বতন্ত্র রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। কাব্যরসিক ইহার মধ্যে একটি নূতন রকমের স্বাদ পাইবেন।

'শেষ লেখা' কবিগুরুর অন্তিম রচনা বলিয়াই স্মরণীয় নহে, উহা কবি-প্রতিভার শেষ রশ্মিরাগে সমুজ্জ্বল। যে-রবিকে এতকাল ধরণীর বলিয়া মনে করিতেছিলাম, আজ দেখি, সে বিশেষ করিয়া আকাশের, মর্ত্ত্যের মাটিতে তাহার কিরণমালা করুণ হইয়া আসিয়াছে; আকাশের দিক্‌দিগন্ত জুড়িয়া তাহার অপরূপ আভা।

দুঃখে বা মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হইয়া মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা করেন নাই কবি। জীবনে ও জীবনান্তে চিরদিন সরল বিশ্বাস লইয়া তিনি চলিয়াছেন, হয়তো হিসাবী লোকেরা তাঁহাকে 'বিড়ম্বিত' মনে করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সান্ত্বনা—"আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে" তিনি সত্যকে পাইয়াছেন। মৃত্যু-

কালেও তাঁহার ভাবনা নাই, সরল বিশ্বাস লইয়াই অজানা অনন্ত পথে পাড়ি দিলেন, চিরন্তনী রহস্যময়ী তাঁহাকে দিয়াছেন 'শান্তির অক্ষয় অধিকার'।

এ কাব্য প্রধানত আকাশের গান। "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" এ আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হয় নাই। কবি যেন আজ ঊর্দ্ধলোকের যাত্রী, গ্রহতারা জ্যোতিষ্কের পথের পথিক, বিরাট্ অসীমের আহ্বানে সুদূরের অভিমুখে চলিয়াছেন।

দিয়েছি উজাড় করি'
যাহা কিছু আছিল দিবার
প্রতিদানে যদি কিছু পাই,
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা,
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই,
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

মমতাপ্রবণ মন আমাদের পৃথিবীর সেই দু'একটি ছবি ভুলিতে চাহে না। বিদায়করুণ আভা তাহাকে মায়াময় করিয়া গিয়াছে যে।

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।

ভাষা অতি সহজ সরল। কিন্তু, শূন্যে গৃহের বেদনাময় ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রায় সকল কাব্যই ভাষার দিক হইতে অনাড়ম্বর। বাহিরের ঐশ্বর্য্য কমাইয়া ভাবগভীরতায় ডুব দিয়াছিলেন কবি। ক্বচিৎ দু'এক ছত্রে চকিত দীপ্তি ঝলকিয়া উঠিয়াছে, মোহন বর্ণরেণু গায়ে মাখিয়া হারানো দিন উড়িয়া আসিয়াছে।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়

অস্ফুট গুঞ্জন স্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

প্রতিদিন নবায়মান জীবনের রহস্যে বিমুগ্ধ কবি তাঁহার প্রশস্তি-গান গাহিয়াছেন। কোন্ অজ্ঞেয় উৎস হইতে ইহার প্রকাশ, কে জানে ?

প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তারে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি' আলোকের অভিষেক ধারা।

সেই আকাশ, সেই অসীম ব্যাপ্তি, আর সূর্য্যের পবিত্র জ্যোতির্বর্ষণ ! আকাশের দৃশ্যই আজ কবিচক্ষে বেশী করিয়া জাগিতেছে, তাঁহার দৃষ্টি আজ ঊর্দ্ধমুখী। কাব্যের মধ্য দিয়া তিনি দিয়াছেন অমর লোকের সন্ধান, জীবন ও মরণকে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে বাঁধিয়া গিয়াছেন এক অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপটের ছবিটি শ্রীযুক্ত শম্ভু সাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
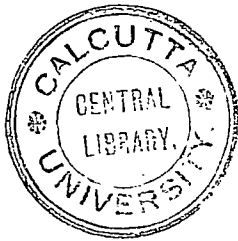
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ ১৩৪৮

পরিচয়

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

(৩)

এ পর্যন্ত আমরা বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কি শব্দ, কি আলোক, কি উত্তাপ, কি চৌম্বক, কি তাড়িতশক্তি—ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে ব্যাপারিত হইলে প্রত্যেকের ক্রিয়াতেই জ্যামিতিকীর নিদর্শন পাওয়া যায়। গতবারে চৌম্বকশক্তির আলোচনার পর আমরা রসায়নক্ষেত্রে পরমাণুর বিচিত্র সংস্থান-ও-সজ্জায় তাড়িতশক্তি কিরূপে জ্যামিতিক আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার অল্লাধিক পরিচয় পাইয়াছি। তদুপলক্ষে Atom বা পরমাণু সম্পর্কে আমাদের অনেক কথা বলিতে হইয়াছে।

ঐ পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে আমরা চর্মচক্ষে ত উহাকে দেখিতে পাইই না—যদি তিগ্মতম অণুবীক্ষণ ১০০ গুণ তিগ্মতর হয় তবুও পরমাণু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। কিন্তু চর্মচক্ষুর উপর দিব্যচক্ষু আছে,—যাহাকে clairvoyance বলে। যোগবলে দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ করিতে পারিলে তবেই আমরা পরমাণু দেখিতে পাইব, এবং যদি পরমাণু অবয়বী পদার্থ হয় তবে তাহার গঠনপ্রণালী জানিতে পারিব। অর্থাৎ, the chemical structure of the atom will become visible by the enlarging power of trained clairvoyance.

পরমাণুর কি অবয়ব আছে? অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা মনে

করিতেন পরমাণু নিরবয়ব নিত্য বস্তু। তাঁহারা বলিতেন স্বর্ণ প্রভৃতি মূল ভূত বা element-এর পরমাণুচয় চিরদিনই স্বর্ণ প্রভৃতি সেই সেই পরমাণু আছে এবং থাকিবে। সে জন্য তাঁহারা পরমাণুর নাম দিয়াছিলেন a-tom অর্থাৎ যাহা অচ্ছেদ্য—Thou knowest thou canst not cut an atom (Dalton)। এমন কি এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডলবেয়ার্ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—

Chemists have concluded from their experience with matter in its various forms and conditions, that it is really reducible to ultimate particles which have never broken up, no matter what conditions they have been subject to; and these ultimate particles are called *atoms.* —Matter, Ether & Motion pp. 9-10.

তৎপূর্ব বৎসর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Story of the Chemical Elements'-এর গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন—No atom has ever been divided। তবে কোন কোন বৈজ্ঞানিকের একটা আশা-কল্পনা ছিল বটে যে, হয়ত ঐ সকল ভিন্ন জাতীয় মূলভূত (elements) এক অদ্বিতীয় উপাদানে গঠিত, তাহারা হয় ত এক চরম ভূতের পরিণাম মাত্র।* মনীষী Sir William Crooks এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন। তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করেন যে, রসায়নোক্ত মূলভূত-সকল (তখনও রাসায়নিকেরা ৮০টি-র অধিক মূলভূত জানিতেন না—এখন জানিয়াছেন ৯২) বস্তুতঃ মূলভূত নহে † তাহারা প্রোটাইল (protyle)-নামক এক চরম ভূতের বিকার মাত্র। এই প্রোটাইলই জগতের নির্বিশেষ (homogeneous) চরম উপাদান—ইহারই সংযোগ-সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। ক্রুক্সের উক্তি এই :—Protyle is a word analogous to protoplasm, to express the idea of the original *primal* matter

---

* It is the dream of Science that all the recognised elements will one day be found to be modifications of a single material element.—World Life, p. 48.

† সেইজন্য স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স রাসায়নিক পরমাণুকে 'Molecules' বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই :—

This deviation from absolute homogeneity should mark the constitution of these *molecules* or aggregations of matter which we designate elements.

existing before the evolution of the chemical elements। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে, বৈজ্ঞানিক যাহাকে নিত্য অখণ্ড পরমাণু মনে করিতেন, তাহা নিত্যও নহে, অখণ্ডও নহে। তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্রও নহে; কিন্তু যেমন একরাশি ইষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিলে নানাবিধ অট্টালিকা নির্মাণ করা যায়, সেইরূপ এই প্রোটাইল-রূপ মূল পরমাণুর সংহনন-ভেদে রসায়নের পরিচিত বিভিন্ন এটম্-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। সে জন্য স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ *Genesis* of the Elements (পরমাণুর 'জনিমানি')-র কথা বলিয়াছিলেন। তাহার পর পরমাণুর অবয়ব সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সমীক্ষা হইয়াছে--অনেকানেক গবেষণা হইয়াছে, এবং ক্রুক্সের ঐ মতই এক্ষণে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া আদৃত হইয়াছে।

এ সম্পর্কে ম্যাদাম ব্ল্যাভাট্স্কির উক্তি শুনিবেন কি?

Our commonly received elements are not simple and primordial; they have not arisen by chance or have not been created in a desultory and mechanical manner, but have been evolved from simpler matters—or perhaps, indeed, from one sole kind of matter. * * Chemists, physicists, philosophers of the highest merit, declare explicitly their belief that the seventy (or thereabouts) elements of our text books are not the pillars of Hercules which we must never hope to pass. ** Philosophers in the present as in the past—have reached the same view from another side. Thus Mr. Herbert Spencer records his conviction that "the chemical atoms are produced from the true or *physical* atoms by processes of evolution under conditions which chemistry has not yet been able to produce." * *

Where, then, is the actual *ultimate* element? As we advance, it recedes like the tantalising mirage—lakes and groves seen by the tired and thirsty traveller in the desert. Are we in our quest for truth to be thus deluded and baulked? The very idea of an element, as something absolutely primary and *ultimate*, seems to be growing less and less distinct.

—Secret Doctrine, Vol. II, pp. 347 & 350.

কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে একথা অবিসংবাদিত যে, আদিতে এই জগৎ অসদ্ বা অব্যাকৃত ছিল—

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ—বৃহ, ১।৪।৭

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ—তৈত্তি, ২।৭

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন, জগতের সেই অব্যাকৃত, অব্যক্ত, অবিশেষ (homogeneous) আদিম অবস্থা বিবর্তিত হইয়া এই ব্যাকৃত, ব্যক্ত, বিশিষ্ট বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। ইহা সেই প্রাচীন শিক্ষা —

অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ—সাংখ্যসূত্র

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ—গীতা

অর্থাৎ, from the homogeneous to the heterogeneous, from indefiniteness to definiteness। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক্ হইতে ঐ বিকাশের ক্রম সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইতে পারে।

বিজ্ঞান বলেন, আদিতে শুধু uniform Ether of Space বা প্রোটাইল ছিল। বৈদিক ঋষি ইহাকেই—'অপ্রকেতং সলিলং' বলিয়াছেন (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৩)। একদিন ঐ নিথর ইথার-সাগর এক আগন্তুক শক্তি বা Energy দ্বারা মথিত হইলে তাহাতে অগণ্য বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিল। বস্তুতঃ ঐ শক্তি ভাগবতী শক্তি। মাদাম ব্লাভাট্স্কি উহাকে 'ফোহৎ' বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

The primordial Electric Entity (Fohat) separates primordial stuff or pre-genetic matter into atoms.*

বলা বাহুল্য ঐ এটম্ রসায়নের অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি chemical atoms নহে। উহারা পরমাণু নয়—পরম-পরমাণু। উহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম Electron বা তাড়িতাণু। †

'Electron is the specialisation or organisation of specks of Ether' অর্থাৎ, নির্বিশেষ ইথার-বিন্দুর কথঞ্চিৎ সবিশেষ ভাব—যাহাকে আমরা বুদ্বুদ বলিতেছি। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ঐ ইলেক্ট্রন দ্বিবিধ—পুং বা Positive এবং স্ত্রী বা Negative। এই ভেদ সূচিত করিবার জন্য কেহ কেহ পুং electron-কে 'প্রোটন' (Proton) এবং স্ত্রী ইলেক্ট্রনকে 'ইয়ন্' (Ion)

* ঐ Fohat-সম্পর্কে মাদাম্ ব্লাভাট্স্কির আর একটি উক্তি এই :—

Fohat is called the 'manufacturer,' because he shapes the atoms from crude materials (প্রকৃতি বা Protyle).

† ঐ Electron-নামের সার্থকতা আছে কারণ, 'In the three whorls (of the electron) flow currents of different electricities'.

বলেন। এই প্রোটন ও ইয়ন্ নানাভাবে সংহত ও সজ্জিত হইতে পারে। সেই সংহনন-ভেদেই ভিন্ন জাতীয় পরমাণু বা atoms (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির) সৃষ্টি হইয়াছে।* এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

When the physical atom of the two types, positive and negative, has been constructed, then begins the building of the chemical atoms.

বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে—Associated systems of electrons constitute the atoms of matter। অর্থাৎ, পারদে ও স্বর্ণে অথবা হাইড্রোজেনে ও নাইট্রোজেনে অন্য কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল ঐ electron-এর সংস্থানে ও সজ্জায়। সেই আদিম যুগে নিসর্গ electron-রূপ ইষ্টক লইয়াই সংস্থানভেদে ঐ ৯২ প্রকার রাসায়নিক পরমাণু বা elements গঠন করিয়াছিল। এইরূপে প্রোটাইল হইতে ঐ সকল পরমাণুর উৎপত্তি হইলে তাহাদের উপর তাপ, তাড়িত প্রভৃতি ভৌতিক শক্তি ক্রিয়া করিয়া তাহাদের সংযোগ-সমবায় দ্বারা এই বিবিধ বিচিত্র বিশাল নিরঙ্গ জগৎ (the whole inorganic universe) রচনা করিল। ইহাকেই বলে স্থাবর সৃষ্টি। এই স্থাবর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক কিছু বলিতে হইবে—যথাস্থানে। এখন আমরা লক্ষ্য করিতে চাই ঐ ইথার-বিন্দু electronগুলি কি ভাবে সজ্জিত হইয়া রাসায়নিক পরমাণু রচনা করিল। এলোমেলো অসম্বদ্ধ ভাবে —না কোন নির্দিষ্ট নিয়মিত ভাবে? লক্ষ্য করিলে ঐ স্থলেও আমরা বিশ্বনাথের অদ্ভুত জ্যামিতিকীর পরিচয় পাই—we have glimpses of the modes of His working in the elements in their *geometrical* designs.

অবশ্য ঐ সকল geometrical designs আমাদের চর্ম চক্ষুর অগোচর;

---

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক Crowther লিখিয়াছেন—

To Sir J. J. Thomson we owe the first suggestion that the properties of the elements were due to the various groupings of electrons inside the atom, and he was the first to discover the main principles of electron-grouping—principles which, in the main, hold good for the more recent and more accurate arrangements deduced by Bohr.—Molecular Physics, p. 94.

কিন্তু যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছে তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন গ্রীক্‌রা যাহাকে Platonic Solids বলিতেন—those solids give us the axes of structure for all the chemical elements। নিম্নে আমরা ঐ বিবিধ Platonic solid-এর চিত্র প্রদর্শন করিলাম।*
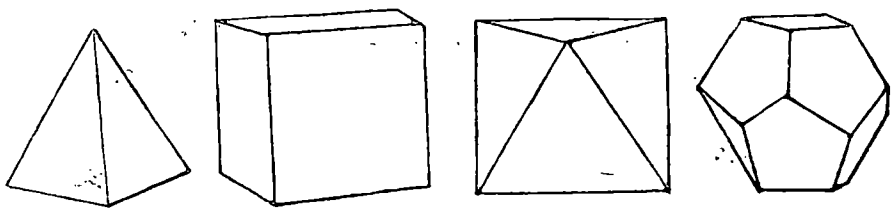
In each of these solids, its lines, angles and surfaces are equal, that is, they are geometrical * * Now these five solids, distinctive though each is in the number of its lines, angles and surfaces, are all developable from one solid, the tetrahedron * * The surfaces and corners give the directions for the building of the chemical elements—being something like the তন্মাত্র's of the Sankhyas.—C. Jinarajadasa, p. 247-8.

আমরা দেখিয়াছি এটম্ এতই ক্ষুদ্র যে তিগ্মতম অণুবীক্ষণের সাহায্যেও তাহাকে নয়নগোচর করা যায় না। কিন্তু তথাপি কোন কোন বৈজ্ঞানিক শিষ্যদিগের 'হিতার্থায়' পরমাণুর 'রূপ-কল্পনা' করিয়াছেন। ঐরূপ একটি কল্পিত চিত্র আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। এটি রেডিয়ম ধাতুর পরমাণুর অবয়ব-সংস্থানের কল্পনা চিত্র। পাঠক চিত্রে লক্ষ্য করিবেন কেন্দ্রস্থলে 'প্রোটন'-সমষ্টি এবং চতুর্দিকে ৮৮টি 'ইলেক্‌ট্রন' নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।

* Accordiug to Plato, the Highest Deity itself built in the Universe in the *geometrical* form of the dodeca-hedron (containing 12 surfaces).

—Secret Doctrine, Vol I, p. 367
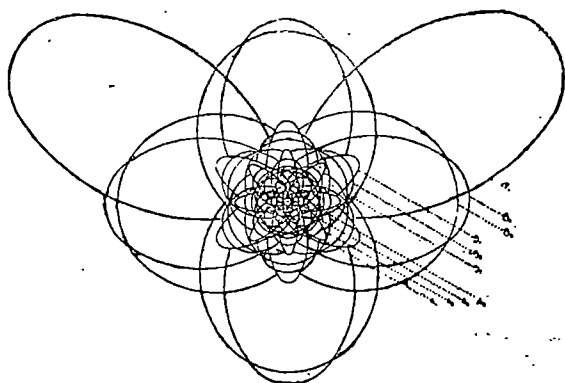
পাঠক চিত্রটির প্রতি একটু মনোনিবেশ করুন—দেখিবেন জ্যামিতিকীর কি চমৎকার উদাহরণ!

পরমাণুর রূপ কল্পনা না করিয়া পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করিবার কি কোন উপায় নাই? পতঞ্জলি বলেন, যোগসিদ্ধেরা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (যেমন, প্রস্তর-প্রাচীরের অপর পারে স্থিত) এবং বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ যেমন, কলিকাতায় বসিয়া লণ্ডনস্থিত) বস্তু দর্শন করিতে পারেন—

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট দর্শনম্—যোগসূত্র

পরমাণু পরম সূক্ষ্ম পদার্থ। যাঁহারা যোগসাধন করিয়া দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ করিয়াছেন তাঁহাদের ঐ তৃতীয় নয়নের সমক্ষে পরমাণু নিজের মূর্তি প্রকটিত করে।

কয়েক বৎসর পূর্বে মিসেস্ বেসেণ্ট ও মিঃ লেডবিটার যোগ সাধনা দ্বারা দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ করিয়া পরমাণু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক গবেষণা করিয়াছিলেন এবং "Occult Chemistry" (গুহ্য রসায়ন) নাম দিয়া ঐ গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে কতকগুলি রাসায়নিক পরমাণুর যোগদৃষ্ট মূর্তি অঙ্কিত আছে। ঐ সকল মূর্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে বিশ্বনাথের অদ্ভুত জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থকারদ্বয় বহু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, যাহাকে রাসায়নিকেরা chemical atoms বলেন উহা বস্তুতঃ যৌগিক পদার্থ। উহারা atom ত

নহেই—প্রত্যুত ভিন্ন ভিন্ন atom ভিন্ন সংখ্যক electron বা পরম-পরমাণুর সমবায়ে রচিত। অর্থাৎ, ঐ পরম-পরমাণুসকলই ঐ ঐ atom-এর অবয়ব।

(এ প্রসঙ্গে পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি যে, ঐ গবেষণা উপলক্ষে মিসেস বেসেন্ট ও মিঃ লেডবিটার দুইটি নূতন—অর্থাৎ তদানীং অপরিজ্ঞাত atom-এর সন্ধান পান—বৈজ্ঞানিকেরা যে দুই জাতীয় পরমাণু পরে আবিষ্কার করিয়া atom-এর তালিকাভুক্ত করেন। ইহা হইতে তাঁহাদের দিব্যদৃষ্টির সত্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হইতেছে।)

প্রথম হাইড্রোজেন atom-এর কথা ধরা যাক। আমরা দেখিয়াছি সকল atom-ই সাবয়ব—each atom is built of protons (পুং electron), Ions (স্ত্রী electron), and Neutrons (নপুংসক জাতীয় electron—neither positive nor negative) in varying numbers। ৯২ প্রকার atom-এর মধ্যে Hydrogen-ই সর্বাপেক্ষা লঘু। কারণ, আমরা যাহাকে পরম-পরমাণু বলিলাম ঐরূপ মাত্র ১৮টি পরমাণুর সমবায়ে হাইড্রোজেন গঠিত। এমন এমন পরমাণু আছে (যেমন Platinum B) যাহার পরম-পরমাণুর সংখ্যা ৩৫১৪, এবং যাহার গুরুত্ব হাইড্রোজেনের প্রায় ২০০ গুণ বেশী। সে যাহা হ'ক আমরা হাইড্রোজেনের কথায় ফিরিয়া যাই।

Hydrogen has in each unit 18 atoms, but there are two varieties of Hydrogen, the first composed of 10 positive and 8 negative atoms and the second composed of 9 positive and 9 negative atoms.

নিম্ন চিত্রে ঐ আঠারোটি electron-এর সজ্জা ও সংস্থান দৃষ্ট হইবে—There the 18 physical atoms making up the one chemical atom of Hydrogen re-group themselves into 6 groups of three each.
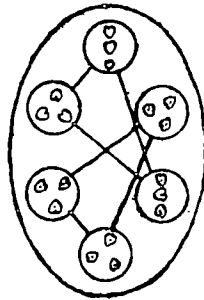
এইবার লিথিয়াম (Lithium) নামক রাসায়নিক পরমাণুর কথা ধরা যাক। ১২৮টি electron বা পরম-পরমাণু একটি লিথিয়াম পরমাণুর অবয়ব। ঐ লিথিয়াম পরমাণুর যোগদৃষ্ট অবয়ব-সংস্থান কিরূপ? নিম্নে তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইল—পাঠক লক্ষ্য করিবেন নিসর্গের কি বিচিত্র জ্যামিতিকী!
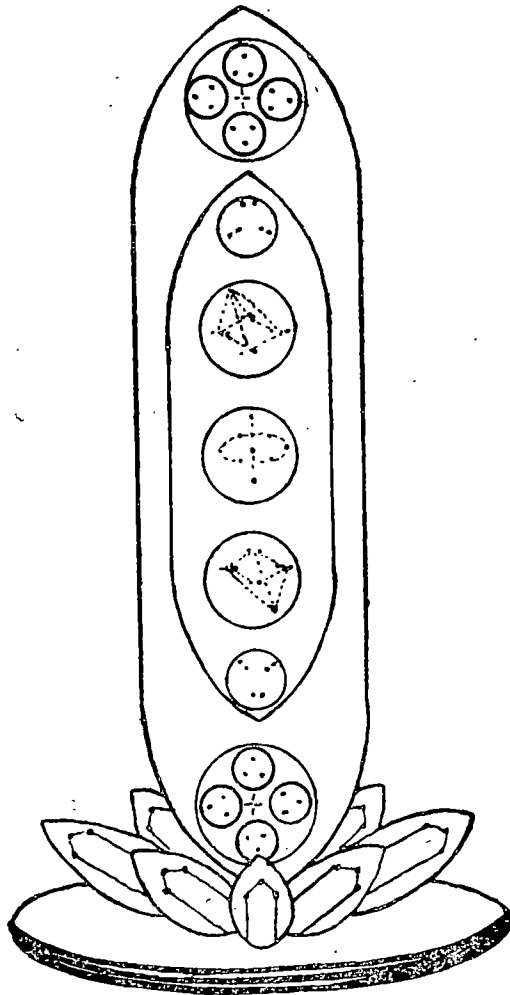
নাইট্রোজেন গ্যাস আমাদের সকলেরই পরিচিত; কিন্তু তাহার অবয়ব

সংস্থান কি বিচিত্র! নিম্নে আমরা একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর যোগদৃষ্ট মূর্তি চিত্রিত করিয়া দিলাম।
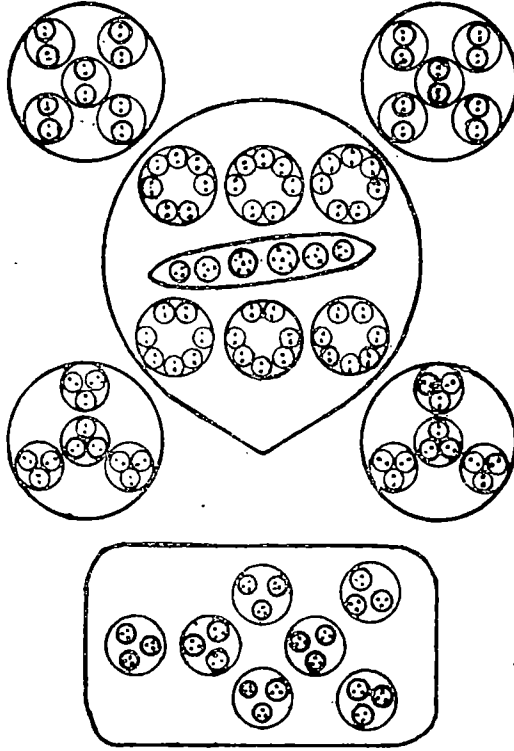
স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ পরমাণুর 'জনিমানি' (genesis)র আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন যে, দেখা যায় রাসায়নিক পরমাণুসকল ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। এক এক গোষ্ঠীর এক একটি ancestral type বা পৈতামহিক গোত্র আছে এবং সকল 'গোত্রজ সপিণ্ডেরা' সেই ancestral type-এর অনুবর্তন করে—যেমন Inert gases, Neon, Argon ও Krypton—তাহাদিগের ancestral type-এর চিত্র এই :—
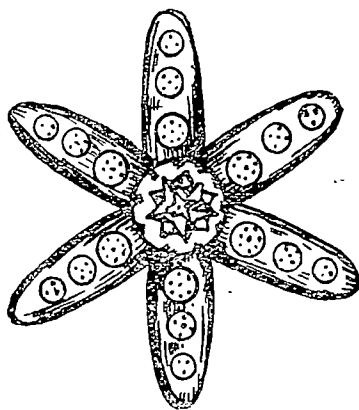
এখানেও ঐ বিচিত্র জ্যামিতিকীর ব্যাপার! আর একদল 'গোত্রজ সপিণ্ডে'র নাম করা যাইতে পারে—Sodium, Chlorine, Copper (তাম্র), Bromide, Silver (রৌপ্য) ও Iodine।* ঐ 'গোত্রজ সপিণ্ড' সকলে Sodium-এর ancestral type-এর অনুবর্ত্তী। নিম্নে প্রদত্ত সেই Type-এর চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন।

It is some-what like a dumb-bell in shape. There is a central rod connecting two groups of funnels, an upper and a lower; the funnels of each group are twelve in number, and each set of twelve radiates on, two planes from a central sphere.

---

* ঐ সকল elements-এর কোন element কতগুলি atom-এর সমবায়ে গঠিত নিম্নে তাহার সংখ্যা দিলাম—

Element	No. of Atoms
Sodium	418
Chlorine	639
Copper	1139
Bromine	1439
Silver	1945
Iodine	2287
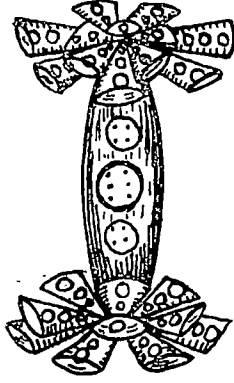
শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস তাঁহার 'First Principles of Theosophy'-গ্রন্থে ঐ সব কয়টি element-এর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। আমরা কেবলমাত্র রৌপ্য ও Iodine-এর অবয়ব-সংস্থানের চিত্র নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন কি অদ্ভুত জ্যামিতিকী!
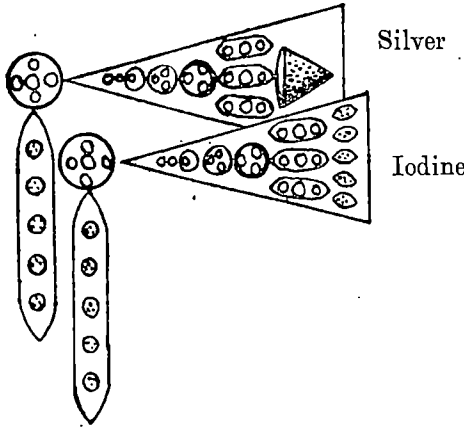
এতক্ষণ রাসায়নিক পরমাণুর কথা বলিলাম। এইবার ঐসকল পরমাণুর গঠক অবয়ব electron বা পরম-পরমাণুর কথা বলি। আমরা জানিয়াছি electron দ্বিবিধ—Positive বা পুং তাড়িতাণু এবং Negative বা স্ত্রী তাড়িতাণু। ঐ ঐ তাড়িতাণুর মূর্তি কিরূপ? যোগসিদ্ধ তৃতীয় নয়নের সমক্ষে ঐ পুং ও স্ত্রী তাঁড়িতাণু কি মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে? নিম্নে আমরা ঐ মূর্তির

চিত্র দিবার চেষ্টা করিলাম। পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীকে বহুমান সহকারে ধন্য ধন্য না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।
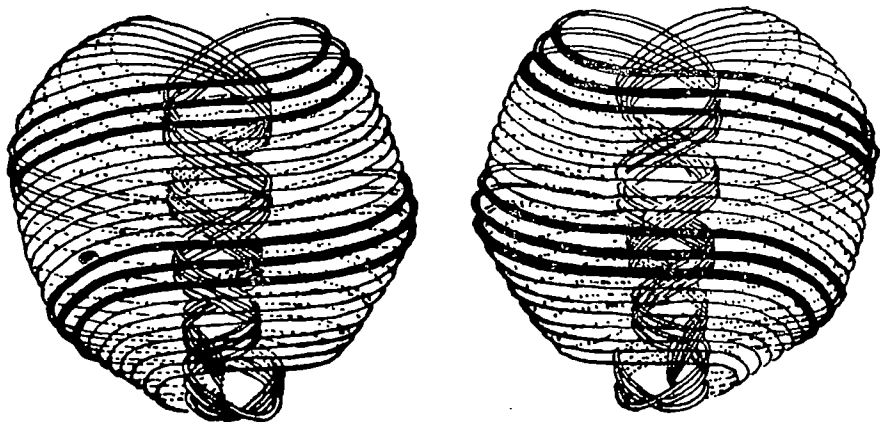
পাঠক লক্ষ্য করিবেন—

The coils in the above figures go from right to left in order to make a positive electron and the coils wound from left to right to make the negative electron.

ঐ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

These three coils in some mysterious way are charged with the three types of energy characteristic of the Triple Logos ; "in the three whorls flow currents of different electricities." Then the seven embodiments of the Triple Logos, the seven planetary Logoi, twist seven parallel coils to complete the physical atom.

—First Principles of Theosophy, p. 246.

বিশ্বনাথ ত্রিমূর্তি—ত্রৈধাত্মা। ইহা লক্ষ্য করিয়া জিনরাজদাস বলিলেন—the Triple Logos। সপ্ত প্রজাপতি (শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস যাঁহাদিগকে the Seven Planetary Logoi বলিলেন) বিশ্বনাথের পরিকর, কিঙ্কর। তাঁহাদিগের সহযোগিতায় বিশ্বনাথ প্রোটাইল-স্থানীয় মূলপ্রকৃতি হইতে ঐ তাড়িতাণু রচনা করেন এবং যেহেতু ঐ তাড়িতাণু মূলতঃ তাড়িতশক্তির কেন্দ্র, অতএব উহার সার্থক নাম—'electron'.

প্রাচীনেরা বলিতেন 'As above, so below'—যাহা পিণ্ডাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন বিশ্বনাথ 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। আমরা অণোরণীয়ান্ পরম-পরমাণুতে বিশ্বনাথের বিচিত্র জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইলাম;—মহতো মহীয়ান্ সৌর মণ্ডলে কি তাঁহার জ্যামিতিকীর ইঙ্গিত নাই? যিনি সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সূর্য নারায়ণ—গায়ত্রী-মন্ত্রে ধী-র মধ্যে মুখরিত যাঁহার বরণীয় ভর্গঃকে আমরা ধ্যান করি—তাঁহার বর্ণনায় ঋষিরা বলিয়াছেন—তিনি 'সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট'—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ ।

ইহা রূপকের ভাষা নহে—ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিলে 'the appearance of the Solar System from the high planes (যে ভূমিকা হইতে ঋষিরা সৌর-মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন) is that of a wonderful cosmic flower of many petals and colours, with a great golden pistil, which is the sun as the heart of the flower.

—First Princlples of Theosophy, p. 367.

শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস ঐ সৌর সরসিজের একখানি চমৎকার রঙীন চিত্র দিয়াছেন। যাঁহাদের এ সম্পর্কে কৌতূহল আছে তাঁহারা ঐ চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। দেখিবেন ঐ সপ্তদল সরসিজ (যাহার প্রত্যেক দল এক একটি Planetary Logos-অধিষ্ঠিত এক একটি Planet বা গ্রহ—পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, ইত্যাদি) বিশুদ্ধ জ্যামিতিক প্রণালীতে রচিত এবং তাহার কেন্দ্রস্থ কূটমূলে Solar Logos বা সূর্য-নারায়ণ।

The whole system forms a great ellipsoid in space, the major focus of which is the sun, and the minor focus the Planetary Logos. * * So the Solar System, as the Logos and His seven great Assistants who work with Him, appears as a great flower of many petals, with a great, glowing, golden heart at its centre.*

---

* যাঁহাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে তাঁহারা C. W. Leadbeater's *The Inner Life*' vol. I, under Symbology এবং Man—whence and whither, chap. XIII-এর প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

সপ্তবর্ণচ্ছেদে বিচিত্রিত ঐ Ellipsoid-এর বর্ণ বাদ দিয়া তাহার জ্যামিতিক আকার মাত্র নিম্ন চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
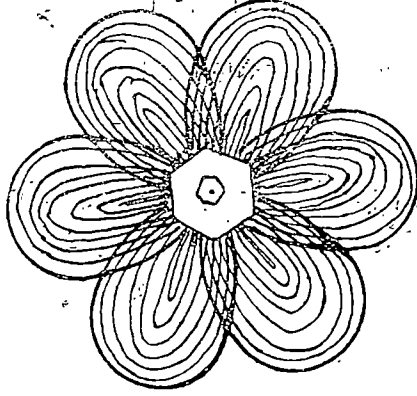
পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, যেমন অণোরণীয়াণে তেমনি মহতো মহীয়ানেও বিশ্বনাথের বিচিত্র জ্যামিতিকীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 'Verily, God geometrises!'

ঐ জ্যামিতিকী সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক বক্তব্য আছে। আগামী বারে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

"তুমি আসতে পারবে—চিঠি লিখছি"—তার পাঠিয়ে রমলা সুজনকে কি লিখবে ভেবে পেলে না। সব কথা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। কলম ধরলেই ভাবনাগুলো ছুটে পালায়। তাদের একটি যদি সূতো থাকত, তবে তার খেই খুঁজে বোনা চলত। এ যে অদ্ভুত সম্বন্ধ, ভালমন্দ তরতমের জট পাকান, খানিকটা অতীত, খানিকটা বর্ত্তমান, এটা ওর ঘাড়ে পড়ছে, যূথভ্রষ্ট কুকুর ছানার খেলা যেন। রমলা জানে স্বামীরা কি চায় এবং স্ত্রীরা কি দেয়। খগেন বাবু তার অতিরিক্ত আরো কিছুর প্রত্যাশা রাখেন, অথচ নিজেই জানেন না সেটা কি। স্বামী পশুত্বের দাবী করেছিল, সে পূরণ করতে পারলে না, তাই চলে এল। ইনিও তার কম কিছু চান নি, কিন্তু মানুষ হিসেবে, প্রাণের প্রাচুর্য্যে, তাই অপমান লাগে নি দৈহিক লেন দেনে, অনিচ্ছার আত্মগ্লানি স্বেচ্ছার গঙ্গাজলে গেল ধুয়ে। কিন্তু প্রাচুর্য্যটাই কাল হল। প্রচণ্ড ক্ষুধার নিবৃত্তির পরও যেন অতৃপ্তি থাকে। উদ্বৃত্তের ছটফটানি কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, তাও আবার সুজনকে! পরকীয়ার এই পরিণাম, না সব পুরুষেরই এই দশা! চাঞ্চল্য বশ করতে বাইরের কাজ, প্রতিদিন রাত্রে ফেরা, খাবার ঠাণ্ডা, আর প্রতীক্ষা। এই যদি মনে ছিল তবে আপন পায়ে দাঁড়ালেই পারত। সফীক আর শ্রমিক, কাজের বিরাম নেই, ঘুম নেই, ঘুমের মধ্যেও ঐ ভাবনা ঘুরছে। ভূত ছাড়াতে সে সেজেছে, স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করেছে, নায়িকা হয়েছে, তার চেয়েও নির্লজ্জ ব্যবহারে আপত্তি জানায়নি। কোনো ফল হল না, দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এখন প্রায় স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধে এসে পৌঁছল। এত কথা কি লেখা যায়, না নিজের কাছেই মুখ ফুটে মানা চলে!

কেমন করে অন্যকে জানাবে, বোঝাবে যে তার ভালবাসা বিমল, তার

স্বার্থত্যাগ অস্বীকৃত, তার সব চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে? যারা এখনও বুকের ভিজে পর্দ্দার ও পাশে কাঁপছে তারা কোন সাহসে পর্দ্দা ঠেলে সামনে এসে নাচবে? এ কি জানান যায় যে তার হার হয়েছে, শেকল নিয়ে ঝটপটানিই সার, জোর উস্‌কো-খুস্‌কো পালক খুঁচিয়ে দেহটা তৈলাক্ত করা, যাতে জল যায় ঝরে আর বাইরের লোকে না বোঝে লালমণিটির কি দশা! বাইরের বাঁধন তবু ছেঁড়া যায়, নিজের পরা শেকল বওয়া ছাড়া উপায় নেই যে! কিন্তু আত্মধিক্কারটা উপরে আসে, তাড়নায় গরল ওঠে। পুরাণের নীলকণ্ঠ মহাদেব, এ-যুগের নীলকণ্ঠ সতী, নীল দাগ ঢাকবার জন্য মুক্তার সাতনরী। টেবিলের আয়নায় চোখের চারপাশের কালো দাগ দেখা যায়, কণ্ঠা বেরিয়েছে, আঙরাখা কাতর, অসমর্থ, হাত থেকে বুক ফসকে গেল, পৃথক হল, সুজনও দেখেছে হাত ছিল দেহের অঙ্গ, একখণ্ড সাদা পাথর থেকে কাটা। সুজনের বয়স হল কত? এক বয়সী নিশ্চয়, এখনও তার দেহে যৌবনের সামঞ্জস্য অটুট। সু-পুরুষ, সুন্দর নয়, ঝলকায় না তার রূপ বিজনের মত, কিন্তু আভা আছে, সুস্থির প্রদীপশিখা, নিজের রসদ নিজে যোগায়, শান্তি আছে, বিষাদ থেকে তার উত্থান। বিষণ্ণ কেন? বঞ্চিত তাই বিষণ্ণ। কেনই বা একজন চিরজন্ম বঞ্চিত থাকবে, আরেকজন স্বেচ্ছার দান পায়ে ঠেলবে! সুজন আসুক, আর সে ঠকবে না। রমলার মুখ উজ্জ্বল হয়, তাই দেখে লজ্জা আসে, বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

সফীকের না হয় হৃদয় ব্যাকুল হোক কুলীদের জন্যে, কিন্তু বিজনের ব্যাকুলতা নিরর্থক। কখনও সে গরীবদের ঘর দোর পর্য্যন্ত দেখেনি। তার কল্পনার দৌড়ও এত বেশী নয় যে তাতে অভিজ্ঞতার ক্ষতিপূরণ হয়। আর উনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সফীকের সঙ্গে কাটাচ্ছেন তারও মূলে না আছে প্রত্যক্ষ অনুভব, না আছে সুদূর দৃষ্টি। এ কেমন দৃষ্টি যেটা সামনের জিনিষ এড়িয়ে চলে! বরঞ্চ সে দৃষ্টি, সে অনুভূতি, সে কল্পনা আছে সুজনের। পরের বাড়ি মানুষ হয়েছে, বিজনের বাবা বড়লোক, তিনি সমান ভাবে রেখেছেন দুজনকে, তবু এই অপক্ষপাত সুজনকে ভোলাতে পারে নি, ভদ্র ভাবে সে তাকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু স্বার্থে প্রয়োগ করে নি, সহজে পরের উপকারে এসেছে, আচরণে আড়ষ্টতার প্রমাণ দেয় নি, তাই তার স্বভাব সুমিষ্ট হয়েছে।

একটু হয়ত মেয়েলী, মুখের হাসিটা অত নম্র পুরুষের হয় না। কেন সে সর্ব্বদা পিছিয়ে থাকে; কেন এগিয়ে এসে নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠিত করে না? আপন অধিকার কেড়ে নেয় না? এক সময় রমলা নিজেই অমনোযোগী ছিল, তাকে হয়ত নিজেই মনের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। 'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল···' এই লাইনটা ঘুরে ফিরে কেবলই আসে···পরিচিত··· কখনও প্রথম আসে, রমলা মনে করতে যায়, মনে পড়ে না। এবার জেগে থাকবে, তন্দ্রা আসতে দেবে না। এবার এলে সে সব পাবে···মুছাব পা আকুল কেশে······

সরম আসে···কেন সে আবার নিজেকে দেবে? সেই কোন যুগ থেকে মেয়েমানুষ দিয়েই এল; লোভ দেখিয়ে, আদর করে, কখনও খোকা সেজে, কখনও যাত্রার বীরের পোষাক পরে খবর নিয়েই গেল, মেয়েদের আপত্তি নেই, উল্‌টে কৃতকৃতার্থ, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি, পুরুষদের কৃতজ্ঞতা নেই, যেন তাদের প্রাপ্য, তারপর হতশ্রদ্ধা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে থাকা, কিনা কাজ, ছাই কাজ, কাজের মুখে আগুন, মিথ্যার সম্ভার, নচেৎ শ্রমিকদের জন্য হৃদয় বিগলিত, আর ঘরের মধ্যে একজন সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা ধন্না'ই দিয়ে যাচ্ছে, তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছা কিছুই নেই, কিছুই থাকবে না, থাকা উচিত নয়, থাকা পাপ। এ-অত্যাচার অনাদি অনন্ত ওতঃপ্রোত। কবি বলেন এই মেয়েদের স্বভাব, তাই পা মোছান চাই, বাঙালী বলে বাঙালী মেয়ের মিষ্টতা, তাই প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকতে হবে। কিন্তু স্বভাব নয়, সংস্কার, যার দম ফুরিয়েছে বহুকাল। রমলা বিছানা থেকে উঠে কলম নিয়ে বসে।

'সুজন, তোমার শেষ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। অবশ্য ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমিও প্রত্যাশা কর নি। উপদেশের একমাত্র উত্তর, পালন·········'

উপদেশ দিয়েছিল, কোথায় গেল চিঠিটা? রাগের বশে নিশ্চয় সেটা ছিঁড়ে ফেলেছে, কিন্তু উপদেশ ছাড়া আরো কিছু ছিল প্যাঁচালো ভাষায়, যার অর্থ আবিষ্কৃত হল, সুজন তাকে প্রেম নিবেদন করেছে, তাই আপদ দূর হল, পাছে কাঁটার মতন সেটা সর্ব্বাঙ্গে চরে বেড়ায়; তবু বুঝলে না। রমলা হঠাৎ উঠে হাত-বক্স খুলে ঘাঁটতে থাকে...এই যে চিঠিটা রয়েছে···হাতের লেখা সুন্দর, শান্ত, মিষ্টি—লিখেছে···

'আশা করি এতদিনে তোমার একাকিত্বের অবসান হবে। অথচ, পরাশ্রয় আমার অগোচর নয়। তবু আমি তোমার জন্য খুশী। তোমার সাধনায় তুমি ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করেছ, খগেন বাবুরও 'পুরুষ সিদ্ধি' নিষ্ফল হয়নি আমার ধারণা। দুজনেই মানুষ না হলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ শেকলই থেকে যায়। তুমি নিজের জোরে আপন অধিকার বিস্তার করেছ, তার সামনে বাধা বিপত্তি স্থায়ী হবে না। এমন কি আমরাও সেখানে অবান্তর। অবান্তরের স্থান নেই যখন সে বুঝতে পারে তখন সে 'বোকা'। তুমি যখন আমাকে 'বোকা ছেলে' বলেছিলে তখন আমি ঠিকই বুঝেছিলাম...অর্থাৎ তোমাদের জীবন পথে আমি অনাবশ্যক। কষ্ট হয়েছিল বলতে এখন লজ্জা নেই, কারণ তার অন্য অর্থ পেতে প্রাণ ব্যাকুল হয়, ক্ষণিকের জন্য। আজ আমার কষ্ট নেই। বিজনের এখন আপন মতামত হয়েছে, সেই অনুসারে সে কাজ করছে। তাতে কি আমার দুঃখ হওয়া উচিত ?"

"কেবল একটা কথা মনে ওঠে। যদি নতুন কর্ম্মপ্রবাহে জীবন চালাতে পার তবেই সার্থক হবে—অবশ্য, সেখানে তোমার কাজ নেতিমূলক। যে এতদিন একলা থাকতে পেরেছে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

"তোমরা কোথায় থাকবে যদি জানতে পারি, এবং তোমাদের এখান থেকে বই কি অন্য কোনো জিনিষ পাঠাবার যদি দরকার হয় তবে আমাকে লিখো। অন্য কোনো প্রয়োজন হয়ত উঠবে না, যদি ওঠে, তবে সঙ্কোচ যেন না হয়।"

'বোকা ছেলে'...মনে পড়ে সেই রাতে অক্ষয় বাবুর বাড়িতে সুজনের ঘর, সুজন বিছানায়, আরাম কেদারায় নিজের সারারাত কাটল, সুজন মড়ার মতন শুয়ে রইল। অবান্তর ব'লে বোকা নয়, মোটেই নয়, না বোঝবার ক্ষমতা অসীম! কী আশ্চর্য্য! কোনো পুরুষের মাথায় কি এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই!

'উপদেশের একমাত্র উত্তর পালন'...নতুন কর্ম্ম প্রবাহে জীবন বহান... শুনতে বেশ, গালভরা কথা; এর নাম কর্ম্মপ্রবাহ! কার কর্ম্ম! যার কেউ নেই সে শ্রমিক আন্দোলন করুকগে...সফীকের মা নেই বাপ নেই নিশ্চয়, নচেৎ ভাওয়ালী পাঠাতে হয়! বাপে তাড়ান মায়ে খেদান ছেলেরাই এই হুজুকে মাতবে...জোর করে প্রেম হয় না...যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যের লাঠি বাজে। সুজন এ-ধরণের উপদেশ কিছুতেই দেয়নি...সে বলতে চেয়েছে,

পুরানো ইতিহাস ভুলে নতুন অধ্যায় খোলো...ও যত পড়ে পড়ুক, লিখুক, কে বাধা দিচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বইএর পাতায় চোখ সেঁটে থাক... কে মানা করছে...কিন্তু এ-সব কি। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-চর্চ্চা খুইয়ে তর্ক, আর মজুরদের জন্য নোট লেখা। একে 'কালচার' বলে না। কথায় কথায় 'ইতিহাস' কপচান...অথচ কোথায় ইতিহাসের বই তার পাত্তা নেই। নীল মলাটের লম্বা লম্বা বই, সংখ্যায় ভরা, ছাপা বাঁধাই যাচ্ছেতাই, তাই হল খোরাক। কেমন করে তাদের দৌত্যে দুটি প্রাণী এক হয়। 'নেতিমূলক' বাদে তারই অংশ। অর্থাৎ খাবার টেবিল সাজান, আর তার পাশে চুপ করে বসে থাকা, তাও নিমন্ত্রণের নাম নেই, একজন ভদ্রলোককে খেতে বলা হয় নি এতদিনে, সহরে কি ভদ্রলোক নেই, এলেও তাদের এই সরঞ্জামে কষ্ট হবে, সফীকের এই যথেষ্ট, বিজন এইতেই খুশী...নেতিমূলক...অর্থাৎ খগেন বাবুকে আরাম দাও যত পার, আর তার চোখে স্বার্থের ছানি পড়তে থাকুক। কি চমৎকার বন্দোবস্ত। এ অচল...সুজন বোঝে না, চিঠিতে বোঝান যায় না, সে চলে আসুক...ও আপত্তি করবে না, ওর সুবিধা হবে, সুজন আর বিজনের হাতে সমর্পণ ক'রে সে সফীকের জন্য নোট লিখবে, তার সঙ্গে রাত বারটা পর্য্যন্ত আড্ডা জমাবে। রমলা নতুন চিঠির কাগজে আবার লিখতে সুরু করল।

'সুজন, নিশ্চয়ই তুমি আমার তার পেয়েছ। তোমাকে পেলে আমরা সকলেই খুশী হব। কানপুরের মতন সহরে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা যায় না, কিন্তু সেই জন্যই তাদের প্রয়োজন বেশী। বিজন ও সেই সঙ্গে এঁরাও 'নতুন কর্ম্ম প্রবাহে' অবগাহন করছেন। যে-ফ্ল্যাটে আছি সেটা মোটেই ভাল নয়। শীঘ্রই অন্য বাড়িতে উঠে গেলে সব দিক থেকে সুবিধে। আমাকে তুমি বিশ্বাসে ধন্য করেছ, তাই বলছি যে তুমি 'অবান্তর' নও। কবে আসবে পত্রপাঠ জানিও।

ইতি—রমলা'

রমলা চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে বসবার ঘরে এসে একটা ক্যান্‌ভ্যাসের চেয়ারে বসল। হাতে পশম আর কাঠি। সোফায় একটা বই পড়ে আছে, নামটা পড়া যায় না। তার চোখ খারাপ হল না কি? চশমা পরলে কেমন

দেখাবে ? কালো ডাঁটির চশমা পরুক মার্কিন মেয়েরা, যারা জিনিষপত্র বেচে বেড়ায়, পাদ্রীগিরি করে, আর পরুকগে রুশ মেয়েরা, যারা চুল ছেঁটে, চামড়ার খাপে কেতাব আর কাগজ পুরে গ্রামে আর সহরে কম্যুনিজমের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত। প্যাঁসনে-র কাল গেছে। ফ্রেম্ না থাকাই ভাল—না হয়, হোয়াইট গোল্ড। রমলা সোফার কাছে যেতে অক্ষরগুলো স্পষ্টতর হয় না। তবে কি চালশে ধরেছে ? না, চশমা এক প্রকার গয়না, কখনও গহনার ওপর তার মোহ ছিল না, এই বয়সে আর শোভা পায় না। রমলা বইটা তুলে নিয়ে দেখলেন অর্থনীতি, মেয়েদের শেখবার অযোগ্য, যাদের সর্ব্বদা টাকা-আনা-কড়া-ক্রান্তির হিসেব রাখতে হয় তাদের পক্ষে অর্থনীতির মূল্য নেই।

বাড়িতে একটা নভেল কি গল্পের বই নেই যে সময় কাটান যায়। পুরুষের আগ্রহে স্ত্রী তাল রাখবে কেন ? স্ত্রীর যখন সন্তান সম্ভাবনা হয় তখন ত পুরুষে নতুন অতিথির সম্বর্দ্ধনায় কালক্ষেপ করে না···প্রথমটা ভয় পায়, ভয় ছাড়া কি ? খগেন বাবুকে যেদিন সে সন্দেহ—মাত্র সন্দেহটুকু জানালে তখন তাঁর চোখের তারা ভয়ে নিশ্চল হয়েছিল ; ভয় নিশ্চয়, এ আবার কে এল ভাগ বসাতে সম্পত্তিতে, আরামে, দাসীগিরিতে ; কেবল অজানার ভয় নয়, এক লাইনে রেলগাড়ি বেশ চলছিল, অন্য লাইনে কেন যাবে, কেন ধাক্কা খাবে সহজ জীবনটা ? ওরা বলে 'এক্‌স্‌প্লয়টেশন' চলছে, কিন্তু গোড়ার পাপ ঐখানে। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধেই তার প্রকাশ, চরম বিকাশ, তার বাইরে যেতে হয় না, কলকারখানায়।

হাঁ, যদি পুরুষে কবি হয়, গল্প কি নভেল লেখে তবে স্ত্রীজাতি সাহায্য দিতে পারে, কারণ তারা জানে ব্যাপারটা কি ! বৈজ্ঞানিক স্বামীর বৈজ্ঞানিক স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ ··কুরী আর মাদাম কুরীর তুলনা কোথায় ! জোর মেয়েরা টাইপ করবে, শ্লাইড ধোবে আর স্বামীর বক্তৃতার সময় সামনের বেঞ্চে বসে থাকবে। যে পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে ব্যস্ত তাদের স্ত্রীদের কর্ত্তব্য কেবল খাবার টেবিলের পাশে অপেক্ষা করা। এর বেশী আর কিছু নয়। মেয়েরা শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে।

কিন্তু সময় কাটে না ! সুজন এলে খানিকটা সময় কাটবে। ততদিন কি কাজ নেওয়া যায় ? নিজের খেয়ালে বই পড়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ভাল

লাগে না। কখনও খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। কন্‌ভেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতিতে বাড়িতে পড়বার সুযোগ নেই, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্কুল, আর খিল-খিল হাসি বেণী দুলিয়ে, সেই মেয়েতে মেয়েতে ভালবাসা, না হয় মাষ্টারনীর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া। সিষ্টার সিসীলিয়ার কথা মনে পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, হিন্দু দর্শনের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাই ভারতবর্ষে আসে, গুজোব উঠল সে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করবে। নীহার এসে বল্লে, মিথ্যে কথা, হিঁদু ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, তাই ছুতো করে চলে যাচ্ছে। মুখটা মিষ্টি ছিল, কি নীল চোখ, সোনালি চুল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত, বাপের জমিদারীতে ঘোড়ায় চড়ে দল বেঁধে শেয়াল মারতে গিয়ে পড়ে যায়। নীহারটা কেবল নিন্দে করত, তবু, মন ছিল তার সরল, যা মনে আসত তাই বলে ফেলত গল্‌ গল্‌ করে। মাদার সুপিরীয়ার বলেছিলেন, কথার আমাশায় ভোগে নীহার···কোথায় আছে কে জানে! একবার একটা গল্প বেরোয় তার নামে···কনভেণ্টের কথা ছিল, নিশ্চয়ই নীহার···আর কে অমন কুৎসা রটাতে পারে।

খগেন বাবুর সঙ্গে বিজন এসেই রমলাকে চা দিতে অনুরোধ করলে। কুরুসকাটি আর পশমের গোলা গুছিয়ে রেখে রমলা ভেতরে গেল। বিজন স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুলো। যখন বেরিয়ে এল তখন তার চেহারা ভিন্ন; চুল 'ব্যাকব্রুশ' করা, ফরসা জামা ও প্যান্তালুন, পায়ে কাব্‌লী চটি।

'রমাদি ভাগ্যিস এখানে জামা কাপড় রাখতে বলেছিল! আঃ বাঁচলাম! আপনিও একবার স্নান করে আসুন, আরাম পাবেন।' খগেন বাবু উঠলেন না। বয় চাএর ট্রে আনল, সঙ্গে পেষ্ট্রি। হাত পা না ধুয়েই খগেন-বাবু পেষ্ট্রি তুলে নিলেন।

'সত্যি বলছি, খগেন বাবু, ওস্তাদকে বুঝি না, দেখলেন ত' ব্যাপারটা! অমন সুবিধা কি কেউ ছেড়ে দেয়? মার্ক্স নিজে বলেছেন যে বিরোধের কাছে সব পদ্ধতিই সমান, কোনোটা বড় আর কোনোটা হেয় নয়।'

ব্যাপারটা এই: একজন কর্ম্মী এসে সফীককে খবর দেয় যে একটা ফ্যাক্-টরীতে যার মালিক মজুরদের পুরী হালুয়া কাবাবের লোভ দেখিয়ে, ফাটকের মধ্যে শোবার বন্দোবস্ত ক'রে কাজ চালাচ্ছিল, সেই ফ্যাক্টরীর একজন মজুর

অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অসহ্য গরম থামাতে ধ্যানে বসেছে, যতক্ষণ না বৃষ্টি পড়ে ততদিন সে উপবাসে থাকবে। অনেক লোকজন জমায়েত হচ্ছে দেখে কর্ত্তৃপক্ষ দু'মিনিট আগেই দুপুরের ছুটি দেয় সীফ্‌টের বাঁশি বাজিয়ে। ফাক্টরীর মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য, রীতিমত কাজ হচ্ছে না। গোলমালের ভয়ে ওরা রাতে তাকে ভাগাতে পারেনি, সঙ্গে অনেক লোক ছিল। সাহেবরা ভয় দেখায়, কিন্তু লোকটা কথাই কয় না। পরের দিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! মজুররা 'বাবা' 'বাবা' করছে, চড়াই দিচ্ছে, মালিকরা ভীষণ গোলমালে পড়েছে। বৃষ্টি যদি না পড়ে আর মেঘ যদি উড়ে যায়, তবে কাজ বন্ধ থাকবে।

কলের সাহেব বলেছে যে সন্ধ্যার আগে যদি লোকটা সরে না যায় তবে পুলিশের হাতে দেবে। ইতিমধ্যে ফাটকের বাইরে সিপাহি এসে হাজির, মজুররা ক্ষেপে উঠেছে। ঘটনা শুনে সকলেই উত্তেজিত হয়। বিজন বলে ভগবানের না হোক ইতিহাসের আশীর্ব্বাদ এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা যেকালে উচিত নয় তখন শীঘ্রই ব্যাপারটাকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়াই সঙ্গত। খগেন বাবুরও তাই মত, কারণ বিবাদ যখন চলছে, এবং হরতাল যখন অসম্পূর্ণ তখন সুযোগটা গ্রহণ করাই ভাল। করিম নীরবে ছিল। সফীকের কোনো আগ্রহ না দেখে বিজন একটু হতাশ হয়। যেন কিছুই নয় ভাবটা, নিতান্ত হালকা ভাবে খগেন বাবুকে অনুরোধ জানায় হরতালীদের নাম-ধামের সূচীপত্র তৈরী আর চাঁদা খরচের হিসাবের ভার নিতে। খগেন-বাবু সফীককে অবশ্য বলেছিলেন, 'বিজনের কথাটা ফেলবার নয়।' কিন্তু সফীক উত্তর না দিয়ে কেবল করিমকে দেখিয়ে দিলে। করিম ইতস্তত করছিল। খগেন বাবুর সোজা প্রশ্নের উত্তরে সে সোজা উত্তর দিলে, 'হিন্দু বাবাজীর পিছুপিছু ফকীর সাহেবও আসবেন, তখন ওদেরই লাভ, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে, পুলিশ ঢুকবে সব কলের মধ্যে।'

এই উত্তর বিজনের মনঃপূত হয় নি। লড়াইএর সময় বাচবিচার অচল, দাঙ্গার ভয়ে বিরোধ বন্ধ রাখা অনুচিত প্রভৃতি যুক্তি দেবার সময় সফীকের মুখে হাসি ফোটে। সেই দিনই সন্ধ্যায় দু' ফোঁটা বৃষ্টি হয়, 'বাবা' মহারাজ হয়েছেন, ফাটকের বাইরে যাগযজ্ঞ ক'রে একটা ডেরা তুলেছেন। ইতি-

মধ্যে একটা বেশী মাইনের চাকরী খালি হয়েছে, পদোন্নতিতে মহারাজের এইবার বোধ হয় ধ্যানভঙ্গ হবে।

চা খেতে খেতে বিজন বল্লে, 'আপনি জানেন যে ওস্তাদকে আমি কত শ্রদ্ধা করি, কিন্তু কখন যে কি ক'রে বসে তার হদীস পাই না।'

খ—'এক হিসেবে সমর্থন দিতে পারি। দাঙ্গা বাধত, এবং সেটায় হরতালের ক্ষতি হত। করিমেরও তাই মত।'

বি—'বলতে বাধে, কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, ভুল ঠাওরাবেন না, করিম, সফীক মুসলমান ব'লে বোধ হয়, ঠিক এই সব হিঁদুয়ানী পছন্দ করে না। তাদের কোনো গোঁড়ামি নেই, বুদ্ধিতে, কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়!'

খগেন বাবু কঠোর ভাবে চাইতে বিজন উত্তেজিত হয়ে বল্লে, 'পজিটিভ ভাবে মোটেই নয়, কখনই নয়, কিন্তু যদি তাদের কার্য্যকলাপ দেখে কেউ ঐ ব্যাখ্যা দাখিল করে তবে তাকে দোষী ভাবা যায় না। কেনই বা আমাদের এমন আচরণ হবে যে-সম্বন্ধে ভুল ভাবা সম্ভব! আমাদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যদি কারুর কখনও সন্দেহ ওঠে তবে আমাদেরই সর্ব্বনাশ। তাছাড়া, কার্ল-মার্কস্, লেনিন ঠিক বিপরীত উপদেশ দিয়েছেন, সেদিন একটা বইএ দেখছিলাম।'

খ—'তাঁরা হিন্দু মুসলমান সমস্যার ধার ধারতেন না। ঘটনাটা বড়, না মতামত বড়! এই ধরণের পবিত্র, শুদ্ধ মার্ক্সিজম-কে মার্ক্স ও লেনিন উভয়েই আচ্ছা করে ঠুকেছেন জান না?'

বি—'কিন্তু লোকে ভুলই বা বুঝবে কেন?'

খ—'তারা কারা?'

বি—'অনেকে, আপনি জানেন না। এই ধরুন, ওস্তাদ মধ্যে মধ্যে একেবারে ডুব দেয়, কোথায় গায়েব হয় কেউ জানে না। নানা লোকে তাই নিয়ে কাণাঘুষা করে—কারুর মতে, ওস্তাদ তখন শুষ্ক কর্ম্মে বিতৃষ্ণ হয়ে রূপ-চর্চ্চায় মগ্ন থাকে, কেউ ভাবে, যেমন আমি, ঐ ফাঁকে ওস্তাদ ভাল ভাবে বই পড়ে। সত্যি কথাটা কি তাকে একবার ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কেমন যেন অবহেলার হাসি, 'হু কেয়ার্স' ভাব!'

বিজনের স্বরে, তার প্রতিবাদে, আলোচনায়, অনুযোগে অভিমানেরই রেশ রয়েছে। অবিশেষ বিরোধের মধ্যে সে ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধের অবিচল

কেন্দ্র চায়। সফীক এই চাহিদার প্রশ্রয় দেয় না। সফীক-বিজনের সম্পর্ককে অমানুষিক বলা যায় না, কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা নিবিড়তার প্রতিকূল। জড়ের কাঠিন্যের অপেক্ষা বায়ব শূন্যতা মানবিক প্রসারকে দমন করবার শক্তি রাখে··· জড়ের আঁশ অনুসারে যন্ত্র চালালে তাকে বশে আনা সম্ভব, কিন্তু পঞ্চ ক্রোশের ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা খামখেয়াল, কোনো বৈজ্ঞানিক তার নিয়ম কানুন ধরতে পারলে না, পাইলটরা তাকে বশে আনতে অপারগ হল। কন্‌কনে পাগলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক। সফীক স্নেহহীন নয়, কিন্তু তাকে স্নেহশীল আখ্যা দিতেও বাধে। মেয়েরাও খামখেয়ালী, প্রহেলিকা, কারুর ভাঁড়ার খালি তাই, কেউ বা দিয়ে ফিরিয়ে নেয়, সম্পর্কের স্থিরতা ও সাতত্য রাখে না, যেমন রমলা। কিন্তু সফীক যে-মর্ম্মে জীবন চালায় তার তর্ক-পদ্ধতি ভাব-রহিত, যুক্তি-বুদ্ধিবিবর্জ্জিত। খগেন বাবু বিজনকে বল্লেন,

'সফীক ডায়েলেক্‌টিকস্‌ ধরেছে।'

বি—'তা হয়ত ধরেছে, কিন্তু তাই বলে কোনো যুক্তি মানবে না, ব্যবহারে কোথাও নরম হবে না!'

খ—'আমি অবশ্য তাকে বেশী চিনি না, কিন্তু একটা দিক থেকে তার আচরণের ব্যাখ্যা সম্ভব।'

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা, কেবল ব্যাখ্যায় বুক গেছে শুকিয়ে, হৃদযন্ত্র বন্ধ, খুলির সামনেকার ঢিবি বেড়েই চলেছে, এইবার শিঙ্‌ বেরুবে, তার পর দাড়ি গজাবে, দেখাবে মজার ভেবে রমলা হাসল। হাসি চোখে পড়তে খগেন বাবু অসোয়াস্তি বোধ করলেন, ব্যাখ্যার খেই গেল হারিয়ে, খুঁজতে গিয়ে একেবারে গোড়ার কথা ধরলেন।

'ব্যাপারটা এই ঃ তুমি···কোনো-কিছুকে, ধর, সম্বন্ধকে স্থির ভাব, না বদলাচ্ছে ভাব ? সুবিধের জন্য স্থির ভাবতেই হয়, কিন্তু সুবিধার ফাঁকে সত্য-বস্তুটা ফস্‌কে যায়।'

'যাই বলুন না, একটা খোঁটা চাই।'

'খোঁটা অবশ্য লোকে চায়, কিন্তু কি ধরণের ? জড়বাদীরও খোঁটা আছে আদর্শবাদীদের মতন।'

'জানি, তবু চাই, সেটা ধরুন, প্রগতিতে বিশ্বাস, মানুষকে ভালবাসা।'

'প্রগতি এবং ভালবাসা—একত্রে ? কি বলছ, বিজন ! তোমাদের প্রগতি মানে নিশ্চয় সেই পুরানো উন্নতিবাদ নয়, আর মানব-প্রেম, সে ত' য়ুটোপীয়ান সোশিয়ালিজম !'

'আমি বলছি ইতিহাসের নিয়ম-কানুন।'

'আমি যদি বলি সফীক সেটা বুঝেছে, কেবল মাথা দিয়ে নয়, হৃদয়ঙ্গম করেছে, তবে তোমার আপত্তি টেঁকে না। তোমরা ইতিহাসের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছ, রক্ত বেরুচ্ছে, সকলে আহা করছে, মহিলারা বিশেষতঃ, রমাদিও, আর ভাবছ এক একজন মার্টার !'

বি—'রমাদিকে কেন আবার ! রমাদি একটা মজা দেখেছ, খগেন বাবু তর্কে তোমাকে না নিয়ে এসে থাকতে পারেন না ? তুমি তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছ···আচ্ছা মেয়ে যা হোক···উনি মুখ ফুটে স্বীকার করবেন না, কিন্তু ওঁর সকল চিন্তায়, সকল কর্ম্মে আছ তুমি। ওঁর বুদ্ধির চর্চ্চা একার নয়। সত্যকারের প্রেরণা তুমি দিয়েছ ওঁকে, রমাদি।'

খগেন বাবু হাসলেন না দেখে বিজন রমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'রমাদি, তোমার মত কি ?'

রমলা বল্লে, 'অমন স্নুবিধে ছাড়তে আছে !'

খগেন বাবু কেবল চাইলেন রমলার দিকে—তার মুখ হঠাৎ যেন স্নুন্দর হয়ে উঠল, তারা ছুটো চোখের কোণে গেছে, চক্ চক্ করছে, বাঁ হাত থুৎনীতে, ক'ড়ে আঙ্গুল দাঁতে, হাতের রেশমী রোঁয়ায় চুড়ির সোনালি আভা, গ্রীবা বাঁকা, এলো খোঁপা কাঁধে লুটিয়েছে। খগেন বাবু দেখছেন বুঝতে পেরে রমলার মুখ কঠিন হল। 'বিজন, পেষ্ট্রি কেমন হয়েছে ?'

বি—'চমৎকার। মেয়েদের বুদ্ধিতে যা আসে তা আমাদের মাথায় আসে না।'

র—'সব পুরুষদের অবশ্য নয়। আমরাই ও-সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।'

বিজন জোরে হেসে উঠল। 'কেমন মানতে হল ত !' খগেন বাবু ঘর থেকে উঠে গেলেন।

রমলা বিজনকে বল্লে, 'তোমাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে। আজ তুমি আর ক্লাবে যেও না, মেয়েদের বড়ই ছুরবস্থা হবে—আমারও হিংসে হবে।'

বি—'ছাখ; রমাদি, ঐ ধরণের ঠাট্টা আমাকে কোরো না। কানপুরে এসে আমি পাকিয়ে গেছি জানি, তাই বলে···তা ছাড়া, আমাকে নিয়ে তোমার রসিকতা শোভা পায় না—সে বরং সুজনদার প্রাপ্য।'

র—'আজ আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে? কতদিন তোমার টেনিস খেলা দেখি নি, গলা খোলা শার্ট, দুধের মতন শাদা ফ্লানেলের ট্রাউজার্স, আর এমারেল্ডের মত ঘাস, ঘন নীল পর্দ্দা···বিজন বাবুর ঘন কালো চুল, হাতের পেশীতে ঢেউ খেলছে, ব্যাক্ হ্যাণ্ডের মার, বল তীরের মতন, ফিতের মতন লাল নেটের কালো টেপ ছুঁয়ে গেল; পড়ল গিয়ে ডান দিকের চূণের দাগের··· বাইরে।

বি—'না, রমাদি, বাইরে নয়, লাইনের ওপর। যাক্‌গে ও-সব কথা। তুমি ক্লাবেই ভর্ত্তি হও, মাষ্টারি তোমার ভাল লাগবে না। একলা থাক জানি, মন আমার খারাপ হয়···কি জানি, তোমরা কি করলে! যাই হোক··· সুজনদাও যদি থাকত। মানুষ সামাজিক জীব—কথাটা সোশিয়ালিষ্টদের মানতেই হয়।'

র—'মানো মানো, তুমি? তবু ভাল।' রমলার মুখে সামান্য যেটুকু উত্তেজনার চিহ্ন ফোটে সেটা মুছে যায় ঘন স্থূল অনিশ্চিত কণ্ঠস্বরে। একটু কাসতে গলার ঘড়ঘড়ানি কেটে গেল। বিজন অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্লে, 'তুমি যদি ক্লাবে যেতে না চাও, তবে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও আছে, ঐ সব মজুরদের ছেলে মেয়েদের জামাটামা দেওয়া, লেখাপড়া শেখান, এই সব আর কি! তবে···'

র—'তবে কি? নতুন আপত্তি মনে উঠল বুঝি?'

বি—'ওটা মালিকরা খাড়া করেছে কি না, তাই—'

র—'অর্থাৎ ওস্তাদ পছন্দ করবে না, তাই বিজন বাবুর পছন্দ নয়। বিজন বাবু চান না যে তাঁর কোনো আত্মীয়া ওঁদের কোনো অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকেন, বিজন বাবুর দলের কাছে, তাঁর হীরোর কাছে সম্মান যাবে কেমন?'

বি—'মোটেই না। ওস্তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা হস্তক্ষেপ করি না, কেনই বা সে আমাদের বেলা করবে?'

র—'একটু তফাৎ এই যে তোমার প্রাইভেট কিছু নেই, এবং তাঁর প্রাইভেট অনেক কিছুই আছে।'

বি—'ওয়েলফেয়ার সমিতিতেও যোগদান আমার মনোমত নয়। যত সব বুর্জ্জোয়া মেয়েরা মোটর চড়ে মধ্যে মধ্যে চামানগঞ্জ, জরীব-কি-তলাও-এর ধোঁয়া ও ধুলো খেতে যান, আত্মপ্রসন্ন হয়ে ফিরে আসেন, স্বামীদেরও আত্মগ্লানি কমে, গর্ব্ব বৃদ্ধি হয়, তাঁরাও বলতে পারেন···'

র—'থাক, আর বুদ্ধি দেখাতে হবে না। ও আমি পারব, কি করতে হয় ?'

বি—'আগে ভেবে দেখ। মোটর না হলে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে খাতির নেই।'

র—'টঙ্গাতেই চালাব, তারপর যা হয় হবে। কাল সভ্য হবার ফর্ম্ম আনবে ?'

বি—'অমনি ক্ষেপে উঠলে! আগে জিজ্ঞেস-পত্র করি, তুমিও খগেন বাবুকে একবার বলে কয়ে ঠিক কর···'

র—'তুমি কাল খবর দেবে কি না—সোজা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

বি—'দেবো। কিন্তু পারবে না। তার চেয়ে মিক্‌স্‌ড্ ক্লাব ঢের ভাল। সব চেয়ে ভাল হয় যদি সুজনদা এসে পড়ে। সুজনদা, তাকে কতদিন দেখি নি···যাক্‌গে···আমার আবার কাজ পড়েছে, এখনই যেতে হবে। আরেকদিন তোমাকে ক্লাবে নিয়ে যাব, রমাদি, কেমন ? রাগ করলে না ত ? ভাল কথা, রমাদি, একটা চমৎকার বাড়ি দেখেছি, সামনে ফুলের বাগান, এক্কেবারে নতুন ডিজাইনের···কী বলব! যেন ছবি।'

র—'খুব বেশী ভাড়া ?'

বি—'তা জানি না, তবে আমি বাড়িওয়ালার ছেলেকে জানি, ক্লাবের আলাপী। বোধ হয় লীজ চাইবে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করব খন। তবে কোলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নায়ক

বলদৃপ্ত তুরঙ্গম অবলুপ্ত। প্রস্তর পথের
বক্রদেহে খুরাগ্নির শেষ আভা জ্বলে।
অশ্বারোহী শিরে
উষ্ণীষের প্রান্তে লাগে ম্লান অস্তরাগ,
মুমূর্ষু দিনের শেষ আরক্তিম স্নেহ।
আসন্ন তাণ্ডবে কাঁপে খাণ্ডব নগরী।
মত্ততায় টলমল দীপান্বিতা নিশা।
ক্ষণজীবী হাউইএর উৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস
আকাশের গায়ে আঁকে পতনের রেখা।
দর্শকের করতালি মৃদু হয়ে মেশে কি মর্ম্মরে
জনতার হৃদয়ের। শাল প্রাংশু পেশী যায় ক্ষয়ে।
তরবারি জগদ্দল, দূরে থাকে আত্মঘাতী ভয়ে।
অগত্যা এ রাসভ বাহন।
আর দেখি এই জনপদে
লঘুপদ পিপীলিকা সারি
বৃত্তাকারে মাঝে মাঝে জমে
মধুবিন্দু ঘিরে।
বেগ নাই, স্তব্ধ মনে পাকস্থলী ভরা
কিংবা শুধু ইতস্ততঃ ঘোরা।
বেতার বিলাসে দেহ ভাসে আর ডোবে,
পঙ্কিল পদ্মার স্রোতে পূতিস্ফীত শব।
দিনান্তের স্তব,
খুব ভাল ঠুংরি গায় কুমারী শোভনা
এ পাড়ায় সে-ই কিন্নরী ;
অন্ততঃ গুর্জ্জন বাই আজও হার মানে।

তার মানে, যেথা যাও অঞ্চলের ভৌগলিক সীমা
মনেরে ধরেছে ঘিরে কর্ম্মনাশা পাশে।
অবসর বুঝে সভা সমিতিতে যাওয়া,
ভদ্র ভীড়ে ভণ্ড ভাবে আড় চোখে চাওয়া
শৃঙ্গার সুষমা ঢাকা বালিকার পানে,
ব্রহ্ম ও আত্মার 'পোড়ো ক্ষেতে' হাওয়া খাওয়া
নিষ্প্রদীপ ঘরে মুখে সিগারেট দ্যুতি
জ্বলে আর নেভে। রাজ্য গেল ছারখারে!
এখন পড়িছে ছেদ ভুরি ভোজনের উদ্গারে।
তাই আজ কুমারীর কেশে বেশে ক্লিষ্ট আমন্ত্রণে
পিষ্ট অভিলাষ,
শিবনেত্র স্বপ্নসেবী নায়কের বিরক্ত বিলাস॥

মদমত্ত তুরঙ্গম অধুনা ত রেসমুগ্ধ ছোটে
অর্থকরী বল্‌গায়, জুয়াড়ীর লোলুপ ইঙ্গিতে।
শ্রমলব্ধ উপার্জ্জন ব্যর্থ হয় বালুকা বেলায়।
মোড়ে মোড়ে ঘোরা ছাড়া কাজ নাই তাই।
মারণ ঝঞ্ঝায় দোলো জানালার মুখ,
বিপ্রলব্ধা, বসন্তের রক্তলেশহীন।
মৃত্তিকার স্পর্শহীন অর্কিড্ কুসুম,
ব্যর্থ তার বর্ণ বিহ্বলতা।
অতঃপর,
বন্ধুবর বিষ্ণু দে-র কাছ থেকে শোনা,
মোদের গ্লুকোস সেবী সুরেশের হয়েছে পতন।
হয়েছে অধুনা
অর্ব্বাচীন সুরেশের আত্মদাবদাহ
আত্মার গভীরে।

মনে হয় ফুরায়েছে মৃগয়ার তূণ,
জীবনের বর্ণছত্রে ধরেছেও ঘূণ।
বিবর্ণ আকাশ, মন, নিঃস্বপ্ন প্রান্তর,
ছত্রভঙ্গ মনে নাই, বিজৃম্ভিত নায়িকা বিলাস।
ব্যর্থতার অপরাধে,
জীবিকার স্বর্ণ মৃগ হয়েছে মারীচ।
কামনার তুঙ্গতম শৃঙ্গ পড়ে ঢাকা,
বজ্রগর্ভ মেঘে।
অহিফেনসেবী দিন ছিন্নমূল শিথিল এখন॥

মধ্যরাতে ঝড় আসে।
ম্লায়মান আলোকের স্তম্ভ সারি সারি
পথে উচ্চ গাঢ় ঘন বাড়ী
প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ মিছিল।
আসুরিক মেঘে মেঘে পদধ্বনি বাজে,
নেমে আসে ভয়ঙ্কর। ভয়ে
স্তব্ধ অন্ধকারের কঙ্কাল।
মধ্য রাতে আসে ঝড়।
মল্লারের ক্রুদ্ধ স্বরগ্রাম
নিষ্পেষিত দন্তে দন্তে বাজে
দুরন্ত মেঘের। ছিন্ন পুষ্পসজ্জা উড়ে যায় ভয়ে।
শৃঙ্গারের অট্টরোল কাঁপে
কত না বাহবাবর্ষী বাবুদের মুখে,
স্খলিত আবেগ,
সংপ্লবের গান।
ত্রাসপিষ্ট অন্ধকারে,
বায়ুছিন্ন রাত্রির শিথিল শিখরে বুঝি ওড়ে
নারীকণ্ঠে বোনা পাড় মিনতির রেশ্মী রুমাল্।

তুমি যাবে? এসো না, কত বা দূরে, ওই মোড়ে—
স্থান হবে—রিক্‌শর নাড়ে
পাশাপাশি ঠাসাঠাসি এ বাদ্‌লায় মন্দ নয়।
কাল এসো তুমি—। দোকানের ঝাঁপি নামে।
সিক্ত মার্জ্জারের ক্ষেদ জানালার পাশে এসে থামে।
প্রবল ফুৎকারে নিভে গেল বুঝি আলো,
এ চোখের, ও ঘরের, দোকানের, শুভেনের
শয়নের পাশে আর ও দোতালার ফ্ল্যাটে,
গণ্ডগ্রামে কুটিরের, হরিজন বস্তির
নামহীন কত শত মুমূর্ষুর চোখে॥

রাত্রি কাটে ক্ষুরধার
মিনিটের খড়্গে। জাগে শুক্ল শুকতারা
স্বপ্নক্লান্ত শয়নের পাশে,
শেষ তন্দ্রা প্রহরের স্তিমিত লণ্ঠন্।
দিন আসে আবৃত্তির মত।
অনুষঙ্গে নাচে চারিদিকে
প্রাণবীজ, বায়না দেওয়া বসন্তের বুকে।
সূর্যকর খর করতালি
দিগন্তে উড়ায় শুধু বালি,
গৃহ কপোতের ঝাঁক ডিগ্‌বাজী খায় মত্ত সুখে
নীল চন্দ্রাতপে।
জঠরে দামামা বাজে দশটায় ঠিক্।
আত্মসমর্পণ যোগ কি কঠোর এই দুর্দ্দিনে।
সদাগরী অফিসের জ্বলন্ত কঠাহে
তেল্, নুন্, ঝাল্ মাখা আত্মাদের স্তূপে
প্রতীতিই পক্ক হয় প্রত্যভিজ্ঞা রূপে।

অগ্নিবর্ষী আকাশের নিচে
তৃষাতপ্ত সহরের বিষাক্ত প্রাঙ্গণে
নিঃশেষ শায়ক এই বালক নায়ক।
বুকে তার নামে এই দ্বিপ্রহর দগ্ধ খর দিন
প্রবৃত্তির আবৃত্তির মত।
নাগরিক চাটুবাক্য শুধে গেছে তার শেষ ঋণ।
বন্দরের শুল্ক দেওয়া শেষ।
দগ্ধরথ অশ্বহীন যৌবনের সেনা
চেয়ে দেখে অন্তঃপুর দাবাগ্নি মুখর,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বসে পড়ে পৌরুষ প্রাকার।
বিধ্বস্ত দিনের শেষ ক্লান্ত মুলতানে,
বারবার প্রাণ প্রার্থনায়।
সূর্য ডোবে। নভশ্চক্রনেমি অচঞ্চল।
আরক্ত কুন্তল
পশ্চিম সমুদ্র তীরে
সন্ধ্যা বসে শ্লথনীবি প্রত্যালীঢ় পদে॥

এ গোলকে কতদিন দেহরক্ষী হয়ে
আর কতদিন, কেন্দ্র খসা তারা সম।
বৈরিতার তাপে এই ভূলোক ত গলে যাবে ক্রমে
মধুথের মত, সীমাহীন শূন্যতার
গর্ভে। বাধ্য তবু সাক্ষী থাকিতে ইহার
নিষ্পলক, মূক, জরা প্রকুঞ্চিত দেহে।
প্রাক্তন প্রতীত হয় ভবিষ্যের ভ্রূণে
এ সান্ত্বনা মানি তাই দিন গুনে গুনে
চরম ক্ষয়ের পর্ব্ব নীরবে কাটাই
বর্ব্বরের লীলা ক্ষেত্রে। এখন গোধূলি
নামে ক্ষমাম্লান সবিতার ক্রোড় হতে
আসন্ন তাণ্ডবে ক্ষুণ্ণ খাণ্ডব নগরী॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ক্লান্তি

বাতাসে তোমার শুক্‌নো চুল ওড়ে।
আর ঝড়, ক্ষত, পথের ধারে বসন্তরোগী
শেষ ফাল্গুনে। কোকিল ডেকেছে, শুনি,
আর ভাবি
আর একটি বছর ষ্ট্রেচারে চড়ে চলে গেল।

যে অরণ্যে একদিন অনেক ভ্রমর এসেছিলো
আর প্রজাপতি
কেমন করে তাকে পাবো ? (বল কেমন করে ?)
বাতাসে তোমার চুল ওড়ে
আর ভাবি
কেমন করে বল্‌বো আমার ভাল লাগে ?

মৃতশিশুর ঠোঁটের মত সূর্যোদয় ঃ
আহা, নতুন সূর্য !
জাহাজের মাস্তুলে শাদা পাখীর ডানার বাতাস লাগলো—
এই ডকে কত জাহাজ আর পতাকা।

তবু তো সমস্ত জাহাজ
সমুদ্রের সির্‌সিরে জলে একাকার।
তবু তুমি আর আমি
ক্লান্তির কাঁটায় বিক্ষত।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবর্ত্তী

ফাঁপা, শূন্যগর্ভ মাটি
কথা কাটাকাটি
নিরর্থক ;
ভিড় করে বিবর্ণ রাত্রিরা,—
ব্যস্ত কণ্ঠময়
নিত্য নব সঙ্কটের পথের মদিরা।

আবিল নিদ্রার ঘোরে কখনো বা জেগে
(মনে পড়ে ঠিক !)
পার্ব্বত্য জটিলপথে আমরা সৈনিক—
নগ্নপদে চলেছে মহড়া,
তারি সাথে চলে চারপাশে
রক্তহীন পৃথিবীর শেষহীন যতো ভাঙা-গড়া।

আবর্জ্জনা হাতড়িয়ে ফিরি
এলোমেলো স্রোতে
অশান্ত অন্তরে,
মেলে না আদেশ, তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ
মন-গড়া বিধাতার বজ্র কণ্ঠস্বরে,
হতবুদ্ধি সচকিত
বিপন্ন মুহূর্ত্তে, দীর্ণ ধূসর প্রহরে।

তবু আজ এখানেই
সব শেষ নয় ;
জোয়ার-ভাঁটায় জেনো এক নদীতেই
জন্ম হয়
নিত্য নব স্পন্দনের, নতুন প্রাণের—
পুরানো গানের সুরে
জন্মবীজ ভবিষ্যের নতুন গানের॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

যে কোন ব্যক্তিকে কবি আখ্যা দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জানা প্রয়োজন যে তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রকৃত কবি-প্রতিভার পরিচয় আছে কি না। তিনি যাহা সৃজন করেন নাই তাহা কেন করেন নাই অথবা তাহা তাঁহার করা উচিত ছিল কি না এই সমস্ত প্রশ্ন অবান্তর সন্দেহ নাই, অবাঞ্ছনীয় বইকি। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লিখেন নাই বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন তবে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় নয়, মন্তব্যকারীরই উক্তিতে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিব। তেমনই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-মালঞ্চে গীতিকবিতার নির্বাহুল্য দেখিয়া যদি কেহ অনুরূপ তিক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন তবে তাঁহারও উক্তির যাথার্থ্যে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিব। সত্যেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে খুব উচ্চ কবি-প্রতিভার পরিচয় সব ক্ষেত্রে পাওয়া না গেলেও অন্ততঃ পক্ষে দুইটি জিনিষ আমরা পাই—"vivid expression of his actual subjects and artistic use of such metre as he actually employed."

রবীন্দ্রকাব্যে দেখিতে পাই real ও idealএর সংমিশ্রণ। এই দুইটি ভাবধারা সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত হইয়া এক অপরূপ অতীন্দ্রিয় লোকের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা যেন Browningএর সেই—"Out of the three sounds, he created not a fourth sound, but a star." Idealকে আরও উদ্ভাসিত, আরও অপরূপ করিবার জন্য কবি যেন realএর সাহায্য লইয়াছেন। "এবার ফিরাও মোরে" বলিয়া সংসারের রূঢ় বাস্তবতায় ফিরিবার বাসনা করিয়াও কবি শেষ পর্য্যন্ত এক অতীন্দ্রিয় লোকেই প্রয়াণ করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা যাহা পাই তাহা ইহা নহে, তাহা নিছক প্রত্যয়-উদ্ভূত—তাহাতে অনুভূতির প্রশ্রয় থাকিলেও তাহা অতি তুচ্ছ। চকিত বিদ্যুৎদীপ্তির মত তাহা আমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত করিয়া অতর্কিতে আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি কোথাও realএর সঙ্গে idealএর মিশ্রণ ঘটাইতে পারেন নাই, যেখানেই তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানেই তিনি ব্যর্থ

হইয়াছেন। এই মিশ্রণের অপচেষ্টা যেখানে নাই সেখানে তাঁহায় কাব্য রসপিপাসু মনকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে না পারিলেও বিমুখ করিয়া তোলে না। দু-এক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তৃপ্তিও দিয়া থাকে, যেমন—

"আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বলে আধ ত্রাসে, আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।"

এই ধরণের কবিতা কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে খুবই বিরল। যে সমস্ত কবিতার ভয়াবহ আধিক্য দেখিতে পাই তাহা নিছক বাস্তববাদী কবিতা। কবি তাঁহার চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বিভিন্ন ছন্দে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপমার ন্যূনতা নাই, ছন্দের দ্বারা ভাবকে হিল্লোলিত করিবার প্রচেষ্টাও রহিয়াছে; কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে কবিতা প্রকৃত রসশিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে তাহার অভাবে সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই ছন্দসর্ব্বস্ব সাধারণ পদ্য হইয়া রহিয়াছে। যখন আমরা পড়ি—

"হে পদ্মা, প্রলয়ঙ্করী, হে ভীষণা ভৈরবী সুন্দরী !"

তখন আমরা সাধারণ একটা বর্ণনাই পাই মাত্র। ইহা আমাদের মনকে আলোড়িত করিতে পারে না। কিন্তু যখন আমরা পড়ি রবীন্দ্রনাথের "পদ্মা"— "হে পদ্মা আমার"—তখন এই একটি ছত্রই আমাদের মনকে এত ভীষণভাবে আলোড়িত করে যে আমরা আমাদের পরিবেশকে ভুলিয়া যাই, মুহূর্ত্তেই আবিষ্ট হইয়া পড়ি। ভূগোলের পদ্মাকে পিছনে রাখিয়া আমরা এমন এক কল্লোলময়ী নদীর সাক্ষাৎ লাভ করি যাহা কবির মানস লোকেরই সৃষ্টি, বাস্তবের স্পর্শে যাহা উজ্জীবিত হইয়া উঠে নাই—সূক্ষ্ম অনুভূতির কারুকলায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া যাহা নিত্যকালের জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমরা মুগ্ধ হইয়া আরও পড়িতে থাকি—

"একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান
তোমারে স'পিয়াছিনু আমার পরাণ।"

বাস্তব ঘেঁষা কবিতার অসুবিধা এই যে অনেক সময়ই তাহা ছন্দোবদ্ধ একটা রিপোর্টের মত হইয়া দাঁড়ায়। কি দেখিলাম তাহা সবাই বলিতে পারে, কিন্তু কি অনুভব করিয়াছি তাহা ব্যক্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ফুল দেখিয়া তাহা বর্ণনা করা চলে—ইহাতে কোন কৃতিত্বের পরিচয় রহিয়াছে কি? কিন্তু যথার্থ কৃতিত্বই বলি কিম্বা সূক্ষ্ম অনুভূতিই বলি কিম্বা প্রকৃতিস্থ সহজ কবিমানসের কথাই বলি, সমস্ত কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে—

"I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But in enbalmed darkness guess each sweet
Wherewith each seasonable month endows
The grass, the thicket and the fruit-tree wild."
[Keats]

এই guess করিবার ক্ষমতা সকলের নাই বলিয়াই প্রথম শ্রেণীর কবি হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, তাই যথেষ্ট উপমামণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের "রামধনু" রামধনুই রহিয়া গিয়াছে উহা আমাদিগকে কবির মানসলোকের কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি আসে—

"পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে
রম্য তুমি জলদের নীল শিলাপটে
স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ।"

কিন্তু Wordsworth যখন বলেন—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky"

কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তখন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠি। কোথাও রামধনুর বর্ণনা নাই, উপমার বাহুল্য নাই, অল্প পরিসর কবিতার কুক্ষিপটে দার্শনিকতা করিবার প্রয়াসও নাই, আঙ্গিকের ঋজুকাঠিন্যও নাই, আছে শুধু সহজ ভাষায় আপন মনের আনন্দ ব্যক্ত করিবার চেষ্টা। এই সুস্থ মনোবৃত্তি এই সুন্দর সহজতা তথা sincerity নাই বলিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের "রামধনু"

কবিতা আমাদের অভিভূত করে না, উহার শেষ দুই চরণ পাঠ করিয়া আমাদের মন বিরক্তই হইয়া যায়—

"রামধনু ! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি রম্য স্মৃতি চির-অমলিন।"

দেবেন্দ্রনাথের "অশোক তরু" যখন পড়িতে আরম্ভ করি—

"হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায়, নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ, প্রকৃতি-দুলাল ?"

তখন চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠি—সুন্দর, সুন্দর ! ইহাই তো চাহিয়াছিলাম। কবিচিত্তের এক অবাধ স্ফূর্ত্তি যেন এই প্রশ্নের মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। "অশোক তরুর" অজস্র পুষ্পরাশির "লালে লাল" হাসি দেখিয়া কবির অধরও যেন হাস্য-স্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

Realismএর স্পর্শে তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্রই সাধারণ স্তরে নামিয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে আরম্ভের উদাত্তগম্ভীর সুরের সহিত পরবর্ত্তী ছত্রগুলি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। "গঙ্গার প্রতি" কবিতার প্রথম স্তবকের প্রথম দুই ছত্রের সহিত উক্ত স্তবকেরই পরবর্ত্তী ছত্রদ্বয়ের তুলনা হয় না, হয় প্রতিতুলনা। এ যেন ক্ষণিকের জন্য মোহমুগ্ধ করিয়া অতর্কিতে আবার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা। আরম্ভের উচ্চসুর মনকে সত্যই কিছুটা আবিষ্ট করিয়া তোলে—

"সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি।"

কল্পনার স্পর্শ নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা গ্রাহ্য করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না, যেমন আমাদের দ্বিধা হয় না Byron-এর সমুদ্রের আবাহনকে গ্রাহ্য করিতে—

"Roll on thou dark deep blue ocean roll !"

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন পড়ি—

"অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্ব্বাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল বিষ্ণুর প্রসাদ !"

তখন মনে হয় কেবলমাত্র বাক্যের অর্থ ও ছন্দের ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া ভাব যেন কোনরূপে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে। পূর্ব্ব ছত্রদ্বয়ের সুন্দর বাক্যবিন্যাস আর এখানে নাই, খাঁটি রসপ্রেরণার প্রকাশও নাই। ইহা ছন্দোবদ্ধ গদ্য মাত্র।

কবি তাহার কাব্যে যে মনোভাব ঘনাইয়া তুলিতে পারেন, তাহাতেই বিশ্বের অখণ্ড মনোভাব ব্যক্ত পাইতে বাধ্য। দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের বিভিন্ন থাকিবেই, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকেও কবি তাঁহার অনুভূতির স্পর্শে মানবসত্তার অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারেন। নূতন পৃথিবী, নূতন আলো দেখিয়া Miranda যখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠে—

"Oh wonder !
How many goodly creature are there here !
How beauteous mankind is ! Oh brave new world,
That hath such people in't !"

তখন তাহাও যেমন সত্য, পৃথিবীর মানুষের ক্রূরতা দেখিয়া Lear যখন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—

"Howl, howl, howl : O you are men of stones.
Had I your tongues and eyes, I'ld use them so,
That Heaven's vault should crack."

তাহাও তেমনি সত্য।

নারীকে পাপীয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকেই দ্বিধা করিবেন। কেহ যদি আচম্বিতে বলিয়া উঠে যে নারীজাতির জন্যই পৃথিবীতে এত পাপ, এত স্খলন, তখন তাহার উক্তিকে সত্যকারের স্থির সত্যের অভিব্যক্তি নয় বলিয়াই অগ্রাহ্য করিব, প্রমাণ চাহিব, যুক্তি চাহিব, কিন্তু যখন এক কবির মুখ হইতে শুনি—

"জগতের পাপভার বহিতেছ, হে পিশাচী নারী !
আজ রাতে আসি নাই জিনিবারে তোমার হৃদয়,
কিম্বা মম মর্ম্মান্তের শ্বাসতপ্ত চুম্বন বিথারি
করিবনা আকুঞ্চিত তব ঐ কুন্তল নিচয়।"

[অনুবাদ-কবিতা, মোহিতলাল]

তখন আমরা কবির উক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। প্রতি ছত্রের মধ্য দিয়া কবির বেদনাহত মন যেন আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। তিনি কোন নির্দ্ধারিত সত্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, তাঁহার ব্যথাদীর্ণ মানস প্রস্তরে ধাক্কা খাইয়া একটি আকৃতি যেন আপনা হইতেই উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই অখণ্ড মনোভাব ঘনাইয়া তুলিবার সামর্থ্য সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁহার প্রায় উক্তিই বিচারের অপেক্ষা রাখে, বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। মোট কথা তাঁহার উক্তিগুলি কাব্যপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। যখন তিনি বলিতে থাকেন—

"শূদ্র মহান গুরু গরীয়ান,
　　　　শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার ওগো,
　　　　শূদ্রে দেখোনা বক্র চোখে।"

তখন শূদ্রের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক করুণা থাকিলেও কবি আমাদের প্রভাবান্বিত করিতে পারেন না মোটেই। ভাষা রসাত্মক নহে, একটা স্থূল বক্তব্যকে কবি গদ্যে না প্রকাশ করিয়া পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

এই ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাদের মস্ত বড় একটা বিপদ আছে, অনেক সময়ই তাহা সত্যকে পিছনে রাখিয়া, রুচি ও নীতিনিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া একটা অহেতুক অপ্রাকৃত আবেগ হইয়া দাঁড়ায় মাত্র। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে দোষের বাহুল্য ঘটিয়াছে। সাম্যবাদের আবেগে কবি উল্লাসে অধীর হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—"কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?" এই উক্তিতে মেথরেরও মর্য্যাদা বাড়ে নাই, আমাদের রস-পিপাসাও অতৃপ্তই রহিয়া গিয়াছে। ইহা নজরুলের সেই—"কে বলে তোমারে বারাঙ্গনা মা?" উক্তির সগোত্র, যাহাকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মোহিতলাল বলিয়াছেন, ইহা আলোচনা করিলে "অন্তরাত্মা কলুষিত হয়।" প্রশংসার এই আধিক্যের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের এই সমস্ত কবিতা রসাত্মক তো হয়ই নাই, রসাভিলাষীও হয় নাই। প্রশংসার চরম করিয়া শূদ্রকে তিনি দেবোপম করিয়াছেন, মেথরকে দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং আমাদের রসপিপাসু মনকে পীড়িত করিয়াছেন।

প্রশংসা করিতে গিয়া "এক বিন্দু নয়নের জল, কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল" তাজমহলকে মন্দিরে পরিণত করিয়াছেন—

"কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির!"

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার এই বিশেষ পরিণতি দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হই, কিন্তু অবাঞ্ছনীয় এই পরিণতির কারণ কি? অনুভূতি নাই, অন্তর্দৃষ্টি নাই, রহিয়াছে শুধু নিতান্ত সাধারণ দৃষ্টিতে বিশ্ব অবলোকন করিবার প্রবৃত্তি, তাই এই পরিণতি ঘটিয়াছে। 'শূদ্র' 'মেথর' ইত্যাদি কবিতা নিরাভরণ, কিন্তু সজ্জামুক্ত হইয়াও ইহাদের ভাবরূপ পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। নিরাভরণ কবিতার ক্ষেত্রে কবিপ্রতিভার এই দৈন্য যথার্থই লজ্জার কারণ, কেননা সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে আভরণের অন্তরালে বক্তব্য আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। ভাবের দৈন্যই আভরণের বাহুল্য ঘটাইয়া থাকে। 'ঝর্ণা' কবিতাটি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কবিতায় বলিবার ভঙ্গী বলিবার বিষয়কে অতিক্রম করিয়াছে। কেন ইহা হয়? অজিত চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে, যেখানে রসের অভাব আছে, সেখানে কবিরা রচনার চাতুর্য্যের দ্বারা সেই আন্তরিক শুষ্কতা গোপন করিবার প্রয়াস পান। শ্রোতাদের মুগ্ধ করিবার জন্য তখন তাঁহারা অপূর্ব্ব উপমা এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

"ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা
তরলিত চন্দ্রিকা চম্পক বর্ণা।"—

এখানে অনুপ্রাসের অহেতুক প্রাচুর্য্য দেখি, লীলায়িত ছন্দ-ভঙ্গিমাও এখানে রহিয়াছে, কিন্তু কোন রসার্দ্র ভাবরূপের প্রকাশ নাই। The light that never was on land or sea—সেই আলোকে বিশ্ব দর্শন করিবার শক্তিকেই আমরা কবি-প্রতিভা বলি, কেন না সে-জ্যোতি বাহ্য জগতে নাই, অন্তর্জগতেই তাহা আবির্ভূত হয়। এই শক্তির পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই নাই। "ঝর্ণা" ক্ষুদ্র একটি উপমা মাত্র।

চেষ্টা করিয়া কবিতা লিখিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা কৃত্রিম হইয়া পড়ে, ভাব ভাষার অধীন হইয়া যায়, তাহার রসাস্বাদমাধুর্য্য নিরতিশয়

ন্যূন হইয়া পড়ে। সহজেই যাহা বাক্যগোচর জোর করিয়া ছন্দের সহায়তায় তাহাকে নূতন এক মূর্ত্তি দিতে গেলে কবিতার শুচিতা নষ্ট হয়, তাহার শ্রী আর থাকে না। সত্যেন্দ্রনাথ এই অপচেষ্টা বহুবার করিয়াছেন। "রাত্রি বর্ণনায়" তিনি মিত্র-অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব রহিয়াছে কি ?—

> "ঘড়িতে বারোটা ; পথে 'বরোফ ! বরোফ !'……লোপ !
> উড়ি উড়ি আরস্থলা দেয় তুড়িলাফ……মাফ !
> পাল্‌কি আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে……তুড়ে !
> আঁধারে হাডু-ডু খেলে কান করি উঁচা……ছুঁচা !
> পাহারা'লা ঢুলে আলা দিতে আসে রোঁদ……খোদ !
> বেতালা মাতাল তাই খায় হালফিল……কিল !"

কষ্টকল্পিত অসঙ্গত উপমার প্রাচুর্য্য এই কবিতার ভাবস্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। উপমার উপর জোর জবরদস্তি করিলে তাহা যে কতদূর অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, এই কবিতাটিই তাহার সুন্দর নিদর্শন।

আবার উপমা ভাবানুসারী হইলে কাব্যে তাহা যে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত হিল্লোলিত করিয়া তোলে, তাহার নিদর্শন সত্যেন্দ্রনাথেই অন্যত্র রহিয়াছে—

> "পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল ; কইগো কই মেঘ ? উদয় হও ;
> সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও ;
> সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
> বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চ'লে যাও ; অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম !"

বিশেষ একটা হৃদয়াবেগের প্রকাশের তাড়নায় বিশেষ বিশেষ শব্দ যেন আপনা হইতেই সংবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে অভিহিত হইয়া যেমন কলগান জাগে সেইরূপ এইখানে শব্দের সহিত শব্দ মিলিত হইয়া সঙ্গীতের এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে।

এই কবিতাটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। এই ছন্দে কবিতাটি রচনা করিবার মধ্যে কবির দিক হইতে কোন প্রকারের consciousness ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। অনুভূতির তাড়নায় ভাব যেন আপনা আপনিই আপন গতিপথ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিতা হিসাবে তাহাদের মূল্য খুবই কম, কেন না ছন্দের চাতুর্য্য দেখানই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, যথার্থ কাব্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস তাঁহার ছিল না। এইভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রাণস্পন্দে বেপথুমান হয় নাই।

পাল্‌কি চলার ছন্দে তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা অনেকটা ছেলে ভুলানো ছড়ার মত।.. অল্পকথায় দু-একটি চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা এই কবিতার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও খুব রসঘন হয় নাই। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে তিনি "তান্‌কা-সপ্তক" নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। উহাও এক অভিনব ছন্দে সজ্জিত—

"অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে।
অশ্রু-সায়র-কূলে।"

এই সমস্ত কবিতার মূল্য যে একেবারে নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অকুণ্ঠ স্তুতিবাদ পাইবার যোগ্যও ইহারা নয়, কেন না কবিতায় প্রকৃত রসবস্তুর সন্ধানই আমাদিগকে করিতে হইবে, বহিরঙ্গ লইয়া কোলাহল করিলে চলিবে না। দুই একটি অবশ্য কাব্য হিসাবেও উত্তীর্ণ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে—

"তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম কোরক দুলিছে বাদল বাতাস লেগে।"...

মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, বাতাস বহিতেছে, বেণুশীর্ষ আন্দোলিত হইতেছে, কদম কোরক বাতাসের স্পর্শে চঞ্চল হইয়া প্রস্ফুটিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে উৎসুক আবেগে। সুন্দর একটি চিত্র!

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সকলেই একটি কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন—তিনি বঙ্গভাষার সৌকর্য্যসাধনের জন্য পথে পথে শব্দ সংগ্রহ

করিয়াছেন, কবিতাকে শ্রুতিমধুর করিবার জন্য বৈদেশিক শব্দ আহরণেও কার্পণ্য করেন নাই, অপ্রচলিত অনাদৃত দেশজ শব্দের সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকেও কবিতায় স্থান দিয়াছেন। কিন্তু ইহাই কি তাঁহাকে কবি নামের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে? ইহা দ্বারা ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তিনি প্রশস্তি পাইতে পারেন, কিন্তু কবি হিসাবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইলে এই ভাষাতত্ত্ববিদের উপমাই কি যথেষ্ট? ইংরেজীতে যাহাকে slang বলে, যাহাকে অভিধানকারেরা অপভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে—

> "বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা ঝামট—
> ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি—
> লাগ্‌বে উছট্ ছাটের জলে
> ঝাপ্‌সা হবে দৃষ্টি।"

কিন্তু ইহা কি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে?

যাহাই হোক্, এই সমস্ত কবিতা কাব্যক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের জন্য একটি বিশেষ আসনের দাবীকে সুদৃঢ় করিয়া তোলে না। নিতান্ত অকৃপণ হইলে এই-টুকুই মাত্র বলা চলে যে বাংলাভাষার শব্দসম্ভার তিনি বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইংরাজী কাব্যক্ষেত্রে টেনিসনের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে—"He has brought back to the English language, out of the cemetery of dead words, a great many expressions from Middle English and other obsolete English, and given them new life. [Lafcadio Hearn]—অল্প একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বাংলা কাব্যক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

আরবী পারসী শব্দের শোভন এবং স্বাভাবিক প্রয়োগে কবির কাব্য অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ইহার অপপ্রয়োগে ভাষা সুসজ্জিত হওয়ার পরিবর্ত্তে সং সাজিয়াই বসে, যেমন সং সাজিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি—

> "হাল্‌কা হাসির গুল্‌গুলাবি
> পাপ্‌ড়ি কেবল ছড়িয়ে রে;
> আমেজে মশ্‌গুল ক'রে দেয়
> সকল শিকড় নড়িয়ে রে।"

এই উদ্ধৃতির শেষ ছত্রটি কাব্য হিসাবে যে কত নিকৃষ্ট তাহা এইটুকু বলিলেই যথার্থ পরিস্ফুট হইবে যে পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিবার অক্ষমতাকে স্বীকার করিয়াও এই কবিতার অল্প যাহা কিছু উপভোগ্য বস্তু ছিল তাহাও উক্ত ছত্রের জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দেশমাতৃকার বন্দনা সত্যেন্দ্রনাথ যথেষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু কাব্য হিসাবে এইগুলি মূল্যবান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন, সত্যকারের অনুপ্রেরণা লইয়া লিখেন নাই। জনগণ উদ্দীপনার উদগ্র বাসনার সন্তান এইগুলি, ইহাদের দ্বারা কবি হয়ত দেশভক্তির চূড়ান্ত করিয়াছেন, কিন্তু আনন্দময় শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং প্রমাণ-সম্ভব, অকিঞ্চিৎকর বাণী-বিন্যাসেই তাহা প্রকাশ পাইতে বাধ্য, কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয় লোকের ব্যাপার, যাহার মূলে আছে সৃষ্টির প্রেরণা, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে অনন্য অনুভূতির প্রয়োজন। এই অনুভূতি ছিল না বলিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের দেশ-প্রেমের কবিতাগুলি রসসিঞ্চিত হইতে পারে নাই। "বিদ্যাসাগর" কবিতার এক স্থানে আছে—

"সেই যে চটি—দেশী চটি, বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তা'রে, থাকৃব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।"

ইহাকে কবিতা বলিব না রসিকতা বলিব ভাবিয়া পাইতেছি না। জাগ্রত চৈতন্যে রসিকতা করিবার প্রবৃত্তি লইয়া ইহাকে সৃষ্টি করিলে, সেই ভাবেই ইহাকে আনন্দের সহিত গ্রাহ্য করা যাইত; কিন্তু কবি এইখানে "বীরসিংহের সিংহ শিশু! বিদ্যাসাগর! বীরের" স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন, গাম্ভীর্য্য ও করুণ রসের সমবায়ে যুগপৎ আমাদের অশ্রুধারা ঝরাইতে চাহিয়াছেন ও আমাদের হৃদয় হইতে স্বদেশপ্রেম উৎসারিত করিতে চাহিয়াছেন। প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত মহাপুরুষের "কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি" গড়িতে গিয়া আপন বক্তব্যকে কবি রসঘন করিতে পারেন নাই, কবিতাটি অত্যন্ত খেলো হইয়া পড়িয়াছে।

বাহুল্য উচ্ছ্বাসের কুহেলিকায় কাব্যের সৌন্দর্য্য এখানে অব্যাহত থাকে নাই। তেমনই অসৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে "নফর কুণ্ডু" কবিতায়, যাহার আরম্ভে কবি বলিতেছেন,

"নফর নফর নয়,—একমাত্র সেই তো মনিব
নফরের তুনিয়ায়।"

কবির অজ্ঞাতে এই সমস্ত কবিতা রসিকতার সগোত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু জ্ঞাতসারে তিনি যেখানে রসসৃষ্টি করিবার প্রয়াস করিয়াছেন সেখানে তাহাদের রসাস্বাদ-মাধুর্য্য অব্যাহত রহিয়াছে কি না তাহা আমরা বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

চটুল ব্যঙ্গের কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ খুব কম লিখিয়াছেন, তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা অনেকটা স্যাটায়ার-(satire)-এর পর্য্যায়ভুক্ত। জাতীয় অন্যায় ও অশোভন রীতিনীতি দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং কবিতার মধ্যবর্ত্তিতায় জনগণের মনে এই সমস্ত নীতি নিয়মের বিরুদ্ধে আনাইতে চাহিয়াছেন বিক্ষোভ। পূর্ব্ব হইতেই কোন আদর্শকে অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া, তাহাকেই জাগ্রত চেতনার প্রেরণায় কাব্যক্ষেত্রে ফুটাইয়া তুলিলে তৎসৃষ্ট কাব্য যথার্থ কাব্য হয় না। উহাকে অন্য যে কোন নামে অভিহিত করিলে হয়ত আমরা সমর্থন করিতে পারি, কিন্তু কবিতা আখ্যা দিলে আমরা তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিব। তাই সত্যেন্দ্রনাথের "নির্জ্জলা একাদশী" শ্রেণীর কবিতা পাঠ করিয়া আমরা হিন্দু সমাজের একটি কঠোর অন্যায় নিয়মের কথা ভাবিয়া অবাক হই, কিন্তু কাব্য পাঠে সাধারণতঃ যে সহজ স্বাভাবিক তৃপ্তি আমাদের মন হইতে উৎসারিত হইয়া উঠে, তাহার ক্ষণিক আভাসও আমরা এক্ষেত্রে পাই না। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের হাল্কা হাসির কবিতাগুলি সত্যই উল্লেখযোগ্য। কোন তাত্ত্বিকতার বাহক তাহারা হয় নাই, আনন্দ দিতে আসিয়া আনন্দই তাহারা সরবরাহ করিয়াছে, নেপথ্যে অলক্ষ্যে কোন গভীর ইঙ্গিত রাখিয়া দেয় নাই। "কুহু ও কেকা" গ্রন্থে যে তিনটি হাস্য-রসের কবিতা পাই—'সাড়ে চুয়াত্তর', 'ওগো', 'ফুলসাজি'— তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কবির আনন্দময় প্রাণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। 'ফুল-সাজি' কবিতায়

একটি ফুলকে কবি তাঁহার পরকীয়া নায়িকা নির্ব্বাচিত করিয়া যে রসের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সত্যই উপভোগ্য। 'সাড়ে-চুয়াত্তর' কবিতায় দেখিতে পাই জনৈকা নারী তাহার প্রিয়তমের নিকট পত্র লিখিতেছে। উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে আপাততঃ দূরে রহিয়াছে, কিন্তু প্রেম-পত্র দ্বারা সে সেই ব্যবধানের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করিতে চায়। পত্রকে সে দুই-ভাগে ভাগ করিয়াছে—দিবাভাকে পড়িবার জন্য এক অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া সে দিব্য দিয়াছে যেন অপরাংশ রাত্রিবেলা পাঠ করে। দিনের পাঠে সে জানাইতে চাহিয়াছে কাজের কথা, রাত্রির পাঠে গোপনতার আবরণে সে প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। এই কবিতাটিও উপভোগ্য।

ইহার পর সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতাগুলি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলা প্রয়োজন। অনুবাদক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই অনন্যসুলভ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু কি সেই প্রয়োজন? সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রয়োজন শুধু অনুবাদ-সম্ভব বস্তুর তথ্যের পরিচয় দিবার জন্যই নয়, অনুবাদের আনুকূল্যে মূল বস্তুর ভাষান্তরিত রূপের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিবার জন্যও। নব রূপায়ণে পূর্ব্বতন ভাবরূপটি বজায় রাখিয়া কবিতাকে নব জন্মান্তরে উত্তীর্ণ করাইতে হইবে। মূল কবিতাটি এবং অনূদিত কবিতাটির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু সেই ভ্রাতৃত্ব থাকিবে শুধু তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যেই, আঙ্গিকের ব্যঞ্জনায় প্রাক্তন রূপ ধরা পড়িতেও পারে, না পড়িলেও ক্ষতি নাই। মূল কবিতা পাঠ করিয়া যে আনন্দ আমরা পাইয়া থাকি, অনুবাদের মধ্যেও যদি সেইরূপ একটা আনন্দের সংস্থান পাই, তবেই বলিব যে অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। এই অনুবাদের দ্বারা তিনি আমাদের মাতৃ-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। অগ্রণী হইয়া তিনি আমাদের কাব্য-সাহিত্যে অনুবাদের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমানে অনেকেই অগ্রসর হইতেছেন। কাব্য সাহিত্যের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তাঁহার দানকে যতই তুচ্ছ করি না কেন, অনুবাদক্ষেত্রে তাঁহার দানকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাঁহার অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে সত্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী কবি যে মনোভাব লইয়া প্রথমে কবিতা লিখিয়াছেন,

মর্ম্মে মর্ম্মে সেই মনোবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাই সেই রূপান্তরিত কবিতার মধ্যেও আমরা মূল কবিতার রসাস্বাদ করিতে পারি। গ্রীক কবিতার ইংরেজী অনুবাদে শুনি Prometheus বলিতেছে,

"Alas me! alas me!
Ye offspring of Tethys who bore at her breast,
Many children, and eke of Oceanus,—he,
Coiling still around earth with perpetual unrest!

Behold me and see
How transfixed with the fang
Of a fetter I hang
On the high-jutting rocks of this fissure and keep
An uncoveted watch o'er the world and the deep."

সত্যেন্দ্রনাথ ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়াছেন আশ্চর্য্য সুন্দরভাবে—

"হা ধিক্! হা ধিক্! কি আর বলিব বল্!
চির-যৌবনা! চির-কুমারীর দল!
অথির লহর নিতি যার আসে ধেয়ে,—
তোরা অপ্সরা সেই সাগরের মেয়ে;
এই দিকে আয়,—দেখে যা আমার দশা,
শিকল বেড়ীতে সকল শরীর কশা।
বন্দী হইয়া পাহাড়ে পাহারা আছি—
এ-পদ কখনো লয় নাই কেহ যাচি।"

রূপ ও রীতিতে এই রূপান্তরিত কবিতাটি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। মূল কবিতাটি বাংলা অনুবাদের মধ্যে যেন নবজন্ম লাভ করিয়াছে! সমপর্য্যায়ের আরও নিদর্শন রহিয়াছে—

"মৃত্তিকাতলে মৃত্যুর অধিকারে
ক্রোধে সে বাঁধিয়া রেখেছে শিকল-ভারে;
বেড়ী দেছে পায় রাক্ষসী রোষে রুষি,
শাস্তিতে মোর হয়নি কেহই খুসী।
দেবতা মানব নয়নের জলে ভাসে,
অন্তরীক্ষে শত্রুরা শুধু হাসে।"

ইহাকে অনুবাদ না বলিয়া মৌলিক সৃষ্টি আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর-প্রাপ্তি, আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে; ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি-কার্য্য। বাংলা সাহিত্যে এ অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত সুবিধা পাইয়াছে, ইহাদিগকে পূর্ব্ব নিবাসের পাশ দেখাইয়া চলিতে হইবে না। কবিরের একটি কবিতায় আছে—

"জনম-মরণ-বীচ দেখো অন্তর নহী—
দচ্ছ ঔর বাম যুঁ এক আহী"—ইত্যাদি

সত্যেন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"গগন সেথা মগন সদা নবীন চির আনন্দে—
জন্ম আর মরণ, তাঁর বাজিছে তালি দুই হাতে;
রাগিণী উঠে ঝঙ্কারিয়া কী মূর্চ্ছনা কী ছন্দে!
ত্রিলোক হ'তে রসের ধারা মিলিছে আসি দিন রাতে।
সূর্য্য শশী লক্ষ কোটী প্রদীপ সেথা সমুজ্জ্বল,
বাজিছে তুরী ভুবন ভরি, প্রেমিক দোলে হিন্দোলে;
পিরীতি সেথা মর্ম্মরিছে, ঝরিছে আলো অনর্গল,
আপনা ভুলি ভকত হিয়া অমৃত পিয়ে বিহ্বলে।
জন্ম আর মরণে কোনো তফাৎ নাই—নাই তফাৎ—
নাই তফাৎ যেমনতর দক্ষিণে ও বামে গো;
কবীর কহে সেয়ানা যেবা হয় সে বোবা অকস্মাৎ,
কোরাণ-বেদ-অতীত বাণী—অতল যেথা নামে গো।"

মূলভাবে উভয় কবিতায় সুন্দর একটা ঐক্য রহিয়াছে, কিন্তু উভয়ের বহিরাকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। মূল কবিতার ছন্দ যতির সহিত অনূদিত কবিতার কোনই সাদৃশ্য নাই, সম্পূর্ণ নূতন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য লইয়া ইহা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে।

তাঁহার "রঙ্গমল্লী" পুস্তকে "আয়ুষ্মতী" বলিয়া একটি অনুবাদ-নাটক রহিয়াছে। যেমন আসল নাটকখানি ভাবে রসে কবিত্বে সুন্দর, অনুবাদও

তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। সরল স্বচ্ছ কবিত্বময় ভাষায়, অনাহত গম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে একেবারে দেশী ছাঁদে অনুবাদটি আশ্চর্য্যরকম পরিপাটী হইয়াছে। কোথাও একটু জটিলতা, আড়ষ্ট ভাব, বা বিদেশী গন্ধ নাই। আর্য্যধন ও আয়ুষ্মতীর ভাবী সুখকল্পনা, শাশুড়ী ও বধূর কথা, পিতা-পুত্রীর বাক্য বিচিত্র রসে ও কবিত্বে মন মুগ্ধ করে। এই পুস্তকের মুখবন্ধে— সত্যেন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতে সমস্ত পুস্তকের মূল ভাবটি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—

"বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
　　　　রঙ্গমল্লী বীণা,
তানে স্বরে মুহু পল্লবি উঠে
　　　　রাগিণী বিশ্বলীনা।
জীবন-রঙ্গ ! শত তরঙ্গ
　　　　চির-ভঙ্গিমাময়,
স্ফুরি' নীহারিকা ফুটায় তারকা—
　　　　অপরূপ অভিনয়।"

অন্যান্য কবিতার জন্য অবশ্যই নয়, কিন্তু অনুবাদ-কবিতার জন্য নিশ্চয়ই সত্যেন্দ্রনাথ কাব্য-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

সহমরণ

ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। গ্রামের মেয়েরা সবাই দলে-দলে দেখতে এলো ভবানীকে।

দু'বছর আগেও একবার এসেছিলো, ক্ষিতীশ যেদিন ভবানীকে নিয়ে আসে বিয়ে করে। কিন্তু সেদিন আর আজ—কত তফাৎ!

সেদিন সবাই মুখ বেঁকিয়েছিলো মনে-মনে। এক গা বয়েস, পাশ দিয়েছে নাকি একটা, মাথার কাপড়ে কপাল পর্যন্ত ঢাকা পড়েনি, পায়ে খুর-তোলা জুতো—শব্দে যেন পাথর ভাঙে। এ কেমন ধারা নতুন বৌ গা। কপালে নেই, চুলের রেখায় অতিকষ্টে একটু সিঁদুর আঁকা বাঁকা সিঁথিতে। দু'দিন যেতে না যেতেই বিধবা শাশুড়ির আঁচলের থেকে চাবির রিং নাকি খুলে নিয়েছে। সকাল আটটার আগে নাকি ঘুম ভাঙে না, আর, আঁধার বা জ্যোছনা, রাত একটু ঘনিয়ে এলেই ক্ষিতীশকে নিয়ে নাকি হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে নদীর বাঁধের উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। রাস্তার উপরেই নাকি টর্চের আলোতে আয়নায় মুখ দেখে ঠোঁটে রঙ ঘষে।

বড়ো রোগা ছেলে তাঁর এই ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশের মা তাই বৌয়ের বিরুদ্ধে কোনো নালিশই সহ্য করতে পারেন না। কত পূজো-আচ্চা কত হত্যে-মানত করে ক্ষিতীশকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁর একমাত্র ক্ষিতীশ। হাতে-গলায় তার বায়ান্নটা মাদুলি ছিল, বিধিনিষেধের দড়ি দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। তবেই না এত বড়ো করতে পেরেছেন তিনি ক্ষিতীশকে নইলে কে ভাবতে পেরেছিলো তাঁর সেই ক্ষিতীশ দু' পায়ে দাঁড়াবে, চাকরি করে টাকা ঘরে আনবে, বিয়ে করবে সোমত্থ বয়সের জ্বলজ্যান্ত মেয়ে। সেই ক্ষিতীশের ঘরে নাতি-নাতনি আসবে পালে-পালে—একটা কোলে, একটা কাঁধে,—আর কী-ই বা তাঁর চাইবার আছে সংসারে! সত্যি, কিছু চানও নি তিনি—ঠিকুজি দেখে জ্যোতিষী বলেছিলো রাজযোটক হয়েছে, তাইতেই তিনি খুসি। বৌয়ের বিরুদ্ধে যে যাই বলুক, ক্ষিতীশের মার হাতে আছে রঙের টেক্কা—রাজযোটক।

পাশের বাড়ির বাগচি-গিন্নী মুখ ঘুরিয়ে বলেছিলো ঃ 'রাজ্য-টক না হয়ে গেলে হয়।'

আজ সকালবেলা ক্ষিতীশের মার কণ্ঠে গগনবিদারণ চীৎকার শুনে প্রথমে সেই কথাটাই মনে হয়েছিলো বাগচি-গিন্নীর ঃ 'কই, এ যে শেষ পর্যন্ত রাজ্য-টকই হয়ে গেলু দেখছি।'

কিন্তু, যে যাই বলো, সবারই আগে এই বাগচি-গিন্নীই এলো ভবানীকে বুকে জড়াতে; বলতে, 'তুই সাক্ষাৎ সাবিত্রী মা, আমরা তোকে চিনতে পারিনি কেউ।'

প্রথমটা ভবানী কিছুই বুঝতে পারেনি, যেমন শূন্য চোখে চেয়েছিল তেমনি শূন্য চোখেই চেয়ে রইলো ; কেউ তার কপাল ভরে লেপে দিতে লাগলো সিঁদুর, কেউ পায়ের পাতা ভরে আলতা। আবার তারি অংশ নিতে লাগলো কৌটো করে। যারা কুমারী তারা তাকে প্রণাম করতে লাগলো পা ছুঁয়ে।

আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারেনি ভবানী। দু' বছরের মধ্যেই সে একেবারে শাদা, শূন্য হয়ে যাবে কে ভাবতে পারতো ? এত সেবা এত প্রার্থনা, কেন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে ? কী সে অপরাধ করেছে জিগগেস করি ? শেষ রাতের দিকে ক্ষিতীশ একবার অসহায় চোখে তাকিয়েছিলো ভবানীর দিকে, সে বিস্তীর্ণ শূন্যদৃষ্টির দিকে চেয়ে সবাইকে শুনিয়ে ভবানী কেঁদে উঠেছিলো ঃ 'কী আমি অপরাধ করেছি জিগগেস করি ? কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে ?'

আর সে কাঁদতে পারেনি এতটুকু। পরিচিত রোদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, এ তার কী হলো ? সব ঠিক আছে তো সে বদলে গেল কেন ? এখন সে যাবে কোথায়, করবে কী ? এরি মধ্যে মনে-মনে হিসেব করে রেখেছে ভবানী। পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানি, মোটে দু' হাজার টাকার ইনসিওর করেছে, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে গোড়াতেই সেটা য়্যাসাইন করে রেখেছিলো তার নামে। টাকাটা তুলে নিতে হয়তো বেগ পেতে হবে না। আর কিছু গয়না হিসেব করে দেখলো, খুচরোখাচরা নিয়ে ভরি কুড়ি। আর কাঁচা বত্রিশটা টাকা এ কয়দিনের সংসার খরচ থেকে বাঁচানো। এত দুঃখের মধ্যেও ভবানীর হাসি পেলো। এতে তার কতদিন চলবে—তার বয়েস মোটে তখন বাইশ। যে-পথ দিয়ে শ্মশানযাত্রীরা গেছে ভবানী একবার সে-পথের দিকে চোখ

মেললো। না, কোনো কিছুতেই সে ভয় পাবে না। সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। যে পরকে ভর করে দাঁড়ায় সেই তো অসহায়। এখানেই নিশ্চয় আর ভবানী থাকবে না—এই জঙ্গুলে গ্রামে, শাশুড়ির মড়াকান্নার মধ্যে। গোড়াতে অবিশ্যি তাকে যেতে হবে বগুড়ায় তার বাপের কাছে। সেখান থেকে কালক্রমে কোলকাতায়। হয় কোথাও একটা মাষ্টারি, নয় হাসপাতালের নার্স—নিজেকে সে কখনোই বয়ে যেতে দেবে না। আর, কাকেই বা বলে বয়ে যাওয়া! সুবিধে যদি সে পায় ফিলম্-ষ্টুডিয়োতে ঢুকতেও তার আপত্তি নেই কি, বরং আগ্রহ আছে। একেকজন অভিনেত্রী কেমন মাটকোঠা থেকে চারতলা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। আর এ-সব সুবিধে যদি সে না-ই পায়, সোজা সে চলে যাবে কলেজে, ধাপে-ধাপে যত উঁচুয় খুসি। সে এখন মুক্ত, একেবারে মূলচ্যুত। এত দুঃখের মধ্যে এটাই শুধু ভবানীর আশা—প্রায় একটা মদের স্পৃহার মতো—এই নির্বারিত মুক্তির চেতনা। আর কেউ কিছু তাকে বলতে আসবে না, ধরতে আসবে না, আর কারুর মুখ রাখবার তার কথা নেই। সে এখন যা খুসি করতে পারে, যেখানে খুসি চলে যেতে পারে, না কেঁদে খিলখিল করে হেসে উঠতেও পারে বা। মরতে বসলে কেউ মানা করবে না মরতে। সে এখন এত স্বাধীন।

'কাঁদো, কাঁদো একবার তুমি বৌ। অমন পাথর হয়ে থেকো না। দেখছ না সবাই কেমন কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে নিজেকে হালকা করো। নইলে ফিট হয়ে পড়ে যাবে যে।' প্রতিবেশিনী অনেকে এসে অনুরোধ করেছেলো ভবানীকে। ভবানী তবুও কাঁদতে পারেনি, শূন্য চোখে চেয়ে-চেয়ে ভাবছিলো, কোলকাতায় পিশেমশাইর বাড়িতে যদি তার আশ্রয় না-ই হয় সে মেয়েদের এমনি কোনো হষ্টেলে গিয়েই উঠবে; ভাবছিলো, বিজয় থাকলে আজ আর কোনো কথা ছিল না।

'তখনিই জানি মা আমার কেন কাঁদে নি।' বাগচি-গিন্নী ভবানীকে নিবিড়তরো স্নেহে আকর্ষণ করলেন! 'কেনই বা কাঁদবে বলো? মার আমার কী হয়েছে যে কাঁদবে?'

'মা যে দেবী, জানতো আগে থেকে। তাই তো চোখের জল ফেলে অমঙ্গল ডেকে আনেনি।' কে আরেক জন বললে:

'তোমার মাহাত্ম্য আমরা বুঝতে পারিনি, মা।' গয়লাদের বৌ এসে লুটিয়ে পড়লো পায়ের উপর।

শ্মশান থেকে খাট এলো ফিরে।

উঠোনেই প্রথম নামাতে গিয়েছিলো, কিন্তু ক্ষিতীশ বললে, 'না, ঘরে নিয়ে চলো। আমি এখন অনেক ভাল আছি।'

'আর কাঁদছ কী ক্ষিতুর মা? ক্ষিতু যে তোমার বেঁচে আছে, ভালো আছে। মিথ্যে কথা, ও যে মরেনি একেবারেই। চেয়ে দেখ, সশরীরে ফিরে এসেছে তোমার ক্ষিতু।'

ক্ষিতীশের মা মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। শোকের মধ্যে হঠাৎ ছেদ পড়ে যাওয়াতে টের পেলেন বাড়ির মধ্যে অনেক উৎসুক লোকের ভিড়, অনেক কৌতূহলী কথাবার্তা। তখনকার ভিড় ছিল স্তব্ধ ক্ষিতীশ যখন যায়, এখনকারটা আশ্চর্য্যরকম মুখরিত। ক্ষিতীশ কি সত্যিই ফিরে এলো না কি তবে? এ কখনো সম্ভব হতে পারে? মরা ছেলে কখনো ফিরে আসে তার মার কোলে?

কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবেন কি করে? শুকনো দড়ির খাট থেকে ক্ষিতীশকে তখন তুলে আনা হয়েছে তার বিয়ের খাটে, নতুন বিছানায়। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ক্ষিতীশ, আর, সত্যি, নিশ্বাস পড়ছে তার ঘন-ঘন, বুক ওঠা-নামা করছে তালে-তালে। গা-হাত-পা গরম।

আনন্দে, আনন্দের আঘাতে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন ক্ষিতীশের মা।

রুগীর নাড়ী ধরে স্তব্ধ মুখে বসেছিলেন কবিরাজমশাই, ক্ষিতীশের মা তাঁর প্রতি হঠাৎ মুখিয়ে উঠলেন: 'আপনারা কেমন ধারা লোক জিগগেস করি? প্রাণ আছে, অথচ বলেছিলেন কি না নেই? বাছাকে আমার পাঠিয়ে দিলেন বাড়ির বাইরে? চলে যান চলে যান আপনারা আমার বাড়ি ছেড়ে, আপনাদের কাউকে আর চিকিৎসা করতে হবে না। যত সব ডাকাত আর বাটপাড়। ছোটলোক।'

মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে, বারান্দায়, ভবানী ম্লানমুখে একটু হাসলো। এ কি, ক্ষিতীশ ফিরে এসেছে শুনে মা-ও হতাশ হয়েছেন নাকি?

কবিরাজমশাই একটুও চঞ্চল হলেন না, মৃদু রেখায় হেসে বললেন,

'আমাদের কথা যে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো এটাই তো মঙ্গল। আপনিই বলুন, মঙ্গল নয়? নইলে, আমরা যে বলেছিলুম, ও আর নেই, সেটা সত্য হলেই কি ভালো হতো?' কবিরাজমশাই গভীরতর মনোযোগে নাড়ী দেখতে লাগলেন: 'নাড়ীর অবস্থা তো এখন ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভাবছি, অসাধ্যসাধন হলো কি করে? এত লোকের দেখা, এতক্ষণ ধরে দেখা সব কি করে ভুল হয়ে গেল?'

মেয়ে-পুরুষ সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো: 'এ শুধু স্ত্রীর জোরে, স্ত্রীর সতীত্বের জোরে।'

'তাতে আর সন্দেহ কী।' কবিরাজমশাই গম্ভীরমুখে সায় দিলেন: 'তবু, ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত, অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে।'

হোমিওপ্যাথির বুড়ো ডাক্তার রুগীর বুকে ষ্টেথিস্কোপ লাগিয়ে চুপ করে বসে ছিলো অনেকক্ষণ। সে এতক্ষণে সচেতন হয়ে বললে, 'সত্যি— আশ্চর্য্য।'

'রেখে দিন মশাই।' পরুষ কণ্ঠে কে একজন উঠলো বিদ্রূপ করে: 'যত সব হাতুড়ের সর্দার। চিকিৎসার আপনারা বোঝেন কী? আর যা বোঝেন না, বিদ্যেয় কুলোয় না, বলে বসেন, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। সূর্য যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যে রাত নয় এটার মধ্যে আশ্চর্য্য হবার আছে কী? এটা গ্রহণের অন্ধকার না সত্যিকারের রাত এটুকু যদি বুঝতে না পারেন তবে হাতুড়ি ছেড়ে দিয়ে হাল চালান গিয়ে।'

'কেন, আপনাদের এম-বিও তো দেখেছিলো একে। তার তো খুব দিগগজ বলে নাম—কই, সে ধরতে পারলে না কেন?' বুড়ো ডাক্তার খাপ্পা হয়ে উঠলো।

'সব চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই।'

অনেকেই হেসে উঠলো কথা শুনে, এবং সকলেই লক্ষ্য করলে, ক্ষিতীশও মৃদু-মৃদু হাসছে।

সত্যি, ভাবতে গেলে যেন বিশ্বাস হয় না। কাল সকাল থেকে ক্ষিতীশের নাকের ডগা ছিল বেঁকে, পশু থেকে সে বিছানা আঁচড়াচ্ছিলো। কে না

ভেবেছিলো যে সে আর বেশীক্ষণ নেই। বারো ঘণ্টারো বেশি তার গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, তারো আগে থেকে, থেকে-থেকে হিক্কা। কনুই আর হাঁটু পর্যন্ত হাত-পা ঠাণ্ডা। কে সন্দেহ করতে পেরেছিলো এ সমস্ত লক্ষণকে? তার পর আজ সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই নাড়ী গেল ছেড়ে, চোয়াল পড়লো ভেঙে, সমস্ত গা বরফের মতো হিম হয়ে গেল। ডাক্তার-কবিরাজেরা বোকা মুখে চলে গেল একে-একে। কত কান্নাকাটি, কত হুলুস্থুল, তার শরীরের উপর কত আছাড়ি-পিছাড়ি, তবু ক্ষিতীশ এতটুকু নড়লো না, টুঁ শব্দ করলে না, হাসলোও না একটু মৃদু-মৃদু। যেমনি অনড় তেমনি অনড় হয়েই পড়ে রইলো। মৃত্যুকে কি কখনো কারু ভুল হয়? উঠোনে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো প্রায় ঘণ্টা চারেক। প্রথমতো কাঠ জোগাড় করিতেই খুব দেরি হয়ে গিয়েছিলো। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে দু'দশখানা করে কাট জোগাড় করে কাঠ সংগ্রহ করতে কম ঘোরাঘুরি হয়নি। তার পর ভবানী বলেছিলো, কিছু ফুল। এ জঙ্গলে আবার ফুল কোথায়, কিন্তু বৌটার মুখের দিকে চেয়ে আপত্তি করতেও মায়া করে। শীতকালে এ অঞ্চলে সর্ষেফুলের উপরে ফুল নেই, আর গাঁদাও যা দু'এক বাড়িতে আছে বেড়া ভেঙে চুরি না করলে পাওয়া যায় না। তবু অতি কষ্টে, অনেক দেরি করে কয়েকটা পাতিগাঁদা কে জোগাড় করে এনেছিলো। ক্রমে-ক্রমে ছায়া সরে গিয়ে রোদ এসে পড়লো উঠোনে, মৃত দেহের উপর, দু'একটা মাছিও ঘুরে-ঘুরে বসতে লাগলো মুখে-চোখে। তবুও ক্ষিতীশ নিঃসাড়, এততেও সে হাস্যহীন।

শবযাত্রা সুরু হয় প্রায় এগারোটায়। যাত্রার আগে ক্ষিতীশকে যখন উঠোনের তক্তপোষ থেকে দড়ির খাটে নামানো হয় তখন উৎসাহী কয়েকজন ছোকরা দেহটাকে খাটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলো। আশ্চর্য, তখনো ক্ষিতীশ এতটুকু গাঁইগুই করেনি। কোমরে গামছা বাঁধা গেঞ্জি-গায়ে উৎসাহী ছোকরারা হরিবোল বলতে কম চীৎকার করেনি, কিন্তু ক্ষিতীশের ঘুমে এতটুকু আঁচড় পড়েনি তখনো।

নদীর ঢালের নিচে চড়ার উপরে শ্মশান। শ্মশানের ঘরটির বড়ো ভগ্ন দশা। এ-দল ভার পেলে ইঁট চুরি করবে আর ও-দল ভার পেলে চুন চুরি করবে এই দলাদলিতে ঘরটির সংস্কার হচ্ছে না। তবু যা হোক ইঁটের কঙ্কাল

ক'খানা এখনো কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে বলে জায়গাটাকে লোকে অন্তত শ্মশান বলে চিনতে পারে।

মন্দ দূর নয় শ্মশান। কাঁধ বদলে-বদলে পৌঁছুতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল। খাট নামিয়ে রাখা হলো অশথ গাছের তলে, ঘরের বাইরে। উত্তুরে হাওয়া দিয়েছে কনকনে, খসখসিয়ে দু'একটা করে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। চারদিকে ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, ন্যাকড়ার ফালি। একটা কাক ডাকছে বসে-বসে।

হঠাৎ ক্ষিতীশ যেন একটু নড়ে উঠলো। কাছেই বসে বিড়ি ফুঁকছিলো কয়েকটা ছোকরা, প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। ভেবেছিলো হাওয়া, নিজেদেরই কারু বা শীতের কাঁপুনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ক্ষিতীশের গলার মধ্যে থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুতে লাগলো, যেন অত্যন্ত কোনো কষ্টের আওয়াজ। হাড়ের মজ্জা পর্য্যন্ত শিউরে উঠেছিলো সবাই, কিন্তু, কই, না, তাদের মধ্যে তো কেউ অমন শব্দ করছে না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনলো আবার তারা, প্রত্যেকটি রোমকূপকে চক্ষুষ্মান করে। কে একজন সাহস করে মৃতদেহকে স্পর্শ করলো, মুক্ত শীতের বাতাসেও গা দিব্যি গরম।

'মরেনি, মরেনি এখনো ক্ষিতীশ।' একবাক্যে সবাই উঠলো চেঁচিয়েঃ 'ক্ষিতীশ আবার বেঁচে উঠেছে।' ক্ষিপ্রহাতে কেউ খুলে ফেলতে লাগলো খাটের দড়ি, মুখের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেউ ছুটে গেল অম্বিকা ডাক্তারকে ডেকে আনতে, কারা বা ধরাধরি করে খাটটাকে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

অম্বিকা ডাক্তার আধঘন্টার মধ্যেই এসে গেল সাইকেলে। ডাক্তারের নাম কিন্তু আসলে অম্বিকা নয়, ওটা তার উপাধি। গ্রামে সেই একা এম-বি বলে, এম-বি ও একা, দুয়ে মিলে সন্ধি করে অম্বিকা হয়েছে।

এসেই তো তার চক্ষুস্থির। রাত্রে যাকে সে জবাব দিয়ে এসেছে সেই কিনা এখন পালটে জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত। আশ্চর্য্য, নাড়ী প্রায় তিড়বিড় করছে, প্রায় ধুকধুক করছে বুক। অম্বিকা ডাক্তার তাড়াতাড়ি তার হাফ-প্যান্টের এক পকেট থেকে ওষুধ ও অন্য পকেট থেকে সিরিঞ্জ বের করে ক্ষিতীশের হাতে একটা ইনজেকশন করলে। মিনিট পনেরো সবাই দম

বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আস্তে-আস্তে ক্ষিতীশের কপালের একটা শিরা ফুলে উঠতে লাগলো নীল হয়ে, ঠোঁট দুটো যেন একটু ফাঁক হলো, আর চোখের পালক সরে গিয়ে দেখা দিল ভিতরের সাদার খানিকটা। অম্বিকা ডাক্তার কালবিলম্ব না করে আরেকটা ইনজেকশন করলে।

সবাই ভেবেছিলো দেখতে-দেখতে আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে আসবে যেমন-কে-তেমনি। আগুন নিবে যাবার পর যদিও বা কোথায় একটি স্ফুলিঙ্গের কণা দেখা যায় তার থেকে ফের নতুন অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না, আপনার চেষ্টার মধ্যেই তার ক্ষয় হয়। সন্ধ্যাকালের রংটা রাত্রিকেই সূচনা করে। তেমনি এও হয়তো নেহাৎ একটু আড়মোড়া ভেঙে একাধটা হাই তুলে, একটু বা নাক ডাকিয়ে নিয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি। তারি জন্যে সবাই প্রতীক্ষা করছিলো, একটা আরম্ভের প্রত্যাশিত পরিণতির জন্যে। কিন্তু তৃতীয় ইনজেকশনের পর ক্ষিতীশ স্পষ্ট চোখ চাইলো, আর আটচল্লিশ ঘণ্টারো উপর যে কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল তা দিব্যি পরিষ্কার করে সে বললে, 'এ কী, আমি কোথায় ?'

দলের মধ্যে যারা মাঝে-মাঝে পরকালের কথা ভেবে থাকে তারা নিচু গলায় বলে উঠলো : 'হরি বোল। হরি বোল।'

তবু কেউ যেন তক্ষুনি মনঃস্থির করতে পারলো না। এ ওর দিকে শুধু চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। কাঠ নামানো রয়েছে, বাঁশ আর কলসি, শকুন একটা পাখা ঝাপটাচ্ছে ডালে বসে, এতক্ষণে প্রায় আদ্ধেক পুড়ে যাবার কথা—কিন্তু এ কী রসিকতা! তাই তখনো তারা ভাবছিলো কী করা যায়।

ক্ষিতীশই দ্বিধার নিরসন করলো। বললে, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। ভবানীর কাছে।'

এর উপর আর কথা চলে না। অম্বিকা ডাক্তারও বললে, 'হ্যাঁ, বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে যান। ছোকরার আয়ু আরো আছে কিছু দিন। আপনারা এগোন আমি আসছি একটু ঘুরে। চিকিৎসার এখুনি আরো বেশি দরকার।'

এবার আর কাঁধে করে নয়, খাটের নিচে দিয়ে লম্বা দুটো বাঁশ বেঁধে নিয়ে

হাতে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে চললো ক্ষিতীশকে। যাবার বেলায় যেমন ছিল হৈ-চৈ, ফেরবার বেলায় তেমনি স্তব্ধতা, প্রায় বিষাদের কাছাকাছি। শ্মশানে পুড়িয়ে এলেও যেন এদেরকে এত ম্রিয়মাণ দেখাত না।

উঠোনেই নামাবে না ঘরে তুলবে আবার দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিলো বোধ-হয়, কিন্তু ক্ষিতীশই নির্দেশ দিলেঃ 'না, ঘরে নিয়ে চলো। আমি এখন অনেক ভালো আছি।'

শীতের বেলা তখন পড়ো-পড়ো শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ ফ্যাকাসে হয়ে আছে পূব আকাশে।

ভবানীকে নিয়ে মেয়েদের মাতামাতির শেষ হচ্ছে না। ভবানীর টানেই যে ক্ষিতীশ ফিরে এসেছে এ তো শ্মশানে ক্ষিতীশেরই নিজ মুখের স্বীকার। আর, স্বীকার না করলেও বা বুঝতে কার বাকি আছে? মাসাবধি কাল ক্ষিতীশের অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি হদ্দ হয়ে গেছে, টোটকা-দৈবেও কিছু সুসার হয়নি, পীর আর সত্যনারায়ণ দুইই অগ্রাহ্য করলে। শেষ পর্যন্ত ভবানীই যমের পথ আটকালো এবং তাও কিনা বাড়ির বাইরে এক পা-ও না এগিয়ে। সাবিত্রীকে কাঙালের মতো অনেক দূর যেতে হয়েছিলো যমের সঙ্গে, বেহুলাকে ভেলা ভাসিয়ে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত। আর, এ শুধু বললে কার সাধ্য আমার স্বামীকে নেয়, আর, ভুল করে একবার গিললেও যমকে ফের ভয়ে-ভয়ে ফেলতে হলো উগরে। তাইতেই বৌ-টা কাঁদেনি, খুলে ফেলেনি গায়ের গয়না, কাল থেকে ওর পরণের সাড়িটা তাই অমন চটুকে। হর-ঘরণী সত্যিকারের ভবানী ছাড়া সে কী!

কিন্তু, যে যাই বলুক, খুব বিশ্রী লাগছিলো ভবানীর। অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। যেন ট্রেন ধরতে না পেরে ইষ্টিশান থেকে বিছানা-বাক্স নিয়ে বোকার মতো বাড়ি ফিরে আসা। কী লজ্জা! কী অপৌরুষ! বাজি ধরে টাকা না দেবার মতো। বিতাড়িত হবার পরেও যেন ফিরে এসে ফের পায়ে পড়া। নিজেরই ভবানীর বার-বার মনে হতে লাগলো, এমন কখনো সে চায়নি, এর জন্যে করেনি সে এত সেবা, এত প্রার্থনা। মুহূর্তে সে আবার বন্ধ হয়ে গেল, তার আকাশ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ছাড়া পাখিকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এসে আবার খাঁচায় পুরলো। মনের মধ্যে আবার তার সীমানা পড়লো।

ধারালো সরল রেখাটা বেঁকে দুমড়ে আস্তে-আস্তে দাঁড়ালো নিয়ে আগেকার নিরীহ বৃত্তে।

তবু যেটুকু লাভ। এই জমকালো সতীত্বগৌরব। ইনসিয়োরেন্সের দু'হাজার টাকার চেয়ে কম কি।

অম্বিকা ডাক্তার এমন চোটপাট করে বাড়ি ঢুকলো যেন সে-ই ঠেকিয়ে দিয়েছে এ-যাত্রা। বললে, 'কই, কেমন আছে এখন ক্ষিতীশ ?'

ক্ষিতীশ ঘুমুবার চেষ্টা করেছিলো অনেকক্ষণ থেকে, কিন্তু বারে-বারেই ঢিল পড়ছিলো তার ঘুমের জলে। এখন তাদের বাড়িটা আর রুগীর বাড়ি নয়, যেন তীর্থক্ষেত্র। তবু, আর সব সইলেও মর্চে-পড়া ভোঁতা সূঁচে অম্বিকা ডাক্তারের ইনজেকশান আর সইবে না। তাই বোজা চোখে শ্রান্ত স্বরে ক্ষিতীশ বললে, 'ওঁকে চলে যেতে বলো মা, আমার চিকিৎসার আর দরকার নেই। আমি বেশ ভালো আছি।'

'তা কখনো হয় ?' হাসতে-হাসতে অম্বিকা ডাক্তার খাটের দিকে এগিয়ে এলো : 'চিকিৎসার সুযোগ যখন আরো কিছুকাল পাওয়া গেছে তখন সেটা অবহেলা করাটা ঠিক হবে না।'

'ঢের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো আপনাদেরকে, আর নয়।' ক্ষিতীশের মা ঝাঁজিয়ে উঠলেন : 'কেন, কার তপস্যায় বাছা আমার জীবন ফিরে পেয়েছে তা আমরা জানি। তার জন্যে আপনাদেরকে আর বাহবা নিতে হবে না।'

'বলেন কী ? ঠিক-ঠিক ঐ তিনটে ইনজেকশান পড়েছিলো বলেই ফিরে পেয়েছেন ছেলেকে।'

'আর এই যে তিরিশ দিন তিন থেকে তিরিশটা করে ক্রমাগত ইন-জেকশান দিচ্ছিলেন সেগুলো কি মোটেই ঠিক-ঠিক হয়নি ?' ক্ষিতীশের মা নিষ্ঠুরের মতো বললেন : 'আর দরকার নেই আপনাদের ছেঁড়াফোঁড়ায়। দয়া করে বাছাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন আপনারা।'

অম্বিকা ডাক্তার রাগে গলার রগ ফোলাতে-ফোলাতে চলে গেল।

বেলা তখন পড়ে এসেছে। ফ্যাকাসে চাঁদ তেজালো হয়ে উঠছে আস্তে-আস্তে।

'বাড়ির মধ্যে গোলমাল আর ভালো লাগছে না, মা।' তেমনি দুর্বল

শ্রান্ত গলায় ক্ষিতীশ বললে ভাসা-ভাসা তন্দ্রার মধ্যে: 'আমি এখন একটু ঘুমুব। ভবানী কোথায়? ভবানীকে ওরা এখন ছেড়ে দিক।'

কিন্তু ভবানীকে ওরা না সাজিয়ে কেউ ছাড়বে না। ভবানী মিষ্টিমিষ্টি করে হাসছে। ওর যেন আজ নতুন করে ফুলশয্যা। তা একরকম মিথ্যে নয়। দু' একটা পাতি-গাঁদা ক্ষিতীশের সঙ্গে চলে এসেছে বিছানায়।

মেয়েরা অনেকে তাকে রেঁধে পাঠালে। সমস্তই মাছের। ভবানী হাসে আর গন্ধে তার গা গুলোয়। কত দিন ধরে তার গলা দিয়ে কিছু তলায়নি, আর আজ প্রথমেই কিনা এই কেলেঙ্কারি। একটু রইতে-সইতেও দেবে না? এক রাত্রেই সমস্ত?

ক্ষিতীশের মা ভবানীকে আবার তাড়া দিলেন। পানের বোঁটায় করে চুন নিয়ে জিভের ডগায় ঠেকিয়ে ভবানী বললে, 'যাই, মা।'

এর আগেও দু'একবার ঘরের মধ্য দিয়ে হাঁটাফেরা করেছে ভবানী, দেখে গেছে ক্ষিতীশকে। এই এখন, এতক্ষণে, স্বামীর সঙ্গে তার নিভৃত হবার সময়। অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে স্বামী ফিরে এলে মিলনের পূর্বমুহূর্তে স্ত্রীর যেমন কুণ্ঠা আসে, একটু বা ভয়-ভয় করে, ভবানীরো তেমনি করতে লাগলো এখন। কিন্তু কুণ্ঠার কিছুই নেই। যা ঘটেছে ঘটুক, আর যা ঘটেনি তা না-ই ঘটুক—ভবানী মন ঠিক করে ফেলেছে।

দেখতে রাত মোটে দশটা, কিন্তু শুনতে অত্যন্ত গভীর। এ নিস্তব্ধ গভীরতার সঙ্গে ভবানী কয়েক দিন থেকেই পরিচিত। থেকে-থেকে শুধু একটা ভুতুমের ডাক শোনা যাচ্ছে। কয়েকদিন থেকেই যাচ্ছিলো।

পানের বোঁটাটা আরেকবার লেহন করে স্বামী সঙ্গে আজ কী নিয়ে সংক্ষেপে পরিহাস করা যায় তাই ভাবতে-ভাবতে ভবানী ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে বাইরের দরজায় হুড়কো দিলে। পাশের ঘরে যাবার ভিতরের দরজাতে হুড়কো দিতে গিয়ে দেখলো সেটা আগে থেকেই বন্ধ। অবাক লাগলো একটু। ভাবলো, মা কিম্বা আর কেউ হয়তো ভিতরের দরজাটা আগে বন্ধ করে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। ক্ষিতীশ তো শোয়া, জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

হঠাৎ ঝপ করে বাতিটা নিবে গেল। ঝপ করে, কেননা মনে হলো কে

যেন হাতের থাবড়া দিয়ে নিবিয়ে দিলে। চমকে উঠেছিলো ভবানী, প্রদীপের বুক পুড়ে যাচ্ছিলো হয়তো, তাই অমনি শব্দ করে নিবে গেছে। ইদানি প্রদীপের আলোই বেশি পছন্দ করছিলো ক্ষিতীশ। এখন বাতিটা নিবে যাওয়াতে স্বামীর সঙ্গে ভবানী একটি শান্ত নৈকট্য অনুভব করলো। ঘর এখন জ্যোৎস্নায় ভরে ওঠবার কথা, কিন্তু ঠাণ্ডা বলে বেশির ভাগ জানালাই বন্ধ। ঘরের মধ্যে শুধু একটা ঠাণ্ডা আবছায়া।

তবু, নিজেকে তখন কেমন দেখাচ্ছে দেখবার জন্যে ভবানী একবার আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো, হয়তো বা নিজেরও অলক্ষ্যে। এত রাতে ঠাট করে কখনো সে নিজের মুখ দেখে না, তবু আজ যেন না দেখলেই নয়। আয়নাটা টাঙানো উত্তরের দেয়ালে, সোজাসুজি খাটের ছায়া পড়ে খানিকটা। আয়নার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভবানীর নজরে পড়লো ক্ষিতীশ যেন দুই চক্ষু মেলে তাকে দেখছে, চোখের মধ্যে কালোর চেয়ে সাদার ভাগই বেশী। উনি কি তবে ঘুমোননি? চমকে পিছন ফিরে চাইলো ভবানী। ভাবলো, যেমন ভাবে বিছানা করা, তাতে কি আয়নায় ক্ষিতীশের মুখের ছায়া পড়ার কথা?

আস্তে-আস্তে সে খাটের দিকে এগিয়ে এলো। মশারিটা এখন ফেলে দিতে হয়। কিন্তু খাটের কাছে এসে দাঁড়াতেই ভবানীর সমস্ত শরীর লোহার মত শক্ত হয়ে গেল। এ কী! এ কে? এতক্ষণ এরা সবাই দেখেনি একে? এ যে অন্য লোক। স্পষ্ট অন্য লোক। এ কাকে এরা নিয়ে এসেছে শ্মশান থেকে?

ভবানীর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোবার আগেই ক্ষিতীশ বিছানার উপর উঠে বসলো। এতদিনকার মরন্ত রুগীর এ কী অসম্ভব ব্যবহার। ক্ষিতীশ প্রায় নামতে চেষ্টা করলো খাট থেকে। অভ্যাসবশতই হবে হয়তো, ভবানী তাকে সামান্য বাধা দিতে এলো; বললে, "ও কি, কোথায় যাচ্ছ?'

ক্ষিতীশ বললে, 'আমাকে একটু জল দিতে পারো?'

'জল? খাবে?'

'না, দাড়ি কামাবো।'

'দাড়ি কামাবে?'

'হ্যাঁ। অনেক দিন ধ'রে দাড়ি রেখেছি বসে-বসে। দাড়ি না কামালে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।' বলে ক্ষিতীশ হাসলো।

ভবানীর হাতের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল এক ঝলক। না, দাড়ি না কামালেও চিনতে পেরেছে। এককালে সন্নেসি হবার ওজুহাতে সেও দাড়ি রেখেছিলো। বগুড়ায় একদিন দেখেছিলো তার জানলা থেকে।

'কী, পেরেছ চিনতে? কত দিন ধরে চেষ্টা করছি তোমার কাছে আসবার জন্যে।' স্পষ্ট সতেজ দাঁতে ক্ষিতীশ হাসলো। ভবানীকে ধরবার জন্যে বাড়িয়ে দিল একখানা হাত। আঙ্গুলগুলো শীর্ণ ও দুর্ব্বল নয় মোটেই।

ভয়ে পিছিয়ে গেল ভবানী। তার পান-ঠাসা মুখে কথা এলো জড়িয়ে। বললে, 'এ কি? তুমি—তুমি বিজয়? তুমি তো মরে গেছ।'

'মরে গেছি। কিন্তু বেশি দিন নয়। বছর দুই হবে, না?' বিজয় নেমে দাঁড়ালো খাট থেকে; 'কিন্তু কী ভাবে মরেছি জানো?'

উঃ, তা মনে করাও যায় না। ভবানী চোখ বোজবার চেষ্টা করে চোখ আরও মেলে রইলো। বাইরের জ্যোৎস্না একটু দেখতে পেলেও হয়তো তার এমন করতো না এখন—একটা কোনো গাছ, কোথাও বা একটু আলো। সমস্ত ঘর বন্ধ, অন্ধকার। তার গলা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে শরীরের সমস্ত চলাচল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটো শুধু খোলা।

'গলায় দড়ি দিয়ে।' বিজয়ই ফের বললে, 'কিন্তু, কী ভাবে—'

শুনেছে ভবানী: ঘরের সিলিঙে কড়া ছিলো না ঝোলবার। তাই জল ঢেলে ঘরের মেঝেটা ভীষণ পিছল করে রেখে জানলার শিকের সঙ্গে গলার দড়ি বেঁধে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলো। যদিও পা পৌঁছোচ্ছিল এসে মেঝেয় তবু পিছল বলে আশ্রয় পাচ্ছিলো না। এমনি ভাবে নিষ্ঠুর টানা-হ্যাঁচড়া করে সে নিজের প্রাণটাকে বের করে নিয়েছে।

'সেই থেকে এখানটায় বড়ো যন্ত্রণা।' বিজয় তার গলায় একবার হাত বুলোলো। ভবানীর দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে এসে গাঢ় অন্তরঙ্গতার সুরে বললে, 'আমার বড়ো সাধ ভবানী, তুমি আমার এই যন্ত্রণাটা বোঝ। কেনই বা বুঝবে না? কত দিন কত সুখের ভাগ তুমি নিয়েছ, এই যন্ত্রণার ভাগটাই বা নেবে না কেন?' বলে দুই হাত বাড়িয়ে বিজয় ভবানীর গলা

টিপে ধরলো। অত্যন্ত আস্তে-আস্তে, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে। ভবানীর মুখের পান মুখের মধ্যেই থেকে গেল।

সকালবেলা ঘরের দরজা ভেঙে সবাই দেখলো ক্ষিতীশ মরে আছে তার খাটে আর ভবানী মরে আছে মেঝের উপর। বাগচি-গিন্নি রাজযোটকে আজ আর রাজ্য-টক বলতে পারলেন না।

প্রায় এগারোটার সময়েই শব রওনা করানো হলো। সেই সব শ্মশান-যাত্রীরাই এলো বহন করতে। সমস্তই আগের মতো। তেমনি করেই রাখা হলো খাট অশ্বত্থ গাছের তলে। নির্দিষ্ট সময়েরো বেশি অপেক্ষা করা হলো। কিন্তু কিছুই আজ নড়লো না আপনা থেকে।

'আজ আর কখনো হয়? আজ মা যে সঙ্গে গেছেন।' বলাবলি করতে লাগলো মেয়ের দল: 'বৈধব্যযন্ত্রণা এক মুহূর্তের জন্যেও সইবে না বলেই তো স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আজ একসঙ্গে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে।'

পাশাপাশি চিতায় শোয়ানো হলো। গ্রামের লোক চাঁদা করে কাঠ আর ঘি জোগাড় করলে। কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেল শ্মশানে।

ভবানীর সুনাম বাড়লো বই কমলো না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৪)

আমাদের জানা দরকার যে, পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলরাজ কে, যাহার সময় বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুকালের জন্য মস্তকোত্তলন করে। পল জর (P. al Jor) বলেন, প্রতিত সেনের সময় সগলা রাজা (Caglaraja) নামক জনৈক রাজা খুব ক্ষমতাশালী হন। হিন্দু ও মুসলমানেরা তাহার হুকুম পালন করিত (P. al Jor—P 122)। রাঙ্গলার রাজনীতিক ইতিহাসে এমন কোন শক্তিমাণ রাজার সংবাদ আমরা পাই না। স্পষ্টই দেখা যায়, তারানাথ প্রভৃতি 'উদোর পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন। এডুমিশ্রের কারিকায় বর্ণিত আছে—"দনুজ মাধু যদা রাজা।. কামরূপ আদি কাশী পর্য্যন্ত যে প্রজা (১)। এই কথাও ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন না।

এই উভয় জনশ্রুতির মূলে কি সত্য আছে? রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গলার হিন্দুর ভাগ্যাকাশে কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য যে বিদ্যুৎ চমকাইয়াছিল—এই সকল জনশ্রুতি কি তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে?

নীচ শূদ্রবংশীয় পাল রাজাদের শাসনকাল বাঙ্গলার গৌরবময় যুগ ছিল বলিয়া আজকালকার ঐতিহাসিকগণ বলেন। ইহা সেইকাল যখন, ৺শাস্ত্রীর কথায়, 'বাঙ্গলার সব ছিল। বাঙ্গলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।" তখন ঘনাঘন নামক রণহস্তী বাঙ্গলার ছিল; এবং নৌ-সৈন্যগণ 'হী-হী' রবে যুদ্ধের রণধ্বনী করিত (২)। এই সময় নানা বিষয়েই অনেক মনিষী জন্ম গ্রহণ করেন।

১। লালমোহন বিদ্যানিধি—'সম্বন্ধ নির্ণয়' পুস্তকে উদ্ধৃত পৃঃ ৭১৩।
২। গৌড় লেখমালা দ্রষ্টব্য।

ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীটপাল ভাস্কর্য্যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেয় (৩)। রাজা ধর্ম্মপালের জামাতা মস্তুরক্ষিত যিনি মগধের Regent ছিলেন তিনি, রাজনীতি (Political Economy and Ethics) বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত কিছু লেখা তিব্বতীয় তাংয়ুর সংগ্রহ মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। বরেন্দ্রভূমির চন্দ্র গোমীন বা চন্দ্র গোস্বামী (তাঁহার নামানুসারেই চন্দ্রদ্বীপ হয়; এক সময় তাঁহার বিরচিত ব্যাকরণ বাঙ্গলায় পঠিত হইত) সর্ব্ব বিষয়েই একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। শান্তরক্ষিত (জহোরে জন্ম গ্রহণ করেন), রত্নরক্ষিত যিনি বিক্রমশীলার প্রথম মন্ত্রাধ্যাপক ছিলেন (তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে দুই বৎসর পরে মুসলমান কর্ত্তৃক মগধের দুইটি বিহার বিধ্বংস হইবে; সেইজন্য তিনি তিব্বতে চলিয়া যাইতে চাহেন), মহাসিদ্ধ শবরী ও তাঁহার দুই প্রসিদ্ধ ডাকিনী (সিদ্ধা-যোগিনী) লোগি ও গুণি, ত্রিপুরার জ্ঞানমিত্র, কুকুরী, বিকীর্ত্তিদেব (ইনি অনেক কাশ্মিরী পণ্ডিতদের শিক্ষা প্রদান করেন) ব্যালী, মীননাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। ইহাদের মধ্যে alchemy-র অনুশীলন বিশেষভাবে ছিল। এইজন্যই তাঁহাদের সিদ্ধ বলা হইত। ইহারা alchemy হইতে প্রাপ্ত ঔষধ দ্বারা লোকদের রোগ আরোগ্য করিতেন। ইহাদের অনেকেই শূদ্র ও নীচবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের নাম বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। কেবল তিব্বতীয় পুস্তক সমূহে তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে। বাংলায় বৌদ্ধ সভ্যতার সমস্ত স্মৃতি ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত করিয়াছে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ব্রাহ্মণেরা পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের অনুযায়ী করিয়া লইয়াছে (৪)। বাঙ্গালার শূদ্র ও পতিতদের অভ্যুত্থানের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান সাহিত্য ও ইতিহাস মধ্য হইতে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়

৩। তারানাথের ইতিহাসে ইহাঁদের বরেন্দ্র ভূমির লোক বলা হইয়াছে (পৃঃ ২৭৯-২৮০)। কিন্তু P. al Jarএর পুস্তকে ইহাদের মগধবাসী বলা হইয়াছে। (পৃঃ ১৩৭)

৪। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ; সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩৬ সাল।

এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ও বাঙ্গলার প্রাগৈতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের বিষয়-বস্তু হইয়াছে। শ্রেণীসংগ্রাম বঙ্গে এত ভীষণ ভাবে তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে যে হিন্দু বাঙ্গলার ইতিহাস আমরা কর্ণাটকাগত সেন বংশীয়দের সময় হইতে গণনা করিতাম।

এই শূদ্রপ্রধান যুগের একটা গল্প অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গলাভাষার মহাকাব্য "ধর্ম্মমঙ্গল" (৫) লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই কাব্য "ধর্ম্মঠাকুর" পূজার প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রধান নায়ক লাউ সেনের যুদ্ধ ব্যাপার লইয়া লিখিত হয়। এই কাব্যে লাউ সেনের জাতির কথা উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তাহার সেনাপতি কালুডোম, গৌড়ের মেটে জাতীয় সহর কোটাল, ঢাকুরের ইচ্ছাই ঘোষের চণ্ডাল কোটাল, বাগদি, ডোম প্রভৃতি সৈন্যের কথা আছে, আর আছে বর্ত্তমান কালের এই সব তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীর পূর্ব্ব পুরুষের বীরত্বের কথা।

পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজাকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি ও রূপান্তর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৬)। কিন্তু গাজন বাণফোঁড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান-গুলি দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত আছে। বরং ধর্ম্মপূজা ও বাণফোঁড়া প্রভৃতি ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের কৌমগত ধর্ম্ম (tribal religion) বলিয়াই সন্দেহ হয়, পরে মহাযানী বৌদ্ধগণ ইহাকে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহারা লৌকিক ধর্ম্মকে মানিয়া চলিয়া, তাহাদের দলের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। এইজন্যই ধর্ম্মের পুরোহিতগণ তথাকথিত নিম্নজাতীয় লোক (৭)। এই সময় "নাথ ধর্ম্ম" নামে একটি ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া পতিতদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথ ধীবর জাতীয় ছিলেন (৮)। এই ধর্ম্ম যে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহার

৫। ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।"

৬। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৭।

৭। কোন কোন যায়গায় ব্রাহ্মণেরা, ধর্ম্ম পূজাকে ব্রাহ্মণ্যমতে পূজা করে ও পঁশুবলি প্রদান করে।

৮। লামা তারানাথের "মাণিকের খনিতে" মীননাথকে কামরূপের ধীবর বলা হইয়াছে পৃঃ ১২১

প্রমাণ মীননাথের সিদ্ধ শিষ্যদের পরিচয়ে পাওয়া যায়ঃ—হালী, মালী, তাম্বুলী (৯)। মীননাথের পুত্র মচ্ছেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিল চৌরুঙ্গিনাথ,—তারানাথের মতে গোরক্ষনাথ (১০)। শেষোক্ত ব্যক্তি গোপালক ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা হাড়িপ্পা, কানকা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নজাতীর লোকদের ধর্ম্মগুরুরূপে দেখিতে পাই। এইজন্য আমরা ডোম পণ্ডিতদের ধর্ম্ম ঠাকুরের পুরোহিতরূপে দেখিতে পাই।

এই যুগের নিম্নশ্রেণীয় যে-সব লোক অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শ্রেণীগত কলহ খৃষ্টীয় দশম শতকে ধর্ম্ম-সংগ্রামরূপেই প্রকট হয়। একটা প্রাচীন জনশ্রুতি—

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।

* * *

সাড়া গেল বামন পাড়া॥—

এই শ্রেণী সংগ্রামের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই যুগে নিম্নস্তরের জাতি ও কৌমগুলি যাহাদের অসৎ শূদ্র, ব্রাত্য ও আজকালকার 'পতিত' বলা হয় তাহাদের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের কার্য্যের সকল দিক দিয়াই জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। কিন্তু আজ তাহাদের বংশধরেরা হয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, না হয় হিন্দু-সমাজে পতিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পাল-বংশের তৃতীয় বিগ্রহ পালের জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কৈবর্ত্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হয় এবং স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আজকালকার লেখকদের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে ইহা 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ' নয়, ইহা প্রজা সাধারণেরই (অনন্ত সামন্তচক্র) বিদ্রোহ। বাঙ্গলার পতিত জেলে ও চাষীর দল রাজাকে তাড়াইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গে শাসন করিয়াছিল, শেষে দেশের সমস্ত অভিজাত সামন্ত (১১) (রামপালের সামন্তচক্র) এব

৯। লামা তারানাথ—"মাণিকের খনি";—পৃঃ ১২১-১২৩

১০। নবাবিষ্কৃত 'মীনচেতনে' গোরক্ষনাথকে মীননাথের শিষ্য বলা হইয়াছে।

১১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৩-২৫৫।

রাষ্ট্রকূটদের (১২) সাহায্য নিয়া পতিতদের এই রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া তাহার রাজধানী পর্য্যন্ত ধ্বংস করা ব্যাপার সাধারণ 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ' নয়। ইহার পশ্চাতে ইতিহাসের কি অর্থনীতিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল তাহা আজ জানিবার কোন উপায় নাই (১৩), তবে এইটুকু বোঝা যায় যে এই বিদ্রোহীরা রাজার বিপক্ষে যুদ্ধে অভিজাতদের কোন সাহায্য পায় নাই। অভিজাতশ্রেণী স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া অত্যাচারী রাজারই সাহায্য করিয়াছিল। তথাকথিত এই বিদ্রোহ বাঙ্গলার শ্রেণী-সংগ্রামের একটি প্রকৃষ্ট নজীর!

ইহার পর বাঙ্গলার রাষ্ট্রগগনে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় প্রতিক্রিয়া আসে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পালশাসন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে; পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্ম বংশ ও চন্দ্র বংশে আর দুইটি রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহারা বিদেশাগত এবং মহীপাল-দেবের রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর রাঢ়ে শূরবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গলা আক্রমণের সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বল্লাল সেন এই শূর বংশেরই দৌহিত্র ছিলেন (১৪)। এই শূর বংশের একটি জনশ্রুতির সহিত বাঙ্গলার আধুনিক হিন্দুসমাজের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। বাঙ্গলার অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই শূরবংশীয় রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। এবং তজ্জন্য তাঁহারা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পাইয়া থাকেন। উক্ত দাবীর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সবিশেষ সন্দেহ আছে; কিন্তু ইহা ঠিক যে, কান্যকুব্জাগত ব্যক্তিগণের নাম ও বংশ-তালিকা হালে রচিত হয় নাই আনন্দভট্ট বিরচিত "বল্লাল চরিত" নামক সংস্কৃত পুস্তকে উপরোক্ত দুই জাতির কান্যকুব্জাগত পূর্ব্বপুরুষদের নাম ও বংশ বিবরণ আছে। এই "বল্লাল চরিত" ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত

১২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৩-২৫৫।

১৩। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'—রাজন্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে, এই সময়ে 'আদিকর্ম্ম-বিধি' (ততকর গুপ্ত রচিত) নামে একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণ কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না,—এরূপ ব্যবস্থা হয় (পৃঃ ১৯৩)। এতদ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন অভিজাত বৌদ্ধেরা পতিত গণশ্রেণী সমূহকে স্বীয় সমাজের বাহিরে রাখিতেন। তাহারই ফলেই কি পতিতদের এই বিদ্রোহ?

১৪। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ পৃঃ ১৩৭; "বল্লাল চরিত" দ্রষ্টব্য।

খানের সভায় বিরচিত হয়। অবশ্য এই আগমন বার্ত্তার কোন সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এবং আদিশূর বলিয়া কোন রাজার লিপি এখনও আবিস্কৃত হয় নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন, কান্যকুব্জে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনরূপ জনশ্রুতি ভারতের পাঁচটি প্রদেশে প্রচলিত আছে। লেখক আসাম প্রদেশেও কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমনের জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই—আসল ব্যাপারটি তাহা হইলে কি? এ সম্পর্কে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটি কথা বলিয়াছেন, "মহারাজ যশোবর্ম্মার প্রেরণায় গৌড়মণ্ডলে যে-সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদিকধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, আদিশূরের পিতা মাধবকে আমরা তাহাদের অন্যতম মনে করি" (১৫)। এই উক্তির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে বসু মহাশয় দায়ী। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, আদিশূর ৭৩২ খৃঃ কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান (১৬)। এই তথ্য ঐতিহাসিক না হইতে পারে, কিন্তু আসলে এই সকল জনশ্রুতির মূলে কি এই সত্যই নিহিত আছে যে, ব্রাহ্মণ্যবাদীয় কান্যকুব্জরাজ বৌদ্ধদের বিপক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচারার্থ চারিদিকে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, এবং পরে সমগ্র দেশ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হইয়া গেলে ইহারা কান্যকুব্জের নামের বড়াই করিয়া নিজেদের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের অভিজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতে লাগিলেন? এই প্রকারের অনুষ্ঠান পৃথিবীর সকল দেশের সমাজে সংঘটিত হইয়াছে, প্রথম ঔপনিবেশিকের দলই আভিজাত্য পায় (১৭)।

কান্যকুব্জাগত ঔপনিবেশিকেরা যদি বাহির হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছেন, শূরেরা আরও অধিক দূর হইতে আসিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

১৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

১৬। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী—'বনের মেয়ে,' পৃঃ ১৬৯

১৭। আমেরিকায় May Flower জাহাজে আনীত Puritan ঔপনিবেশিকদের বংশধরগণ যুক্তরাষ্ট্রে কুলীন, অর্থাৎ তাঁহাদের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করেন এবং কৌলীন্যের দাবী করেন।

"আগমাৎ ভারতবর্ষং দারদাৎ সরবিপ্রভঃ।
জিত্বাচ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান" (১৮) ॥

এইস্থলে আমরা এই তথ্য পাইলাম যে শূরেরা সুদূর "দরদিস্থান" হইতে আসিয়াছিলেন। যে দরদদের মনু "ব্রাত্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন, বৈয়াকরণিকেরা 'পৈশাচী প্রাকৃত' ভাষী বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুরা সাধারণতঃ "ম্লেচ্ছ" বলিয়াছেন, সেই জাতীয় লোকেরা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় উচ্চজাতীয় লোক হন, এবং ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া বাংলায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। এই প্রকারে নানাদিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলায় সংগঠিত হইতে লাগিল, এবং এই সকল রাষ্ট্রের তাঁবেদার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা জমি পাইয়া এই সমাজের অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক দেশ হইতে সেন বংশীয়েরা আগমন করিয়া বাঙ্গালী পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া বাঙ্গলার একচ্ছত্র রাজা হন। সেন বংশীয়েরা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ছিলেন। নবাবিষ্কৃত খোদিত লিপিগুলিতে তাহাদিগকে "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১৯)। পুনঃ লক্ষণ সেনের মাতা রামাদেবী চালুক্য রাজকুমারী ছিলেন (২০)।

অনেকে 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' অর্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ-সঙ্কর জাতীয় লোক বলিয়া মনে করেন। বল্লালচরিত গ্রন্থে এক যায়গায় সেনদের এই প্রকারের মিশ্রজাতীয় লোক বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং অন্যত্র তাহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় এবং মহাভারতের কর্ণের পুত্র বৃষসেনের বংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (২১)। কিন্তু আসলে ক্ষত্রোপেতা ব্রাহ্মণদের "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" বলা

১৮। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

১৯—২০। N. G. Mazumder—The Inscriptions of Bengal, Vol. III, P 114. সেনদের জাতি সম্বন্ধে R. L. Mitra—"The Indo-Aryans; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' এবং আনন্দভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত" দ্রষ্টব্য।

২১। এই অদ্ভুত কাহিনী বল্লালসেনকে মোসাহেবী দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার একটা প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় 'সেনে' 'সেনে' মিলাইবার জন্য বৃষসেনের বংশে বিজয় সেন এবং তৎপুত্র বল্লাল সেন বলা হইয়াছে ('বল্লাল চরিত' দ্রষ্টব্য)।

হয়; মৎস্য পুরাণে অনেক ক্ষত্রোপেত দ্বি-জাতির নামোল্লেখ আছে (৫, ১৪, ৩৮)। যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করে তাহারা "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আবার ভূবভূতির "মহাবীর চরিত" গ্রন্থে বিশ্বামিত্র নিজেকে "ব্রহ্মক্ষত্র" বলিতেছেন (২২)। এই প্রকারের ব্রহ্মক্ষত্রিয় রাজবংশ ভারতের অন্যত্রও ছিল। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে বল্লাল স্ব-কৃত দান সাগরে আপনাকে "ক্ষাত্র চারিত্রচর্য্যা মর্য্যাদা রক্ষণ" বলিয়াছেন (সম্বন্ধ নির্ণয়, পৃঃ ৭৩৯—৭৪১)। 'চর্য্যা' শব্দের অর্থ 'আচরণ'; সুতরাং "ক্ষাত্র চারিত্র-চর্য্যা" দ্বারা "ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুযায়ী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী" (পৃঃ ৭৩৯)। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের ইতিহাসের গতি বুঝিতে এই তথ্য বুঝা আমাদের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সেন রাজবংশ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিল বলিয়াই বাঙ্গলায় তাহারা ব্রাহ্মণদের এতটা প্রাধান্য দিয়াছিলেন—এই ব্যাখ্যা উপরোক্ত সংবাদ হইতে গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু তাহারা ক্ষত্রিয়দের সহিত বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড করিত বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে। হিন্দুর ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বলে যে রাজার কোন জাতি নাই। প্রাচীন রাজারা জাতি খুঁজিয়া বিবাহ করিত না; ভারতের ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে পাল রাজাদের উদ্দেশ্য করিয়া নুলো পঞ্চানন যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই ভারতীয় রাজাদের সামাজিকতত্ত্বের চাবিকাঠি ঃ—

"রাজায় রাজায় বিবাহ, সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃ-মাতৃ একপক্ষ রাজন্য গোত্রীয়"॥

'গোষ্ঠীকথা', সম্বন্ধ নির্ণয়ে উদ্ধৃত পৃঃ ৭৩৮—৭৩৯

বল্লাল সেনের সম্বন্ধে একটি বদনাম আছে যে তিনি জারজ ছিলেন। বল্লালচরিত গ্রন্থে এই বদনামের প্রতিধ্বনি ইঙ্গিত হইয়াছে (বল্লালচরিত—পরিশিষ্ট, ৪।৫।৬)। তাঁহার নামের সহিত আরও একটি দুর্নামের কাহিনী জড়িত আছে। তিনি নাকি যজ্ঞসূত্রধারী সুবর্ণ বণিকদের পৈতা ছিনাইয়া লইয়া পতিত করেন (বল্লালচরিত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই গল্পের মূলে কতটা

২২। কবি কথা—নিখিলনাথ রায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২

সত্য আছে আজ তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। শ্রেণীগত ও বংশগত মর্য্যাদা রাজশক্তি দ্বারাই প্রদত্ত হয়। একখানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক অথবা জনকতক ধর্ম্ম যাজকের ফতোয়া দ্বারা একটা লোকসমাজ পতিত হয় না অথবা শ্রেণীচ্যুত হয় না। সুবর্ণবণিকদের তথাকথিত পতনই তাহার একটি প্রকৃষ্ট নজীর। হিন্দুসমাজের জাতি সমূহের পদ বুঝিতে হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সে সম্বন্ধে কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পাঞ্জাবের পাহাড়ের হিন্দু জাতিগুলির পদমর্য্যাদা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Ibbetson (২৩) বলিয়াছেন যে, জাতি (Caste) হইতেছে একটি Status group। এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও সমিচীন বলিয়া মনে হয়।

বল্লালচরিতে উল্লিখিত আছে, বল্লাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বংশতালিকা দেখিয়া তাহাদের যজ্ঞদ্বারা শুচি (purifying ceremonies) করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করেন (২৪)। এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ অবগত হই যে সেন রাজবংশের সময় হইতে বাঙ্গলায় সমাজ একটা নূতন সামাজিক সমীকরণের মধ্য হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। ইহার অর্থ, খৃষ্টীয় ১১শ—১২শ শতাব্দী হইতে যে সকল লোক বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গলায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মণ্য আদর্শে বাঙ্গলার সমাজ নূতনভাবে সংগঠন করা হইতে থাকে। বোধ হয়, চৈতন্যদেব ও রঘুনন্দনের পর এই সমীকরণের অভিব্যক্তির শেষ হয়। লেখক অন্যত্র ইহাকে বাঙ্গলার দ্বিতীয় সামাজিক সমীকরণ (Second Social Integration) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পর যেসব হিন্দু বাহির হইভে বাঙ্গলায় আগমন করিয়া বসবাস করিয়াছেন তাহাদের বংশধরগণ আজও বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের বাহিরে আছেন।

পুনঃ বল্লাল সেনের নামের সহিত কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্ত্তনের নাম বিজড়িত আছে। আজকাল এই বিষয়ে কেহ কেহ সন্দিহান হইতেছেন। কথিত আছে যে লক্ষ্মণ সেন কৌলিন্য পরিচায়ক উপাধিটি বংশগত করেন। এতদ্বারা

২৩। Ibbetson—Ethnological Glossary of the Punjab Castes.

২৪। বল্লাল চরিত এবং Ballala Charita-translated by H. P. Sastri in Proceedings of the A. S. B. No. X., 1901-1902 দ্রষ্টব্য।

ইহাই অনুমিত হয় যে, সেন রাজগণ নিজেদের তরফদার একটি অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করেন। দক্ষিণী সেনবংশের অভ্যুদয় হইতে বাঙ্গলার সামাজিক পট পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা এই সময় হইতে একটা নূতন অভিজাত শ্রেণী ও জাতি সমূহের নূতন পদ মর্য্যাদা নিরীক্ষণ করি। বল্লালচরিতে (২৫) উল্লিখিত হইয়াছে যে বল্লাল স্নুবর্ণ বণিকদের পতিত করেন; কৈবর্ত্ত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকারদের জলাচরণীয় করেন। আনন্দভট্ট উপরোক্ত পুস্তকের শেষে জাতি সমূহের পদের যে hierarchy প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রায়ই আজ পর্য্যন্ত অটুট আছে। অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে, সেই সময় হইতেই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গোড়াপত্তন হয়। এই সমাজ বৌদ্ধযুগের গৌরব ও কীর্ত্তি-কাহিনীর বিষয় অবগত নহে, ইহা বাঙ্গলার সার্ব্বভৌমিকত্বের কথাও জানে না। ইহা জানে যে কনৌজ তাহার সভ্যতা ও বারাণসী তাহার ধর্ম্মের পীঠস্থান!! ইহা জানে শুধু বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা ও জাত মারামারির কথা, ইহা জানে শেষ সেন রাজার খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়নের কথা এবং সাতশত বৎসরের ছুঁৎমার্গের দলাদলি এবং গোলামীর কথা!

সেনবংশের শেষ রাজার নাম লইয়া একটু গোলমাল আছে। Stewart-কে অনুসরণ করিয়া সকলে লিখিয়াছিলেন যে বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণই এই বংশের শেষ রাজা। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়া গিয়াছেন যে মিনহাজ তাহাকে 'লখমনিয়া' বলিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র লখমনিয়াকে শেষ হিন্দু নরপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখনকার ভারতীয় ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণের বহু পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হয় (২৬)।

মুসলমান-তুরস্ক দ্বারা বাঙ্গলা বিজয় ঘটনাটি এখন কুহেলিকাচ্ছন্ন আছে। মুসলমান লিখিত ফার্সী ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া রাজাকে বলে, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে শ্বেতকায় আজানুলম্বিত বাহু একজন

২৫। শোনা যাইতেছে যে বল্লাল চরিতের পাঠান্তর সম্বলিত পুঁথিও বাহির হইয়াছে! তজ্জন্য কেহ কেহ এই পুস্তকের সত্যতা সম্বন্ধে হালে সন্দিহান হইয়াছেন।

২৬। R. L. Mitra—The Indo-Aryans; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলার ইতিহাস; জয়চন্দ্র নারং—'ইতিহাস প্রবেশ' (হিন্দী) দ্রষ্টব্য।

তুর্কী এই দেশ জয় করিবে। তৎপর মিনহাজের 'নোদিয়া' বিজয়ের অদ্ভুত কাহিনী একমাত্র সত্য নয়। অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে মুসলমান তুর্কী কর্ত্তৃক ভারত বিজয়, বিশেষতঃ মগধ ও বঙ্গ বিজয়ের পশ্চাতে কি কি বড় Factor ছিল সে বিষয়ের অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (২৭) স্পষ্টই বলিয়াছেন, কর্ণাটকাগত সেনদের বাঙ্গালী সাধারণ পছন্দ করিত না। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে সেনদের নামে একটিও গাথা রচিত হয় নাই। আবার শূন্য পুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" পাঠ করিলে মনে হয় যে সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধ) মনে করিতেন যে তাহাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দেবতারা মুসলমানের বেশে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন ঃ—

"ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপী মাথাএত কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিরূচ কামান।"

এতদ্দারা ইহাই বোধগম্য হয় যে গরীব সাধারণ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাসন পদ্ধতি পছন্দ করিত না। কারণ ব্রাহ্মণেরা—

"বলিষ্ঠ হইল বড় দশ বিশ হইয়া জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাশ।
* * *
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ইবড় হোইল অবিচার॥" (শূন্যপুরাণ)

তুর্কী আক্রমণের পূর্ব্বে মগধে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র ও গৌড়ের লক্ষণ সেনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল (২৮)। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে লামা তারানাথর মতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মগধে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, এমন কি, মুসলমান ধর্ম্মও তথায় প্রবেশ করিয়াছিল। বাঙ্গলায় তখন ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ও প্রতিপত্তি বিশেষ প্রবল ছিল। কাজেই দেশের একদল লোক যে অসন্তুষ্ট থাকিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের অপেক্ষায় থাকিবে

২৭। "গৌড়ের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।
২৮। "ইতিহাস প্রবেশ" দ্রষ্টব্য।

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এই সময়েই তুর্ক আক্রমণ হয়। তারানাথের সংবাদ এই অবস্থায় একটা নূতন আলোক সম্পাত করে। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন যে মগধের অনেক বৌদ্ধভিক্ষু তুরস্কের রাজার দৌত্য কার্য্য করিয়া চারিদিকের সর্দ্দারদের সহিত উক্ত রাজার যোগাযোগ স্থাপন করে। এই সংবাদটি অনায়াসে মগধ ও বাঙ্গলা বিজয় বিষয়ে নূতন তথ্য প্রদান করে। চারনামাতে উল্লেখ আছে যে সিন্ধুর রাজা দাহিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ব্রাহ্মণেরা, ঠাকুরেরা (ক্ষত্রিয়) জাঠ ও মেড়েরা, বৌদ্ধ মোহান্তেরা আরবদের সহিত মিলে। বৌদ্ধ প্রজারা বলে, তাহাদের সহিত দক্ষিণ ইরাণের আরব শাসনকর্ত্তা আল-হেজাজের সহিত সন্ধি আছে যে তাহারা কেল্লা সমর্পণ করিবে ও যুদ্ধ করিবে না (২৯)। এইজন্যই গিডুমল (৩০) বলিয়াছেন—Sind was conquered by treachery !

মুসলমান কর্তৃক ভারত বিজয়ের যে-সব সংবাদ আবিষ্কৃত হইতেছে তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে মিশর প্যালেষ্টাইন, ইরাণ, বিজয়ের ন্যায় (৩১) ভারতবর্ষেও মুসলমান আক্রমণকারীরা একদল দেশীয় লোক পাইয়াছিলেন, যাঁহারা তাহাদের ভিতর হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন ! আরবদের সিন্ধু-বিজয়ের বহুপরে যখন সাহাবুদ্দীন ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাহার প্রথম দুই প্রচেষ্টায় পরাজিত হইলেও অবশেষে ভারতীয় একদলের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার কৃতকার্য্যতার সোপান স্বরূপ হয়। 'উচ' অথবা 'ওচ' নামক উত্তরপশ্চিম পাঞ্জাবের ভট্টি রাজপুত রাষ্ট্রের রাণীর, ঘোরীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া স্বামীকে হত্যা করিয়া কেল্লার ফটক খুলিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া (৩২) কনৌজের জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও শেষে মগধ এবং গৌড়ের

২৯। Dr. R. C. Mazumder—The Arab invasion of India, Dacca University Bulletin, No. XV দ্রষ্টব্য।

৩০। Gidumal—translation of "Chah Nama," Introduction.

৩১। Arnold—"Preaching of Islam."

৩২। নারং—"ইতিহাস প্রবেশ" ; Dr. Ishwari Prosad—History of Mahammedan Rule in India.

একদল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের বিশ্বাসঘাতকতা (৩৩) দ্বারাই দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান তুর্কীরা জয়যুক্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আরব আক্রমণের সময়ে একদল ব্রাহ্মণ যেমনি বলিতে লাগিল যে তাহাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে মুসল-বিজয়ের কথা ভবিষ্যৎ বাণীস্বরূপ লিখিত আছে, বাঙ্গলায়ও তদ্রূপ একদল ব্রাহ্মণ শেষ সেনরাজাকে সেই প্রকার কথা বলিয়া ভয় দেখায় (৩৪)। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক লিখিত এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা এবং তারানাথের সংবাদ একত্র করিলে ইহাই কি অর্থ দাঁড়ায় না, যে, দেশের অভ্যন্তরে একদল লোক ষড়যন্ত্র করিয়া মুসলনান আক্রমণ সফল করিয়া তোলে? তৎপর মুসলমান লিখিত ইতিহাসে এই কথাও আমরা পাই যে বক্তিয়ার খিলিজি যখন কামরূপ উত্তরবঙ্গে অভিযান করেন তখন অনেক হিন্দু রাজা সেনাপতিরূপে তাহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল (৩৫) ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে বাঙ্গলার একদল লোক মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়াছিল! মিনহাজ তাঁহার পুস্তকে সব কথা লেখেন নাই, কেবল তাঁহার সহধর্ম্মীদের বড়াইয়ের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন!

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩৩। নারং বলেন, জয়চন্দ্র ও পৃথ্বিরাজের কলহের কথা মিথ্যা; সংযুক্তা বা সংযোজিতা বলিয়া কোন রমণী ছিল না। আজকালকার সমালোচকদের মতে পৃথ্বিরাজের রাসো প্রামাণিক গ্রন্থ নয়। ইহা ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত হয় এইজন্যই বহু আরবী ও ফারসী শব্দ ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে।

৩৪। Talboy Wheeler's 'History of India', Vol. IV, Part 1, P 45.

আশ্চর্য্যের কথা এই যে মুসলমান ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক লিখিত এই কথাটি আজকালকার হিন্দু লেখকেরা চাপিয়া যাইতেছেন! কিন্তু এই বিষয়টি বঙ্কিমবাবুর নভেল, নগেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মণকাণ্ড, কালীপ্রসন্নবাবুর 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' ৪৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৫। Asiatic Society of Bengal কর্ত্তৃক ফার্সীতে লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসগুলির ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

পুস্তক-পরিচয়

এপারে-ওপারে—শশিভূষণ দাসগুপ্ত

ব্ল্যাকবোর্ড—কলেজ বয়

সমাজচৈতন্যহীন বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টি হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু সনাতন রণাঙ্গনে প্রবেশ না ক'রেও বলা যায় যে পৃথিবীর বর্তমান অধিবাসীমাত্রই যুগসন্ধির বিপুল বিক্ষোভে আন্দোলিত। এবং কবি যে-হেতু সামাজিক জীব-বিশেষ আর কাব্য যে-হেতু সমগ্র কবি-জীবনের প্রতিচ্ছায়া বহন করে, সেজন্য কাব্যে সমসাময়িক সমাজের অল্পবিস্তর সমালোচনা স্বভাবতই অবশ্যম্ভাবী। তারপর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য নিয়েও বিবাদ ঘটে। কিন্তু আপাততঃ সে প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ না ক'রে এই মাত্র বলা দরকার, যে শত্রুর প্রহার নিয়ত স্মরণ রেখে যে-সৈনিক প্রাক্-সামরিক শান্তির স্বপ্ন দেখে সে বরং প্রশংসনীয় ; কিন্তু বিপক্ষের সৈন্য-সমাবেশের সংবাদ পেয়েই যে ভীরু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, সমাজের কল্যাণের জন্যই সে বর্জনীয়। 'রোম্যান্টিসিজ্‌ম্' এবং 'রিয়্যালিজ্‌ম্'—কাব্য-বিচারের পরিভাষায় এই শব্দ দু'টির অতি-প্রয়োগ এবং এই কেন্দ্র অবলম্বন করে বাদানুবাদের যে প্রশস্ত বৃত্ত রচিত হ'য়েছে—সে কথা স্মরণ ক'রলে নির্বাণাতুরেরও বিচলিত হবার সম্ভাবনা আছে। সাহিত্যে 'রিয়্যালিজ্‌ম্' একমাত্র কর্ণধার হোক—এ ঘোষণা প্রচার করা একদেশদর্শী অসাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব। পক্ষান্তরে বাস্তব-পরিচয়হীন রমণীয় রচনা হঠযোগীর যাদু-ক্রিয়ার সঙ্গেই তুলনীয়। কলাবিদ্যার তরণীতে কর্ণধারের সম্মান লাভের যোগ্যতা আছে একমাত্র রোম্যান্টিক দৃষ্টির। শব্দার্থ সম্বন্ধে সচেতন থেকেই 'রোম্যান্টিক' শব্দটি ব্যবহার করছি। 'রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ অর্থাৎ সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে অপরিচিতের রহস্যময়তার সমাবেশ। এ পর্যন্ত এই অপরিচিতের অনুসন্ধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীতের অথবা সুদূরত্বের ধূসরতায় নিবদ্ধ ছিল। নবযুগের কবি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রবেন। সে ভবিষ্যৎ নিশ্চয় অতীতের অবলেপহীন নয়—কিন্তু সে অতীতও নয় এবং পলায়নের দ্বারা

তাকে লাভ করা যায় না। সে বর্তমানের উত্তরাধিকারী এবং শক্তিমানের সম্ভোগ্য।

ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্তের 'এপারে-ওপারে' একখানি কবিতার বই। 'মনসা-মঙ্গলের' বেহুলা চরিত্রের প্রতীকত্ব নিরূপণ-ই এই গ্রন্থের উপজীব্য। গল্পের বেহুলা যে তরণীতে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাত্রা ক'রেছিলেন, দাসগুপ্ত মহাশয় ব'লছেন, সেটি লৌকিক কোনো যান নয়,—সে হ'চ্ছে আমাদের স্মৃতি। স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়।

"অতি সযতনে স্মৃতির ভেলায় দয়িতের দেহ রাখি
কালের সাগরে বেহুলা ভাসিয়া চলে।"

ডক্টর দাসগুপ্ত বোধ হয় দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'বিদ্রোহিণী' নামক উপন্যাসেও অতি-দার্শনিকতার প্রলেপ দেখা গেছে। তত্ত্বসার সাহিত্য বিরুদ্ধ-বচনেরই দৃষ্টান্তস্থল। সাহিত্যের পাঠক ভিন্ন শ্রেণীর রস-প্রত্যাশী। এই স্থূল, পরিচিত, লৌকিক পৃথিবীর সংস্পর্শ এড়িয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা অনুভব করা সাহিত্য-পাঠকের স্বধর্ম নয়,— সাহিত্যিকেরও নয়। আটষট্টি পাতার এই সুদীর্ঘ বই-এর মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত একটু আধটু প্রকৃতির ছবি যেখানে চোখে পড়ে, সেইখানে মন তবু একটু হাঁপ ছাড়বার অবসর পায়। অকূল সমুদ্রে সবুজে-শ্যামলে-রঞ্জিত এই ছোটো দু'একটি দ্বীপ-রচনার জন্যই দাসগুপ্ত মহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। এমনি একটি আশ্রয়ের দৃষ্টান্ত ঃ—

"বুনো হাঁসগুলি এপার হইতে ওপারে যেতেছে চলি
ক্বক্ ক্বক্ ডাকি উড়ে যায় সাদা বক।
শেওলার মাঝে পানকৌড়িরা ডুবিয়া করিছে খেলা,
ঠোঁটে ঠোঁটে রাখি সঘন সম্ভাষণ।
জারুলের ছোট শাখে
থাকিয়া থাকিয়া হলুদ পাখীটি লঘু অস্ফুট ডাকে।"

'কলেজ বয়' হালকা হাসির কবিতা লিখতে সিদ্ধহস্ত। তাঁর বইখানি যাঁর নামে উৎসর্গ করা হ'য়েছে, সেই সজনীকান্ত দাস এই শ্রেণীর রচনায়

বর্তমান কালে এদেশে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। স্বভাবতঃই 'কলেজ বয়' সজনীকান্তের প্রভাবমুক্ত হ'তে পারেন নি। তবু নিঃসন্দেহে তাঁকে শক্তিমান বলা যায়। এই বই-এর 'প্যারডি' এবং 'উদ্ভট' শীর্ষক কবিতাগুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে। একটি 'উদ্ভট' রচনার নমুনা দেওয়া যাক ঃ—

যদি

গাছে গাছে টাকা যদি রহিত ফলিয়া,
জ্যো'স্না হতে মদ যদি পড়িত গলিয়া,
সকলের পত্নী যদি হতো সকলের,
গাঁজা খেয়ে ভেবে দেখো জবাবটা এর ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

মিথ্যার সাথে মিতালি বা বর্ত্তমান যুদ্ধে হিটলার।—লেখক ঃ ভাইকাউন্ট মহ্‌ম, গ্রেট বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব লর্ড চ্যান্সেলর। অনুবাদক ঃ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়।—অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস।—মূল্য আট আনা।

এই পুস্তিকাটি Lies as Allies or Hitler at War নামক ইংরেজী পুস্তিকার অনুবাদ। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে রাষ্ট্রীয় কূটনীতির অন্যতম প্রধান সহায়ক প্রচার এবং এই প্রচারকার্য্যের প্রধান সহায়ক সুনিপুণ মিথ্যা-প্রয়োগ। কিন্তু এই মিথ্যাপ্রয়োগের মাত্রা যে কতদূর যাইতে পারে ও তাহাতে নৈপুণ্য অপেক্ষা নির্লজ্জতা কি পরিমাণে প্রকট হওয়া সম্ভব তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান জার্মাণীর রাষ্ট্রনীতিতে ও রণনীতিতে। এবং যে-হেতু হিটলার বর্তমান জার্মানীর নেতা ও মুখপাত্র সুতরাং স্বভাবতই এইরূপ নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণের চরম প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার রচনা ও বাণীতে। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে হিটলারের মিথ্যা ভাষণের যে-সকল পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয় এই ভাবিয়া যে কী করিয়া সমগ্র একটি জাতিকে এইরূপ মিথ্যাভাষণে ভুলাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে! হিটলার

সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনো রকম মোহ আছে এই পুস্তিকাটি পড়িলে তাহা দূর হইবে আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের হাত আছে, সমগ্র পুস্তিকাটিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু চরম পরিচয় পাওয়া যায় পুস্তিকাটির নামের অনুবাদে।

রাধাকান্ত চৌধুরী।

আমাদের গল্প।—শ্রীঅবিনাশ সাহা। নিউ বুক ষ্টল, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।···দাম সাড়ে চার আনা।

বইটি ছোটদের জন্যে লিখিত কয়টি গল্পের সমষ্টি। রচনা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। ছোট ছেলে মেয়েরা পড়িয়া উপভোগ করিবে মনে হয়। বইটিতে কয়েকটি ছবিও আছে। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

RABINDRANATH TAGORE—Two Portraits by Ranee Chanda.

শ্রীমতী রাণী চন্দ চিত্রশিল্পী হিসাবে সুপরিচিতা। রবীন্দ্রনাথর এই দুইটি ছবিতে তাঁহার নিপুণ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ছবি দুইটির তারিখ ১১ই মাঘ ১৩৪৭ ও ২৮শে মে ১৯৪১। দুটিতেই কবির স্বাক্ষর আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের চেহারা এই দুটি ছবিতে চমৎকার ফুটিয়াছে। আশা করা যায় এই দুটি ছবির বিশেষ আদর হইবে।

ক. খ. গ.

কোপবতী—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। কাত্যায়নী বুক ষ্টল ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম আড়াই টাকা।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রমথ বাবুর সুনাম আছে যে তিনি হাল্‌কা প্রবন্ধে, হাস্য-রচনায় এবং ব্যঙ্গ-নিপুণ নক্সায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কেবল মাত্র দুষ্ট সরস্বতীর শিষ্য বলে তাঁর পরিচয় দিলে তাঁর উপর অবিচার করা হয়।

আমার বক্তব্য এই: প্রমথবাবু গম্ভীর হতে জানেন এবং মনের যে

প্রেরণায়, যে শান্ত ও সমাহিত ভাবের মধ্যস্থতায় একখানি সার্থক উপন্যাসের জন্ম হতে পারে, সে মন তাঁর আছে। যাঁরা 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' একটু যত্ন করে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—একটি প্রাচীন বংশের উত্থান-পতনের কাহিনীকে কেন্দ্রায়িত ক'রে প্রমথবাবু বিগত যুগের সামাজিক ঐতিহ্যকে কেমন করে মানুষের জীবন ও তার পরিবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রমথবাবুর লেখায় পেয়েছিলাম আখ্যানের লৌকিক অর্থ নয়, তার বিস্তৃততর সংজ্ঞা। জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, মানব-মনের বিশ্বাস ও সংস্কার—এ সব মিলেই ইতিকথার প্রকৃত ব্যাখ্যান। আর একখানি উপন্যাস 'পদ্মা' আমার কাছে নতুন লেগেছিল; তার কারণ তার রচনার ছাঁচ ছিলো সম্পূর্ণ মৌলিক। অন্ততঃ তখনো পর্য্যন্ত প্রকৃতি অথবা তার কোনো এক অঙ্গকে নায়কস্থানীয় ক'রে বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখা হয় নি। 'পদ্মা'য় গল্পাংশ তেমন জমে উঠ্‌তে পারেনি। অবশ্য এ ক্রটি ছিলো অনিবার্য্য; কেন না সেখানে নায়িকা হল নদী,—যার ক্রিয়াকল্প ও কার্য্যকারী প্রভাব মানুষের জাগতিক সম্বন্ধের ও অন্তরঙ্গ অনুভূতির বাইরে। অতো বড় পট-ভূমির অশরীরী আকর্ষণকে বাঙ্ময় করে তোলা আর সেই সঙ্গে কথাবস্তুর শিথিলতা এড়িয়ে যাওয়া রীতিমত শক্তিশালী প্রতিভার অপেক্ষা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঙ্গিকের অভিনবত্বে এবং শিল্প-প্রচেষ্টার সততার জন্যে প্রমথবাবুর কৃতিত্ব প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করতে হয়।

'পদ্মা'র সঙ্গে 'কোপবতী'র রক্তগত সম্বন্ধ পরিষ্কার। এবং প্রথম উপন্যাসে পদ্ধতির যে নূতনত্ব লক্ষ্য করার বস্তু ছিল, এ বইখানিতে সেই অসম্পূর্ণ ইঙ্গিতেরই অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। একটি দুরূহ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রমথবাবু এসে পৌঁছেচেন এবং এ কথা বলা চলে যে তিনি নায়িকা-প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপ ও তার চারিত্রিক প্রভাবকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে ফোটাতে পেরেছেন। এ উপন্যাসের নায়িকা হ'ল 'কোপাই' নদী—বাঙলা দেশের রুক্ষ প্রান্তর আর মালভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যে নদী অনুর্ব্বরতার উপরে শ্যামলতার স্নিগ্ধ প্রলেপ টেনেছে। এর পটভূমি হ'ল বীরভূমের রিক্ত গেরুয়া মাটি আর খোয়াই; পরিণতি হ'ল নিয়তির অভ্রান্ত দ্বন্দ্বজটিল আবর্ত্তন। এ উপন্যাসখানায় তিনটি ভিন্নমুখী সাহিত্যিক ধারার সমন্বয় ঘটেছে :—রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মভূমি, হার্ডির শিল্পমার্গ আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গিমা। রবীন্দ্রনাথের সাধনাস্থলের সঙ্গে যাঁদের চাক্ষুষ এবং নিবিড় পরিচয় আছে তাঁরাই মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করবেন এই ভৌগোলিক সংস্থানের বিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয়তা, বর্ষাধৌত বীরভূমের অপরূপ গৈরিক শোভা। মনে হবে এই পরিবেশের মধ্যেই হার্ডির কল্পিত চরিত্রগুলির সম্ভাবনা মানায়; এই

নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব মালভূমির ওপরেই অদৃষ্টবাদের সার্থক লীলা-বৈচিত্র্য। প্রমথবাবুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কবি-প্রাণের সত্যোপলব্ধি ধরা পড়েছে তাঁর উজ্জ্বল শিল্পে, ভাষার হৃদয়বান্ মুখরতায়। কিন্তু স্থানে স্থানে মনে হয়েছে—অজস্র শব্দ যোজনায় আর আবেগের আতিশয্যে শিল্পী কলমকে সংযত করতে পারেননি, হারিয়ে ফেলেছেন আপনাকে উদ্দেশ্যের পুনরুক্তিতে, চিত্রের অতিরঞ্জনে। এর জন্যে অবশ্য লেখকের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যই দায়ী।

স্বীকার করি—কল্পনা এখানে মুখ্য। পশ্চাদ্‌ভূমি যেখানে নীরব গৌণতা থেকে নেমে এসেছে জীবনের মূক অভিসন্ধিতে, ঘনিষ্ঠ উপস্থিতির শারীরতায় এবং চালিত করেছে অদৃষ্ট-প্রভাবকে—সেখানে কল্পনার বলিষ্ঠ প্রয়োগের প্রয়োজন। প্রথম খণ্ডটি সেই কারণে উপন্যাসের গৌরব, আমার কাছে তা' পরম চিত্তাকর্ষক। চটুল 'কোপাই'-এর ছলনা-লীলা ও দুর্নিবার আকর্ষণ; দ্বিতীয়া নায়িকা ফুল্লরার স্বভাবজ সুকুমার সৌন্দর্য্য আর নায়ক বিমলের সংশয়গ্রস্ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব মনোভাব এমন একটি জটিল ত্রিকোণের সৃষ্টি করেছে যার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনার পরিণতি অথবা সুনির্দ্দেশ পাওয়া উচিত দ্বিতীয় খণ্ডটিতে। এই অংশে কিন্তু প্রমথবাবুর যন্ত্রের তার একটু ঢিলে হয়ে এসেছে—ফলে বাঁধা সুর কিছুটা নেমে এসেছে। কারণ নায়কের পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির পর যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের জন্ম, তার পিছনে প্রকৃতির প্রেরণা আছে সুনিশ্চিত। কিন্তু ঠিক্ এইখান থেকেই প্রকৃতির ব্যবধান সুরু হয়েছে, জীবনকে সে আর সান্নিধ্যের স্পর্শে প্রাণবান্ করতে পারছে না। প্রেমে এল স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ, ফলে মনস্তত্ত্ব আর নিজেকে বোঝবার পালা হয়ে উঠ্‌ল বড়। 'কোপাই' দূরে সরে গেল; এর পর থেকে পটভূমির আব্‌ছায়ায় নিজের দূরত্ব রক্ষা ক'রে সে বাস্তব জীবনের স্বপ্নহানি আর আত্মরতির একটা অপ্রত্যক্ষ মোহজালের সৃষ্টি করেছে মাত্র। এখানে প্রকৃতি তার আদিম সরলতা এবং নিষ্ঠুর শক্তিমত্তা হারালো। 'কোপাই' হয়ে উঠ্‌ল ইন্দ্রধনুর বর্ণমণ্ডল যার আকস্মিক প্রতিফলনে দুটি নর-নারীর জীবন আদিম কামনায় কখনো হচ্ছে রঙীন্ আবার আসন্ন নিয়তির বিক্ষোভে কখনো হয়ে উঠ্‌ছে স্বেচ্ছাকৃত বিভ্রমের কৃষ্ণ-কুটিল মেঘ। এক কথায়—প্রকৃতি যেন উদ্দেশ্য সাধন করেই অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে মানুষের সঙ্গে আধুনিক সমস্যার মীমাংসা নিয়ে লুকোচুরি খেলতে সুরু করলে। প্রমথবাবু হার্ডির পদ্ধতি অনুসরণে যদি এখানে ডিগরি ভেন্ কিংবা মার্টি সাউথের মতো কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অবতারণা করতেন, তা হলে তাল কাট্‌ত না—উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে মানব মনের আর জীবনের ওপরে প্রকৃতির দুর্নিবার প্রভাব সেই চরিত্রের প্রতিঘাতেই আরো স্পষ্ট ও সত্যধর্ম্মী হয়ে রূপ নিতে পারত। 'কোপবতী'র প্রথম ভাগে প্রকৃতির

ওপরে মানবত্বের যে সুন্দর অধ্যাস করা হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগের সাংসারিক দ্বন্দ্বে আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা যেন স্থানচ্যুত, অবাস্তব বলে ঠেকেছে।

আসল কথা—প্রমথবাবুর মনে শিল্পীর দ্বন্দ্ব আজো নিরসন হয়নি। বহির্জগতের বাস্তব সত্য আর মনোজগতের অন্তর্নিবিষ্ট সত্যকল্পতা—এদের মধ্যে কে জয়ী হবে, তার সমাধানের জন্যে তাঁর পররর্ত্তী উপন্যাসের প্রতীক্ষায় আমি বসে থাক্‌তে রাজী। কেন না উপমায় আর ভাষায়, আখ্যানে আর ব্যাখ্যানে, আদর্শে আর পরীক্ষায় তিনি যে সত্যিকারের মৌলিকতার পরিচয় দিলেন এ বইতে, তার পূর্ণতর সম্ভাবনা এবং সংহততর রূপ সমালোচকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

A WOMAN OF INDIA by G. S. Dutt. Oxford University Press. Rs 2/.

৺গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের লেখা তাঁর স্ত্রীর জীবন কথার তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। ৺সরোজ নলিনী দেবীর কর্ম্মবহুল জীবন কতোখানি দেশবাসীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, বর্ত্তমান সংস্করণ তারি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। একাধারে স্ত্রী ও জননী হয়ে স্বজাতির মঙ্গল কামনায় এমন একটি সুদূরবিস্তৃত ফলপ্রদ অনুষ্ঠান গড়ে তোলা সামান্য কথা নয়। এ বইয়ে সরোজ নলিনীর সৌভাগ্যবান, স্বামী তাঁর জীবনের নানাদিক্ ফুটিয়ে তুলেছেন যা সকলের কাছেই সুখপাঠ্য। এণ্ড্রুজ্-সাহেবের ভূমিকা আর রবীন্দ্রনাথের মুখবন্ধ থেকেই প্রমাণ হয় সরোজ নলিনীর আদর্শ ও কর্ম্মস্পৃহা কি ধরণের ছিল। নারীর সামাজিক কল্যাণের খাতিরে এ বইয়ের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সায়ম্—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সারস্বত-মন্দির, ১, রমেশ মিত্র রোড ভবানীপুর। দাম দেড় টাকা।

একদা যতীন্দ্রনাথের কাব্যে যে নতুন সুর বেজেছিল, তা রসিক পাঠকের কাছে যথাযোগ্য সমাদর পেয়েছিল। ফিকে ভাবালুতা ও গতানুগতিক রোমাণ্টিক পন্থা ত্যাগ করে বাস্তব জগতের ক্লিন্ন, মোহহীন পথ ধরেই তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'মরীচিকা'য় যে বলিষ্ঠ কল্পনা, তীব্র জিজ্ঞাসা ও অস্বস্তিকর সমালোচনার প্রীতিকর আবির্ভাব হয়েছিল, 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়াতে' তারই পুনরাবৃত্তি চল্‌তে লাগল। ফলে নতুনত্বের

রঙ্ উঠে গিয়ে নৈরাশ্য এবং তথাকথিত নাস্তিকবাদ মানসিক মুদ্রাদোষের পর্য্যায়ে দাঁড়িয়ে গেল। বর্ত্তমান কাব্যগ্রন্থে পুরানো আঙ্গিকের ও বিষয়-বস্তুর কোনো বদলই পেলাম না। "কচি ডাব" যতীন বাগচী মহাশয়ের "কেয়াফুলের" কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; "নাস্তিক" "মাটির কাজে" প্রভৃতি কবিতা যতীন্দ্রনাথের কাব্যে ভাঁটার টান।

কয়েকটি কবিতায় অবশ্য যতীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রয়েছে :

পথপার্শ্বে মলিন দোকানে, স্বর্ণশালে,
কাঁপে পাণ্ডু দীপশিখা,
অগ্নিস্নাত অঙ্গারিকা
পাংশু কুণ্ডে ছাড়ে কালো পাড়ি,
লোহার ছেনির মুখে রূপার আশায়
কনক হতেছে কারুময়ী।

(রূপ কোথা আছে)

অথবা—

কৃষ্ণ সাগর উড়াইয়ে লয়ে—
কালবৈশাখী ঝড়ে
সাহারার বুক জুড়াবে কি ওরা
ঘন মেঘাড়ম্বরে ?
আকাশে আকাশে নিবাইয়ে বাতি
সঞ্চারি' কালো ছায়া
অতলান্তিকে ডুবাইয়ে কি রে
যত প্রশান্তী মায়া ?

(এসিয়ার আশা)

এ সব লাইনের মধ্যে দিয়ে যে ছবি ফুটে ওঠে, তাতে কবির নিজস্ব পরিপ্রেক্ষণী বর্ত্তমান।

কিন্তু এমন অনেক কবিতা আছে যা কষ্ট করে' পড়তে হয়। কবির একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে বিসঙ্গত বাক্যের প্রতি। তাই তাঁর তথ্য-মূলক কবিতাগুলিতে পাই বিরোধমূলক উক্তির সাহায্যে একটা সত্যকল্পতার প্রতিপাদন; যেমন "পাঁকাল-বন্দনা।"

'সায়ম্' নামকরণটি কবির ইচ্ছাকৃত কি না জানি না। তবে তাঁর একদা উজ্জ্বল বিশিষ্ট কাব্যশিল্প আজ সায়াহ্নে ম্লানায়মান, একথা শুধুই রূপক নয়।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু—সুশীল রায়। শ্রী পাব্লিশিং কোম্পানী। ৩৭-৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

সুশীল রায়ে-র "একদা" উপন্যাসখানি পড়ে মনে হয়েছিল যে আঙ্গিকের দিক্ থেকে তার সম্ভাব্যতা আছে। তাঁর দ্বিতীয় রচনা পড়ে মনে হল তাঁর লিপিকৌশল এবং গল্প বলার ভঙ্গীটি মনোরম হলেও সেই গঠন-শিল্প এখনো করায়ত্ত হয় নি। অবশ্য স্বীকার করি যে এ গল্পের বিষয়বস্তুতে আরো বেশী জটিলতা এবং কিছু পরিমাণে নতুনত্ব এসেছে। চিঠির মারফৎ তিনি যে গল্পপদ্ধতি অবলম্বন করে গল্প গড়ে তুলেছেন সেটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌলিক না হলেও কৃতিত্বের অপেক্ষা রাখে যে হেতু ব্যক্তিগত চিন্তা, মন্তব্য ও প্রক্ষিপ্ত বর্ণনার মাঝখান দিয়ে গল্পের স্রোত সাম্‌লে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ শক্ত কাজ। এ বইয়ের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি খণ্ডচিত্র আছে যেগুলি মূল গল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ওঠেনি ; তাদের এপিসডিক্ মূল্য থাকলেও গল্পের সম্পূর্ণতা তাদের বাদ দিয়েও সম্ভব হতে পারতো।

সুশীল বাবুর ভাষা ঝরঝরে, সুখপাঠ্য ও তাঁর ছোটো-ছোটো টিপ্পনীগুলো বেশ উপভোগ্য, যেখানে মন থমকে দাঁড়ায়। আসল গল্পের ভেতরে আর একটি ছোটো প্লট্ ঘুরছে এবং দুটি কথাবস্তুরই কেন্দ্রস্থল এক জায়গায়। কিন্তু অনুকথার নায়ক-নায়িকা তেমন জীবন্ত হতে পারেনি যেমন সজীব হয়েছে বড়ো গল্পের বিজন ও কৌমুদী। কৌমুদীর জীবন-বৃত্তান্ত একেবারে অবিশ্বাস্য না হলেও একটু ইতালীয়ান্ ধরণের রোমান্টিক হয়ে পড়েছে। এ-ও বোঝা যায় ও মেনে নেওয়া যায় গল্পের খাতিরে, কিন্তু সুশীলবাবু শিকারী ভদ্রলোক মহিমবাবুকে দু' দু'বার অকারণে টেনে আনলেন কেন ? এর আগেই যবনিকা পড়া উচিত ছিলো ; তাতে গল্পের স্বাভাবিক ছেদ ঘট্‌ত না। গল্প বিয়োগান্ত হোক্ ক্ষতি নেই,—কিন্তু এতগুলো মৃত্যু এক সঙ্গে এনে ফেলায় সুশীলবাবু কষ্টকল্পিত পরিণতির সন্ধান করেছেন। প্রকাশকের হাতে গল্পের বইটা ছেড়ে দেবেন—এই মূল প্রতিপাদ্য নিয়ে লিখতে গিয়েই এই ত্রুটি অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। পূর্ব্বকল্পিত কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে শেষ অধ্যায়টি কিছু অসঙ্গত হয়ে উঠেছে।

মোটের ওপর বইখানি পড়ে খুসী হলাম। এতে ত্রুটি আছে অবশ্যই, আর উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গ সফলতা কয় জনই বা পেয়েছেন ? কিন্তু সুশীলবাবুকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে গল্প রচনায় ও প্রকাশদক্ষতায় তাঁর যখন স্বভাব-ক্ষমতা রয়েছে, তখন আধুনিক টেক্‌নিকের অযথা খাতিরে কয়েকটি সিনেমা-রাজ্যের দৃশ্যের অবতারণা কেন তিনি করলেন ? গল্পের আবর্ত্তকে নিরর্থক জটিল করলে শিল্প-কৌশল স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগামী উপন্যাসে তাঁর প্রতিশ্রুতি সার্থকতর হবে, এ ভরসা করি। উপন্যাস খানির আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। সারা উত্তর-বঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যার মধ্যে লেখকের কাব্যদৃষ্টি ও প্রসন্ন অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।

মজলিস—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং। দাম পাঁচ সিকা।

'ভাস্কর' ছদ্মনামেই জ্যোতির্ম্ময় বাবু বেশি পরিচিত। ইতিপূর্ব্বে তাঁর দুখানি সরস প্রবন্ধ ও গল্পের বই বেরিয়েছে। যে কয়েকজন মাত্র লেখক বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়েই লিখে থাকেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এই একান্ত বাঙালী-প্রীতি ছেড়ে তিনি যদি অন্য বিষয় নিয়ে লেখেন, তাহলে সাহিত্যের উপকার হয়। ও জিনিষটা প্রায়-চর্ব্বিত-চর্ব্বণেরই সামিল। বিশেষ ক'রে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর যখন হাস্যরসে স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে, আর তার চেয়েও দরকারী গুণ সামঞ্জস্য-জ্ঞান আছে, তখন প্রাচীন আর নবীনের সংঘাত আর বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখের পুরানো চিত্র না এঁকে আপনার শক্তিকে যোগ্যতর পথে নিয়োজিত করতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি "লেখা" পড়ে যতটা তৃপ্তি পেয়েছিলাম, "মজলিস"-এ সে মজলিসি ভাবের অভাব লক্ষ্য করেছি। তবু ওরি মধ্যে 'আর্ট ও জুতা,' 'প্রাণ ও ডাঁটা' নকসা দুটি সরস হয়েছে ; সব চেয়ে ভালো উৎরেছে "খোকা"। এটি একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা হ'তে পারতো যদি জ্যোতির্ম্ময় বাবু শেষ চারটি লাইন বাদ দিতেন। এতো ছোটো গল্পের আঁট-বাঁধুনি অসতর্ক অতিভাষণের ব্যাখ্যায় ঢিলে হয়ে গেছে।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু এই ধাঁচের আরো গল্প লেখেন না কেন ? 'সবুজ পত্রে'র যুগে একমাত্র প্রবোধ ঘোষ মহাশয়ের হাতে এই আঙ্গিক সফল হয়েছিল।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।